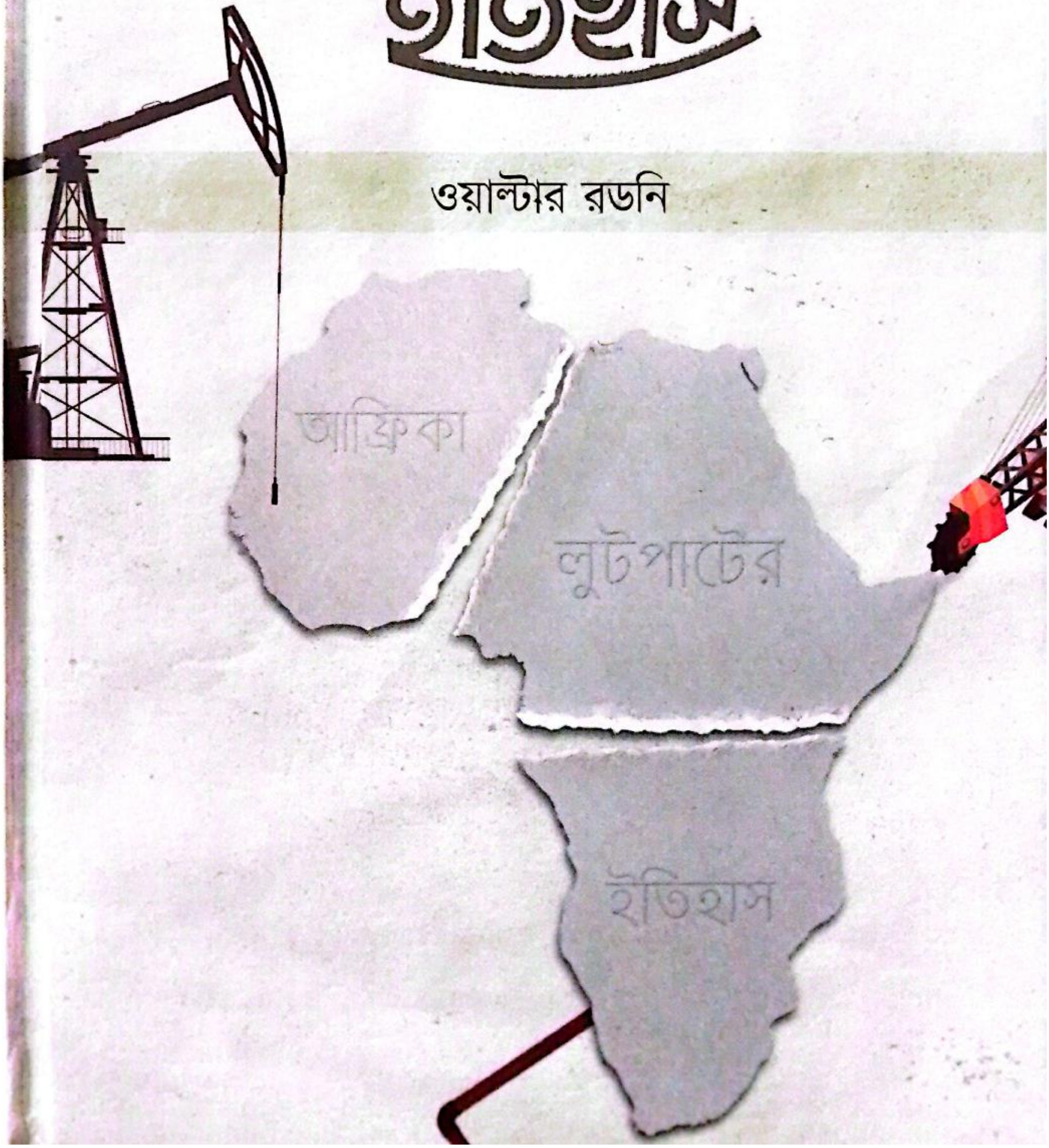
'হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপড আফ্রিকা' বইয়ের অনুবাদ

আফ্রিকা লুটপাটের ইতিহাস

ওয়াল্টার রডনি



সূচিপত্র

এঞ্জেলা ওয়াই. ডেভিসের পূর্বকথন | ৯-১২ |

মু খ ব ন্ধ | ১৩-১৪ |

ভূ মি কা | ১৫-৩২ |

ওয়াল্টারের পদচিহ্ন ---------- ২৯

আফ্রো-আমেরিকান চ্যালেঞ্জ ---------- ৩১

উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন | ৩৩-৬৭ |

উন্নয়ন কী? ---------- ৩৩

অনুন্নতি কী? ---------- ৪৬

ইউরোপীয়দের আগমনের আগ পর্যন্ত আফ্রিকার উন্নয়ন (পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত) | ৬৮-১২০ |

একটি সার্বিক চিত্র ---------- ৬৮

কিছু বাস্তব উদাহরণ ---------- ৮৮

- মিশর ---------- ৮৮
- ইথিওপিয়া ---------- ৯১
- নুবিয়া ---------- ৯৪
- মাগরেব ---------- ৯৫
- পশ্চিম সুদান ---------- ১০০
- হ্রদঘেরা অঞ্চল ---------- ১০৭
- জিম্বাবুয়ে ---------- ১১১

উপসংহার ---------- ১১৭

ইউরোপীয় পুঁজিবাদী উন্নয়নে আফ্রিকার অবদান (প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ) | ১২১-১৪২ |

ইউরোপ যেভাবে বাণিজ্যব্যবস্থার অধিপতি হয়ে উঠল ---------- ১২১

পুঁজিবাদী ইউরোপের অর্থনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আফ্রিকার অবদান ---------- ১৩১

ইউরোপ এবং আফ্রিকান অনুন্নতির শেকড় (১৮৮৫ পর্যন্ত) | ১৪৩-২১৬ |

আফ্রিকার অনুন্নয়নের মৌলিক প্রভাবক হিসেবে ইউরোপীয় দাসব্যবসা ---------- ১৪৩

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে কারিগরি স্থবিরতা এবং আফ্রিকান অর্থনীতির বিকৃতি ---------- ১৫৪

আফ্রিকায় অব্যাহত রাজনৈতিক-সামরিক উন্নয়ন— ১৫০০ থেকে ১৮৮৫ ---------- ১৬৮

- ইয়োরুবা ---------- ১৭০
- ডাহোমি ---------- ১৭৭
- পূর্বদিকের হ্রদঘেরা রাষ্ট্রসমূহ ---------- ১৮১
- রুয়ান্ডা ---------- ১৮৬
- আমা-জুলু ---------- ১৯০

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের আগমন ---------- ২০০

ইউরোপের পুঁজিবাদী উন্নয়নে আফ্রিকার অবদান—ঔপনিবেশিক যুগ | ২১৭-২৮৮ |

উপনিবেশবাদের অধীনে আফ্রিকার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিদেশে স্থানান্তর ---------- ২১৭

- পুঁজি ও আফ্রিকান মজুরিভুক্ত শ্রম ---------- ২১৭
- ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানি বনাম আফ্রিকান কৃষক ---------- ২২৪
- জাহাজ-পরিবহন ও ব্যাংকিং খাত ---------- ২৩২
- অর্থনৈতিক শোষক হিসেবে ঔপনিবেশিক সরকার ---------- ২৩৭

পুঁজিবাদের প্রযুক্তিগত ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ---------- ২৪৯

▪ উপনিবেশবাদের ফলে ইউরোপের অন্যান্য উপকার :
প্রাথমিক পর্যালোচনা ---------- ২৪৯
▪ আফ্রিকাকে শোষণের অন্যতম প্রধান
সুবিধাভোগী হিসেবে ইউনিলিভার ---------- ২৫৮
▪ উপনিবেশবাদ থেকে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তির উপকার লাভ - ২৬৬
▪ মেট্রোপলিটন অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার
নিয়ামক হিসেবে উপনিবেশবাদ ---------- ২৭২

আফ্রিকাকে অনুন্নত করার
ব্যবস্থা হিসেবে উপনিবেশবাদ | ২৮৯-৩৮৫ |

আফ্রিকায় পুঁজিবাদের কথিত সুবিধাসমূহ ---------- ২৮৯
▪ আর্থসামাজিক বিভিন্ন সেবা ---------- ২৮৯
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ----- ৩১২
অনুন্নতির জন্য শিক্ষা ---------- ৩৩১
দ্বন্দ্বের মাধ্যমে উন্নয়ন ---------- ৩৬০

পুনশ্চ | ৩৮৬-৩৯২ |

এঞ্জেলা ওয়াই. ডেভিসের পূর্বকথন

ওয়াল্টার রডনিকে হত্যা করা হয় ১৯৮০ সালে। তখন তার বয়স মাত্র ৩৮। এই সময়ের মাঝেই তিনি যেসব কাজ করে গেছেন, তার চেয়ে যথেষ্ট আয়ু লাভকারী অনেক বিশেষজ্ঞও তা করতে পারেননি। *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা* প্রকাশিত হওয়ার পর চিরতরে পালটে গেছে আফ্রিকার ইতিহাসের ময়দান। আফ্রিকা মহাদেশের ওপর ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের স্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে এটি অত্যন্ত যত্নশীল গবেষণা। সারা বিশ্ব জুড়ে বর্ণবাদ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের রূপরেখাও রাতারাতি পালটে গেছে এর ফলে। সত্যি বলতে কী, "স্কলার-অ্যাক্টিভিস্ট" তকমাটি সবচেয়ে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ওয়াল্টার রডনির বেলায়। একদিকে তার গবেষণাকর্ম, অন্যদিকে এই গ্রহকে উপনিবেশবাদ ও দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তার দৃঢ় সংকল্প। এ দুয়ের মেলবন্ধন তিনি ঘটিয়েছেন এক অদম্য সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে। তার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পরে এসেও এরকম উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। আমাদের সামাজিক জগতকে পালটে দেওয়ার সক্ষমতাই যে জ্ঞানের চূড়ান্ত তাৎপর্য—ব্যাপারটি বুঝতে পারার মতো প্রত্যয়ী বুদ্ধিজীবী এখনো দরকার আমাদের।

ওয়াল্টার রডনির আগে ও পরে অনেকেই মার্কসবাদ নিয়ে পর্যালোচনামূলক কাজ করেছেন। উপনিবেশবাদ ও দাসপ্রথার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন। তাদের সবার থেকে শেখার বিষয়টি হলো—মানবীয় প্রকৃতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানো। যেসকল তাত্ত্বিক ও কর্মী বর্ণবাদের কাঠামো ও দর্শনকে ভাঙতে চান, তাদের জন্য এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। 'স্থবিরতার প্রতি আফ্রিকার সহজাত প্রবণতার কারণেই ইউরোপের হাতে তারা পদানত হয়েছে'—এই যুক্তিকে

খণ্ডন করেছেন রডনি। সেইসাথে মতাদর্শ-তাড়িত আরেকটি ধারণার অপনোদন ঘটিয়েছেন যে, বহিরাগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই কেবল মহাদেশটিতে প্রগতির সূচনা ঘটানো সম্ভব ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশায়ন স্থায়ী হয়েছে মাত্র সত্তর বছরের মতো, যা বেশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রডনি দেখিয়েছেন, ঠিক এই যুগেই পুঁজিবাদী বিশ্বে (অর্থাৎ, ইউরোপে ও যুক্তরাষ্ট্রে) এবং উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে (বিশেষত রাশিয়ায় ও চীনে) ঘটে গেছে বিশাল সব পরিবর্তন। তিনি বলেন, "অন্যেরা যখন লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে এগোচ্ছে, তখন গড়িমসি করা বা এমনকি ধীর-পায়ে চলাটাও পিছিয়ে পড়ারই নামান্তর।" *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা*-য় তিনি বেশ খাটাখাটনি করে দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মদদদাতারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই মহাদেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে এক অভেদ্য দেয়াল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু "উন্নতি সাধনের চূড়ান্ত দায়িত্ব" থেকে আফ্রিকানদের দায়মুক্ত করাটাও আবার তার আলোচনার উদ্দেশ্য নয়।

আফ্রিকা মহাদেশে আমি প্রথমবার ভ্রমণ করি ১৯৭৩ সালে। সে-বার ওয়াল্টার রডনির সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে অত্যন্ত ধন্য মনে করি নিজেকে। দার-এস-সালামের নিকটে হওয়া এই সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করলাম, কারণ *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা* প্রথমবার প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুকাল পরেই এ ঘটনা ঘটে। তাকে ঘিরে তাত্ত্বিক ও কর্মী মহলে যে বিপ্লবী তাড়না সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিকে ক্ষণকালের জন্য স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয় আমার। আফ্রিকার স্বাধীনতা এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মাঝে সম্পর্ক নিয়ে দার-এস-সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেসকল বক্তৃতা ও আলোচনার আয়োজন করেছিলেন, সেগুলোও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার ওপর এমপিএলএ'র প্রশিক্ষণ শিবিরেও ঘুরে এসেছি। যেখানে আমি সাক্ষাৎ করেছি আগোস্টিনিয়ো নেটো এবং পর্তুগিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত সামরিক শিক্ষানবিশদের সাথে। ওয়াল্টার রডনির বিশ্লেষণে মার্কসবাদী আলোচনা-পর্যালোচনা দিয়ে সাজানো এক গুরুগম্ভীর ও যুক্তিনির্ভর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রতিফলিত হয়েছে। আরেকদিকে উঠে এসেছে বৈশ্বিক বিপ্লবী উত্থানের দ্বারা প্রভাবিত ঐতিহাসিক অনুমানের এক গভীর অনুভূতি। বিশেষত সে-সময়কার আফ্রিকান স্বাধীনতা সংগ্রামগুলো এতে বেশ প্রভাব ফেলেছে।

শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে, লিঙ্গ-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে তিনি উপেক্ষা করেননি। অথচ তিনি এ কাজ করেছেন নারীবাদী শব্দভাণ্ডার ও কাঠামোর সুবিধা ব্যবহার না করেই—যেগুলোর বিকাশ ঘটেছে অনেক পরে। কারও কারও মতে, তিনি আরও সক্রিয় থাকতে পারলে নিঃসন্দেহে আরও

বেশি গুরুত্ব দিতেন এসব প্রশ্নের ওপর।

সে যা-ই হোক, লেখনীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রডনি লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। সতর্কভাবে দেখিয়েছেন যে, উপনিবেশবাদের অধীনে আফ্রিকান নারীদের "সামাজিক, ধর্মীয়, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ও অধিকার উধাও হয়ে যায়। অর্থনৈতিক শোষণ তো এ সময়ে অব্যাহত ছিলই, বরং কিছুক্ষেত্রে আরও জোরদার হয়ে গেছে।" তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, আফ্রিকায় শ্রমের ওপর উপনিবেশবাদের প্রভাবের ফলে পুরুষদের কাজ "আধুনিক" এবং নারীদের কাজ "সেকেলে" বা "পশ্চাৎপদ" হিসেবে তকমা পেয়েছিল। "অতএব, একদিকে নারীর শ্রমের মর্যাদা তো নেমে গেলই। এর ফলে আবার কোন কর্মের মূল্য আছে এবং কোনটির নেই, সে ব্যাপারে নিজস্ব মাপকাঠি নির্ধারণের অধিকারও হারিয়ে গেল।"

হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা যখন প্রথমবার প্রকাশিত হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ এক্টিভিজম একটি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা দিয়ে প্রভাবিত ছিল। আর তা হলো নারীরা স্বভাবগতভাবেই হীনতর। এই ধারণাটিকে প্রায়শ অন্যায়ভাবে আফ্রিকান সংস্কৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতো। এখানেই শেষ না। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কাঠামোকে মাতৃতান্ত্রিক বলে প্রচার করা হতো একদম আনুষ্ঠানিকভাবেই। আর যেহেতু নারী মানেই হীন, সেহেতু মাতৃতন্ত্র মানেই ত্রুটিপূর্ণ সমাজকাঠামো। সে যুগের কৃষ্ণাঙ্গ মৌলবাদী আন্দোলনগুলোর মাঝে লিঙ্গ নিয়ে এই যে ধরাবাঁধা ধারণা প্রচলিত ছিল, আমার মতো অনেকেই সেটার বিরোধী। তাই এই বইটি আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ওয়াল্টার রডনিকে হত্যা করা হয়, কারণ তিনি মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের বাস্তব সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। যেমনটি হয়েছে তার জন্মভূমি গায়ানায়। তার সময়কার ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঠিক যে ধরনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অবদান সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল, ওয়াল্টার রডনির কাজগুলো তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বর্তমান সময়ে তার এসকল ধারণা আরও বেশি মূল্যবান। কারণ পুঁজিবাদ বর্তমানে নিজের স্থায়িত্বকে আরও জোরেসোরে চাপিয়ে দিয়েছে। এর বিরোধিতাকারী যেসকল সুসংগঠিত শক্তি এককালে বিদ্যমান ছিল (শুধু সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা দেশগুলোই না, বরং নিরপেক্ষ দেশগুলোও), সেগুলোকে এখন প্রায় বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যারা বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে এই গ্রহের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ভবিষ্যৎ বলে মানি না, "অনুন্নয়নে"র দারিদ্র্যে আটকে থাকাকেই আফ্রিকা ও সাবেক তৃতীয় বিশ্বের

নিয়তি বলে মানি না, তাদের সামনে এখন একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত—বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পুঁজিবাদের মৌলিক সমালোচনাকে কীভাবে উৎসাহিত করা যায়? আবার, বর্ণবাদের কাঠামোগুলো অক্ষত থাকলে-যে পুঁজিবাদকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব না, এই স্বীকার্যকেও কীভাবে প্রচার করা যায়? এই দিক থেকে চিন্তা করলে, ওয়াল্টার রডনির রেখে যাওয়া কাজের অনুসরণ, সম্প্রসারণ ও গভীরায়ন আমাদেরই দায়িত্ব।

ভূমিকা

শুরুতেই একটি বিষয় আমাদের খোলাখুলি স্বীকার করা উচিত। আমাদের ভাই, বন্ধু ও কমরেড ওয়াল্টার রডনি মারা গেছেন। এই অনিবার্য বাস্তবতা মেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য বড়ই কঠিন। ১৩ জুন, ১৯৮০ সালে এই অনন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-কর্মের রচয়িতা এক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। হত্যা-সহ সব রকমের নিষ্ঠুর অভিযান নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করে আসছে তারই স্বদেশ গায়ানার সরকারি কর্তৃপক্ষ। রডনি সেই অভিযানের সবচেয়ে বিখ্যাত শিকার।

এই পরিণতি অনুমিতই ছিল। কারণ তার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সত্যিকার মানবীয় উন্নয়ন ও মুক্তির একমাত্র পথ কী হবে, তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ওয়াল্টার রডনি। আর তা হলো নব্য-উপনিবেশবাদী সরকারকে প্রতিস্থাপন ও পুনর্গঠিত করার সংগ্রাম। আর এরই মাধ্যমে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনয়ন। এই সরকার দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের সমাজকে শোষণ ও তাদের অস্তিত্বের গতিপথ ঠিক করে দিয়ে আসছে। গায়ানার রাষ্ট্রপতি ফোর্বস বার্নহাম বহুবার স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন একটি ঘোষণা। মানুষের হৃদয় ও মননকে দখল করার এই যুদ্ধে তিনি নাকি "বিরোধী শক্তিসমূহকে নিঃশেষ করে"ই ছাড়বেন। এক্ষেত্রে কোনো সীমা-পরিসীমায় বিশ্বাস করেন না তিনি। অনেকেই মনে করেন, ওয়াল্টার রডনির জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া বোমাটি নিঃসন্দেহে বার্নহামের এই মারাত্মক শপথেরই পরিণাম।

তার মৃত্যুকে মেনে নেওয়া ও হজম করা যত কঠিনই হোক, আমাদের শুরুটা এখানে মূলত আবেগ বা রাজনৈতিক আগ্রাসন সৃষ্টির জন্য হওয়া উচিত না। কিন্তু ওয়াল্টার রডনিকে না চিনলে *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা*-র ভূমিকা লেখা সম্ভব নয়। তিনি একজন বিপ্লব বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ বিপ্লবী। প্রচণ্ড সততা ও আশা-ভরসার স্থল। কারণ, এই ঘরানার বেশির ভাগ বইয়ের তুলনায় এই রচনাটি একদম আলাদা। লেখকের চেতনা, বুদ্ধিমত্তা ও

অঙ্গীকারে টইটম্বুর এই বই। এই লেখকেরও আবার দুটি সত্তা। একটি সত্তা ত্রিশ বছর হওয়ার আগেই এমন এক দুর্বিনীত ও বিশাল ব্যাপ্ত রচনার জন্ম দিয়েছে। আরেকটি সত্তা সেই বইয়ের তত্ত্বকে বাস্তব জীবনে আনার জন্য অবিচল সততা সহকারে সামনে এগিয়ে গেছে তার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে।

রডনির জীবন ও কর্ম ছিল একই সুতোয় গাঁথা। বইয়ের শিরোনাম যা-ই হোক, এটি কিন্তু নিতান্ত ইউরোপীয় নিপীড়ক ও আফ্রিকান ভুক্তভোগীদের নিয়ে কোনো রচনা নয়। আর না এটি শোষকদের চামড়া ছিলার কোনো অস্ত্র। তাদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক খেলায় তাদেরই পরাজিত করার কোনো হাতিয়ার নয় এই বই। (যদিও ওই ব্যাপারগুলোতেও বইটির জুড়ি মেলা ভার।) বরং এই সুনিপুণ সমীক্ষাকর্মের এর চেয়েও বড় ভূমিকা রয়েছে। আমাদের কাউকেই স্বস্তিতে ঘুমাতে দেয় না এই গবেষণাকর্মটি।

বইয়ের শুরুর দিকেই এক জায়গায় রডনি এর মৌলিক বার্তার সারাংশ লিখেছেন এভাবে : আফ্রিকার অনুন্নতির জন্য কে বা কী দায়ী, এই প্রশ্নটির উত্তর দুটি স্তরে প্রদান করা যায়—প্রথমত, উত্তর হলো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড এখানে একটি প্রধান দায়ভারের অধিকারী। এটি আফ্রিকার সম্পত্তি চুষে নিয়েছে এবং মহাদেশটির সম্পদের দ্রুততর উন্নয়নকে অসম্ভব করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, যারা এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং যারা উক্ত ব্যবস্থার প্রতিনিধি ও অবচেতন সহযোগী, তাদের নিয়েও কাজ করা চাই। পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদীরা তাদের শোষণকর্মকে ইউরোপের ভেতর থেকে শুরু করে পুরো আফ্রিকায় ছড়িয়ে দিয়েছে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে, বা কিছু ক্ষেত্রে তাদের জায়গা নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদীরা। এমনকি এখন বহু বছর যাবৎ ওইসকল মেট্রোপলিটন দেশের শ্রমিকরা পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে আফ্রিকার শোষণ ও অনুন্নতি থেকে।

এসবের সমর্থনে ওয়াল্টার বহু উৎস, সময়কাল ও স্থান থেকে তুলে এনেছেন বিপুল ও সৃজনশীল সব পুঙ্খানুপুঙ্খ উদাহরণ। তারপরও, নিপীড়কের ওপর একের পর এক সুপ্রমাণিত আঘাত ছুড়ে মেরেই তিনি ক্ষান্ত হননি—যদিও এই কাজে তার মুনশিয়ানা অনস্বীকার্য। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী আমরা অনেকেই যে আমাদের আফ্রিকান দেশগুলোর শোষণে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছি ও তা থেকে লাভবান হচ্ছি, আমাদের কৃষ্ণবর্ণ যে সেটার কোনো কাফফারা নয়—এতটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়েই তিনি থেমে যাননি। বরং বইটির সারাংশের ইতি টেনেছেন এমন এক ভাষায়, যা নিতান্ত অভিযোগ ও অপরাধবোধকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি বলেছেন, উন্নয়নের চূড়ান্ত দায়ভারকে স্বয়ং আফ্রিকানদের ঘাড়

থেকে সরিয়ে দেওয়াটা মোটেই এসকল লেখার উদ্দেশ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ আফ্রিকান সহযোগীরাই কেবল একমাত্র আসামি নয়। বরং প্রত্যেক আফ্রিকানের দায়িত্ব হলো এই ব্যবস্থাকে বোঝা এবং একে উৎখাত করার জন্য কাজ করা।

এসব কথা আমরা অনেকেই পড়ি ও লিখি। কিন্তু ওয়াল্টার এগুলোকে আসলেই গুরুত্বের সাথে নিতেন। তিনি জানতেন, এসকল লেখা তার নিজের জন্য; ক্যারিবিয়ান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান শিশুদের জন্য; ইন্ডিয়ান, এশিয়ান-সহ ইউরোপের অধীনস্থ পোড় খাওয়া আরও অনেকের জন্য। তিনি আরও জানতেন যে, এগুলো সেসকল ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের জন্যও, যারা উন্নয়ন ও মুক্তির লক্ষ্যে তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রামের সাথে একাত্মতার দাবি করে।

রডনি একটি অনুসিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়ে সেটির ওপর কাজ করেছেন। তার ভাষ্যমতে, আফ্রিকান এবং অন্যান্য "প্রান্তিক" জনগোষ্ঠীর নব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন "আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা"। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার ব্যর্থ কেন্দ্রের প্রতি এ এক দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জ। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এরকম বিচ্ছিন্নতা বা গুরুতর বিরোধিতার ফলে স্বয়ং কেন্দ্রের ভেতরেও দেখা দেবে গভীর ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাই তার দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত দরকারি জিনিস হলো, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করে বেড়ানো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর এক আমূল পরিবর্তন।

এটা ছিল প্রচণ্ড এক দূরদর্শিতা। বিশেষত এই কারণে যে, ওয়াল্টার এক দুঃসাহসী কথা বলে ফেলেছেন ও তাতে বিশ্বাস করেছেন। তা হলো, এমন এক উথালপাথাল পরিবর্তনের সূচনাটা করতে হবে স্বয়ং আফ্রিকানদের। পরাধীনতা ও শোষণের জালে আবদ্ধ অন্যান্য নরকবাসীদেরও। এহেন চিন্তার পরিণাম কী, তা টের পেয়েও তিনি ঝিমিয়ে যাননি। এর বদলে তিনি সকলকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ জুগিয়েছেন। মৌলিকভাবে নতুন এক ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। নিজেই হয়ে গেছেন সেই পথচলার বাস্তব দৃষ্টান্ত। আমরা যে আমাদের জীবন ও নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম, সেই বিশ্বাস আমাদের দিয়ে গেছেন তিনি। নীরবে, নাছোড়বান্দা হয়ে তিনি আমাদের কাছে আকুল আবেদন করে গেছেন—যেন আমরা এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হই। কাঁধে তুলে নিই এর পূর্ণ দায়িত্ব।

ওয়াল্টারের কাজকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কেউ প্রশ্নবিদ্ধ

করতে পারবে না তার আহ্বানকে। কারণ তিনি এই অসাধারণ দায়িত্বে নিজের অংশটুকু পালন করার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপিত করে দিয়ে গেছেন। ঠিক এজন্যই ১৯৮০ সালের জুনে গায়ানায় অবস্থান করছিলেন তিনি। ঠিক এজন্যই তিনি সেখানে ছিলেন ১৯৭৪ সাল থেকে। বিকশিত করে তুলছিলেন ওয়ার্কিং পিপল'স অ্যালায়েন্স (ডাব্লিওপিএ) নামে পরিচিত সংগঠনটির নেতৃত্বকে। পরিবারের ভরণপোষণ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এত সবকিছুর মাঝেও কীভাবে যেন সময় বের করে নিচ্ছিলেন গবেষণা ও লেখালেখির জন্য। নিজের দেশ ও ক্যারিবিয়ানের অন্যান্য অংশের খেটে-খাওয়া মানুষদের ইতিহাস নিয়ে করে গেছেন এসকল গবেষণা ও রচনাকর্ম। আর ঠিক এজন্যই তাকে হত্যা করা হয়।

যাতনা ও ক্ষোভ আছে বটে। কিন্তু আমরা যারা ওয়াল্টারকে চিনি, তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমরা আসলে চমকে উঠিনি। কারণ তার জীবনকর্মে এমন এক ধারাবাহিকতা ছিল, যেটাকে অস্বীকার করা যায় না। তার সংক্ষিপ্ত জীবনের শুরু থেকেই এর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। রডনির জন্ম ২৩শে মার্চ, ১৯৪২। তৎকালীন ব্রিটিশ গায়ানার রাজধানী জর্জটাউনে তার বেড়ে ওঠা। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন এমন পরিবারের অংশ, যারা পরিবর্তনবাদী রাজনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতেন। পিপল'স প্রোগ্রেসিভ পার্টির (পিপিপি) বিকাশের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন তার পরিবারের সদস্যরা, বিশেষত তার বাবা। বহু বর্ণের মানুষের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা এই দলটি ছিল তৎকালীন ক্যারিবিয়ানের একমাত্র গণরাজনৈতিক দল, যেটি সাধারণ মানুষকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছিল মার্কসবাদী (সমাজতান্ত্রিক) চিন্তাধারার সাথে। সেইসাথে গড়ে তুলছিল এমন সব বিকল্প ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, যা হয়তো নিতান্ত ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ থেকে স্বাধীনতা লাভ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

কৈশোরে প্রবেশ করার আগ থেকেই লিফলেট বিতরণ, দলীয় সমাবেশে যোগদান এবং তার নিজের ঘরে চলা হাজার ঘণ্টার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হজম করে আসছেন ওয়াল্টার। এরপর তিনি ভর্তি হন কুইনস কলেজে, যা জর্জটাউনের এক প্রখ্যাত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই কিশোর রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠেন তৎকালীন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের কাছে অতিপরিচিত "স্কলারশিপ বয়েজ"-এর একজন। মেধাবী, উদ্যমী ও বাগ্মী ছেলেটি পড়াশোনা ও খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন (তিনি হাই জাম্পের স্কুল রেকর্ড ভেঙেছেন)। তারপর লোভনীয় গায়ানা স্কলারশিপ লাভ করে তিনি ভর্তি হন জ্যামাইকার মোনায় অবস্থিত ইউনিভার্সিটি কলেজ অব দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজে। এর ফলে অ্যাকাডেমিক সম্মাননা ও বিশিষ্টতা অর্জনের নিয়মতান্ত্রিক পথ তার সামনে

উন্মুক্ত হয়ে যায়।

রডনি ১৯৬৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাসের ওপর স্নাতক সম্পন্ন করেন ইউসিডাব্লিওআই থেকে। তারপর তাকে প্রদান করা হয় ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কলারশিপ। সেখানে তিনি আফ্রিকান ইতিহাসের ওপর ডক্টরেট করার জন্য ভর্তি হন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগে। ওয়াল্টারের সহজাত রাজনৈতিক প্রবৃত্তি এবং পারিবারিক শিক্ষা তাকে গৎবাঁধা ও নিরাপদ অ্যাকাডেমিক জীবনের ভেতরে থিতু হতে দেয়নি। এর বদলে লন্ডনে তার অতিবাহিত বছরগুলো (১৯৬৩-১৯৬৬) হয়ে ওঠে তার চলমান রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অচিরেই তিনি তরুণ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের একটি পাঠচক্রের সদস্য হয়ে যান। তারা নিয়মিত একত্র হতেন এমন এক ব্যক্তির দিক-নির্দেশনার ছায়াতলে, যিনি তৎকালীন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ সি. এল. আর. জেইমস, ত্রিনিদাদিয়ান মার্কসবাদী বিশেষজ্ঞ। হাইতিয়ান বিপ্লবের ইতিহাস ব্ল্যাক জ্যাকোবিনস-এর রচয়িতা হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিত।

মৌলবাদী ক্যারিবিয়ান রাজনীতির দৈনন্দিন জীবনের সাথে একটু একটু করে পরিচিত হতে শুরু করেছেন রডনি। জেইমস ও উক্ত পাঠচক্রের সাথে অভিজ্ঞতা সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। সেইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতায় পা রাখার ক্ষেত্রেও এ ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ উৎস। কারণ এতদিন তিনি অ্যাকাডেমিক সমাজের কাল্পনিক জগতেই ঘুরপাক খেয়ে এসেছেন। লন্ডন ছেড়ে যখন তিনি ১৯৬৬ সালে তানজানিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন, ততদিনে রডনি একটি ইতিহাস-বিষয়ক রচনাকর্মের জন্য প্রস্তুত। এই রচনাই পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে "এক বৈপ্লবিক, সমাজতান্ত্রিক ও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি"র ইতিহাস হিসেবে। (অ্যাকাডেমিক গবেষণার পরিসরে তার অসাধারণ অভিসন্দর্ভ *আ হিস্ট্রি অব আপার গিনি কোস্ট, ১৫৪৫-১৮০০* এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছে।)

ওয়াল্টার ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে তানজানিয়ার ইউনিভার্সিটি কলেজ ইন দার-এস-সালামে ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। তারপর ১৯৬৮ সালে জ্যামাইকায় ফিরে আসেন তার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের একটি পদ গ্রহণ করার জন্য। সেইসাথে আফ্রিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টাডিজের একটি বড় কার্যক্রম সংযোজিত করারও পরিকল্পনা ছিল তার। সবচেয়ে বড় কথা, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের যে সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিলেমিশে থাকা উচিত—নিজের এই বিশ্বাসটিকেও তিনি পরখ করে দেখতে

চান। ওয়াল্টার তার উভয় লক্ষ্যেই প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু ঠিক এই সাফল্যের কারণেই তার ওই দেশে অবস্থান করার মেয়াদ নিদারুণভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বিশেষত জ্যামাইকার রাস্তাঘাটে, পাহাড়ে ও অলিগলিতে বসবাসরত সাধারণ মানুষদের নিয়ে কাজ করার কারণে। জ্যামাইকার সাধারণ জনগণ ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়ার জীবনকে ঘিরে রেখেছিল যেসকল গভীর অসন্তোষ ও অস্থিরতা, এক বছরেরও কম সময়ের মাঝে রডনি সেগুলোর সংস্পর্শে আসেন ও সেগুলো ভাষায় প্রকাশ করতে থাকেন।

তারা একসাথে বসে পরস্পরের সাথে কথা বলতে ও শুনতে লাগল, চেষ্টা করল পরস্পরের সাথে মিশে যাওয়ার। আলাপ উঠল, পরিবর্তন আনার জন্য কীভাবে সংগঠিত হওয়া যায়। দেশে কৃষ্ণাঙ্গ শক্তির উত্থানের শক্তিশালী আহ্বান শ্রবণ ও এর তাৎপর্য নিয়ে ভাবতে লাগল সকলে। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, গভীর ও অবাধ্য এক পরিবর্তন দানা বাঁধতে শুরু করেছে দেশে। জ্যামাইকার রক্ষণশীল সরকার সাথে-সাথেই ওয়াল্টারকে চিহ্নিত করে এক অযাচিত বিদেশি উৎপাত হিসেবে। তাই অক্টোবর ১৯৬৮-তে ওয়াল্টার রডনি যখন মন্ট্রিলে এক কৃষ্ণাঙ্গ লেখক সম্মেলনে অবস্থানরত, তখন তাকে জ্যামাইকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কৃত ঘোষণা করা হয়। এই সরকারি পদক্ষেপের ফলে কিংস্টনে কয়েকদিন যাবৎ প্রতিবাদ চলে। কিন্তু রডনিকে আর দেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

এই রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং মন্ট্রিল সম্মেলনে তার শক্তিশালী অংশগ্রহণের ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের অনেকের মনোযোগ ঘুরে যায় ছাব্বিশ বছর বয়সি এই ক্যারিবিয়ান ইতিহাসবিদের দিকে। জ্যামাইকান সরকারের এই কাজের সূত্র ধরেই সি. এল. আর. জেইমস পাঠচক্রে ওয়াল্টারের সতীর্থরা এবং লন্ডন-ভিত্তিক আরও কয়েকজন ক্যারিবিয়ান কর্মী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। জ্যামাইকায় ওয়াল্টারের দেওয়া কিছু বক্তৃতা ছাপিয়ে বিতরণ করার জন্য ওয়াল্টারকে চাপ দিতে থাকেন তারা। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে তারা প্রতিষ্ঠা করেন বোগল-লোভার্চার পাবলিশিং হাউজ। আর ১৯৬৯ সালে প্রকাশ করেন ওয়াল্টারের প্রথম বহুলপঠিত বই *গ্রাউন্ডিংস উইথ মাই ব্রাদারস*। ওয়াল্টার দার-এস-সালামে ফিরে যান, আবারও ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতে থাকেন (১৯৬৯-১৯৭২)। আর ওদিকে দেশের বহু মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে থাকে গ্রাউন্ডিংস। বিশেষত কালো (ও সাদা)-এর সংজ্ঞায়নের অধিকার নিয়ে যারা সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের ওপর।

সেই আন্দোলন যতগুলো সম্মেলনের আয়োজন করেছে, সেগুলোর কারণেই ওয়াল্টার রডনি প্রথমবারের মতো পরিচিতি লাভ করেন আফ্রো-

আমেরিকান শ্রোতাদের মাঝে। মে, ১৯৭০-এ তিনি হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির আফ্রিকান হেরিটেজ স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশানের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় অংশ নেন। এই ভূমিকার একজন লেখক (রাবার্ট হিল) আগেই তার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, যখন ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট ইন্ডিজে কর্মরত ছিলেন ওয়াল্টার। হার্ভার্ড সম্মেলন এবার আমাদের বাকি দুজনকেও সেই সুযোগ করে দেয়।

এই কৃশকায়, নম্রভাষী, কৃষ্ণাঙ্গ গায়ানিজ ভাইটির প্রতি সম্মেলনের অনেকের মতোই আমার প্রথম অনুভূতি তৈরি হয় তার বাকপটুতা দেখে। তিনি কোনো কাগজ না দেখেই বক্তব্য দেন এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে, যা মোটাদাগে আলংকারিক বাগাড়ম্বরমুক্ত। অথচ এই অত্যন্ত তথ্যবহুল বক্তব্যটি এতটাই সতর্কভাবে ও সুসংহত আকারে সাজানো ছিল যে, সেটিকেই সরাসরি অনুলিপি করে নিয়ে মুদ্রিত করে ফেলা সম্ভব। একসময় আমরা আবিষ্কার করলাম, এই প্রচণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মানুবর্তিতার (ও রাজনৈতিক প্রবৃত্তির) সাথে মেলবন্ধন ঘটেছে এক সুশৃঙ্খল চেতনাশক্তির। সেইসাথে রয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি দাসত্বহীন মুনশিয়ানা। আরও রয়েছে জগতের লাঞ্ছিতদের সামষ্টিক কর্মের প্রতি এক অবিচল অঙ্গীকার। আর এই সবকিছুর ওপর আবরণ হয়ে আছে এক শুষ্ক ও তাৎক্ষণিক রসবোধ। মোটকথা, ওয়াল্টার রডনি স্পষ্টতই এক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি। আফ্রিকার এক চমৎকার সন্তান।

প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই আমরা জানতাম যে, আমরা একজন ভাই, শিক্ষক ও কমরেডের দেখা পেয়েছি। হাওয়ার্ড সম্মেলনের সময়ে রাবার্ট হিল, বিল স্ট্রিকল্যান্ড এবং আমি আরও বেশ কয়েকজনের সাথে মিলে ইন্সটিটিউট অব দ্য ব্ল্যাক ওয়ার্ল্ড (আইবিডাব্লিও) দাঁড় করানোর জন্য কাজ করছিলাম। এটি একটি আটলান্টা-ভিত্তিক গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রচারণা কেন্দ্র। এই সামষ্টিক বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের নিরীক্ষায় ওয়াল্টার আমাদের কীভাবে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন, তার সঙ্গে মিলে সাথেসাথেই সেগুলো উদ্‌ঘাটন করতে শুরু করি আমরা। ফলে ধারাবাহিক কয়েকটি সাক্ষাতে তিনি আমাদের মাঝে অতিবাহিত করেন কিছু নীরব, ধীরস্থির সময়। আমাদের বাসাবাড়িতে আমরা তার স্ত্রী প্যাট এবং তাদের প্রাণোচ্ছল সন্তান শাকা, কানিনি ও আশার সঙ্গও লাভ করেছি।

আমাদের সম্পর্ক যখন বিকশিত ও মজবুত হয়ে উঠছিল, এমনই সময়ে *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকার* প্রথম সংস্করণটি ১৯৭২ সালে যৌথভাবে প্রকাশিত করে বোগ্‌ল-লোভার্চার এবং তানজানিয়ান পাবলিশিং হাউজ। যতজন এই বইয়ের কপি সংগ্রহ করতে পেরেছে, তাদের জন্য এ ছিল

এক শক্তিশালী সঞ্জীবনী। নির্মল বাতাসের ঝাপটার মতো। তিনি ইউরোপের উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর সাথে এর আসল ঐতিহাসিক সম্পর্ক খুঁজে বের করেছেন। আফ্রিকার জনগণের নতুন এক জীবনের দিকে যাত্রার পথ এবং পৃথিবী পুনর্গঠনে তাদের এক নতুন ভূমিকা প্রস্তাব করেছেন।

বইটি মানুষের এমন এক বীণায় আঘাত করে, যার ফলে টুংটাং করে উত্তেজনা ও সাড়া আসতে থাকে। প্রায় এক দশক আগে রাজনীতি-সচেতন কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে ফ্রানৎস ফানোঁর *রেচেড অব দি আর্থ* বইটি যেরকম যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল, এই বইটিও প্রায় সেরকমই হয়ে দাঁড়ায়। উভয় লেখকই কাজ করেছেন উপনিবেশবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদের সর্বনাশা প্রভাব নিয়ে। সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং নতুন এক বিন্যাস সৃষ্টির জন্য উভয়েই ডাক দিয়েছেন এই শোষণমূলক ও সর্বনাশা ব্যবস্থা থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার। উভয়েই ছিলেন তাদের দাবিকৃত পরিবর্তনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

ফানোঁর যুগান্তকারী রচনাটির মতো রডনিও শুরু করেছেন আফ্রিকান/ক্যারিবিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী আমরা সাথেসাথেই ধরতে পারি যে, পুরো বিশ্বের সাথেই এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক বিদ্যমান। ওয়াল্টার তার প্রাথমিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ শেষ করেছেন ১৯৫০-এর দশকের সমাপ্তির সাথে। তবুও আফ্রিকার শোষণে যুক্তরাষ্ট্রের সমসাময়িক ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত, অকাট্য ও শক্তিশালী বর্ণনা তুলে ধরেছেন তিনি। এই ধ্বংসাত্মক কাজে আমরা নিজেরাও যে সক্রিয় বা পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী, সে ব্যাপারে আমাদের সূক্ষ্মভাবে সতর্ক করেছেন। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকের আফ্রো-আমেরিকান সংগ্রামের সাথে আরও প্রত্যক্ষ বিষয়াদি ছিল এতে। বিশেষত উপনিবেশবাদী ও নব্য-উপনিবেশবাদী শিক্ষা এবং আফ্রিকান চিন্তাচেতনার ওপর এগুলোর প্রভাব নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, সেখানে। যেমন: ওয়াল্টার লিখেছেন, "উপনিবেশবাদী শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সম্ভবত পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বার্থবাদ...। উপনিবেশবাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং অনানুষ্ঠানিক মূল্যবোধ—এই দুয়ে মিলে আফ্রিকার সামাজিক সংহতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সামাজিক দায়িত্ববিহীন নির্লিপ্ত ব্যক্তিস্বার্থবাদের নিকৃষ্টতম রূপটিকে প্রচার করেছে এখানে।"

আমরা আফ্রো-আমেরিকানরা এই অবস্থাটির স্বরূপ চিনে ফেলেছি। সত্যি বলতে কী, ব্ল্যাক স্টাডিজ এবং ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে সামাজিক সংহতির আহ্বান। সেইসাথে মূলধারার আমেরিকান জীবনপদ্ধতিতে ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিস্বার্থকে প্রতিহত

করা। আমেরিকার তরুণদের মাঝে বেড়ে উঠতে থাকা নির্লিপ্ততা সম্পর্কে আমরা করুণভাবে সচেতন। তারা আমেরিকান গণসমাজ সাংস্কৃতিক স্রোতে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রবল গতিতে দৌড়ে যাচ্ছে। সাথে রয়েছে উক্ত সমাজের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কুশিক্ষার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। তাই আমরা যারা ইন্সটিটিউট অব দ্য ব্ল্যাক ওয়ার্ল্ডের (আইবিডাব্লিও) সাথে জড়িত, তারা স্বভাবতই ওয়াল্টার রডনিকে নিমন্ত্রণ জানাই। এই বিষয়গুলোর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি প্রকল্পে আমাদের সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করি তাকে। এর মাঝে প্রথম প্রকল্পটি হলো বইয়ের সমান কলেবরের একটি মনোগ্রাফ *এডুকেশান অ্যান্ড ব্ল্যাক স্ট্রাগল*। এই কাজটি আমরা ১৯৭৪ সালে রচনা ও সম্পাদনা করেছি হার্ভার্ড এডুকেশনাল রিভিউ-তে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এখানে ওয়াল্টারের লেখাটির শিরোনাম "এডুকেশান ইন আফ্রিকা অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি তানজানিয়া"।

দ্বিতীয় প্রকল্পটি ভিন্ন প্রকৃতির। ওয়াল্টার ১৯৭৪ সালের শুরুর দিকে ইউনিভার্সিটি অব গায়ানার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগপত্র লাভ করেন। এই নিযুক্তিকে দেখা হয় ওয়াল্টার ও তার সমর্থকদের স্পষ্ট বিজয় হিসেবে। এটি তার স্বপ্নের এক সত্যায়ন। তিনি গায়ানায় ফিরে যাবার আগে আমরা তাকে দাওয়াত দিই, যেন তিনি আমাদের সাথে আটলান্টায় গ্রীষ্মের একাংশ অতিবাহিত করেন। আইবিডাব্লিও-তে এক মাসেরও বেশি সময় কাটান তিনি। এই সময়টুকু তিনি মূলত ব্যয় করেন একটি সামার রিসার্চ সিম্পোজিয়ামের পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের পেছনে। দেশের অন্যান্য অংশ থেকে এবং ক্যারিবিয়ান থেকে আগত সহকর্মীরা আমাদের সাথে যোগ দেন। আমরা শিক্ষা কার্যক্রমের এমন কিছু নমুনা নিয়ে গবেষণা করি, যেগুলো দেশজুড়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য আরও বড় পরিসর ও নতুন বিকল্প প্রদান করবে। একই সময়ে এক স্বপ্নবাজ ও সাহসী উদ্যোগ হিসেবে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত করতে চলেছিল *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপড আফ্রিকা*-র প্রথম আমেরিকান সংস্করণ।

ওই গ্রীষ্মে ওয়াল্টার আইবিডাব্লিও-তে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, তা আমাদের সকলের জন্য তাৎপর্যময় ছিল। নিজেদের সমাজে কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তাকে চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এটি। সেইসাথে উক্ত উন্নয়নে আইবিডাব্লিও'র পালনীয় ভূমিকা নিয়েও ধারণা লাভ করি। পক্ষান্তরে, ওয়াল্টার এখান থেকে লাভ করেন অনন্য কৃষ্ণাঙ্গ-আমেরিকান অভিজ্ঞতাকে আরও গভীরভাবে উদ্‌ঘাটন করার সুযোগ। তা ছাড়া এটি শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের এক উদ্যমী

দলের সাথে আমাদের একত্র করে তোলে। ইউনিভার্সিটি অব গায়ানায় নতুন পদে আসীন ওয়াল্টারের সাথে মিলে আমরা কীভাবে আরও নানা উপায়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারি, সে ব্যাপারেও পরিকল্পনা চলতে থাকে।

কিন্তু ওয়াল্টার আটলান্টা থেকে বেরোনোর আগেই আমরা ইঙ্গিত পেতে থাকি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই নিযুক্তিতে কিছু একটা ঝামেলা আছে। যতদিনে তিনি দেশে পৌছান, ততদিনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদম শেষ মুহূর্তে, এক অভূতপূর্ব চালের মাধ্যমে নিয়োগটি বাতিল করা হয়। দৃশ্যত এটি সরকারের উচ্চতম মহল থেকে আসা চাপের ফল। সেই থেকে নিয়ে বিপ্লবী বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার রডনি আরও এক বার তার স্বদেশের মাটিকে গভীরভাবে খুঁড়তে শুরু করেন। বহু জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ ও আবেদন আসা সত্ত্বেও অবিচলভাবে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে চলেন তিনি। গায়ানায় থেকে যান স্থায়ীভাবে।

তিনি নিজেকে দুটি বড় কাজে নিয়োজিত করেন। স্বজাতির মুক্তি ও উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের ভূমিকার যে সংজ্ঞায় তিনি বিশ্বাস করেন, দুটি কাজই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয়টির জন্যই আবার গায়ানায় তার উপস্থিতিও দরকারি। প্রথমটি হলো সে দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের ইতিহাসের ওপর একটি বড় মাপের, কয়েক খণ্ডের রচনাকর্ম তৈরি করা। দ্বিতীয়টি (আর এর পরিসর সর্বাত্মক) হলো নিজেকে ওই একই মানুষগুলোর সমসাময়িক জীবনের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া। তারপর তাদের সাথে মিলে সেই সরকারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার একটি উপায় খোঁজা, যেই সরকার তাদের আশা ও তাদের আস্থার সাথে স্পষ্টতই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যেই সরকার এখন তাদের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দণ্ডায়মান। আরেকভাবে বললে, ওয়াল্টার তখনো *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা*-র নব্য-উপনিবেশবাদী পরিণাম নিয়ে কাজ করার চেষ্টায় রত। নিজের ও নিজের জাতির জীবনের কেন্দ্রে যেতে চাইছেন তিনি। নির্ভীকভাবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন কিছু সমাধান। আর এই পুরোটা সময় জুড়ে ওয়াল্টারকে একইসাথে ভাবতে হয়েছে তার পরিবারের ভরণপোষণ নিয়েও। তার স্ত্রী প্যাটিকেও চাকরি-বঞ্চিত করা হচ্ছিল সে-সময়। তাই ওয়াল্টারের ওপর চাপ আরও বেড়ে যায়।

এহেন ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা ও বিপৎসংকুল এক পরিস্থিতির মধ্যেও ওয়াল্টার ইউনিভার্সিটি ইন জর্জটাউনের ক্যারিবিয়ান রিসার্চ লাইব্রেরিতে গায়ানা ন্যাশনাল আর্কাইভসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করার মতো সময়

ও শক্তি বের করে নিয়েছিলেন। আমাদের অনেকের কাছে এই কাজ কল্পনারও অতীত। বেশ কয়েকটি মনোগ্রাফের পাশাপাশি জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস যেদিন ওয়াল্টারের লেখা *হিস্ট্রি অব দ্য গায়ানিজ ওয়ার্কিং পিপল, ১৮৮১-১৯০৫* বইটি প্রকাশিত করবে, সেদিন এই সুশৃঙ্খল ও হাড়ভাঙা খাটুনির চূড়ান্ত ফল আমরা আস্বাদন করতে পারব। এই সুকঠিন সংগ্রামকালে তিনি আরেকটি রচনা প্রকাশিত করেছেন, যার শিরোনাম *গায়ানিজ শুগার প্ল্যান্টেশানস ইন দ্য লেইট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি*।

এরই মাঝে সাংগঠনিক কার্যক্রমও অব্যাহত রাখেন তিনি। সন ১৯৭৪ শেষ হওয়ার আগেই ওয়াল্টার ওয়ার্কিং পিপল'স অ্যালায়েন্স-কে কেন্দ্রীভূত হতে সহায়তা করেন। এটি তার অবিরাম সংগ্রামের রাজনৈতিক ভিত্তিতে পরিণত হয়। এটি এমন এক বাহিনী নির্মাণ করার সংগ্রাম, যারা গায়ানিজ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বাস্তব রূপ দান করবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অনেক মানুষের সহযোগিতায় ওয়াল্টার বক্তৃতা প্রদান ও শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ করতে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেন গায়ানার বাইরের কমরেডদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার এবং তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করার। (আমরা যারা এসকল কার্যক্রম আয়োজন করার চেষ্টা করে গেছি, তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন কর্নেলের আফ্রিকানা স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক জেইমস টার্নার এবং বিংহ্যামটনের স্টেইট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন।)

যখনই ওয়াল্টার বিদেশ ভ্রমণ করতেন—বিশেষত যেহেতু সরকারি দমনপীড়ন ক্রমেই বেড়ে চলছিল—তখনই অনেক বন্ধু তাকে চিরতরে গায়ানা ত্যাগ করার অনুরোধ করতেন। বলতেন নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনো স্থান বেছে নিতে। ওয়াল্টারের জবাব হতো সাধারণত দুটি অংশে। প্রথমটি হলো গায়ানার কমরেড ও জনগণের প্রতি থাকা তার দায়িত্ববোধ। তিনি বলতেন, নিজেদের ও সমাজের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এক নির্ভীক সংগ্রামে তাদের নিয়ে কাজ করে চলেছেন। পালানোর পথ আছে বলেই তিনি স্রেফ মাঝপথে তাদের ছেড়ে চলে আসতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, রডনির কাছে মনে হতো, তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে কাজ ও ভ্রমণের সূত্র ধরে তিনি বিপুল পরিমাণ মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন, সেই সুবিধা আর কেউ লাভ করেনি। তার মতে, এই সুবিধার সঙ্গে একটি দায়িত্বও চলে আসে। মুক্তিসংগ্রামে জড়িত নারী-পুরুষদের যে আন্তর্জাতিক

নেটওয়ার্কের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছেন, স্বজাতির লোকদেরকে সেটার বিষয়বস্তু ও চেতনার সাথে পরিচিত করিয়ে দিতে চান তিনি। মোটকথা, আত্মোৎসর্গের বাসনায় তিনি দেশে থাকেননি। বরং পরিস্থিতিই ছিল অমন। তাই ওয়াল্টারের জবাব সবসময় একই থেকেছে: "আমার এখানে থাকাটা জরুরি।"

শেষদিকে এসে এক বছরব্যাপী কিছু টালমাটাল ঘটনা ঘটে। এই সকল বিপদ, আশা ও দুশ্চিন্তা শেষবারের মতো একাট্টা হয় সেখানে। জুন, ১৯৭৯-তে ডাব্লিওপিএ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা দেয়। দলটি সেদেশে বার্নহ্যামের পিপল'স ন্যাশনাল কংগ্রেসের জগদ্দল পাথরকে উৎখাত করার জন্য নিরলস শ্রম দিয়ে যাবে। পরের মাসে জর্জটাউনের একটি সরকারি ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যে আটজন ব্যক্তিকে অগ্নিসংযোগের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের মাঝে ওয়াল্টার-সহ আরও চারজন ডাব্লিওপিএ-সদস্য ছিলেন। ভবনটি যেহেতু সরকারি, সেহেতু অভিযোগ বড় গুরুতর। কিন্তু এটাও অনেক পর্যবেক্ষকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আগুন লাগানোর কাজটি পুরোটাই সাজানো। রডনির প্রভাবশালী এই ক্ষুদে সংগঠনটির শক্তিকে ভাঙার জন্য গৃহীত পদক্ষেপেরই অংশ এই নাটক। অভিযুক্তির দিন ক্যাথোলিক স্ট্যান্ডার্ড-এর একজন সাংবাদিক ও পুরোহিত ফাদার বার্নার্ড ডেংক-কে মারাত্মকভাবে পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়। তিনি আদালত ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে একটি ডাব্লিওপিএ-পন্থি মিছিল প্রত্যক্ষ করছিলেন। সেই থেকে নিয়ে নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয় যে, একে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক দীর্ঘ রাত হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। এর মাঝে ছিল বোমাবাজি, পুলিশি মারধর এবং ওয়াল্টার-সহ বিরোধীদল ডাব্লিওপিএ-এর অন্যান্য নেতাকে "নির্মূল" করার ব্যাপারে বার্নহ্যামের ক্রমবর্ধমান হুমকি।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ শেষ হতে হতে ডাব্লিওপিএ-তে ওয়াল্টারের দুইজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ওহেনে কোয়ামা এবং এডওয়ার্ড ডাবলিন পুলিশের হাতে নিহত হন। কাউকে গুলিবিদ্ধ ও মারধর করা হয়, কাউকে করা হয় কারাবন্দি। কারও বাড়িতে তছরুপ ও বোমা হামলা করা হয়। ততদিনে ডাব্লিওপিএ-এর কিছু নেতৃস্থানীয় সদস্যও গায়ানার রাজবন্দি হিসেবে আটক ছিলেন। সরকার তাদের দেশত্যাগের অনুমতি দিচ্ছিল না। কিন্তু রডনি মে ১৯৮০-তে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্যাট্রিওটিক ফ্রন্টের নিমন্ত্রণ পান তিনি। এরপর ওয়াল্টার গায়ানায় ফিরে যান। আর্কাইভস নিয়ে কাজ করা অব্যাহত রাখেন এবং জনগণকে সংগঠিত করতে থাকেন। অত্যন্ত অশুভ শক্তির ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের অনেককে তিনি

বলেছিলেন যে, তার সাথে আর দেখা না-ও হতে পারে।

দোসরা জুন অগ্নিকাণ্ডের বিচার শুরু হয়। ক্যারিবিয়ান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের শুভাকাঙ্ক্ষী পর্যবেক্ষকগণ তা প্রত্যক্ষ করেন। কয়েকদিনের মাঝেই স্পষ্ট হয়ে যায়, সরকারের হাতে আর কোনো মামলা নেই। তারা রডনি ও তার সহকর্মীদের শাস্তি দিতে অক্ষম। ফলে ৬ জুন সরকারের অনুরোধে বিচারকার্য ২০ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।

স্থগিতাদেশের এক সপ্তাহ পরের কথা। ১৩ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়াল্টার তার ভাইয়ের গাড়িতে বসা ছিলেন। চালকের আসনে বসে অপেক্ষা করছিলেন ডোনাল্ড রডনির জন্য। তারা যার বাড়িতে থেমেছিলেন, তিনি ছিলেন ডাব্লিওপিএ-তে অনুপ্রবেশ করা গোয়েন্দা। ওয়াল্টার একটি ওয়াকি-টকি চেয়েছিলেন। সেটা দেওয়ার কথা বলে লোকটি ডোনাল্ড রডনিকে ঘরের ভেতরে ডেকে আনে। সন্ধ্যা ৭.৩০ নাগাদ তারা ওই গোয়েন্দার উঠানেই ছিলেন। এরপর সে ডোনাল্ডকে গাড়ি চালিয়ে দূরে চলে যেতে বলে। রাত ৮টার দিকে ওয়াকি-টকিতে একটি টেস্ট সিগন্যাল আসবে বলেও জানিয়ে দেয়। তারা যেন অপেক্ষা করে। ডোনাল্ড গাড়িতে ফিরে আসেন এবং চালিয়ে নিতে থাকেন। ওয়াকি-টকিতে সিগন্যালটি আসামাত্র বোমা বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে শেষ হয়ে যায় ওয়াল্টার রডনির জীবন।

মৃত্যুর অল্প কয়েক সপ্তাহ আগে রডনির সামনে থাকা বিপদ এবং সেগুলো থেকে তার আত্মরক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়ে বারবার তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমার এবং ডাব্লিওপিএ-এর আরও কয়েজনের নিরাপত্তার ব্যাপারে বলতে পারি—দেশে ও দেশের বাইরে আমাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা যতটুকু, সে অনুপাতেই আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। কিন্তু শেষমেশ কোনো ধরনের শারীরিক প্রতিরক্ষা আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না। সারাক্ষণ যে হুমকিধমকি আসছে, সে ব্যাপারে আমরা কেউই বেখবর নই। আমরা নিজেদেরকে কোনো দুঃসাহসী অভিযাত্রী, বা কোনো শহীদ বা হবু শহীদ মনে করি না। কিন্তু আমরা মনে করি একটি কাজ রয়েছে, যা সম্পন্ন করা দরকার। যে কাজটা করা দরকার, একটা-না-একটা সময়ে সেটা আমাদের করাই লাগবে।'

আরও এক বার, ওয়াল্টারের অঙ্গীকার ও সততার সাহসী চেতনা আমাদের ফানোঁর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। তিনিও নিজ দেশের মানুষদের মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। মারা গেছেন চল্লিশের আগে। তিনিও আফ্রিকার সন্তানদেরকে এবং ইউরোপের জুলুমের শিকার সকলকে আহ্বান

করেছিলেন—নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। তিনিও আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, যেন ইউরোপের চিরস্থায়ী ভুক্তভোগী, গালফোলা নালিশকারী বা ধামাধরা অনুসারী হয়েই পুরো জীবন কাটিয়ে না দিই। তিনিই বলেছেন,

'আসুন কমরেডগণ! ইউরোপীয় খেলা শেষ হয়েছে... আজ তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা আণবিক ও আত্মিক ভাঙনের মাঝে দোদুল্যমান... আমাদের ভিন্ন কিছু খুঁজে নেওয়া উচিত। আমরা আজ সব করতে পারি, যে পর্যন্ত না আমরা ইউরোপকে অনুকরণ করছি, যে পর্যন্ত না আমরা ইউরোপের সমকক্ষ হতে লালায়িত হচ্ছি। [আমরা এই জায়গায় এসে "ইউরোপ"-এর জায়গায় "ইউরোপ/আমেরিকা" লিখছি—আমাদের ধারণা ফানোঁ এতে আপত্তি করতেন না।]

তৃতীয় বিশ্বের সামনে ইউরোপ/আমেরিকা এক জগদ্দল পাথরের মতন। তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেসকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা, যেগুলোর উত্তর ইউরোপ/আমেরিকা খুঁজে পায়নি।

কমরেডগণ! চলুন এমনসব রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও সমাজ বানানোর মাধ্যমে ইউরোপ/আমেরিকাকে সম্মান না দেখাই, যেগুলো তা[দে]র থেকেই অনুপ্রাণিত।

...যদি আমরা মানবজাতিকে এক ধাপ এগিয়ে নিতে চাই, ইউরোপ/আমেরিকা যেই পর্যায়ে গেছে সেখান থেকে ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই উদ্ভাবন এবং উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

আমরা যদি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে চাই, আমাদের উচিত ইউরোপ/আমেরিকা ব্যতিরেকে উত্তর খোঁজা। ইউরোপের/আমেরিকার জন্য, আমাদের জন্য এবং মানবতার জন্য, হে কমরেডগণ, আমাদের উচিত এক নতুন পাতা উলটানো, উচিত নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে কাজ করা, এবং উচিত এক নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটানো।' (*রেচেড অব দি আর্থ*, পৃ. ২৫২-২৫৫)

ওয়াল্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই সেই কাজ, "যে কাজটা করা দরকার।" এই সেই চ্যালেঞ্জ, যেটা গ্রহণ করার জন্য তিনি ও তার কমরেডগণ বদ্ধপরিকর। নিরীক্ষণ, উদ্ভাবন, ঝুঁকি গ্রহণ, নবধারার সংগঠন, সংগ্রামের নতুন প্রণালী, সেগুলোর পথপ্রদর্শন ও পদক্ষেপ শক্ত করার জন্য নতুন নতুন লক্ষ্য, ধ্যানধারণা, নিজ ভূমিতে সেগুলোর সূচনা ঘটানো প্রয়োজন। ওয়াল্টার রডনির কাছে ডাব্লিওপিএ ছিল সেই কাজের একটি উপাদান। অপর উপাদান তার গবেষণা ও লেখালেখি। তার চোখে এ দুটি উপাদানের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। এই কাজের সকল উপাদানকে তিনি দৃঢ়ভাবে একসাথে জুড়ে

রেখেছিলেন তার জীবনের সততা, তার লক্ষ্যের সুশৃঙ্খল ক্ষমতা এবং জনগণ ও তাদের সম্ভাবনার প্রতি তার অক্ষয় ভালোবাসার বলে।

এভাবেই তিনি করে গেছেন সেই কাজ, যা করাই দরকার। কিন্তু ম্যালকম এক্সের ব্যাপারে যেমনটি বলা হতো, সেভাবে ওয়াল্টারের ব্যাপারেও বলা চলে : "তিনি যতটুকু সময় পেয়েছেন, এর মাঝে যতটুকু হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল, তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু হয়ে উঠেছেন।"

তিনি যে সময়টুকু পাননি, সেটা এখন আমাদের হাতে আছে। তার শুরু করা কাজটা এখন আমাদের হাতে। একে চালিয়ে যাওয়া, পুনঃসংজ্ঞায়িত করা এখন আমাদের কাজ। তা সে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যে-ই হই না কেন। তিনি যে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সে আহ্বান আমাদের সকলের প্রতিও। "যদি আমরা মানবজাতিকে এক ধাপ এগিয়ে নিতে চাই...তাহলে আমাদের অবশ্যই উদ্ভাবন এবং উদ্‌ঘাটন করতে হবে...আমাদের উচিত এক নতুন পাতা উলটানো, উচিত নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে কাজ করা, এবং উচিত এক নতুন [মানবতার] আবির্ভাব ঘটানো।" (*রেচেড অব দি আর্থ*, পৃ. ২৫৫)

ওয়াল্টারের পদচিহ্ন

এসকল মহতী আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতে হবে সাহসী ও সৃজনশীল উপায়ে। এর স্বরূপ হলো আমাদের অনুন্নতির শেকলগুলো ভাঙতে শুরু করা। সব ধরনের মানব-শোষণের শেকড় ধরে ঝাঁকুনি মারা। এতদিনে কি এটা স্পষ্ট হয়ে যায়নি যে, এই শোষণপ্রক্রিয়ার ফলে "কেন্দ্র" ও "প্রান্ত" উভয়ে স্থানেই মানবতার অনুন্নতি হয়েছে? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না যে, স্বয়ং শোষকদের স্বদেশ তথা কেন্দ্রও অনুন্নত রয়ে গেছে? শুধু সেটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে বস্তুগত সম্পত্তি ও মারণাস্ত্রের পর্দা দিয়ে। কিন্তু সেই পর্দার আড়ালে ঠিকই রয়েছে নগ্নতা ও মানবীয় স্থবিরতা। তাহলে কি আমাদের উচিত নয়—অতীতের কুণ্ডলি ভেঙে ফেলা, নিজেদের ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা?

হয়তো ওয়াল্টার ও ফানোঁর ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নেওয়ার মাধ্যমেই আমরা বিগত অর্ধ-সহস্রাব্দের ভয়ানক খেলাটা বাদ দিতে পারব। খুঁজব প্রতিরক্ষার নতুন মাধ্যম, সংগ্রামের নতুন সব রূপ, বিপ্লবের পানে নতুন নতুন পথ, নতুন ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, যা সত্যিকার অর্থেই মানবসমাজ আমাদের কাছ

থেকে দাবি করে। যখন আমরা এরকম সব চিন্তা মাথায় আনতে শুরু করব, সেরকম উদ্ভাবনের কথা ভাবব, তখনই আমরা *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা*-র অসাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলো মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষা করতে সক্ষম হব। পারব সেগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে। রডনি আর ফানোঁর মতো করেই নতুন প্রশ্নের অবতারণা ঘটাব—কীভাবে আমরা পৃথিবীকে পুনরায় উন্নত করতে পারি?

শুরুটা হবে আমাদের দিয়ে, যেখানে আছি সেখান থেকে। কী কী ভাঙতে হবে? কী কী গড়তে হবে? কী কী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করতে হবে আমাদের? কাদের সঙ্গে কাজ করব, কী কী ভবিষ্যৎদৃষ্টি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, কী কী আশা আমাদের ঘিরে থাকবে? সংগঠিত হব কীভাবে? তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে, যারা দক্ষিণ আফ্রিকায়, এল সালভাডোরে, গায়ানায় একই প্রশ্ন উত্থাপন করছে? আমাদের সময়ের জরুরি চাহিদাগুলো অন্যদের কীভাবে জানাব? কীভাবে আমরা নিজেদের দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ছবি আঁকব এবং সেজন্য কাজ করব? এই ভূমিতে আমাদের যে বিপ্লব দরকার, সেদিকে এগিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে কোন কোন উদ্ভাবন, উদ্‌ঘাটন ও নতুন ধ্যানধারণা?

শব্দের ঝংকার বা জারিজুরির কোনো ফায়দা এখন নেই। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কি পঙ্গু ও অনুন্নতই থেকে যাব? নাকি নিজেদের আরোগ্য-প্রক্রিয়ায় অংশ নেব? এই আরোগ্য হবে নিজেদের, নিজেদের জনগণের, আমাদের বিপন্নপ্রায় জাতির ও পৃথিবীর পুনঃউন্নয়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মাধ্যমে। কেউ আমাদের জোর করে এই কাজে লাগাতে পারবে না। প্রচলিত মাপকাঠির হিসেবে বললে, সাফল্যের কোনো নিশ্চয়তাই এখানে নেই। আমাদের সুপরিচিত ও স্বল্পপরিচিত আত্মত্যাগী ও বীরদের রক্ত এই বাস্তবতার সাক্ষী। যেমন ওয়াল্টার রডনি ও ফ্রানৎস ফানোঁ, রুবি ডরিস ও ফ্যানি লু, ম্যালকম এক্স ও মার্টিন লুথার।

কিন্তু আমাদের জন্য নতুন এক পৃথিবী অপেক্ষা করে রয়েছে। সত্যি বলতে কী, অনেকগুলো পৃথিবী রয়েছে আমাদের প্রতীক্ষায়। একটি হলো আমাদের সন্তানদের পৃথিবী, যারা এখনো অনাগত অথবা সদ্যজাত; কিন্তু বাঁচতে, বাড়তে ও নিজেদের সম্ভাব্য সেরা সত্তা হয়ে উঠতে তারা ইচ্ছুক। ওয়াল্টার যেমনটি বলেছেন, কেন্দ্রকে রূপান্তরিত ও মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করতে না পারলে এটি সম্ভব হবে না। সেই পরিবর্তন আসবে না, যদি না আমরা পালটাই, পুনরায় উন্নত হই ও নবায়িত হই। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এই কঠোর

পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

আফ্রো-আমেরিকান চ্যালেঞ্জ

এরপর আমাদের সামনে রয়েছে আরও একটি কঠিন পৃথিবী—ইউরোপ/আমেরিকার পুত্র ও কন্যাদের পৃথিবী, যারা নিজেদের অনুন্নতিকে উদ্‌ঘাটন করতে শুরু করেছে, যারা চিনে ফেলেছে তাদের আত্মার বিকৃতি ও চেতনাহীনতাকে। সংহতি ও মৈত্রীর যতসব গৎবাঁধা রাজনৈতিক তর্ক না আওড়ে, অতীতকে ভুলে না গিয়ে বা তার হাতে বন্দি না হয়ে, আমাদের এই ছেলেমেয়েদের প্রতি সাড়া দানের উপায় খুঁজে নিতে হবে। তাদের আসতে দিতে হবে আমাদের সংস্পর্শে। এ কোনো ক্ষণকালের বিলাসিতা নয়, পুরোনো ধাঁচের "সুসম্পর্ক" রেখেই এখানে কাজ শেষ না। বরং আমরা এখন উপলব্ধি করেছি যে, মজলুমের সন্তান ও জালিমের সন্তানরা পরস্পর এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে জড়িত। এই সম্পর্ক এতই গভীর যে, আমাদের বেশির ভাগ সেটা স্বীকার করতেই অনিচ্ছুক। এক পক্ষকে অগ্রাহ্য করে অপর পক্ষের কোনো ধরনের মৌলিক পুনঃউন্নয়ন সম্ভব নয়। এ এক ভারী বোঝা, কিন্তু সেইসাথে এক অসাধারণ সম্ভাবনাও বটে। এই দেশের যে অনন্য ইতিহাস, তার প্রেক্ষিতে এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতাও।

অতএব, এসকল কঠিন বিষয়ই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় ওয়াল্টার ও তার মহৎ রচনাকর্মের দিকে। এখন আমাদের কাছে দাবি হলো, আমরা যেন *হাউ ইউরোপ আন্ডারডেভেলাপ্‌ড আফ্রিকা*-কে ওয়াল্টার রডনির জীবন ও মৃত্যুর আলোকে পুনঃপাঠ করি। এবারের পাঠটি হবে বিপজ্জনক, বিস্ফোরক আমেরিকান কেন্দ্রকে মাথায় রেখে। এবারের পাঠ হবে আমাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে। এবারের পাঠ হবে আমাদের সকলের প্রতি ফানোঁর অব্যাহত আহ্বানকে সামনে দাঁড় করিয়ে।

তাহলেই হয়তো আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাব, আফ্রিকা-সহ বাকি বিশ্বকে অনুন্নত করতে গিয়ে ইউরোপ কীভাবে নিজেকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেইসাথে ধ্বংস করেছে তার পথে বাধা-হয়ে-দাঁড়ানো সবাইকে ও সবকিছুকে। আহতরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে এবং আমাদের ভেতরে। অনুন্নয়নের এই নিষ্ঠুর দ্বান্দ্বিকতাকে চিনতে হবে। আমাদের সকলের প্রয়োজন একই, বিপদ একই, সম্ভাবনাও একই। আর এগুলোর রয়েছে ঐক্য সৃষ্টির এক অসাধারণ ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে স্বীকার করতে হবে। যারা এভাবে চিনেছে ও স্বীকার করেছে,

তাদের সকলের কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করে দিচ্ছি আমরা। আর এভাবেই আমরা সৃষ্টি করেছি নতুন ভিত্তির ওপর রচিত এক সংহতি। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি পরস্পরের দিকে। একইসাথে এই রূঢ় কিন্তু সুন্দর বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি যে, আমাদের নিজেদের ও পৃথিবীর পুনঃউন্নয়ন করতে হবে। অন্যথায় আমরা একসাথেই ডুবে যাব কোনো এক ভয়ানক, বিস্ফোরক অন্ধকারের ভেতর।

অবশ্য শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ভীতির প্রতি সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে বেশি দূর যাওয়া যাবে না (কারণ সেটা করলে ইতিহাসকে পালটানোর বদলে তার পুনরাবৃত্তিই করা হবে—আর সেটা হবে ওয়াল্টারের মতো সাহসী ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা)। এর বদলে আমাদের চালিকাশক্তি হবে এই বাস্তবতা যে, আমাদের আকৃষ্ট করার মতো অনেক কিছুই আছে। যেমন, বিগত ৫০০ বছরের শোষণ/পরাধীনতার অপর পিঠেই রয়েছে বহু আশাব্যঞ্জক উপাদান। তার একটি হলো মানবজাতির মাঝে আগের চেয়ে অনেক বেশি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও আন্তঃসম্পর্ক। সনাতন, জাতীয়তাবাদী বাধা পেরিয়ে নতুন ধরনের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় এই ব্যাপারটি অপার সম্ভাবনার জোগানদাতা। আকৃতি ও গতিপথ পালটে দিতে পারলে শোষণের হাতিয়ারগুলোই হয়ে উঠতে পারে আমাদের সাধ্যের মাঝে পুনঃউন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এবার ইতিহাসকে ছাড়িয়ে আসার, অতীতের শেকল ভাঙার, নিজেদের, জনগণের, স্বজাতির ও পৃথিবীর পুনঃউন্নয়ন করার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। যারা বর্তমানে এরকম উন্নয়নের বিরোধিতা করে চলেছে, তাদের সাথে লড়াই করার মানবীয়, সৃজনশীল ও নির্ভীক সব উপায় খুঁজে নেওয়ার দায়িত্বও আমাদেরই। এসকল প্রত্যাশা দুঃসাহসিক বটে, এবং সত্যিই এগুলো অভাবনীয় সব দায়িত্ব। কিন্তু তবুও এগিয়ে চলতে হবে। এটা মনে হয় এতক্ষণে স্পষ্ট যে, সাফল্যের নিশ্চয়তা এখানে নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের এগিয়ে চলতে হবে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম ও সৃজনশীলতম কল্পনার স্রোতে, নবশক্তিতে বলীয়ান স্বপ্নের পানে।

এর চেয়ে কম যেকোনো কিছুই বর্তমানের বিপজ্জনক সময়ের জন্য অপর্যাপ্ত। এর চেয়ে কম যেকোনো কিছুই আমাদের ভাইয়ের স্মৃতির কাছে, আমাদের শিশুদের চাহিদার মোকাবিলায়, বা আমাদের অসাধারণ ও অনাবিষ্কৃত সামর্থ্যের তুলনায় অযোগ্য।

১

উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে চলেছে। বেশির ভাগ পুঁজিবাদী দেশেও উন্নয়ন সংঘটিত হচ্ছে, যদিও অনেক ধীরগতিতে। কিন্তু এর বিপরীতে অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো, তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলোর বিরাট অংশজুড়ে বিরাজ করছে পূর্ণ স্থবিরতা। আর সেগুলোর কোনো কোনোটিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও কম।

এসকল বৈশিষ্ট্য কোনো দুর্ঘটনা নয়। বরং পরিপূর্ণরূপে ছড়িয়ে পড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ব্যবস্থাটি তার শোষণের সবচেয়ে নিপীড়নমূলক ও নির্লজ্জ রূপগুলোকে পাঠিয়ে দেয় নির্ভরশীল দেশগুলোর কাছে। ভালো করে বুঝে নিন। এখন মানবজাতির সামনে উপস্থিত দায়িত্ব হলো উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর হাতে নির্ভরশীল দেশগুলোর শোষণকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা। এজন্য যা পরিণাম সহ্য করা লাগে, তা করতে হবে।

—চে গুয়েভারা, ১৯৬৪

উন্নয়ন কী?

মানবসমাজে উন্নয়ন এক বহুমুখী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি পর্যায়ে এর মানে হলো দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, অধিকতর স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা, আত্মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও বস্তুগত কল্যাণ। এর মধ্যে কোনো কোনোটি মোটামুটি নৈতিক প্রকৃতির এবং এদের মূল্যায়ন করা কঠিন—এগুলো নির্ভর করে ব্যক্তির বয়স, পারিবারিক শ্রেণী, এবং ঠিক-ভুলের ব্যাপারে ব্যক্তির নিজস্ব ধারণার ওপর। কিন্তু যেটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে, তা হলো ব্যক্তিগত উন্নয়নের এসকল বিষয় অর্জন করার সাথে

সার্বিকভাবে সমাজের অবস্থাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই আদিকাল থেকেই শিকার ও টিকে-থাকার উদ্দেশ্যে মানুষ দলবদ্ধভাবে থাকাকে সুবিধাজনক ও প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। যেকোনো সামাজিক গোষ্ঠীর মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সার্বিকভাবে সমাজকে বোঝার জন্য সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। স্বাধীনতা, দায়িত্বশীলতা, দক্ষতা—এসবের আসল অর্থ তৈরি হয় কেবলমাত্র সমাজের ভেতর মানুষে-মানুষে সম্পর্কের সাপেক্ষে।

একাধিক সামাজিক গোষ্ঠী আবার পরস্পরের সংস্পর্শেও আসে। যেকোনো দুই সমাজের মাঝে সম্পর্ক কেমন হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ দুটির ধরন-প্রকৃতি। তাদের প্রতিটির রাজনৈতিক কাঠামো এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গোষ্ঠীগুলোর শাসক বা নিয়ন্ত্রক শ্রেণীটিই শুধু পারস্পরিক যোগাযোগ, বাণিজ্য বা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। সাধারণ জনগণ না। তাই সামাজিক গোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন মানে হলো, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়া। মানব ইতিহাসের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে প্রাকৃতিক বিপদ এবং বাস্তব ও কাল্পনিক মানবশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও টিকে থাকার সংগ্রাম। অতীতে চিরকালই উন্নয়নের অর্থ ছিল সামাজিক গোষ্ঠীর স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারার সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং সেইসাথে অন্যদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারার সক্ষমতা—এক্ষেত্রে ওই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক।

মানুষই একমাত্র গোষ্ঠীবদ্ধ সত্তা নয়। কিন্তু শুধুমাত্র মানবজাতিই উন্নয়নের অনন্য যাত্রা শুরু করতে পেরেছে। কারণ মানুষের রয়েছে হাতিয়ার ব্যবহারের সামর্থ্য। বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং হাতিয়ার নির্মাণ করার এই কাজটাই যৌক্তিক চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। ঐতিহাসিক পরিভাষায় বললে, চিন্তাবিদ মানুষ যতটা গুরুত্বপূর্ণ, শ্রমিক মানুষও ঠিক ততটাই গুরুত্বধারী। কারণ হাতিয়ার নিয়ে কাজ করাটাই মানুষকে নিতান্ত শারীরিক প্রয়োজন থেকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে নিজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী প্রাণীদের ওপর এবং স্বয়ং প্রকৃতির ওপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে মানুষ। মানুষ কী কী হাতিয়ার দিয়ে কাজ করে এবং কী উপায়ে নিজেদের শ্রমকে সংগঠিত করে, এই উভয় জিনিসই সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

সাধারণত "উন্নয়ন" পরিভাষাটি শুধু অর্থনৈতিক পরিসরেই ব্যবহার করা হয়। এর পক্ষে যুক্তি হলো, অর্থনীতির ধরন নিজেই অন্যান্য সামাজিক বৈশিষ্ট্যের একটি সূচক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাহলে কী? সমাজের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে তাদের পরিবেশের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে

থাকলে একটি সমাজ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার এই সক্ষমতা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর। ওই সমাজের সদস্যরা প্রকৃতির নিয়মগুলো কতটুকু বোঝে (বিজ্ঞান), হাতিয়ার নির্মাণের মাধ্যমে ওই বুঝকে তারা কতটুকু চর্চা করে (প্রযুক্তি), এবং শ্রমবিন্যাসের ধরন। দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মানবের উদ্ভবের সময় থেকেই মানবসমাজে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়ে আসছে। কারণ মানুষ প্রকৃতি থেকে জীবিকা অর্জনের সামর্থ্যকে গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের অর্জনের বিশালতাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় মানবসমাজের আঁকাবাঁকা ইতিহাস নিয়ে ভাবলে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে :

- ☑ প্রথমত, এবড়োথেবড়ো পাথুরে হাতিয়ার থেকে পরবর্তীকালে ধাতুর ব্যবহার শেখা;
- ☑ দ্বিতীয়ত, শিকার ও বন্য ফল সংগ্রহ থেকে পরবর্তীকালে পশুপালন ও ফসল উৎপাদন করতে শেখা;
- ☑ তৃতীয়ত, শ্রমের বিন্যাসকে ব্যক্তিগত কার্যক্রম থেকে বহুজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সামাজিক রূপ প্রদান করতে শেখা।

প্রতিটি জাতিই প্রকৃতির সম্পদকে ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে আরও ভালোভাবে জীবন যাপন করার সামর্থ্যকে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি করে গিয়েছে। প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির আদিম যুগে প্রতিটি মহাদেশই অংশগ্রহণ করেছে স্বাধীনভাবে। তার মানে, প্রতিটি মহাদেশেরই ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো-না-কোনো যুগ। আফ্রিকা যেহেতু মানবজাতির আদিনিবাস, সেহেতু এই মহাদেশটিও ছিল এসব প্রক্রিয়ার এক প্রধান অংশগ্রহণকারী। এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে রিযিক খুঁজে বের করে নেওয়ার ক্রমবর্ধমান সামর্থ্য দেখিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মানুষের যে শারীরিক বিকাশ ঘটতে থাকে, তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আফ্রিকা।[১]

---

[১] লেখক ডারউইনীয় বিবর্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা করেছেন, এর সাথে ইসলাম ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। বিবর্তনবাদ একটি তত্ত্ব। এর স্বপক্ষে তারা এখনো পর্যন্ত কোনো শক্ত দলিল পেশ করতে পারেনি। আমেরিকান গবেষক H. S. Lipson বলেছেন, "On reading *The Origin of Species*, I found that Darwin was much less sure himself than he is often represented to be; the chapter entitled 'Difficulties of the Theory' for example, shows considerable self-doubt. As a physicist, I was particularly intrigued by his comments on how the eye would have arisen" [H. S. Lipson, *A Physicist's View of Darwin's Theory*, *Evolution Trends in Plants*, Vol 2, No.

উন্নয়ন সব জায়গাতেই হচ্ছিল। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ-সুগমকারী অবস্থাগুলো ছিল বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সবখানেই মানুষের কাজ ছিল—মৌলিক বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে টিকে থাকা নিশ্চিত করা। এই টিকে থাকার সংগ্রামের অংশ হিসেবে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল হলো উন্নততর হাতিয়ার। অবশ্য মানব ইতিহাস কেবল অগ্রগতির ইতিহাস নয়। পৃথিবীর প্রতিটি অংশেই কখনো কখনো দেখা দিয়েছে সাময়িক সমস্যা। এমনকি জনগণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু ও অন্যান্য সেবা উৎপাদন করার সক্ষমতা কমেও গিয়েছিল। কিন্তু মূল স্রোতটা ছিল অধিকতর উৎপাদনের দিকে। আর যখনই কোনো সমাজে দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে, সেটার পেছনে কারণ হিসেবে থাকে ওই সমাজের গুণগত পরিবর্তন। অর্থাৎ, ওই সমাজের বৈশিষ্ট্য পালটে যাওয়া। আফ্রিকার আলোচনায় পরে আসা যাবে। কিন্তু পরিমাণ বা গুণগত পরিবর্তন নীতি যে সর্বজনীন, তা বোঝাতে চীনের একটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

চীনের আদিবাসীরা ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। ধীরে ধীরে তারা মৌলিক কিছু বিষয় উদ্ঘাটন করে নেয়। যেমন : আগুন জ্বালানো এবং খাবারের চাহিদা মেটাতে কিছু ঘাসের বীজ মাটিতে পুঁতে দেওয়া ইত্যাদি। এসকল আবিষ্কারের ফলে চীনের অধিবাসীরা সহজসরল কৃষিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তোলে। খাওয়া-পরার জন্য যতটুকু দরকার, পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে তারা অতটুকু খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এই ব্যাপারগুলো অর্জিত হয়েছে খ্রিষ্টের জন্মের বা নবি মুহাম্মাদের হিজরতের কয়েক হাজার বছর আগে।

এ পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য সমাজের সকল সদস্যের মাঝে মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত করে দেওয়া হতো। এই সদস্যরা সমাজে বাস ও কর্ম করত পরিবারবদ্ধ আকারে। সপ্তদশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে যখন তাং রাজবংশের উদ্ভব ঘটে, তখন চীনের অর্থনৈতিক সামর্থ্য দারুণভাবে বেড়ে যায়। তারা যে অধিকতর খাদ্যশস্য ফলাতে শুরু করে, তা-ই না। পাশাপাশি উৎপাদন করতে থাকে নানান রকমের জিনিস, যেমন : রেশম, চীনামাটি, জাহাজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এগুলো উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণগত বৃদ্ধি। কিন্তু চীনা সমাজের গুণগত পরিবর্তনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। শেষোক্ত যুগটিতে একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, যেখানে পূর্বোক্ত যুগে ছিল কেবল স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠী। আগে প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি ব্যক্তিই কৃষিকাজ, গৃহনির্মাণ ও পোশাক সেলাই করত। এবার একেক শ্রেণী একেক কর্ম শুরু

1, 1988, p. 6] - সম্পাদক

করে। প্রায় পুরো জনগোষ্ঠীই তখন জমিজমা চাষ করত। কিন্তু এদের মাঝে কেউ রেশম ও চীনামাটির দক্ষ কারিগর, কেউ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনাকারী আমলা, আর কেউ তাৎক্ষণিক বোধবুদ্ধির বাইরের জিনিসগুলো ব্যাখ্যায় পারদর্শী বৌদ্ধ ও কনফুসীয় দার্শনিক।

বিশেষ দক্ষতা ও শ্রম বণ্টনের ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আসে বণ্টনবৈষম্য। চৈনিক সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ নিয়ে যেতে থাকে। আর ঠিক এই শ্রেণীটিই কিন্তু কৃষি বা শিল্পে সবচেয়ে কম শ্রম দিয়েছে উৎপাদনের জন্য। উৎপাদনের একদম মৌলিক মাধ্যম তথা ভূমির মালিকানা তারা অর্জন করে ফেলেছে। এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য। তাই বিনাশ্রমে অধিক সম্পদ ভোগ করে যেতে পারছে তারা। বেশির ভাগ কৃষকের ক্ষেত্রে বংশ-পরম্পরায় ছোট হতে থাকে পারিবারিক জমির পরিমাণ। অল্প কিছু মানুষ অধিক পরিমাণ জমি হস্তগত করে নেয়। জমির অধিকারে এই পরিবর্তন ছিল বৃহত্তর অর্থে উন্নয়নেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্যই উন্নয়নকে পুরোপুরি অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে দেখা সম্ভব না। বরং এ এক সার্বিক সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের চেষ্টার ফলাফলের ওপর এই প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিবর্তন এবং অবশিষ্ট মহাকাঠামোতে পরিবর্তনের মাঝে অত্যন্ত জটিল কিছু সংযোগ রয়েছে। সতর্ক অধ্যয়নের মাধ্যমে সেগুলোর কিছু কিছুকে বোঝা সম্ভব। এখানে মহাকাঠামোর ভেতরে মতাদর্শ ও সামাজিক বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত। যেমন: এশিয়া ও ইউরোপে গোষ্ঠী-ভিত্তিক ব্যবস্থা পালটে যাওয়ার ফলে এমনকিছু আচরণবিধির সৃষ্টি হয়, যেগুলো সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। বর্মধারী ইউরোপীয় নাইটদের আচরণ অনেকটাই জাপানি সামুরাই বা যোদ্ধাদের মতো। কথিত বাহাদুরির এক মিথ্যে ধারণা তৈরি করে তারা। তাদের ঠাটবাট দেখে মনে হতো যেন কোনো অশ্বারোহী ভদ্রলোক। পক্ষান্তরে কৃষককে শিখতে হবে চরম নম্রতা, বশ্যতা, ও পদলেহী আচরণ। প্রভুদের সামনে তারা ক্যাপ খুলে খালি মাথায় দাঁড়াতে বাধ্য থাকবে। আফ্রিকাতেও রাষ্ট্র ও উচ্চতর শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে এমন চর্চার শুরু হয়, যেখানে রাজা ও অভিজাতদের উপস্থিতিতে সাধারণ প্রজারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। এই পর্যায়ে এসে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিবারের মাঝে সাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত ধরেই সমাজে নতুন এক অবস্থার সূচনা ঘটে।

বিজ্ঞানের একটি সর্বজনবিদিত বিষয় হলো, পরিমাণগত পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময় পর গুণগত পরিবর্তনে বদল হয়। যেমন, পানির তাপশোষণ

ক্ষমতা (পরিমাণগত প্রক্রিয়া) এবং ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তার বাষ্পে পরিণত হওয়া (রূপের গুণগত পরিবর্তন)। মানবসমাজেও এমনটি হয়ে আসছে। অর্থনীতির সম্প্রসারণ একসময় সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তন সাধন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখক কার্ল মার্কস এই বিষয়টি প্রথম লক্ষ করেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের ভেতরে উন্নয়নের বা বিকাশের কয়েকটি ধাপ চিহ্নিত করেন তিনি। সহজসরল শিকারিদের পর যে প্রধান পর্যায়টি আসে, তা হলো গোষ্ঠীতন্ত্র। সেখানে সম্পদের মালিকানা হলো সামষ্টিক, কাজ করা হয় সবাই মিলে, আর পণ্য ভাগাভাগি করা হয় সমানভাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে দাসপ্রথা। এর একটি কারণ হলো, পরিবারের মাঝে শাসক সদস্য বৃদ্ধি পাওয়া। আরেকটি কারণ, কিছু দলের হাতে অপর কিছু দলের শারীরিকভাবে পরাজয়। দাসেরা নানারকম কাজই করত, কিন্তু তাদের প্রধান কাজ ছিল খাদ্য উৎপাদন করা। দাসপ্রথার পরবর্তী পর্যায় হলো সামন্ততন্ত্র। সেখানে জীবিকা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কৃষিই বহাল থাকে। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির মালিকানা চলে যায় অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে। সম্পদের সিংহভাগ তারাই নিয়ে নিতে থাকে। জমিতে কাজ করা শ্রমিকরা (বর্তমানে ভূমিদাস নামে আখ্যায়িত) এখন আর মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না। কিন্তু তারা কোনো-না-কোনো জমিদার বা জমির সাথে বাঁধা।

জমিদারির হাতবদল হলে ভূমিদাসদের সেখানেই থেকে গিয়ে জমির মালিকের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার, তারা শুধু ততটুকুই রাখে। দাসের সন্তানরাও যেমন দাস, তেমনি ভূমিদাসের সন্তানেরাও ভূমিদাস। এর পরের পর্যায় পুঁজিবাদ। এ পর্যায়ে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ কৃষির মাধ্যমে নয়, বরং যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদিত হতে থাকে—কল-কারখানায় ও খনিতে।

সামন্ততন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদেও রয়েছে। সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমগুলোর মালিকানা অল্প কিছু মানুষের কাছে কুক্ষিগত থাকে। আর মানবীয় শ্রমের উৎপাদ বণ্টিত হয় অসমভাবে। শাসনকারী সংখ্যালঘুদের বলা হয় বুর্জোয়া। সামন্তবাদী যুগের বণিক ও কারিগরদের থেকে এদের উদ্ভব। এ পর্যায়ে তারা হয়ে ওঠে শিল্পপতি ও অর্থের কারবারি। ওদিকে ভূমিদাসদের আইনত মুক্ত ঘোষণা করে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলোয় চাকরি সন্ধানের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে তাদের শ্রম হয়ে যায় পণ্য—যেটাকে ক্রয় ও বিক্রয় করা যায়।

অনুমান করা হয়েছিল, এরপর আরেকটি পর্যায় আসবে যা হবে সমাজতান্ত্রিক। গোষ্ঠীতন্ত্রের মতো অর্থনৈতিক সাম্যের নীতি পুনরুদ্ধার হবে এ পর্যায়ে এসে। বর্তমান শতাব্দীতে কিছু দেশে আসলেই সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থনৈতিক ভাষায়, প্রতিটি পর্যায়ই উন্নয়নের পরিচায়ক। কারণ প্রতিটি পর্যায়েই মানুষের বস্তুগত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে সমাজের জন্য অধিকতর খাদ্য ও সেবা উৎপন্ন করা সম্ভব হয়।

দক্ষতা ও মানবীয় উদ্ভাবনী শক্তি যত বেশি, খাদ্য ও সেবার পরিমাণও তত বেশি। নিজের মেধা প্রদর্শন ও বিকশিত করার অধিকতর সুযোগ পাওয়া গেছে, এই অর্থে মুক্ত হয়ে যায় মানুষ। নৈতিক বিচারে মানুষ নিজেকে ওপরে তুলতে পেরেছে কি না, সেটা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। উৎপাদনে অগ্রগতির ফলে সমাজের একাংশের ওপর অপর অংশের ক্ষমতার সীমাও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বৃদ্ধি পায় সহিংসতা। টিকে থাকা ও বেড়ে ওঠার ব্যাপারে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মাঝে যে প্রতিযোগিতা, এই সহিংসতা সেটার অংশও বটে। "আদিম" শব্দটা দিয়ে যা বোঝায়, সে অর্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুঁজিবাদের সেবাকারী সৈনিকের তুলনায় ষোড়শ শতাব্দীর জাপানের সামন্ততান্ত্রিক সৈনিককে অধিকতর আদিম বলার কোনো স্পষ্ট কারণ নেই। কিংবা ব্রাজিলের বনে মানব-সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে বসবাসকারী শিকারিকেও এদের চেয়ে বেশি আদিম বলা কঠিন। তবে এতটুকু আমরা জানি যে, ওই তিন পর্যায়ে (শিকার, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ) জীবনের মান ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়েছে। জীবন হয়েছে কম বিপজ্জনক ও কম অনিশ্চিত। সমাজের সদস্যরা তাদের ভাগ্যের ব্যাপারে সম্ভাব্য অধিকতর বিকল্প থেকে বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে। "উন্নয়ন" শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সবকিছুই বিবেচ্য।

উৎপাদনের বেশ কয়েকটি ধরনের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো সমাজ অতিক্রম করেছে। তাদের ইতিহাস থেকে দেখা যায়—পরিমাণগত পরিবর্তন শেষদিকে এসে ভিন্নরকম সমাজের জন্ম দেয়। এখানে মূল বৈশিষ্ট্য হলো, একটা সময়ে সামাজিক সম্পর্কগুলো আর অগ্রগতি সাধনে সহায়ক থাকে না। বরং সেগুলো কাজ করতে থাকে উৎপাদনশীল শক্তির পথে বাধা হিসেবে। ফলে সেগুলো বাতিল করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেমন : ইউরোপের দাসপ্রথার কথাই ধরুন। দাসপ্রথা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য না। কিন্তু ইউরোপের বড় অংশে এবং রোমান সাম্রাজ্যে খনি ও জমির আবাদের জন্য এই ব্যবস্থা কিছুকাল ভালোমতো কাজে লেগেছে। কিন্তু এরপর মুক্ত শ্রমিকদের শ্রম আবার বহুলাংশে অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছিল দাসদের উপস্থিতির কারণে। দক্ষতার

প্রয়োজন হয়, এরকম কোনো কাজ দাসদের দিয়ে করানো সম্ভব না। ফলে সমাজের প্রযুক্তিগত বিবর্তন স্থবিরতার হুমকির মুখে পড়ে যায়। তা ছাড়া, দাসেরা বিদ্রোহ শুরু করলে তা দমন করা অনেক ব্যয়বহুল। জমির মালিকরা যখন দেখল যে তাদের ভূসম্পত্তি ধ্বংসের মুখে, তখন দাসদের আইনি স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়াটাই সমীচীন বলে মনে করল। দাসরাও এটার জন্য হইচই করছিল। এই মুক্ত ভূমিদাসদের তো আর নিজেদের কোনো চাষের জমি থাকবে না। থাকবে শুধু জমিদারদেরই। এভাবে তাদের শোষণ জারি রাখাও সম্ভব হবে। ফলে অতীতের দাস-মালিক সম্পর্কের জায়গা পূর্ণ করবে জমিদার-ভূমিদাস সম্পর্ক।

কিছু ক্ষেত্রে নতুন পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়ার একটি ক্রান্তিলগ্নে গিয়ে সহিংসতা দেখা দেয়। রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় যখন শাসকগোষ্ঠীর বিদায় ঘণ্টা বাজতে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এসকল সহিংসতা ঘটে। সামন্তপ্রভু জমিদাররা কয়েক শতাব্দী ধরে ক্ষমতায় ছিল। এসময় বণিক ও উৎপাদক শ্রেণী সম্পদশালী হয়ে যায় এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। শ্রেণীগুলো যেহেতু এতটা সুসংজ্ঞায়িত, সেহেতু তাদের সচেতনতাও উচ্চমাত্রার। জমিদার ও পুঁজির মালিক উভয়ই বুঝতে পারে, সংকট কোন জায়গায়। প্রথম দলটি বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য লড়াই করতে থাকে। যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি এবং শ্রমশক্তি ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মের নতুন যে বিন্যাস সৃষ্টি হয়, তার সাথে এই সামাজিক সম্পর্ক আর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইউরোপের পুঁজির মালিকেরা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্রোহ করে উৎপাদনের এই পুরাতন সম্পর্ক ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে।

আফ্রিকার আধুনিক শ্রমিক ও কুলি-মজুর শ্রেণীর অবস্থা বুঝতে হলে, বিপ্লব ও শ্রেণী-সচেতনতার ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু আফ্রিকার ইতিহাসের বড় অংশ জুড়েই বিদ্যমান শ্রেণীগুলোর গঠন ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আর পরিবর্তনগুলো ইউরোপের মতো বৈপ্লবিকভাবে না হয়ে ধীরে ধীরে ঘটেছে। এও মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন হয়েছে অসমভাবে।

সকল সমাজই উন্নয়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, এটা সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে, এক মহাদেশের চেয়ে আরেক মহাদেশের উন্নয়নের হার ছিল ভিন্ন রকম। আবার একই মহাদেশের বিভিন্ন অংশ প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে বিভিন্ন হারে। মিশরীয়রা পঁচিশ শতাব্দী আগে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ উৎপাদন করতে পেরেছে। কারণ, নানারকম বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের

ব্যাপারে তাদের ভালো জানাশোনা ছিল। পাশাপাশি তারা উদ্ভাবন করতে পেরেছিল সেচ, খাদ্য উৎপাদন, এবং মাটির নিচ থেকে খনিজ উত্তোলন করার প্রযুক্তি। অথচ সে-সময় আফ্রিকা মহাদেশের বেশির ভাগ মানুষ শিকারের জন্য তির-ধনুক বা কাঠের গদার ওপর নির্ভরশীল ছিল। এমনকি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বহু অংশের অবস্থাও ছিল এরকমই।

ঠিক কী কারণে বিভিন্ন জাতি বহিরাগত প্রভাব মুক্ত অবস্থায় বিভিন্ন হারে উন্নতি করেছে, এটি এক কঠিন প্রশ্ন। উত্তরের একাংশ হলো, যেই পরিবেশে মানবগোষ্ঠীটির বিবর্তন ঘটেছে, সেটি এর কারণ। আরেকটি অংশ হলো মানব-সমাজের "মহাকাঠামো"। অর্থাৎ, মানুষ বস্তুগত পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করার পাশাপাশি নিজেদের সামাজিক সম্পর্কের ধরন, প্রশাসনের রূপ, আচরণবিধি, এবং বিশ্বাসের রীতিনীতি তৈরি করে নিয়েছে। এই সবগুলো মিলে তৈরি হয় মহাকাঠামো—এটি কোনোকালেই সব সমাজে একইরকম ছিল না। মহাকাঠামোর প্রতিটি উপাদান অন্যান্য উপাদানের সাথে যেমন মিথস্ক্রিয়া করে, তেমনি করে বস্তুগত ভিত্তির সাথেও। যেমন: রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিন্যাস পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং প্রায়শ মিশ্রিত হয়ে যায়। অমুক বনকে পবিত্র বলে ধর্মীয়ভাবে বিশ্বাস করাটা মহাকাঠামোর এমন এক উপাদান, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। কারণ চাষবাসের জন্য তখন ওই বনকে সাফ করা যায় না। মানবীয় উন্নয়নের চূড়ান্ত আগমন ঘটে পরিবেশের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতেই। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে, কোনো সমাজের মহাকাঠামোর বৈশিষ্ট্যও উন্নয়নের হারের ওপর প্রভাব ফেলে।

চীন যে কখনোই পুঁজিবাদী হয়ে ওঠেনি, এই ব্যাপারটি বহু পর্যবেক্ষকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এটি সামন্তবাদী পর্যায়ে প্রবেশ করেছে খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ১,০০০ বছর আগে। প্রযুক্তির বহু দিকও বিকশিত হয়েছে সেখানে। আর সেখানে ছিল বহু কারিগর ও শ্রমশিল্পী। অথচ উৎপাদনের ধরন কখনোই এমন হয়ে ওঠেনি, যেখানে সম্পদ উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম হবে যন্ত্র, আর কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে মালিক শ্রেণীরা। এর ব্যাখ্যা বড় জটিল। কিন্তু সাধারণভাবে বললে, সামন্তবাদী ইউরোপ ও সামন্তবাদী চীনের প্রধান পার্থক্য মহাকাঠামোতে নিহিত। অর্থাৎ, বস্তুগত ভিত্তি থেকে উদ্ভূত বিশ্বাস, প্রেরণা, ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। চীনে ধর্মীয়, শিক্ষাগত, ও আমলাতান্ত্রিক যোগ্যতা ছিল সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। প্রশাসন ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের হাতে। জমিদাররা নিজ নিজ সামন্ত-ভূমিতে পৃথক কোনো সরকার-ব্যবস্থা গড়ে তুলত না। আবার, ইউরোপীয় ভূমিবণ্টনের তুলনায় চীনা ভূমিবণ্টনে

সাম্যবাদী প্রবণতা ছিল বেশি। তা ছাড়া, চীনা রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল বিশাল পরিমাণ জমি। এর ফলাফল দাঁড়ায়, আমলা হিসেবে জমিদারদের ক্ষমতা যত, সম্পদশালী হিসেবে ব্যক্তির ক্ষমতা ততটা না। উক্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা সামাজিক সম্পর্ককে একই আকৃতিতে অক্ষুণ্ন রাখে। চিরকাল এমনটিই করে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে তারা স্লো করে দেয়। ইউরোপে পরিবর্তনের উপাদানগুলো আমলাতন্ত্রের ভারে সেভাবে স্লো হয়ে যায়নি।

ইউরোপীয় সমাজে যখন পুঁজির মালিকদের উদ্ভব ঘটল, অমনি এই শ্রেণীটির মনে আরও বেশি উন্নয়ন করার প্রণোদনা তৈরি হলো। এভাবে একদল মানুষ সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের জন্য সচেতনভাবে কাজ শুরু করল। ইতিপূর্বে কোনো সমাজেই এ ধরনের কোনো শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেনি। বেশি বেশি পুঁজি জমা করার এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল মালিক শ্রেণী। কারণ, বৈজ্ঞানিক সূত্র কাজে লাগিয়ে একে যান্ত্রিক কর্মে পরিণত করা যায়, যার ফলে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারবে তারা।

রাজনৈতিক স্তরের কথা বললে, বর্তমানে যেটা পশ্চিমা গণতন্ত্র নামে পরিচিত, তার বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী পুঁজিবাদ। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য পুঁজিবাদীরা সংসদব্যবস্থা, সংবিধান, ও গণমাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে বুলি আওড়ানো শুরু করে। এগুলোকেও উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু ইউরোপের কুলি-মজুর ও শ্রমিকদের (এবং কালক্রমে সারা বিশ্বের অধিবাসীদের) এজন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে। যাতে করে পুঁজিপতিরা মানবীয় শ্রম থেকে মুনাফা হাসিল করে নিতে পারে (যন্ত্রের পেছনে তো এই মানবীয় শ্রমই মূল চালিকাশক্তি)। এর ফলে উন্নয়নের অন্যান্য দিকের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

বিশেষত যারা পুঁজিবাদীদের অর্জনকে সম্ভব করার জন্য ভুক্তভোগী হয়েছে এবং এখনো হয়ে চলেছে, তাদের সাথে। এই ভুক্তভোগী দলটিই মানবজাতির বৃহত্তর অংশ। এগিয়ে যেতে হলে তাদের উচিত পুঁজিবাদকে উৎখাত করা। আর ঠিক এ কারণেই মানব-সমাজের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদ। আরেকভাবে বললে, পুঁজিবাদের সামাজিক (শ্রেণী) সম্পর্ক এখন মেয়াদোত্তীর্ণ, ঠিক যেভাবে নিজ নিজ সময়ে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল দাস-মালিক এবং সামন্তকেন্দ্রিক সম্পর্কগুলো।

একটি যুগ ছিল, যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেশ ভালো সংখ্যক মানুষের

উপকার করেছিল। এটি ছিল সংখ্যালঘুর জন্য মুনাফা অর্জনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আজ সাধারণ জনগণের বস্তুগত ও সামাজিক চাহিদা নিবারণ করার সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে মুনাফা অর্জনের এই অভিযান। পুঁজির মালিক বা বুর্জোয়া শ্রেণী এখন আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ বিকাশকে পথ দেখাতে সক্ষম নয়। কারণ হলো, এগুলো এখন মুনাফার সাথে সাংঘর্ষিক। পুঁজিবাদ কিছু মৌলিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে অপারগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন: উৎপাদন-সক্ষমতার অপর্যাপ্ত ব্যবহার, সবসময়ই একটি বেকার জনগোষ্ঠী বিদ্যমান থাকা, এবং "বাজার" ধারণাটির সাথে জড়িত পুনঃপুনঃ অর্থনৈতিক সংকট। বাজারব্যবস্থা মানুষের পণ্যের প্রয়োজনীয়তার বদলে বরং তাদের মূল্য পরিশোধের ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়। পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছে নিজস্ব কিছু অযৌক্তিক বিষয়। যেমন: বিষাক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ, বিজ্ঞাপন প্রচারণার সাথে সংশ্লিষ্ট মারাত্মক অপচয়, এবং এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভেতরও সম্পদ ও অপব্যয়ের মাঝে বিরাজমান অবিশ্বাস্য রকমের দারিদ্র্য।

সর্বোপরি, পুঁজিবাদ নিজের রাজনৈতিক স্ববিরোধিতাকেও প্রকট করে তুলেছে। সে ইউরোপের বাইরের দেশ ও মহাদেশগুলোকে পদানত করার চেষ্টায় লিপ্ত। তাই পৃথিবীর প্রতিটি অংশের কৃষক ও শ্রমিকেরা হয়ে উঠেছে আত্মসচেতন। তারা এখন নিজেদের ভাগ্যকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে বদ্ধপরিকর। এই বিষয়টিও আবার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ঢালাওভাবে বলা চলে, উন্নয়নের সকল পর্যায়ই অস্থায়ী। আজ হোক বা কাল, সে অন্য কিছুর জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য। পুঁজিবাদের প্রসঙ্গে এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ পুঁজিবাদী যুগ এখনো শেষ হয়নি। যারা যে যুগে বাস করে, তারা সে যুগটির ক্ষণস্থায়িত্ব টের পায় না। বোঝে না যে, তাদের জীবনব্যবস্থাও পরিবর্তিত হবে বা উৎখাত হয়ে যাবে। এখানেই পুঁজিবাদীরা সুযোগ বুঝে পুঁজিবাদের পক্ষে সাফাই গায়। দাবি করে, পুঁজিবাদ চিরকাল থাকবে। বিগত পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে সমাজতন্ত্রের। এ থেকে বোঝা যায়, পুঁজিবাদের পক্ষে বয়ানদাতারা আসলে দ্রুত ক্ষয়-হতে-থাকা এক সমাজব্যবস্থার মুখপাত্র।

আজ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ একইসাথে অস্তিত্বমান। এখান থেকে আমাদের একটি বিষয় বুঝতে হবে। উৎপাদনের একটি ধরনকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে আরেকটি আসে না। অসম উন্নয়নের ফলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকা একাধিক সমাজ প্রায়ই পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে। যেমন: গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজ ও

পুঁজিবাদী সমাজ।

দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সমাজ যখন দীর্ঘকাল পরস্পরের কার্যকরী সংস্পর্শে থাকে, তখন উভয় সমাজের পরিবর্তনের হার ও ধরন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। এমনকি পুরোপুরি নতুন ধাঁচও সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। সার্বিকভাবে এখানে দুটি সূত্র প্রযোজ্য।

☑ **প্রথমত,** দুই সমাজের মাঝে দুর্বলতর সমাজটি (যেটির অর্থনৈতিক সামর্থ্য কম) বিরূপভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য। সমাজ দুটির মাঝে পার্থক্য যত বেশি হয়, তার পরিণাম হয় ততই ক্ষতিকর। যেমন : ইউরোপীয় পুঁজিবাদ যখন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের আদিনিবাসী শিকারি সমাজগুলোর সংস্পর্শে আসে, এই আদিনিবাসীরা তখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

☑ **দ্বিতীয়ত,** ধরা যাক দুর্বলতর সমাজটি কোনোক্রমে টিকে গেল। তবুও তার স্বাধীন উন্নয়ন পুনরায় আরম্ভ করতে হলে তাকে তার আগেকার অর্থনীতির চেয়ে এক ধাপ ওপরে উঠে আসতে হবে। এই দ্বিতীয় নিয়মের বাস্তব উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও কোরিয়া।

চীন ও কোরিয়া যখন ইউরোপ ও জাপানের পুঁজিবাদী শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন তারা উভয়েই সামন্ততন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছিল। রাশিয়া কোনোকালেই আইনত উপনিবেশ হয়নি। কিন্তু দেশটি একসময় সামন্ততান্ত্রিক ছিল এবং তার নিজস্ব পুঁজিবাদ তখনো খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। এই সময়েই পশ্চিম ইউরোপের সেয়ানা পুঁজিবাদের হাতে পদানত হয়ে যায় রাশিয়ার অর্থনীতি। এই তিনটি দেশেরই পুঁজিবাদের শাসন ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে। পরাধীন থাকাকালে এই দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ভুল খাতে প্রবাহিত করা হয় এবং স্থবির করে দেওয়া হয়। এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতির সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে। বৃহত্তম দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন) ক্ষেত্রে বলতে হয়, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন তাদেরকে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মতো রাষ্ট্রের চেয়ে বহু দূর এগিয়ে দিয়েছে। অথচ ব্রিটেন ও ফ্রান্স কয়েক শতাব্দী ধরে পুঁজিবাদের অনুসারী।

পঞ্চাশের দশকের শেষ অবধি (যেখান পর্যন্ত গিয়ে এই গবেষণাকর্মটি শেষ হয়েছে) পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে চূড়ান্তভাবে বেরিয়ে আসা দেশগুলো হলো রাশিয়া, চীন, কোরিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ। সাম্রাজ্যবাদ স্বয়ং পুঁজিবাদী উন্নয়নের একটি পর্যায়। এটির মাধ্যমেই পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশসমূহ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

সামরিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই আধিপত্যের শিকার-হওয়া দেশগুলো শুরুতে পুঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ে ছিল। তাই এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে পারেনি তারা। সাম্রাজ্যবাদ কার্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি বর্ধিত রূপ। এটি বহু বছর ধরে গোটা পৃথিবীকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। পৃথিবীর একাংশ ছিল শোষক, অপরাংশ শোষিত। একপক্ষ শাসিত, অপরপক্ষ শাসক চরিত্রে অভিনয়কারী। এক অংশ নীতিনির্ধারক, অপর অংশ পরাধীন।

পুঁজিবাদ যেসব জায়গায় দুর্বল, সেসব জায়গাতেই এগিয়ে গেছে সমাজতন্ত্র—যেই অংশগুলো ছিল শোষিত, অত্যাচারিত, ও পরাধীনতায় পর্যবসিত। সমাজতন্ত্র এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের পরাধীন মানুষদের জাতীয় শক্তির লাগাম খুলে দিয়েছে। অর্থবাজারকে উৎপাদনের লক্ষ্য না বানিয়ে বরং মন দিয়েছে মানবীয় চাহিদা পূরণের দিকে। নির্মূল করে দিয়েছে নানারকম প্রতিবন্ধকতা। যেমন: স্থায়ী বেকারত্ব এবং পুনঃপুনঃ সংকট। পশ্চিমা বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়, অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র সেগুলোর কোনো কোনোটাও বাস্তবায়িত করে ফেলেছে। রাজনৈতিক সমতা বা আইনের চোখে সমতা থেকে উপকার পাওয়ার আগে এই অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিত করা জরুরি।

গোষ্ঠীতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু গোষ্ঠীতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল নিম্ন অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং অভাবের কারণে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য প্রাচুর্য সৃষ্টি করা, যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অর্জিতও হয়েছে। ফলে সমতাভিত্তিক বণ্টননীতি নিশ্চিত করা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি সম্ভব হয়েছে সমাজের সকল সদস্যের চাহিদা পূরণ করা।

সমাজতন্ত্রের অধীনে অর্থনৈতিক সামর্থ্য আরও দ্রুত ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর একটি অন্যতম কারণ হলো পরিকল্পিত উন্নয়ন। এখন পর্যন্ত যতগুলো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হলো, সেগুলোর বেশির ভাগই অনিচ্ছাকৃত ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে জড়িত। কেউ পরিকল্পনা করেনি যে, একপর্যায়ে মানুষ পাথরের কুঠারের বদলে ধাতব হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু করবে। আর (সাম্প্রতিক সময়ের কথা বললে) পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সম্প্রসারণ ঘটানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু পুরো ব্যবস্থাটি অর্থনীতি ও সমাজের সার্বিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে কাজ করে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শুধুমাত্র ক্ষেত্রবিশেষে এবং আংশিকভাবে হস্তক্ষেপ করে পুঁজিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হলো শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষ

থেকে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। শ্রমিক ও কৃষকেরা এখন হয়ে উঠেছে বিশ্ব ইতিহাসের ও মানব উন্নয়নের সবচেয়ে গতিশীল শক্তি।

সামাজিক উন্নয়নের মতো অসম্ভব জটিল সমস্যার ব্যাপারে আলোচ্য সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি এখন শেষের দিকে। পরিশেষে একটি স্বীকার্য মেনে নিলে বেশ ভালো হয়। বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নের যেসকল ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। তারা পূর্ণাঙ্গ বিষয়টিকে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে না। শুধু "অর্থনৈতিক উন্নয়ন"-এর সংকীর্ণ পরিসরেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। গড়পড়তা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞায় উন্নয়ন মানে নিতান্ত কিছু "উৎপাদন নিয়ামক"-এর সমন্বয়। এসকল নিয়ামক হলো ভূমি, জনগোষ্ঠী, পুঁজি, প্রযুক্তি, বিশেষ দক্ষতা, ও বৃহৎ মাত্রার উৎপাদন। এসকল নিয়ামক অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

আমাদের বিশ্লেষণেও এখন পর্যন্ত এরকমটাই দেখানো হয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরা যা কিছুকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে অসংখ্য বিষয়। সমাজতন্ত্রের আগে যত উন্নয়ন হয়েছে, সবগুলোর পেছনে রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর নিপীড়ন। বুর্জোয়াদের বিশ্লেষণে এটার কোনো উল্লেখ নেই। উৎপাদনের বা শ্রেণীসমূহের মাঝে যে সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোর কোনো উল্লেখ নেই। এসকল প্রভাবক ও উৎপাদন-সম্পর্কের সমন্বয়ে ইতিহাসের একেক যুগে একেকটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বা উৎপাদনের ধরন তৈরি হয়। এগুলোরও কোনো উল্লেখ নেই। সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদী ধারারই একটি ধাপ, সেটার কোনো উল্লেখ নেই।

পক্ষান্তরে যেসকল বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী নীতিমালা, সেগুলোর শুরুতেই কিছু ধারণার ব্যাপারে আলোচনা পেশ করা উচিত। যেমন: শ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, এবং শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণের ভূমিকা। প্রতিটি নতুন ধারণার ভেতরেই আবার গিজগিজ করছে তার নিজস্ব সব জটিলতা। কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যাকেই সবকিছুর সমাধান মনে করা যাবে না। কিন্তু উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ মানবীয়, ঐতিহাসিক, ও সামাজিক দিকগুলো অন্তত স্বীকার করতে হবে। তাহলেই এরপর "অনুন্নতি" বা এ থেকে পরিত্রাণের কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা শুরু করা সম্ভব।

অনুন্নতি কী?

উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা শেষ। এবার অনুন্নতির ধারণাটা বোঝা সহজ হবে। অনুন্নতি মানে উন্নয়নের অনুপস্থিতি না। কারণ প্রতিটি জাতিই কোনো না

কোনোভাবে, কমবেশি মাত্রায় উন্নতি করেছে। অনুন্নতি হলো উন্নয়নের তারতম্য পরিমাপের একটি মানদণ্ড। এর বাইরে অনুন্নতির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। মানব-সমাজের উন্নয়ন যে অসম পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে, এই ব্যাপারটির সাথে অনুন্নয়নের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একদম অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, কিছু মানবগোষ্ঠী অন্যগুলোর তুলনায় বেশি উৎপাদন করা ও বেশি সম্পদের মালিক হওয়ার মাধ্যমে বেশি উন্নতি করতে পেরেছে।

একটি গোষ্ঠী যখন অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে আপাতদৃষ্টে অধিকতর ধনী হয়ে ওঠে, তখন মানুষ এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করতে চাইবেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেন ইউরোপের বাকি অংশগুলোর চেয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে। তখন বিভিন্ন দেশের সম্পদের তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ। আবার রাশিয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ও জার্মানির তুলনায় "পশ্চাৎপদ" ছিল। তাই একই সময়ে রাশিয়ানরাও ভাবতে শুরু করে এই ব্যাপারটি নিয়ে। আজ আমাদের মূল আলোচ্য হলো বিভিন্ন মহাদেশের মাঝে সম্পদের পার্থক্য। এক পক্ষে রয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা; অপর পক্ষে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা। প্রথম পক্ষটির তুলনায় দ্বিতীয় পক্ষটিকে পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত বলা চলে। তাই সর্বযুগেই অনুন্নতি ব্যাপারটা ছিল আপেক্ষিক বা তুলনানির্ভর। দুটি ভিন্ন যুগে একই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, সেগুলোর মাঝেও তুলনা করা যায়। সেখান থেকে বোঝা যায়, ওই দেশটি উন্নতি করেছে কি না। আর (তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার,) যেকোনো যুগে দুটি দেশের অর্থনীতির মাঝেও তুলনা করা সম্ভব।

বর্তমানে উন্নয়নের দ্বিতীয় এবং আরও অবিচ্ছেদ্য একটি উপাদান হলো শোষণ। এখানে দুই পক্ষের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কটি হলো শোষণের সম্পর্ক। অর্থাৎ, এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করে। পৃথিবীতে "অনুন্নত" হিসেবে আখ্যায়িত সকল দেশই অন্যদের হাতে শোষিত। আর বর্তমান বিশ্ব যে অনুন্নতির সম্মুখীন, তা পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, ও উপনিবেশবাদী শোষণের ফল। আফ্রিকান ও এশিয়ান সমাজগুলো স্বতন্ত্রভাবে উন্নতি করে চলেছিল। এরপর পুঁজিবাদী শক্তিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখল করে নেয় তাদের। এর ফলে শোষণ বৃদ্ধি পায়। উদ্বৃত্ত সম্পদ দেশের বাইরে চলে যেতে থাকে। উক্ত সমাজগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমের উপকার থেকে বঞ্চিত হয়। এটি বর্তমানে অনুন্নতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিছু ক্ষেত্রে "অনুন্নত" শব্দটির বদলে "উন্নয়নশীল" ব্যবহার করার প্রস্তাবনা

উঠেছে। এর উদ্দেশ্য হলো "অনুন্নত" কথাটির সাথে জড়িত নেতিবাচক দ্যোতনা পরিহার করা। কারণ, এই শব্দটি দিয়ে মানসিক, শারীরিক, নৈতিক, বা অন্যকোনো অনুন্নতিও বোঝানো যায়। আসলে "অনুন্নতি" যদি অর্থনীতির তুলনা না হয়ে অন্য কিছু হতো, তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে অনুন্নত দেশ হতো যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশটি অন্যান্য দেশের ওপর গণহারে অত্যাচার চালায়। আর তার অভ্যন্তরে রয়েছে শোষণ, পাশবিকতা, ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির এক মিশ্রণ। কিন্তু অর্থনীতির আলোচনায় "উন্নয়নশীল"-এর বদলে "অনুন্নত" শব্দটি ব্যবহার করাই শ্রেয়। কারণ "উন্নয়নশীল" শুনলে মনে হয় যেন আফ্রিকা, এশিয়া, ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো তাদের অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠছে। বিশ্বের শিল্পনির্ভর দেশগুলোর সাথে শোষণের সম্পর্ক থেকে নিজেদের মুক্ত করছে তারা। অথচ তা একদমই সত্য নয়। আফ্রিকা ও অন্যান্য জায়গার বহু অনুন্নত দেশ তো বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর তুলনায় দিন দিন আরও অনুন্নত হচ্ছে। কারণ উন্নতরা নিত্যনতুন উপায়ে তাদের ওপর শোষণ জোরদার করে চলেছে।

আলোচ্য সমাজে কী কী পণ্য ও সেবা উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর পরিসংখ্যানের ছক ও সূচকের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক তুলনা করা সম্ভব। পেশাদার অর্থনীতিবিদগণ কোনো দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নিয়ে আলোচনা করে। ইদানীং সংবাদপত্রের কল্যাণে এই পরিভাষাগুলো সাধারণ মানুষের মুখেও অহরহ ব্যবহৃত হয়। তাই এগুলোর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে না এখানে। এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, জাতীয় আয় বলতে পুরো দেশের মোট সম্পদকে বোঝায়। আর জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় মাথাপিছু আয়। সেখানকার অধিবাসীদের "গড়" আয়ের একটি ধারণা পাওয়ার জন্য করা হয় এই হিসাব। যেসব দেশে মানুষে-মানুষে সম্পদের চরম ব্যবধান বিদ্যমান, সেখানে এই "গড়" সংখ্যাটি চরমভাবে বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

এক তরুণ উগান্ডান খুবই সহজ একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। তার দরিদ্র শ্রমিক পিতা এবং দেশটির সবচেয়ে ধনী পুঁজিপতি মাধভানির আয়ের মাঝে রয়েছে প্রকাণ্ড ফারাক। মাথাপিছু আয়ের হিসাব এই পার্থক্যকে ঢেকে দেয়। অনুন্নতিকে বাদ দিয়ে যখন শুধু উন্নয়নের আলাপ করা হয়, তখন এই বিষয়টি মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের আলাপে ভূমিবণ্টন, সম্পত্তির মালিকানা, ও উপার্জনের মধ্যকার বিশ্রী তারতম্যকে একদমই গোনায় ধরা হয় না। জাতীয় আয়ের সংখ্যার পেছনে ঢাকা পড়ে যায় এসকল বাস্তবতা। ইতিহাসের একপর্যায়ে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত

সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোকে হটানোর মাধ্যমে। বর্তমান সময়ে উন্নয়ন মানে এমন অগ্রগতি, যেখানে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকে সুবিধাবঞ্চিতদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। তারপরও এক দেশের সাথে আরেক দেশের তুলনার জন্য মাথাপিছু আয়ের হিসাবটি একটি কার্যকর মানদণ্ড। আর সদ্য-স্বাধীন-হওয়া যেকোনো আফ্রিকান দেশের তুলনায় প্রতিটি উন্নত রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় কয়েক গুণ বেশি।

আফ্রিকার সাথে কিছু দেশের মাথাপিছু আয়ের যে পার্থক্য, তার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে নিচের ছক থেকে। এই পার্থক্যের কারণেই একটি পক্ষকে বলা হয় "উন্নত" এবং অন্যটিকে "অনুন্নত"। (তথ্যগুলো জাতিসংঘের পরিসংখ্যান প্রকাশনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সবগুলো তথ্য ১৯৬৮ সালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদি না অন্যথা উল্লেখ করা থাকে।)

দৃশ্যমান এই পার্থক্য কেবল বেশিই না, বরং ক্রমবর্ধমান। অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, উন্নত দেশগুলো আরও ধনী হয়ে উঠছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। আর অনুন্নত দেশগুলোয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্থবিরতা, আর নয়তো প্রবৃদ্ধির নিম্ন হার। প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় করে একটি সংখ্যা আকারে প্রকাশ করা যাবে। এই প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয়। এর পরেই রয়েছে পুঁজিবাদী বড় দেশগুলো। উপনিবেশ ও প্রাক-উপনিবেশগুলো বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলো যে অনুপাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকারী ছিল, তা কমে আসছে। এই অনুপাত ১৯৩৮ সালে ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। ষাটের দশকে তা ২০ শতাংশেরও কমে নেমে আসে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। কারণ একটি দেশে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কতটুকু এবং বাহিরে থেকে আনা পণ্য তারা কীভাবে অর্জন করে, সেগুলোর প্রতিফলনই ব্যবসা-বাণিজ্য।

অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অনুন্নত দেশগুলোর একদম বিপরীত। সবগুলো উন্নত দেশই শিল্পায়িত। অর্থাৎ, তাদের কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষির সাথে জড়িত না, বরং শিল্প-কারখানার সাথে জড়িত। তাদের বেশির ভাগ সম্পদ আসে খনি, কারখানা, ও অন্যান্য শিল্প থেকে। উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতার কারণে একেকজন শ্রমিকের শ্রমের বিপরীতে বেশি মাত্রার ফলাফল লাভ হয়। এগুলো জানা কথা। কিন্তু এর চেয়েও নজরকাড়া ব্যাপার হলো, উন্নত দেশগুলোর কৃষিও বাকি বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। তাদের কৃষিও শিল্পখাতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থনীতিতে কৃষিজ উৎপাদের পরিমাণ কম হলেও তা অনুন্নত দেশের চেয়ে

বেশি। আফ্রিকা, এশিয়া, ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়, কারণ তারা ওই কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুব কম বা একদমই নেই। কিন্তু তাদের কৃষি অবৈজ্ঞানিক। এগুলোর উৎপাদ উন্নত দেশগুলোর তুলনায় খুবই কম। সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলোর কৃষিখাতে ১৯৬৬ সাল থেকে হয় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে, আর নয়তো হ্রাস পেয়েছে। আফ্রিকায় মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। যেহেতু উন্নত দেশগুলোর শিল্প ও কৃষিখাত বাকিদের তুলনায় শক্তিশালী, সেহেতু তারা গরিব দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি পণ্য উৎপাদন করে। এটা প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি বিলাসী পণ্যের ক্ষেত্রেও। খাদ্যশস্য, দুধ, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক শক্তি, কাগজ, ও আরও নানারকম পণ্য কোন দেশে কতটুকু উৎপাদিত হয়, তা পরিসংখ্যান-ভিত্তিক ছক এঁকে দেখানো সম্ভব। একইসাথে দেখানো যাবে যে, প্রতিটি নাগরিকের (গড়পড়তা) কাছে একেকটি পণ্যের সহজলভ্যতা কতটুকু। এখানেও অল্প কিছু সুবিধাভোগী দেশের সাথে বাকি বিশ্বের রয়েছে বিশাল ফারাক।

দেশ	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)
কানাডা	২,২৪৭
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩,৫৭৮
ফ্রান্স	১,৭৩৮ (১৯৬৭)
যুক্তরাজ্য	১,৫৬০ (১৯৬৭)
গোটা আফ্রিকা	১৪০ (১৯৬৫)
কঙ্গো	৫২
ঘানা	১৯৮
কেনিয়া	১০৭
মালাওয়ি	৫২
মরক্কো	১৮৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৪৩
তানজানিয়া	৬২
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	১৫৬

জাম্বিয়া	২২৫

একটা দেশে কী পরিমাণ ইস্পাত ব্যবহৃত হয়, তা সেখানকার শিল্পায়নের এক অসাধারণ মানদণ্ড। এক প্রান্তে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ ৬৮৫ কিলোগ্রাম, সুইডেনে ৬২৩, পূর্ব জার্মানিতে ৪৩৭। আরেক প্রান্তে জাম্বিয়ায় সেই পরিমাণ দশ কিলোগ্রাম, পূর্ব আফ্রিকায় আট, ইথিওপিয়ায় দুই। চিনির ক্ষেত্রে একই ধরনের হিসাব করলে অস্ট্রেলিয়ায় তার পরিমাণ দেখা যায় ৫৭ কিলোগ্রাম, উত্তর আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ করে। কিন্তু আফ্রিকায় চিনির বার্ষিক ব্যবহার মাথাপিছু মাত্র দশ কেজি। অবশ্য এশিয়ার (সাত কেজি) চেয়ে এদিক দিয়ে তারা এগিয়ে আছে।

মৌলিক খাদ্য চাহিদার পরিসংখ্যানের চিত্রটা এর চেয়েও দুঃখজনক। প্রতিটি ব্যক্তির দৈনিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি খাদ্য প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত পরিমাণটি হলো দিনে ৩,০০০ ক্যালোরি। কিন্তু একটা আফ্রিকান দেশও এর ধারেকাছেও নেই। আলজেরীয়রা দৈনিক ভক্ষণ করে গড়ে মাত্র ১,৮৭০ ক্যালোরি। যে আইভোরি কোস্টকে আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে বেশ সচ্ছল বলা চলে, তাদের জাতীয় গড় ২,২৯০ ক্যালোরি। তা ছাড়া খাদ্য উপাদানের মাঝে প্রোটিনের পরিমাণকেও বিবেচনায় নেওয়া চাই। আফ্রিকার অনেক অংশই "প্রোটিন দুর্ভিক্ষে" জর্জরিত। অর্থাৎ, শর্করা-জাতীয় খাদ্য থেকে ক্যালোরি পেলেও প্রোটিন জোটে না তাদের কপালে। উন্নত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষেরা অনুন্নত দেশের চেয়ে দ্বিগুণ প্রোটিন ভক্ষণ করে। এসকল পার্থক্য থেকে বোঝাই যায়, কোন দেশগুলো উন্নত আর কোনগুলো অনুন্নত।

মানবীয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বস্তুগত উৎপাদন যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি সামাজিক সেবাও। বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ করা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু সরকার বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ যে-ই এগুলো প্রতিষ্ঠিত করুক না কেন, সেগুলোর সংখ্যা হতে হবে জনসংখ্যার অনুপাতে। একটা দেশে মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সামাজিক সেবা কতটা সহজলভ্য, তা নির্ণয় করার কিছু পরোক্ষ মাধ্যমও রয়েছে। যেমন : প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, শিশু মৃত্যুহার, পুষ্টিহীনতার পরিমাণ, টিকা ও গণস্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব, এবং সাক্ষরতার হার। এই সব ক্ষেত্রেই উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মাঝে রয়েছে বিশাল ও ভয়ানক পার্থক্য। ক্যামেরুনে জন্মানো ১,০০০ শিশুর মাঝে ১০০টি প্রথম জন্মদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। গ্রাম্য সিয়েরা লিওনে জন্মানো

১,০০০ শিশুর মাঝে এক বছর হওয়ার আগে মারা যায় ১৬০টি। ওদিকে যুক্তরাজ্য ও হল্যান্ডে এই সংখ্যা যথাক্রমে মাত্র ১২ ও ১৮। তা ছাড়া, পাঁচ বছর হওয়ার আগে মারা যায় আরও অনেক আফ্রিকান শিশু। চিকিৎসকের অভাব একটি বড় সমস্যা। ইটালিতে প্রতি ৫৮০ জনের জন্য রয়েছে একজন করে ডাক্তার। নাইজারে একজন ডাক্তারকে সামাল দিতে হয় ৫৬,১৪০ জনকে। তিউনিসিয়াতে সেই সংখ্যাটি ৮,৩২০; আর চাদে ৭৩,৪৬০।

একটি শিল্পায়িত অর্থনীতিকে কর্মক্ষম রাখতে হলে চাই বিশাল সংখ্যক দক্ষ জনগোষ্ঠী। অথচ উচ্চ যোগ্যতাবিশিষ্ট মানুষের সংখ্যা আফ্রিকায় দুঃখজনকভাবে কম। ডাক্তারের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হলো, তা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট। প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিদ, এবং এমনকি কিছু জায়গায় প্রশাসক ও আইনজীবীর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান। ঢালাইয়ের মতো কাজগুলোতে যেখানে মধ্যম মাত্রার দক্ষতা প্রয়োজন, সেখানেও রয়েছে অভাব। গোদের ওপর বিষফোড়া হিসেবে বর্তমানে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, ও পূর্ব ইউরোপ থেকে চলছে "ব্রেইন ড্রেইন"। অর্থাৎ, অনুন্নত বিশ্বে যে কয়জন পেশাজীবী, প্রযুক্তিবিদ, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রশাসক ও দক্ষ শ্রমিক রয়েছে, তারাও বেশি বেতন ও অধিক সুবিধার লোভে উন্নত বিশ্বে পাড়ি দিচ্ছে। এতে করে আরও কমে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা।

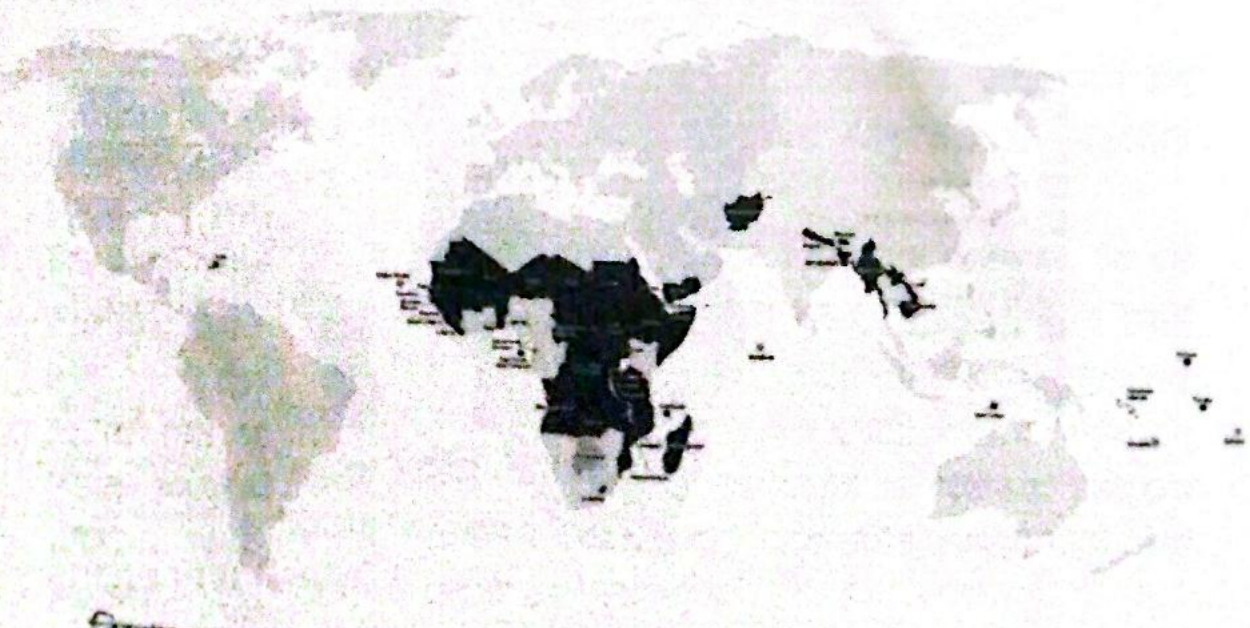
আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এই ভারসাম্যহীনতার আরেকটি চমকে দেওয়া দিক রয়েছে। তা হলো, অনুন্নত দেশগুলো ঘুরেফিরে আবার দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। আর এজন্য তাদের পরিশোধ করতে হয় মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক।

এখন পর্যন্ত উপস্থাপিত বেশির ভাগ উপাত্তকে বলা চলে "পরিমাণগত"। বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার পরিমাণ জানা যায় এখান থেকে। অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পাওয়ার জন্য এর সাথে কিছু নির্দিষ্ট গুণগত বিষয়ও যোগ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু বেশি বেশি পণ্য ও সেবা উৎপাদন করাই যথেষ্ট নয়। দেশটিকে ওইসব পণ্য ও সেবা বেশি মাত্রায় উৎপাদন করতে হবে, যাতে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে যায়। যেমন, খাদ্য উৎপাদন খাত এমনভাবে বিকশিত হতে হবে, যেন কর্মীদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর কৃষিখাত এমন কার্যকর হতে হবে, যেন সেই খাত থেকে আসা মুনাফা (বা সঞ্চয়) শিল্পখাত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ভারী শিল্প (যেমন ইস্পাত শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন) বিদ্যমান থাকতে হবে, যেন কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদিত করা যায়।

ভারী শিল্পের অভাব, খাদ্যের অপর্যাপ্ত উৎপাদন, অবৈজ্ঞানিক কৃষি—এগুলো সব অনুন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

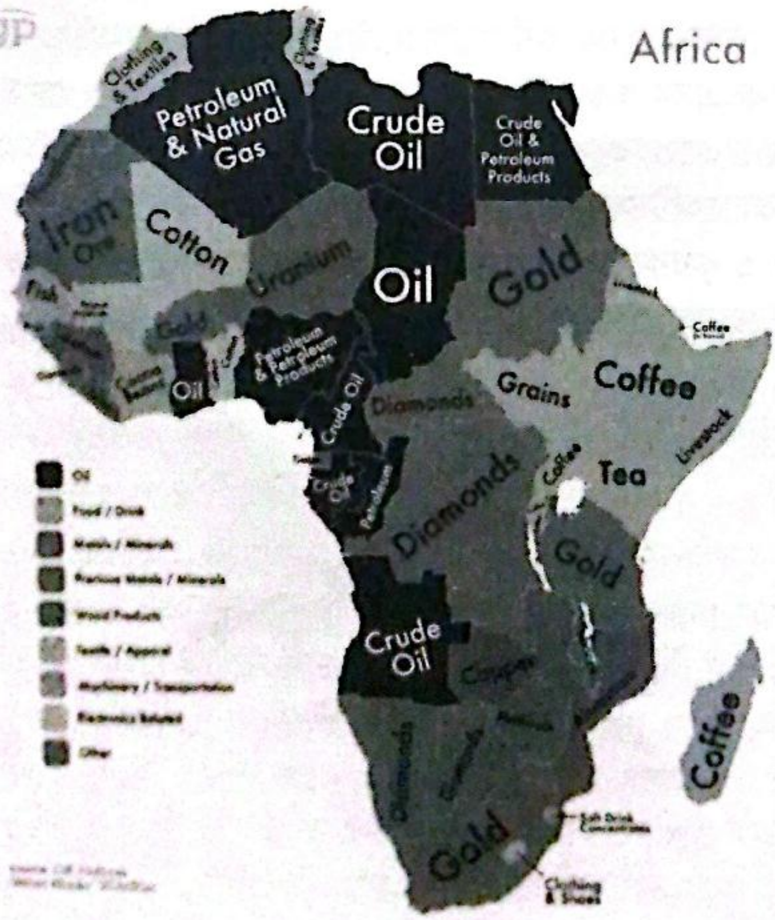
অনুন্নত দেশগুলো অর্থনীতির সেসব খাতে মনোযোগ দেয় না (বা তাদের দিতে দেওয়া হয় না), যেগুলো একসময় প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করবে এবং উৎপাদনকে সার্বিকভাবে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এটা অনুন্নত অর্থনীতির এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া তাদের বিভিন্ন খাতের মাঝে সমন্বয়ও থাকে নগণ্য। যেমন, কৃষি ও শিল্প পরস্পরকে উপকৃত করতে পারে না।

এছাড়াও দেশের ভেতর যা কিছু সঞ্চয় হয়, সেগুলো প্রধানত বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর নয়তো ভোগ করে শেষ করে ফেলা হয়। উৎপাদনশীল কোনো উদ্দেশ্যে পুনরায় ব্যবহার করা হয় না সেগুলোকে। দেশের ভেতরে থাকা জাতীয় আয় চলে যায় এমনসব মানুষের পারিশ্রমিক বাবদ, যারা সম্পদ উৎপাদনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না। বরং সহায়ক কিছু সেবা প্রদান করে কেবল। যেমন: লোকপ্রশাসন কর্মী, বণিক, সৈনিক, বিনোদনকর্মী। কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য এসকল চাকরিতে যতজন মানুষ দরকার, তার চেয়ে বেশি নিয়োগ করা হয়। এতে করে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। আর এই সবকিছুর ওপর আরেকটি সমস্যা, এসকল লোক কৃষি বা শিল্পে পুনর্বিনিয়োগ করে না। শ্রমিক ও কৃষকদের উৎপাদিত এই সম্পদ তারা উড়িয়ে দেয় গাড়ি, মদ, আর সুগন্ধি কেনার পেছনে।



বিশ্বের সবচেয়ে অনুন্নত দেশসমূহ অধিকাংশই আফ্রিকায় কেন? কার দোষে?
[nationsonline.org]

পরিহাসের ব্যাপার এই যে, বহু অনুন্নত দেশের প্রধান "শিল্পখাত" হলো প্রশাসন। বেশিদিন আগের কথা না। ডাহোমির অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ৬০ শতাংশ চলে যেত লোকপ্রশাসন কর্মী ও সরকারি নেতাদের বেতনের পেছনে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের চেয়ে এই দেশের নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের বেতন ছিল বেশি। আর অনুন্নত আফ্রিকান দেশগুলোতে সাংসদের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশি। গ্যাবোনে প্রতি ছয় হাজার বাসিন্দার বিপরীতে সাংসদ রয়েছে এক জন করে। অথচ ফ্রান্সের পার্লামেন্টে প্রতিনিধির সংখ্যা প্রতি এক লক্ষ নাগরিকের বিপরীতে এক জন। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেখানো সম্ভব। তাই অনুন্নত কোনো দেশের অর্থনীতিকে বুঝতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বন্টনের এই বৈষম্যকেও বিবেচনায় নিতে হবে। বিপুল পরিমাণ দেশীয় সম্পদ চলে যায় মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীর পকেটে।



আফ্রিকার এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের পক্ষে অজুহাত হিসেবে করের কথা তুলে ধরে। বলে, তাদের দেওয়া করের টাকাতেই দেশ চলে। খালি চোখে এই বক্তব্য যৌক্তিক বটে। কিন্তু ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়, এটি নিতান্তই উদ্ভট যুক্তি। অর্থনীতির ব্যাপারে নিরেট অজ্ঞতাই ফুটে ওঠে এই কথা থেকে। করের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ উৎপাদন বা উন্নয়ন ঘটে না। প্রকৃতি থেকে আগে সম্পদ উৎপাদন করতে হয়—জমি চাষ করা, খনি থেকে ধাতু আহরণ

করা, গাছ কাটা, কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য উৎপাদিত পণ্যে পরিণত করা। এই কাজগুলো করে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ, যারা পেশায় শ্রমিক ও কৃষক।

এই মানুষগুলো মাথার ঘাম পায়ে না ফেললে তো কোনো উপার্জনই সৃষ্টি হতো না, যেখান থেকে আপনি কর দিতেন।

জনতার উৎপাদিত সম্পদের ভাণ্ডার থেকে সরকারি কর্মী, পেশাজীবী, ও বণিকদের উপার্জন আসে। সম্পদ বণ্টনে অবিচারের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু "করদাতাদের" টাকায় দেশের উন্নয়ন হয়, এই যুক্তিকে ছুড়ে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আগে উৎপাদকদের থেকে শুরু করতে হবে। তারপর দেখতে হবে, তাদের শ্রমের উৎপাদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে জাতির স্বনির্ভরতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না।

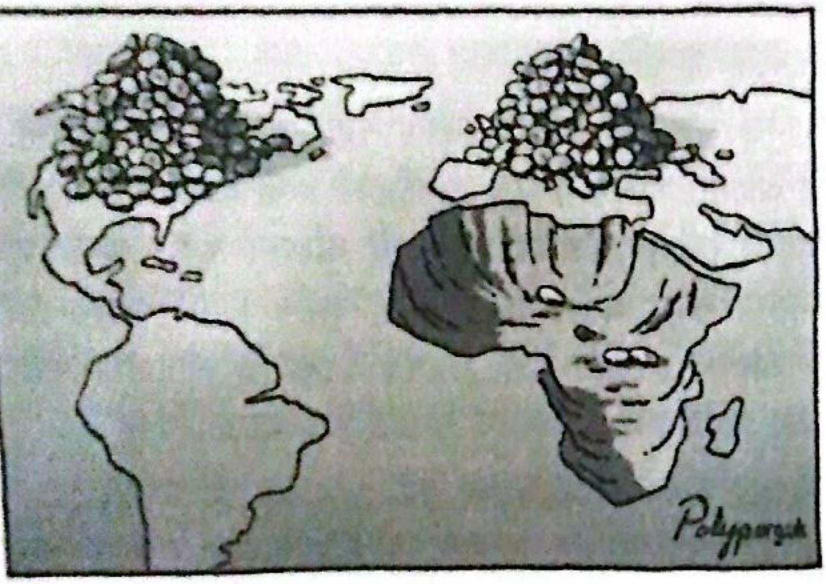
শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়, তা মাথায় রাখুন। তাহলেই খেয়াল করবেন যে, অনুন্নত দেশগুলোয় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব প্রায় নেই বললেই চলে। জীবনকে উন্নত করার জন্য এগুলো কত ভালোভাবে ব্যবহার করা যেত। এ উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক অঞ্চল পারস্পরিক সুবিধার জন্য নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ একাট্টাও করতে পারত। সত্যি বলতে কী, অনুন্নত দেশগুলোই প্রাকৃতিক সম্পদে সবচেয়ে এগিয়ে। অথচ নাগরিকদের জন্য ও নাগরিকদের দ্বারা সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার বিচারে বর্তমানে তারাই সবচেয়ে দরিদ্র।

জাতিসংঘ ১৯৬৪ সাল অবধি যে সার্ভে অব একোনমিক কন্ডিশানস ইন আফ্রিকা পরিচালিত করেছে, সেখানে মহাদেশটির প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডার সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আফ্রিকা খনিজ ও প্রাথমিক শক্তি সম্পদে একেবারে ভরপুর। বিশ্বের জনসংখ্যার আনুমানিক ৯ শতাংশ এখানে বসবাস করে। অথচ পৃথিবীর মোট খনিজ উৎপাদের ২৮ শতাংশ এবং অশোধিত পেট্রোলিয়ামের ৬ শতাংশই রয়েছে এই মহাদেশে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ষোলোটি পূর্ণ ধাতব ও অধাতব খনিজের মধ্যে দশটি আফ্রিকায় পাওয়া যায়। এগুলোর একেকটির ক্ষেত্রে আফ্রিকার অবদান পুরো বিশ্বের ২২ থেকে ৯৫ শতাংশ।

আসলে নতুন নতুন খনিজ সম্পদ উদ্‌ঘাটনের সাথে সাথে আফ্রিকা হয়ে উঠছে আরও বেশি সম্ভাবনাময়। ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের প্রাচুর্য দেখে যতটা মনে হয়, আফ্রিকার মাটি আসলে কৃষির জন্য অতটা উপকারী নয়। কিন্তু অন্যান্য

দিক দিয়ে আবার পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে। তাই যথাযথ সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে মহাদেশের বেশির ভাগ অংশে সারা বছর জুড়ে ফসল ফলানো সম্ভব।



কিন্তু আফ্রিকা তার বেশির ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার তো দূরের কথা, এর ধারেকাছেও যেতে পারেনি। আর এখানে উৎপাদিত বেশির ভাগ সম্পদ আফ্রিকার ভেতরেও থাকছে না, আফ্রিকানদের উপকারেও ব্যবহৃত হচ্ছে না। জাম্বিয়া ও কঙ্গো বিপুল পরিমাণ তামা উৎপন্ন করে। কিন্তু সেগুলোর উপকার ভোগ করে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ও জাপান। এমনকি আফ্রিকার ভেতরে উৎপাদিত হয়ে আফ্রিকাতেই থেকে যায় যেসকল পণ্য ও সেবা, সেগুলোও চলে যায় ভিনদেশিদের হাতে। দক্ষিণ আফ্রিকা বুক চাপড়ে বলে, গোটা আফ্রিকায় তাদের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তার বণ্টন কীভাবে হয়? বর্ণবিদ্বেষী সরকার নিশ্চিত করে, যাতে প্রতি ১,০০০ শ্বেতাঙ্গ শিশুর মাঝে ২৪ জনের বেশি মারা না যায়। কিন্তু প্রতি ১,০০০ আফ্রিকান শিশুর মাঝে ১২৮টিকে মরতে দিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। আফ্রিকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে বুঝতে হলে আগে জানতে হবে, কেন আফ্রিকা তার প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে এত কম ব্যবহার করতে পেরেছে। আরও জানতে হবে, কেন তার বর্তমান সম্পদের এত বড় অংশ চলে যায় অনাফ্রিকানদের হাতে, যাদের অধিকাংশ আবার বসবাস করে মহাদেশটির বাইরে।

এক অর্থে, অনুন্নয়ন শব্দটা একটা গোলকধাঁধা। পৃথিবীর যেসব জায়গা প্রাকৃতিকভাবে প্রাচুর্যশালী, তার অনেকগুলো দেশ বাস্তবে গরিব। আবার যেসব জায়গার মাটি বা খনি অত উন্নত না, তাদের জীবনযাত্রার মান সবার চেয়ে ওপরে। উন্নত বিশ্বের পুঁজিবাদীরা যখন এই গোলকধাঁধার ব্যাখ্যা দেওয়ার

চেষ্টা করে, তারা ভাব দেখায় যেন এহেন পরিস্থিতি আসলে "ঈশ্বরের ইচ্ছে" জাতীয় কিছু একটা। উন্নয়ন-বিষয়ক এক বইয়ে জনৈক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ স্বীকার করেছেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার পরিসংখ্যানগত ফারাক অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। তিনি বলেছেন, গত ১৫০ বছরে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মাঝে এই ফারাক কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উক্ত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এর কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেননি। শোষণভিত্তিক সম্পর্কের কারণেই যে পুঁজিবাদী পরজীবীরা নিজেরা মোটাতাজা হয়ে অন্যদের গরিব করে দিয়েছে, তাও স্বীকার করেননি তিনি। বরং হাজির করেছেন একটি বাইবেলীয় ব্যাখ্যা! এটা নাকি বাইবেলেই বলা আছে :

> "কারণ যার কাছে আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে ও তার অনেক হবে। যার নেই, তার কাছে যা আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। আর তোমরা সেই অকর্মণ্য দাসকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে কেবলই রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে।" (মথি, ২৫ : ২৯-৩০)

"যার নেই", তারা হলো আজকের অনুন্নত দেশগুলো।

এর উত্তরে মনে হয় "আমিন" বলে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনুন্নতিকে একরকম ঈশ্বরের ইচ্ছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ ইউরোপের জ্ঞানীমহল বর্ণবাদী মানসিকতায় আক্রান্ত। বর্ণবাদীরা প্রকাশ্যে বলে বা পরোক্ষভাবে বোঝাতে চায় যে, কিছু জাতি সহজাতভাবে শ্রেয় বলেই তারা আজ উন্নত। আর আফ্রিকার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জাতির জেনেটিক পশ্চাৎপদতা। বাইবেলের উক্ত ব্যাখ্যাও এই বর্ণবাদী ধারণার ফল। এর চেয়েও বড় সমস্যা হলো, আফ্রিকা এবং পরাধীন বিশ্বের অন্য অংশগুলো একটি সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে। অন্তত আংশিকভাবে হলেও সবকিছুর ইউরোপীয় সংস্করণ মেনে নিয়েছে তারা। আফ্রিকানরা যে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে উন্নত করতে সক্ষম, এ ব্যাপারে তারা নিজেরাই সন্দিহান। এই সন্দেহের বশে তারা এমনকি ওইসব আফ্রিকান ভাইকেও চ্যালেঞ্জ করে বসে, যারা দাবি করে আফ্রিকা তার নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সক্ষম ও উন্নতি করবে। অনুন্নতির শুরু ঠিক কখন থেকে, তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে যে, অনুন্নতি আমাদের নিয়তি বা বর্ণের দোষ।

পুঁজিবাদী দেশের "বিশেষজ্ঞগণ" যদি বর্ণবাদী ব্যাখ্যা না-ও দেয়, তবুও অন্য আরেকটা ভুল কাজ করে তারা। অনুন্নয়নের পরিণামকে তারা "কারণ"

বলে চালিয়ে দেয়। যেমন, দক্ষ ব্যক্তির অভাবের কারণেই নাকি আফ্রিকা বর্তমানে পিছিয়ে রয়েছে। এটা সত্যি যে, প্রকৌশলীর অভাবে আফ্রিকা নিজ উদ্যোগে সড়ক, সেতু ও জলবৈদ্যুতিক স্টেশন বানাতে পারছে না। কিন্তু সেটা অনুন্নতির কারণ না। কারণ ও ফলাফল পরস্পরকে প্রভাবিত ও শক্তিশালী করে—বড়জোর এতটুকু বলা যায়। আসল কথা হলো, আফ্রিকান দেশগুলোর অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার সবচেয়ে গভীর কারণ অভ্যন্তরীণ নয়। দেশগুলোর ভেতরে শুধু রয়েছে অনুন্নতির লক্ষণ এবং দারিদ্র্যের গৌণ প্রভাবকসমূহ।

তার মানে অনুন্নতির ভুল ব্যাখ্যা সাধারণত দুটি কারণে দেওয়া হয়। প্রথমত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা। দ্বিতীয়ত এই বিশ্বাস যে, অনুন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের মাধ্যমেই উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আসলে আফ্রিকার সাথে কিছু উন্নত দেশের যে সম্পর্ক, সেটার বিশ্লেষণের মাঝেই সত্যিকারের ব্যাখ্যা নিহিত। আর এই সম্পর্ক যে শোষণের সম্পর্ক, তাও স্বীকার করতে হবে।

জীবিকার তাগিদে মানুষ চিরকালই তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে শোষণ করে এসেছে। একটা পর্যায়ে গিয়ে মানুষের হাতে মানুষও শোষিত হতে শুরু করে। অন্যদের শ্রমের বদৌলতে ধনী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে শুরু করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। তারপর এমন এক পর্যায় আসে, যখন জাতি (বা দেশ) নামক একটি জনগোষ্ঠী অপর জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমকে শোষণ করা আরম্ভ করে। যেহেতু অনুন্নতির আলোচনা আদতে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির মাঝে তুলনা, সেহেতু শেষোক্ত এই শোষণটিই এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক—অর্থাৎ, এক দেশের হাতে অন্য দেশের শোষণ। যেসকল মাধ্যমে এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করে, এর মাঝে একটি হলো বাণিজ্য।

আফ্রিকার পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সাথেও এই বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের ধারণাটি প্রাসঙ্গিক। একটি দেশ যদি শুধু নিজের জন্যই সুবিধাজনক শর্ত দিয়ে ব্যবসায়িক চুক্তি তৈরি করে, তাহলে সেটা তার ব্যবসায়িক অংশীদারের জন্য ক্ষতিকর। এর একটি উদাহরণ: আফ্রিকার কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করার বিনিময়ে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ও জাপানের উৎপাদিত পণ্য আফ্রিকায় আমদানি করা। বড় দেশগুলো এসকল কৃষিজ পণ্যের দাম নির্ধারিত করে দেয় এবং সময়ে সময়ে কমাতে থাকে। আবার, উৎপাদিত পণ্যের দামও নির্ধারণ করে তারাই। তা ছাড়া, সেসকল দেশের জাহাজে করে পণ্য পরিবহন করতে যে ভাড়া লাগবে, সেটার নিয়ন্ত্রণও তাদেরই হাতে। আফ্রিকার খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রেও একই কথা। দাম নির্ধারণের ক্ষমতা আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণে

নেই। আফ্রিকা এবং তার ব্যবসায়িক অংশীদারদের মাঝে আমদানি-রপ্তানির এই সম্পর্কটি অসম বিনিময় ও শোষণের সম্পর্ক।

বাণিজ্যের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর আরেকটি বিষয় হলো, এক দেশের উৎপাদনের মাধ্যমের মালিকানা অন্য দেশের নাগরিকদের হাতে থাকা। ইউরোপের নাগরিকরা যদি হয় আফ্রিকার জমি ও খনির মালিক, তাহলে সেটা আফ্রিকাকে চোষার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। মালিকানার এই রূপটি পূর্ণতা পায় উপনিবেশিক যুগে। সামরিক আধিপত্যের মাধ্যমে একে টিকিয়ে রাখা হয়। আজ আফ্রিকার দেশগুলো থেকে বিদেশি শক্তির সেনাবাহিনী ও পতাকা সরিয়ে নেওয়া হলেও বিদেশি মালিকানা ঠিকই রয়ে গেছে। বিদেশিরা যতদিন জমি, খনি, কারখানা, ব্যাংক, বীমা, কোম্পানি, পরিবহন, সংবাদপত্র, পাওয়ার হাউজ ইত্যাদির মালিক থাকবে, ততদিন আফ্রিকার সম্পদ যেতে থাকবে তাদের হাতে। অর্থাৎ, আফ্রিকার নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফায়দা লোটে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম থেকে যেসকল অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি হয়, সেগুলো থেকে তারা এই মহাদেশকে বঞ্চিত করে।

বিদেশি বিনিয়োগের আরেকটি রূপ হলো, আফ্রিকান সরকারগুলোকে ঋণ প্রদান। ঋণ তো পরিশোধ করতেই হবে। ষাটের দশকে অনুন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক ঋণের প্রত্যর্পণ হার (অ্যামর্টাইজেশান) বার্ষিক ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৭০০ মিলিয়ন হয়ে যায়। আর এটা ক্রমাগত বাড়ছেই। তা ছাড়া, এসকল ঋণের সুদ যেমন দিতে হয়, তেমনি দিতে হয় অর্থনীতিতে সরাসরি বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফাও। এই দুই উৎস মিলিয়ে ১৯৬৫ সালে অনুন্নত দেশগুলো থেকে বেরিয়ে গেছে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এসব ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তথ্যও পাওয়া যায় না।[২] কারণ, মুনাফাভোগীরা

---

[২] গত বছরের নভেম্বরে সাংবাদিক Roland S. Martin-এর চ্যানেলে আসেন আমেরিকায়
নিযুক্ত আফ্রিকান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত Dr. Arikana Chihombori-Quao. এসে শোনান
মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক হৃদয়বিদারক অধ্যায়। ৬০ বছর আগে ফ্রান্স আফ্রিকা ছেড়ে গেলেও
উপনিবেশ ছেড়ে দেয়নি। তারা স্বাধীনতা দিয়েছিল একটি লিখিত চুক্তির বিনিময়ে। চুক্তিটি ছিল এই
যে, আফ্রিকার মোট বৈদেশিক রিজার্ভের ৮৫% ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। আর বাকি ১৫% দিয়ে আফ্রিকা
চলবে। যদি আফ্রিকার ১৫% দিয়ে চলতে অসুবিধা হয়, তবে ফ্রান্স আফ্রিকাকে সুদে ১০% লোন
দেবে। চিন্তা করেন, আফ্রিকার টাকা আফ্রিকাকে ঋণ দিবে, সুদে।
[Roland S. Martin (Premiered Nov 5, 2019). EXCLUSIVE: Former AU Ambassador To The
U.S. On Her Dismissal, France's Ongoing Influence In Africa. YOUTUBE]
PAN AFRICAN VISIONS জানাচ্ছে, প্রতি বছর ফরাসি সেন্ট্রাল ব্যাংকে ৫০০ বিলিয়ন
ডলার জমা দেয় ১৪টা আফ্রিকান দেশ colonial debt হিসেবে। তাদেরকে ফরাসিরা যে উন্নতি

স্বভাবতই চায় এগুলো নিয়ে উচ্চবাচ্য না হোক। তাই ওপরে প্রদত্ত উপাত্ত বাস্তবতার চেয়ে কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কী পরিমাণ সম্পদ যে এভাবে আফ্রিকা থেকে ভেসে চলে যাচ্ছে, তার একটা চিত্র পাওয়া যায় এখান থেকে। বিনিয়োগকারী এবং আফ্রিকার উৎপাদন-মাধ্যমের মালিকদের পকেটে যাচ্ছে সকল সম্পদ। তা ছাড়া, সাম্প্রতিক কালে এসকল বিনিয়োগের ধরন সূক্ষ্মতর ও অধিকতর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এগুলোর মাঝে রয়েছে কথিত ত্রাণ সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বিশেষজ্ঞদের হাতে দেশীয় আফ্রিকান কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর।

আফ্রিকা মূলত ব্যবসা করে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ এবং জাপানের সাথে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে লেনদেন শুরু করার মাধ্যমে এতে বৈচিত্র্যও আনছে আফ্রিকা। কিন্তু এটা যদি আফ্রিকার অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়, তার মানে দাঁড়াবে উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও আফ্রিকার শোষকদের কাতারে চলে এসেছে। কিন্তু এ পর্যায়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মাঝে একটি পার্থক্যরেখা টেনে দেওয়া আবশ্যক। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কোনোকালেই আফ্রিকা মহাদেশের কোনো অংশের মালিক ছিল না। আবার আফ্রিকা থেকে মুনাফা হাসিলের মতো করেও এখানকার অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করে না তারা। অতএব, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আফ্রিকার ওপর ডাকাতিতে জড়িত নয়।

অনুন্নতি নিয়ে লেখালেখি-করা এবং আফ্রিকা, এশিয়া, ও লাতিন আমেরিকা নিয়ে গবেষণা-করা বেশির ভাগ ব্যক্তিই পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া বিশ্বের মুখপাত্র। তারা নিজেদের দেশের ভেতরে-বাইরে পুঁজিবাদী শোষণকর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে। ব্যাপারটা ঘোলাটে করার জন্য তাদের একটি কৌশল হলো, সকল অনুন্নত দেশকে এক দলে এবং সকল উন্নত দেশকে আরেক দলে ফেলা। অথচ দেশগুলোর মাঝে সামাজিক ব্যবস্থার তারতম্য রয়েছে। তাই পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক পরিভাষা দুটি জায়গাই পায় না তাদের আলোচনায়। তার বদলে সরলভাবে দেখানো হয় যে, কিছু দেশ শিল্পায়িত এবং কিছু দেশ তা নয়। এটা সত্যি যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই শিল্পোন্নত। আবার ফ্রান্স, নরওয়ে, চেকোস্লোভাকিয়া, ও

এনে দিয়েছে তার প্রতিদানে বিগত ৬০ বছর ধরে ঋণ শোধ করে চলেছে দেশগুলো।

[Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

Mawuna Remarque Koutonin (January 30, 2014). 14 African countries forced by france to pay colonial tax for the benefits of slavery and colonization. PAN AFRICAN VISIONS]

রোমানিয়া যে আফ্রিকার কোনো দেশের তুলনায় বরং নিজেদের মাঝেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ, তাও ঠিক। কিন্তু কোনো শিল্পোন্নত দেশের জীবনযাত্রার মান কি তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ফল, নাকি অন্য দেশকে শোষণ করার পরিণাম—তাও নির্ণয় করা জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি জনসংখ্যা বাস করে। তাদের ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদও কম। কিন্তু তাদের সম্পদের একটি বিরাট অংশ আসে সারা বিশ্বের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করার মাধ্যমে।

অনুন্নতির ব্যাপারে ভুল ধারণা এবং ধনী-গরিব রাষ্ট্রের অতিসরলীকরণ—এই উভয় ধারণার বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞরা। সেটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভেতরে যেমন, বাইরেও তেমনি। অনুন্নত দেশের অর্থনীতিবিদরাও এসকল ভ্রান্ত ধারণার মুখোশ উন্মোচন করে দিচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের দেওয়া ব্যাখ্যাগুলো আসলে নিজের দেশের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ব্যাখ্যা। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বাকিদের শোষণকারী দেশগুলোর সাফাই গাওয়া হয় এসব ব্যাখ্যার মাধ্যমে। ফরাসি সমাজতান্ত্রিক লেখক পিয়েরে জালিয়ে এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাবনা রেখেছেন। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মাঝে সম্পর্ককে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হলে দুটি শ্রেণী তৈরি করতে হবে : সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছোট-বড় সকল দেশ থাকবে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে। আর সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ও জাপানের মতো পুঁজিবাদী দানবরাই থাকবে, তা না। বরং যেসকল দুর্বল দেশে এদের বিনিয়োগ রয়েছে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে আবার দুটি উপভাগে ভাগ করা যায় : শোষক ও শোষিত দেশ। বেশির ভাগ আফ্রিকান দেশ পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার শোষিত দেশের কাতারে পড়বে। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইতিমধ্যে কোনো না কোনো সমাজতন্ত্রের অধীনে বাস করছে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মিলে পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী শিবির, যাদের বেশির ভাগই শোষিত উপভাগের সদস্য।

মজার ব্যাপার হলো, পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টায় লিপ্ত বুর্জোয়া লেখকরাও মাঝেমাঝে সত্য বলে ফেলে। যেমন, জাতিসংঘ (যাকে নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তিরা) কখনোই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর শোষণকর্মের কথা বলে না। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় দুইরকম দেশের উল্লেখ থাকে। একটি হলো "কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থনীতি" বা সমাজতান্ত্রিক দেশ। আরেকটি "বাজার অর্থনীতি", অর্থাৎ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী অংশ।

শেষোক্ত ভাগটির আবার রয়েছে দুটি উপভাগ, "উন্নত বাজার অর্থনীতি" এবং "উন্নয়নশীল বাজার অর্থনীতি"। বাজার মানে যে পুঁজিবাদী বাজার, এ কথাটি এড়িয়ে যাওয়া হয়। পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় একত্রে অবস্থান করা দেশগুলোর মাঝে সম্পর্ক কীরকম, সেটা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য।

যেসব জিনিস আফ্রিকাকে পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে, সেগুলো হলো বাণিজ্য, ঔপনিবেশিক শাসন, এবং পুঁজিবাদী বিনিয়োগ। বাণিজ্যের অস্তিত্ব কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই বিদ্যমান। ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বর্তমানে তা প্রায় বিলুপ্ত। আর আফ্রিকান অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বর্তমান শতাব্দীতে ক্রমাগত বাড়ছে। আফ্রিকা যতখানি সময় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অংশ নিয়েছে, তাতে অনুন্নতি সংঘটিত হয়েছে দুটি প্রভাবকের ফলে :

- ☑ প্রথমত, আফ্রিকান শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত এবং আফ্রিকান উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো।
- ☑ দ্বিতীয়ত, আফ্রিকার নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের যে সক্ষমতা, তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অথচ উন্নয়ন মানেই এই সক্ষমতা।

আফ্রিকার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন কেন এত কম হয়েছে এবং কেন বর্তমানে তার সব সম্পদ মহাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, এই দুটি প্রশ্নের উত্তর হলো উল্লিখিত দুটি প্রক্রিয়া।

আফ্রিকান দেশগুলোকে উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেটা এমনভাবে করা হয়েছে, যা আফ্রিকার জন্য প্রতিকূল। আফ্রিকা যেন বড় পুঁজিবাদী দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল থাকে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে এখানে। কাঠামোগত নির্ভরশীলতা আদতে অনুন্নতির একটি বৈশিষ্ট্যই। বেশির ভাগ প্রগতিশীল লেখক পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করে থাকে। প্রথমটি কর্তৃত্বশালী বা মেট্রোপলিটন দেশ। আর দ্বিতীয় ভাগের দেশগুলোকে স্যাটেলাইট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ তারা মেট্রোপলিটন দেশগুলোর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। আরও সহজভাবে বললে, অনুন্নত দেশগুলো মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদীদের ওপর নির্ভরশীল।

কোনো প্রাণীর বাচ্চা যখন খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে না, তখন সে পরিপক্ব হয়েছে বলা যায়। নির্ভরশীল দেশগুলোকে কখনোই উন্নত বলা সম্ভব না। হ্যাঁ, আধুনিক পরিস্থিতি সকল দেশকেই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। নাহলে নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করা যায় না।

কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া না। তবে পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চা করার সক্ষমতা থাকতে হবে। আর সর্বোপরি দেশটির প্রবৃদ্ধি হতে হবে এমন, যেন একটা পর্যায়ে তারা স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই ব্যাপারটি অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতার একদম বিপরীত। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানের মতো মেট্রোপোলের স্যাটেলাইটগুলো এই অর্থে পরনির্ভর।

এটাও সত্যি যে, মেট্রোপোলগুলো[৩] আবার বিশ্বের শোষিত অংশের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এই ব্যাপারটি পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার শক্তির উৎস এবং সেইসাথে তাদের সম্ভাব্য দুর্বলতাও। কারণ, নির্ভরশীল দেশগুলোর কৃষক-শ্রমিকরা জেগে উঠছে। তারা বুঝতে পারছে যে, তাদের দেশকে জড়িয়ে ধরে রাখা সাম্রাজ্যবাদী জালগুলো কেটে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু উপনিবেশের ওপর মেট্রোপোলের নির্ভরশীলতা এবং বিদেশি পুঁজিবাদী শক্তির ওপর উপনিবেশের নির্ভরশীলতা মৌলিকভাবে আলাদা।

পুঁজিবাদী দেশগুলো প্রযুক্তিগতভাবে অধিকতর অগ্রসর। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সেই অংশ, যারা পরিবর্তনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হলো, পুঁজিবাদী মেট্রোপোলে উৎপাদিত সিন্থেটিক কাপড়। উপনিবেশগুলোতে কাঁচামাল থেকে যে কাপড় উৎপাদিত হয়, সেগুলোকে সরিয়ে ক্রমেই বাজার দখল করে নিচ্ছে সিন্থেটিক কাপড়। অর্থাৎ, (নির্দিষ্ট সীমার ভেতর) প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর মেট্রোপোলই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কখন তারা নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রে আর পরনির্ভরশীল থাকবে না। তখন উপনিবেশ বা নব্য-উপনিবেশই আবার ভিক্ষার থালা হাতে নিয়ে নতুন কোনো সুযোগের জন্য অনুনয় করতে থাকে। তাই সাবেক কোনো উপনিবেশ যদি উন্নত হতে চায়, তাহলে তাকে এই সাম্রাজ্যবাদী নির্ভরশীলতা ও শোষণের দুষ্ট চক্র থেকে কার্যকরভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তার উন্নয়নের কোনো আশা নেই।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বেশ কিছু বিষয় একদিকে অনুন্নত দেশগুলোকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভেতর ঢুকিয়ে রাখে, আরেকদিকে তাদের লজ্জাজনকভাবে নির্ভরশীল করে রাখে মেট্রোপোলের ওপর। খ্রিষ্টান চার্চ সর্বকালেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের একটি প্রধান

---

[৩] মেট্রোপোল (Metropole): উপনিবেশী শক্তির মূল ভূখণ্ড (mother country), যেটি দূরবর্তী ভূমির উপর ক্ষমতা পরিচালনা করে।

হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আফ্রিকানরা যদিও নিজেদের স্বাধীন চার্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতে এই বাস্তবতা পালটে যায়নি। সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শিক্ষার ভূমিকাও। এতে করে এমন আফ্রিকান তৈরি হয়েছে, যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবক এবং এর মূল্যবোধের ধারক। সম্প্রতি, সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকায় নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করে সর্বোচ্চ অ্যাকাডেমিক পর্যায়ের দখল বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভাষার মতো মৌলিক একটি বিষয়ও নির্ভরশীলতার এই চক্রান্তের উপকারে আসে। ফরাসি ও ইংরেজি ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় আফ্রিকার ভেতর। আফ্রিকানের সাথে আফ্রিকানের যোগাযোগ করানো যতটা না এর উদ্দেশ্য, তার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো শোষকদের সাথে আফ্রিকানদের যোগাযোগ। আসলে এমন কোনো পরিমণ্ডল খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে এই অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ও কাঠামোগত অন্তর্ভুক্তির প্রতিফলন ঘটে না। সাদা চোখে গান-বাজনার চেয়ে কম ক্ষতিকর ও বেশি বিনোদনমূলক আর কিছু হতেই পারে না। অথচ এটাকেও ব্যবহার করা হয়েছে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উদ্দেশ্যে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এমনকি নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের ফোক মিউজিক, জ্যায, এবং সোল মিউজিককে পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে আমেরিকান প্রোপাগান্ডায় পরিণত করেছে। তারপর ভয়েজ অব আমেরিকার মাধ্যমে সেগুলো ছুড়ে মারছে আফ্রিকার দিকে।

ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকার ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল স্পষ্ট। প্রশাসক, ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা, ও পুলিশ সশরীরে অবস্থান করত এখানে। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোতে মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদীরা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে নিজেদের পক্ষে রাখে। তাই তারা আফ্রিকার বহু অংশে নিজেদের রাজনৈতিক পুতুলদের বসিয়ে রেখেছে। প্রভুদের আদেশে তারা নির্লজ্জভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্ঠুর বর্ণবিদ্বেষী সরকারের পক্ষ নেয়। মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী এবং তাদের আফ্রিকান নির্ভরশীলদের মাঝে যোগাযোগ-রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে এরকম মুষ্টিমেয় কিছু আফ্রিকান ব্যক্তি। বিপ্লবী লেখক ফ্রানৎস ফানোঁ এদের নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই সংখ্যালঘু দলটির গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। একদল দালাল আফ্রিকানের উপস্থিতি আসলে অনুন্নয়নের সংজ্ঞারই অংশ। অনুন্নয়নের উপসর্গ শুধু নিম্ন মাথাপিছু আয় বা প্রোটিনের অভাব না। বরং প্যারিস, লন্ডন, ও নিউইয়র্ক থেকে বাজানো বাদ্যের তালে তালে আবিদজান-আক্রা-কিনশাসায় নৃত্য শুরু করেন যেসব ভদ্রলোকেরা, তারাও সেসকল উপসর্গের অংশ।

সাম্রাজ্যবাদী প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক জীবনও যে অনুন্নতির শিকার, তার দুরারোগ্য উপসর্গ হিসেবে আফ্রিকায় দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হচ্ছে, যার ফলে জনগণের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তনই হচ্ছে না। জাতীয় মুক্তির যেসব চেষ্টা চলমান ছিল, এসকল অভ্যুত্থান কিছু ক্ষেত্রে সেগুলোকে একদমই উলটে দিচ্ছে। এই চক্র ইতিপূর্বে লাতিন আমেরিকাতেও দেখা গিয়েছিল। তাই নব্য-উপনিবেশে পরিণত-হওয়া দক্ষিণ ভিয়েতনাম বা আফ্রিকায় এর আবির্ভাব মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র যদি হয় আফ্রিকান সীমান্তের বাইরে, তাহলে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির আসল কেন্দ্রও তো বাইরেই হবে। এই মেকি রাজনৈতিক স্বাধীনতা-ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে যদি শ্রমিক-জনতা এগিয়ে না আসে, তাহলে এভাবেই চলতে থাকবে সবকিছু। উল্লিখিত এই সকল বৈশিষ্ট্যই অনুন্নয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার হাতে শোষিত হওয়ার শাখাপ্রশাখা। এই প্রশ্নের বেশির ভাগ বিশ্লেষণেই এই ব্যাপারগুলো হয় পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, আর নয়তো সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদের ধারণাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয় নিতান্ত শব্দের বাগাড়ম্বর আখ্যা দিয়ে। বিশেষত "অরাজনৈতিক" দাবিদার "অ্যাকাডেমিক"গণ এই কাজ বেশি করে। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ইত্যাদির এসকল কথিত স্লোগানের পেছনে যে দুর্বিষহ চিত্র, তা আরও অনেক বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হবে এই গবেষণাকর্মের বাকি অংশে। আপাতত পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ এরকম : আফ্রিকার অনুন্নতির জন্য কে বা কী দায়ী, এই প্রশ্নটির উত্তর দুটি স্তরে প্রদান করা যায়—

- ☑ প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড এখানে একটি প্রধান দায়ভারের অধিকারী। এটি আফ্রিকার সম্পত্তি চুষে নিয়েছে এবং মহাদেশটির সম্পদের দ্রুততর উন্নয়নকে অসম্ভব করে দিয়েছে।
- ☑ দ্বিতীয়ত, যারা এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং যারা উক্ত ব্যবস্থার প্রতিনিধি ও অবচেতন সহযোগী, তাদের নিয়েও কাজ করা চাই। পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদীরা তাদের শোষণকর্মকে ইউরোপের ভেতর থেকে শুরু করে পুরো আফ্রিকায় ছড়িয়ে দিয়েছে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে।

সম্প্রতি তাদের সাথে যোগ দিয়েছে, বা কিছু ক্ষেত্রে তাদের জায়গা নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদীরা। এমনকি এখন বহু বছর যাবৎ ওইসকল মেট্রোপলিটন দেশের শ্রমিকরা পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে আফ্রিকার শোষণ ও অনুন্নতি থেকে। উন্নয়নের চূড়ান্ত দায়ভারকে স্বয়ং আফ্রিকানদের ঘাড় থেকে সরিয়ে দেওয়াটা মোটেই এসকল লেখার উদ্দেশ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার

অভ্যন্তরীণ আফ্রিকান সহযোগীরাই কেবল একমাত্র আসামি নয়। বরং প্রত্যেক আফ্রিকানের দায়িত্ব হলো এই ব্যবস্থাকে বোঝা এবং একে উৎখাত করার জন্য কাজ করা।

বিস্তারিত দেখুন :

"উন্নয়ন" ও "অনুন্নতি" বিষয়ের ওপর প্রচুর লেখালেখি রয়েছে। কিন্তু বিষয়গুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় যে পরিমাণ থাকা উচিত ছিল, সে তুলনায় অপ্রতুল। যা-ও বা আছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের সাফাই গাওয়া। অতএব, সেগুলোর আলোচনা "অর্থনৈতিক উন্নয়ন"-এর সংকীর্ণ পরিসরেই সীমাবদ্ধ। মানবীয় সামাজিক উন্নয়নের বদলে বিশেষ জোরারোপ করা হয়েছে পুঁজিবাদী দেশগুলোর ওপরে। এহেন চিন্তাপদ্ধতিকে আগে থেকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছেন মেট্রোপোলের মার্ক্সবাদী লেখকগণ। এখন অনুন্নত বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণও ক্রমবর্ধমান হারে যোগ দিচ্ছেন সেই মিছিলে।

ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, *দি ওরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেইট,* শিকাগো : সি.এইচ. কের অ্যান্ড কোং, ১৯০২।

কার্ল মার্ক্স, *প্রেফিস টু আ কন্ট্রিবিউশান টু আ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল একোনমি।*

কার্ল মার্ক্স, *প্রি-ক্যাপিটালিস্ট একোনমিক ফাউন্ডেশানস, সম্পাদক ই.জে. হবসবম।* নিউ ইয়র্ক : ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬৫।

ওপরের তিনটি বইয়ের লেখকদ্বয় যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেটাকেই আমরা এখন মার্ক্সবাদ নামে চিনি। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের বেশির ভাগ রচনা উন্নয়ন বিষয়টির সাথে প্রাসঙ্গিক। বিশেষভাবে জোরারোপ করা হয়েছে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী যুগের ওপর।

রিচার্ড টি. গিল, *একোনমিক ডেভেলাপমেন্ট : পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট।* এঙ্গলউড ক্লিফস, এন.জে. : প্রেন্টাইস-হল, ১৯৬৩।

রাফনার নার্কসে, *প্রবলেমস অব ক্যাপিটাল ফর্মেশান ইন আন্ডারডেভেলাপড কান্ট্রিজ।* লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩।

এগুলো উন্নয়ন ও অনুন্নতির ব্যাপারে গতানুগতিক বুর্জোয়া মেট্রোপোলিটান দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ। প্রথমটি উত্তর আমেরিকার কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত একটি পাঠ্যবই। এর লেখক একজন ক্যানাডিয়ান অর্থনীতিবিদ। দ্বিতীয়টির লেখক "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র" তত্ত্বের অন্যতম প্রধান সমর্থক। বুর্জোয়া এই লেখকের গ্রন্থটি বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, আফ্রিকার যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গণগ্রন্থাগারের শেলফও ভর্তি হয়ে আছে এই ধরনের বই দিয়ে। পাঠক আমার এই দাবি নিজে যাচাই করে দেখতে পারেন।

জে.ডি. বার্নাল, *সায়েন্স ইন হিস্ট্রি (৪ খণ্ড)।* কেমব্রিজ : এমআইটি প্রেস, ১৯৭২।

জোসেফ নীডহ্যাম, *সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশান ইন চায়না*। কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৪।

উভয় গ্রন্থের কলেবরই বেশ দীর্ঘ। কিন্তু তাও কষ্ট করে পড়া উচিত। প্রাকৃতিক পরিবেশকে বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়ার চেষ্টা থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব। সমাজের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন হতে হলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথে পরিচয় থাকা চাই। বিজ্ঞান মানেই ইউরোপীয়—প্রচলিত এই ধারণাকে সংশোধন করতে কাজে লাগবে নীডহ্যামের বইটি।

সেলসো ফুরটাডো, *ডেভেলাপমেন্ট অ্যান্ড আন্ডারডেভেলাপমেন্ট*। বার্কলি : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৭।

এ. গান্ডার ফ্র্যাংক, *ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আন্ডারডেভেলাপমেন্ট ইন ল্যাটিন আমেরিকা*। নিউ ইয়র্ক : মান্থলি রিভিউজ প্রেস, ১৯৬৭।

টামাস সেন্টেস, *দি একোনমি অব আন্ডারডেভেলাপমেন্ট*। বুদাপেস্ট : আকাডেমিয়াই কিয়াডো, ১৯৭১।

প্রথমটির লেখক ব্রাজিলীয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মতো মেট্রোপোলের হাতে নির্ভরশীল ও নিপীড়িত হওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এই দেশটির। ফ্র্যাংকের বইটি লাতিন আমেরিকার বহু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর চিন্তার প্রতিফলন। বর্তমানে মেট্রোপোলের মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই। সেন্টেস একজন হাঙ্গেরিয়ান অর্থনীতিবিদ। অনুন্নত বিশ্ব এবং সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যেসব বাস্তব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, সেগুলোর ওপর তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে মার্ক্সবাদী দর্শন প্রয়োগ করে দেখান।

সামির আমিন, *দ্য ক্লাস স্ট্রাগল ইন আফ্রিকা*। কেমব্রিজ, এম.এ. : আফ্রিকা রিসার্চ গ্রুপ, ১৯৭৭।

সামির আমিন একজন উত্তর আফ্রিকান। লেখালেখির পরিমাণ এবং অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা—দুই দিক থেকেই তিনি সেরাদের সেরা। উল্লিখিত বইটির বিষয়বস্তু একদমই সার্বিক। আলোচনা শুরু হয়েছে প্রাচীন আফ্রিকার উন্নয়নের শেকড় থেকে। বর্তমান পর্যন্ত আলোচনা করার পর একটি সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, তার আরও অনেক কাজ ইংরেজিতে অনূদিত হবে (তিনি ফরাসি ভাষায় লেখালেখি করেন)।

২

ইউরোপীয়দের আগমনের আগ পর্যন্ত আফ্রিকার উন্নয়ন (পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার আগে থেকেই আমরা ছিলাম উন্নত এক জাতি। আমাদের ছিল নিজস্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ছিল সরকার ও প্রশাসনের ব্যাপারে নিজস্ব ধ্যানধারণা।

— জে.ই. কেইসলি-হেফোর্ড, ১৯২২ আফ্রিকান (গোল্ড কোস্ট) জাতীয়তাবাদী

একটি সার্বিক চিত্র

তুলনামূলক মানদণ্ড ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে, পশ্চিম ইউরোপ ও বিশ্বের আরও কিছু অংশের সাপেক্ষে আজকের আফ্রিকা অনুন্নত। আর আজকের এই অবস্থায় আফ্রিকা ও ইউরোপ স্বতন্ত্রভাবে আসেনি, বরং এসেছে শোষণের মাধ্যমে। আফ্রিকা যে দীর্ঘকাল ও ব্যাপক মাত্রায় ইউরোপের সংস্পর্শ পেয়েছে, তা সর্বজনবিদিত। মাথায় রাখতে হবে যে, দুটি ভিন্ন সমাজের মাঝে সংস্পর্শের ফলে তাদের স্ব স্ব উন্নয়নের হার পরিবর্তিত হয়। বিদ্যমান ভুল ধারণাগুলো দূর করার জন্য চারটি কাজ করতে হবে :

(১) ইউরোপীয়দের আগমনের আগে আফ্রিকার উন্নয়নের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন।

(২) দেশের বাইরে প্রভাব বিস্তার শুরুর আগ পর্যন্ত ইউরোপে সংঘটিত উন্নয়নের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন।

(৩) ইউরোপের বর্তমান "উন্নত" অবস্থার পেছনে আফ্রিকার অবদান বিশ্লেষণ।

(৪) আফ্রিকার বর্তমান "অনুন্নত" অবস্থার পেছনে ইউরোপের অবদান বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় বিষয়টি ইউরোপীয় লেখালেখিতে ইতিমধ্যে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলেই হবে। কিন্তু বাকি সবগুলো বিস্তারিত মনোযোগের দাবিদার।

বিভিন্ন সমাজের উন্নয়ন যে অসম গতিতে হয়, এই বাস্তবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আফ্রিকা মহাদেশ। ইথিওপীয় সাম্রাজ্য এবং কঙ্গোর পিগমি শিকারি দলগুলোর মাঝে রয়েছে স্পষ্ট বৈপরীত্য। তেমনি পশ্চিম সুদানের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের তুলনায় কালাহারি মরুভূমির খোইসান শিকারি গোষ্ঠী একেবারেই আলাদা। যেকোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের অভ্যন্তরেও বিস্তর পার্থক্য থাকে। ইথিওপীয় সাম্রাজ্যের ভেতর সাক্ষর-সামন্তবাদী-অভিজাত আমহারিক জাতি যেমন ছিল, তেমনি ছিল সহজসরল কাফফা কৃষক এবং গাল্লা পশুপালক জাতি।

পশ্চিম সুদান সাম্রাজ্যের মাঝে ছিল আধুনিকমনা ও শিক্ষিত মান্দিঙ্গা শহুরে জাতি, ছোট ছোট দলে বসবাসকারী বোজো জেলের দল, আর যাযাবর ফুলানি রাখাল। এমনকি যেসকল গোত্র ও বংশকে মোটামুটি একইরকম মনে হয়, তাদের মাঝেও উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যগুলো এককভাবে "আফ্রিকান", আর কোনগুলো উন্নয়নের একেক পর্যায়ে মানব-সমাজের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য—তা আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব। তা ছাড়া সামাজিক বিন্যাস নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে বিবর্তিত হয়। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটিও মাথায় রাখতে হবে। মহাদেশটিতে বিদ্যমান সবগুলো সামাজিক গঠনের মধ্যে যেটি সবচেয়ে অগ্রসর, সেটাকে বিবেচনায় নিলে সার্বিকভাবে আফ্রিকা মহাদেশের সক্ষমতা ও পরিবর্তনের গতিপথ সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করা যাবে।

আফ্রিকার ইউরোপ-পূর্ব অতীত নিয়ে যখনই আলোচনা ওঠে, অনেকেই তখন আফ্রিকান "সভ্যতা"র অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে বেশ অস্থির হয়ে পড়েন। এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রধান কারণ হলো, ইউরোপীয় "সভ্যতা"র সাথে এটাকে তুলনা করার বাসনা। ইউরোপের কথিত সভ্যতার মূল্যায়ন আপাতত এখানকার আলোচ্য নয়। আপাতত একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। দাসপ্রথার যুগ থেকে শুরু করে উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ, এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় গণহত্যা চালানো যুদ্ধগুলোতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের আচরণ দেখুন। এত সব বর্বরতার পরও "সভ্যতা" শব্দটি পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ক্ষেত্রে খাটে কি না, তা সন্দেহজনক। আফ্রিকা প্রসঙ্গে ফেরত আসা যাক। এই মহাদেশের প্রারম্ভিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায়

সভ্যতার বদলে বরং "সংস্কৃতি" শব্দটি ব্যবহার করা বেশি সমীচীন।

সংস্কৃতি মানে সার্বিক জীবনপদ্ধতি। মানুষ কী খায় ও কী পরে, কীভাবে হাঁটে ও কীভাবে কথা বলে, কীভাবে মৃতের সৎকার করে ও কীভাবে নবজাতককে বরণ করে—সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, প্রায় প্রতিটি এলাকাই সব ধরনের সামাজিক বিষয়ে একে অপরের থেকে ভিন্ন। তা ছাড়া, আফ্রিকার যে অংশটি বিশাল সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, সেখানে বাস করত এক বড়সড় জনগোষ্ঠী। তাদের মাঝে চোখে পড়ার মতো সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, বাইরের সংস্পর্শ না পাওয়া আফ্রিকান সমাজে গান-বাজনা ও নাচের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম, অভিষেক, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষ্যগুলোতে এসব থাকতই। আফ্রিকা হলো ঢাক-ঢোল আর তাকধুম আওয়াজের মহাদেশ। এই পরিমণ্ডলে অর্জনের শিখরে অবস্থান করছে আফ্রিকান জাতিগুলো।

উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের (এই বিষয়গুলো পরে আলোচিত হবে) প্রভাবে ইউরোপীয়রা আফ্রিকান সংস্কৃতির এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। এমনকি স্বয়ং আফ্রিকানরাও না। এসব বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। আলোচ্য ১৫০০ সালের আগে হোক বা পরে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির ছায়ায় এগুলো ঢাকা পড়ে যেতে পারে না। ঢাকা পড়তে পারে না। কারণ এগুলো আসলে তুলনাযোগ্য বিষয়ই না। অস্ট্রিয়ান ওয়াল্টয এবং মাকোন্দে ন্‌গোমা নৃত্যের মধ্যে কোনটি বেশি ভালো, সে বিচার করার মতো যোগ্য কে আছে পৃথিবীতে? আচ্ছা, সংস্কৃতির কিছু দিক নাহয় কিছু মাত্রায় তুলনীয়, যেমন "চারুকলা"। এই ময়দানেও প্রাক-ইউরোপীয় যুগে আফ্রিকার যেসব অনন্য অবদান অর্জন রয়েছে, নান্দনিকতার ইতিহাসে সেগুলো সর্বজনস্বীকৃত।

মিশর, সুদান, ও ইথিওপিয়ার চিত্রকর্ম সম্পর্কে বাকি বিশ্ব বহু আগে থেকেই জানে। আর আফ্রিকার বাকি অংশের শিল্পকলা এখনো ইউরোপীয় ও বর্তমান আফ্রিকানদের হাতে "আবিষ্কৃত" ও পুনরাবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। আইফে ও বেনিনে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের শিল্পকর্মগুলোর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে শিল্প-ইতিহাসবিদরা যে রায় দিয়েছেন, তাও সকলের জানা। এগুলো চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর জিনিসপত্র। তাই ইউরোপের সংস্পর্শে আসার আগে আফ্রিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনায় এগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এসব অর্জনকে অস্বাভাবিক ভাবারও কোনো কারণ নেই। হতে পারে এগুলো তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলো ব্যতিক্রম। কিন্তু একই মাত্রায় টেকসই না, এরকম উপকরণের ভাস্কর্য ও শিল্পকর্মেও নিশ্চয়ই এই একই দক্ষতা ও

অনুভূতির ব্যবহার ঘটে থাকবে। বিশেষত কাঠের ক্ষেত্রে।

আফ্রিকান নৃত্য ও শিল্প কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি, সনাতন আফ্রিকান ধর্মীয় আচারগুলোর মাঝে অসংখ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তা ছাড়া এও মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্ম আফ্রিকা মহাদেশে বসতি গড়েছে প্রায় তাদের জন্মের সময় থেকেই। সনাতন আফ্রিকান ধর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখলে বোঝা যায়, অন্যান্য মহাদেশের সংস্কৃতি থেকে আফ্রিকান সংস্কৃতি কোন কোন জায়গায় আলাদা। তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো অন্যান্য স্থানের ধর্মগুলোর সাথে আফ্রিকান ধর্মসমূহের সাদৃশ্য। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের সংস্পর্শে আসার আগে আফ্রিকার উন্নয়ন কী মাত্রায় হয়েছিল, তার একটি সূচক হিসেবে ব্যবহার করা যায় এসকল সাদৃশ্যকে।

ধর্ম হলো কোনো সমাজের মহাকাঠামোর একটি উপাদান। বস্তুগত বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও উপলব্ধির মাত্রা থেকেই এর চূড়ান্ত উদ্ভব। কিন্তু মানুষ যখন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে, তার শুরুটা বস্তুগত বিশ্ব থেকে হয় না। বরং তা হয় চিন্তাগত দিক থেকে (অর্থাৎ, যা কিছু বোধবুদ্ধির ঊর্ধ্বে)। এর ফলে পৃথিবীকে নন-সায়েন্টিফিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখার একটি পদ্ধতির অবতারণা ঘটে। এটা প্রায়শ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ এবং সমাজের উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এ অর্থে আফ্রিকান পূর্বপুরুষদের ধর্মগুলো পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের চেয়ে ভালো বা খারাপ না। কিন্তু মানবজীবনের যেসকল পরিমণ্ডলে ধর্ম ও চার্চের ভূমিকা থাকতে পারে, সামন্তবাদের পতনের পর ইউরোপ সেগুলোকে সংকুচিত করতে শুরু করে। রাজনীতি, ভূগোল, ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ধর্মের আধিপত্য বন্ধ হয়ে যায়। এই শাস্ত্রগুলোকে ধর্মীয় বাঁধন থেকে মুক্ত করার জন্য যুক্তি তুলে ধরতে হয় যে, ধর্মের নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে এবং পার্থিব বিষয়াদির নিজস্ব সেক্যুলার ক্ষেত্র রয়েছে। এই সেক্যুলারায়নের ফলে পুঁজিবাদ ও পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গদের আগমনের আগ পর্যন্ত আফ্রিকান জীবনে ধর্মের প্রভাব ওইরকমই সর্বব্যাপীই থেকে যায়, যেমনটি ছিল অন্য সকল প্রাক-সামন্তবাদী সমাজে। যেমন : অস্ট্রেলিয়ার মাওরি, আফগানিস্তানের আফগান বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভাইকিং সমাজের মতো।

মহাকাঠামোর উপাদান হিসেবে ধর্ম ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকারের ভূমিকাই পালন করতে পারে। অতীত আফ্রিকায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা ছিল। ধর্মের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ

উদ্যোগী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, যার ফলে গঠিত হয় রাষ্ট্র। অল্প কিছু ক্ষেত্রে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ধারণাও প্রদান করে ধর্ম। নেতিবাচক ভূমিকাগুলোর প্রধান কারণ ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধর্মের অপরিবর্তিত থাকার প্রবণতা। বিশেষত জীবিকা অর্জনের প্রযুক্তি যখন খুবই ধীর গতিতে এগোতে থাকে, তখন তা সমস্যা আকারে হাজির হয়। প্রাক-পুঁজিবাদী সকল সমাজের মতো আফ্রিকান সমাজগুলোর ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে। আবার ধর্মীয় বিশ্বাসমালা স্বয়ং উৎপাদনের ধরনের ওপরও প্রভাব ফেলে। এই অর্থে আরও ধীর হয়ে যায় অগ্রগতি। যেমন, কোনো সমাজ হয়তো বিশ্বাস করে প্রার্থনা অথবা মৃত পূর্বপুরুষ বা দেবতাদের কারণে আবহাওয়া ও পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। ফলে এগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার তাড়না অনুভূত হবে না তাদের মাঝে।

জীবিকার মাধ্যম এবং কর্মের ফলে উদ্ভূত সামাজিক বিন্যাসের মাঝেও এরকম দ্বিমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত আফ্রিকায় সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান মূলনীতি ছিল পরিবার ও আত্মীয়তা। এগুলো গোষ্ঠীতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। আফ্রিকান সমাজের প্রতিটি সদস্যের অবস্থান নির্ধারিত হতো তার মায়ের দিকের বা বাবার দিকের আত্মীয়দের সাপেক্ষে। কোনো কোনো সমাজে মাতৃপক্ষের আত্মীয়তার গুরুত্ব বেশি, কোনোটায় আবার পিতৃপক্ষের। আফ্রিকান সমাজের সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য এসকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জমির (উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম) মালিকানা থাকে এরকম কোনো দলের হাতে, যেমন পরিবার বা গোত্র। এসকল দলের নেতা বাবা-মা এবং তখনো না-জন্মানো শিশুরা। তাত্ত্বিকভাবে এই মালিকানা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা হলো, কোনো গোষ্ঠীর সকল সদস্যই ওই ভূমিতে বসতি স্থাপনকারী প্রথম ব্যক্তিটির সরাসরি বংশধর। নতুন কোনো দল এলে তারা প্রায়ই ভান করত যে, তাদের পূর্বপুরুষও ওই ভূমিতে লোকালয় স্থাপনের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। আর নয়তো তাদের আদিপুরুষরা ওই অঞ্চলের ভূমি বা জলের সাথে সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালন করা অব্যাহত রেখেছিলেন, এই নিশ্চয়তা দিত তারা।

একইভাবে, ওই জমিতে কাজ করা শ্রমিকদেরও নিয়োগ দেওয়া হতো পারিবারিক ভিত্তিতে। একটি একক পরিবার বা গৃহ-সদস্যরা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করত। আবার বর্ধিত পরিবার বা গোত্রের অন্য সদস্যদের সাথে কিছু কৃষিকাজ ভাগাভাগি করে সম্পাদন করার জন্যও রাজি থাকত তারা। বার্ষিক শিকার বা নদীতে মাছ ধরার আয়োজনও করত পুরো বর্ধিত পরিবার বা গ্রামের সকলে মিলে। বেম্বা (জাম্বিয়া)-এর এমনই একটি মাতৃতান্ত্রিক

সমাজে বিয়ের পাত্র তার পাত্রীর বাবার অধীনে কয়েক বছর কাজ করত। আবার একই ঘরের মেয়েদের বিয়ে করা অনেক যুবক মিলে তৈরি করত এমন কর্মী, যারা পরস্পরের কাজে সাহায্য করবে। ডাহোমিতে যুবকরা তাদের স্ত্রীর পরিবারের সাথে গিয়ে বাস করত না। কিন্তু কোনো যুবক চাইলে দোপকোয়ে (কর্মী দল)-এর সাথে মিলে তার স্ত্রীর বাবার জন্য বড়সড় কোনো কাজ করে দিত। উভয় ক্ষেত্রেই জামাতার শ্রমের ওপর শ্বশুরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় আত্মীয়তার ভিত্তিতে। পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদে শ্রমের মালিকানা আরেক রকম। পুঁজিবাদে অর্থের বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করা হয়। আর সামন্তবাদে জমিদারের জমির একাংশের ওপর অধিকার লাভ করার জন্য শ্রম প্রদান করে ভূমিদাস।

পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে থাকা সেসকল জমিতে পারিবারিক শ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদিত হলো। এবার এগুলোর ফসল ও অন্যান্য পণ্য বণ্টিত হবে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। কোনো আচমকা দুর্যোগের ফলে যদি কারও ফসল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাকে সাহায্য করত তার গ্রামের আত্মীয়রা। আর পুরো জনবসতিই বিপর্যস্ত হয়ে গেলে তারা অন্য এলাকার আত্মীয়দের কাছে চলে যেত, যেখানে খাদ্যসংকট নেই। অ্যাকান দেশে (ঘানা) গোত্রব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। তাই একজন মানুষ ব্রং থেকে শত শত মাইল দূরে ফান্তেতে ঘুরতে গিয়েও খাবার ও আতিথেয়তা পেত একদম অচেনা মানুষের কাছ থেকে। কারণ তারা একই গোত্রের সদস্য।

আফ্রিকার উন্নয়নের গোষ্ঠীতান্ত্রিক পর্যায়ে এই পরিবার-নীতি কতটা প্রভাবশালী ছিল, তার অসংখ্য উদাহরণ তুলে আনা সম্ভব। উৎপাদনের দুটি প্রধান নিয়ামক জমি ও শ্রমকে প্রভাবিত করে এই নীতি। আবার, পণ্য বণ্টনও হতো এরই ভিত্তিতে। আফ্রিকান সমাজ নিয়ে যেসকল ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানী গবেষণা করেছে, তারা মূলত সে কাজ করেছে অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও বর্ণবাদী অবস্থান থেকে। তবুও তাদের গবেষণা থেকে এসব বিষয়ে প্রচুর তথ্যের সন্ধান মেলে। পারিবারিক বাসস্থান ও ভিটেমাটি থেকে শুরু করে বর্ধিত পরিবার (যেখানে এমন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত, যারা জন্মের ভিত্তিতে না, বরং সম্বন্ধীয়তার ভিত্তিতে আত্মীয় বলে গণ্য), বংশ থেকে শুরু করে গোত্র পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে এসকল গবেষণায়। এই গোত্রীয় ব্যবস্থার ফলে বিশাল বড় অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত আত্মীয়তার বন্ধন। সব বিষয়ে একদম একইরকম না হলেও অন্যান্য দেশের অনেক সমাজেও এরকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দেখা মেলে। যেমন : একাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ফল, একই সময়কালে ইন্দোচীনের ভিয়েত, এবং কোনো-না-কোনো যুগে বিশ্বের প্রায় সকল স্থানে। কারণ গোষ্ঠীতন্ত্র এমন এক পর্যায়, যার মধ্য দিয়ে প্রতিটি

মানবসমাজই কখনো না কখনো পার হয়েছে।

একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজের অন্যদের প্রতি তার কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। সেইসাথে ছিল কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকারও। প্রারম্ভিক যুগের সকল আফ্রিকান সমাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। অধিকার ও কর্তব্যের পরিসীমা নির্ধারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক ছিল বয়স। সমাজের প্রবীণতম সদস্যরা অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং সাধারণত কর্তৃত্বের আসনের অধিকারী। বহু আফ্রিকান সমাজে বয়স-শ্রেণী নামক একটি ধারণা ছিল। এ থেকে প্রবীণতার এই গুরুত্ব বোঝা যায়। খতনা মানে সমাজে ও সাবালক জীবনে অভিষেক। ওই মুহূর্ত থেকে একজন পুরুষ তার নিজের বয়স-শ্রেণীর সদস্য হিসেবে স্থান পায়। নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ। সাধারণত বয়স-শ্রেণী ছিল অন্তত তিনটি। সেগুলোকে মোটামুটি তরুণ, মধ্যবয়সি ও বৃদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

গোষ্ঠীতন্ত্র ভেঙে পড়ার পর ইউরোপের বিশাল অংশে ব্যাপকভাবে দাসপ্রথা চালু হয়। এটি তখন শ্রম সচলায়নের নতুন রূপ। এই দাসপ্রথা পুরো মধ্যযুগ জুড়ে চলতে থাকে ইউরোপে। খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত ক্রুসেডের ফলে মানুষকে দাস বানানোর আরেকটি অজুহাত মেলে। দাসপ্রথা পালটে কালক্রমে আসে ভূমিদাসত্ব। এখানে শ্রম জমির সাথে আবদ্ধ। একে আর বিক্রি বা স্থানান্তরিত করা যায় না। ইউরোপে দাসপ্রথা থেকে সামন্তপ্রথায় রূপান্তর ঘটতে বহু বছর সময় লেগেছিল। তাই প্রায়ই দেখা যেত, সামন্ততান্ত্রিক কোনো সমাজেও দাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান। চীন, বার্মা ও ভারতের সমাজ যখন প্রাথমিক গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সামনে অগ্রসর হয়, তখন সেসব দেশের কিছু অংশ জুড়েও ছিল উল্লেখযোগ্য দাস। কিন্তু দাসব্যবস্থা কোনোকালেই এশিয়ার প্রধান উৎপাদনের ধরন ছিল না।

আফ্রিকাতে দাস ছিল নগণ্য সংখ্যক। দাসব্যবস্থার যুগ বলে কোনো যুগই ছিল না। বেশির ভাগ দাস ছিল উত্তর আফ্রিকান ও অন্যান্য মুসলিম সমাজে। ওইসব ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ ও তার পরিবার হয়তো কয়েক প্রজন্ম ধরেও দাস পদে অবস্থান করত। আর সমাজের সার্বিক কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজগুলো বহিরাগত মানুষদের ওপর মালিকানা লাভের ধারণার সাথে পরিচিত হয়। এই মালিকানা লাভ হতো যুদ্ধবন্দিদের ওপর। শুরুতে এসকল বন্দির অবস্থান ছিল দাসদের মতোই করুণ। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত এই বন্দিরা ও তাদের বংশধররা সমাজের সাধারণ সদস্যের মতোই মর্যাদা লাভ করে। কারণ যে সমাজব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিকও

না বা পুঁজিবাদীও না, সেখানে অনির্দিষ্টকাল যাবৎ মানুষের ওপর মানুষের মালিকানার কোনো সুযোগ নেই।

ইউরোপে উৎপাদনের ধরন যে ক্রমধারায় পরিবর্তিত হয়েছে, আফ্রিকাতে তেমনটি ঘটেনি। মার্কসবাদী এবং অ-মার্কসবাদী উভয় পক্ষই (বিভিন্ন উদ্দেশ্যে) এ ব্যাপারটি দেখিয়েছে। আফ্রিকায় গোষ্ঠীতান্ত্রিক পর্যায়ের পর অভ্যন্তরীণ কোনো বিবর্তনের ফলে দাসপ্রথার কোনো যুগের উদ্ভব হয়নি। এমন কোনো উৎপাদনের ধরনও আসেনি, যা ইউরোপীয় সামন্তবাদের অবিকল প্রতিচ্ছবি। মার্কস নিজেই স্বীকার করেছেন, এশিয়ার উন্নয়নের পর্যায়গুলো ভিন্ন এক প্রকৃতির সমাজ সৃষ্টি করেছে। সেটাকে সহজে ইউরোপীয় খাপে ঢোকানো যায় না। সেটাকে তিনি বলেছেন "উৎপাদনের এশীয় ধরন"।

এই ধারার অনুসরণে বেশ কয়েকজন সমসাময়িক মার্কসপন্থি এই আলাপ তুলেছে যে, আফ্রিকাও এশিয়ার মতো একই শ্রেণীতে পড়ে কি না। কিংবা আফ্রিকার নিজস্ব "উৎপাদনের আফ্রিকান ধরন" ছিল কি না। এসকল আলোচনা বেশ তাৎপর্যময়। কারণ, ইউরোপের গৎবাঁধা ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে আফ্রিকার সত্যিকারের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু উক্ত বিশেষজ্ঞরা যেন এই পুরো যুগটিকে দেওয়ার জন্য একটি নামই খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর। অথচ প্রায় পঞ্চম খ্রিষ্টীয় শতাব্দী থেকে উপনিবেশ যুগের আগমন পর্যন্ত আফ্রিকায় ছিল নানা ধরনের সামাজিক গঠন। এই গবেষণার স্বীকার্য হলো, ১৫০০ সালের আগ পর্যন্ত আফ্রিকান সমাজগুলো একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এর শুরুতে ছিল পরিবার-ভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কৃষিকাজের (সেইসাথে মাছধরা ও পশু চরানোর) চর্চা। আর শেষদিকে রয়েছে রাষ্ট্র ও সামন্ততন্ত্রের সাথে তুলনীয় সমাজের ভেতরে ওই একই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা।

এক অর্থে ইতিহাস মানেই এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবর্তন। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য অন্যগুলো থেকে সহজে আলাদা করা যায়। গোষ্ঠীতন্ত্রের অধীনে শ্রেণীভেদ ছিল না। জমির মালিকানা এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে ছিল সমতা। প্রযুক্তি ও উৎপাদন ছিল নিম্নমানের। সামন্ততন্ত্রে ভূমিজ ও সামাজিক উৎপাদ বণ্টনে বিরাট অসমতা থাকত। জমিদার শ্রেণী ও এর আমলারা নিয়ন্ত্রণ করত রাষ্ট্রকে। শ্রমিক, ভূমিদাস, দাস, এবং এমনকি কারিগর ও বণিকদের ওপরও অত্যাচার করার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করত তারা। প্রতিটি মহাদেশেই গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে রূপান্তর ঘটতে সময় লেগেছে কয়েক শতাব্দী। কিছু ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিবর্তন কখনোই ওই প্রক্রিয়াকে পরিপক্বতা

পেতে দেয়নি। আফ্রিকায় যেসকল সমাজ একসময় সামন্ততন্ত্রে পৌঁছেছে, সেগুলোর সংখ্যা নিঃসন্দেহে নগণ্য। সামন্তবাদী রাষ্ট্র যখন গড়ে উঠছিল, তখন কিছু গোষ্ঠীতান্ত্রিক উপাদান ও কিছু সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অস্তিত্ব ছিল পাশাপাশি। আর ছিল আফ্রিকান প্রেক্ষাপটের নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব। বেশ কয়েক ধরনের সামাজিক গঠন এই রূপান্তরকালের বৈশিষ্ট্য ছিল; ছিল পশুপালক ও কৃষক, জেলে সমাজ ও বণিক সমাজ, হানাদার ও যাযাবর। তারা সকলেই ক্রমে ক্রমে ভূমির সাথে, পরস্পরের সাথে ও রাষ্ট্রের সাথে একটি সম্পর্কের দিকে এগিয়ে আসছিল। উৎপাদক শক্তি এবং বণ্টন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছিল এই সম্পর্ক।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদার ও শ্রমিক-জনতার মাঝে সংঘাত ঘটত। পরে জমিদার ও বণিক শ্রেণীর মাঝেও বেঁধে যায় এই সংঘাত। পুঁজিবাদী যুগে ইউরোপে প্রধান শ্রেণী-সংঘাত ঘটে প্রোলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মাঝে। এসকল শত্রুতাপূর্ণ শ্রেণীসম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। আফ্রিকান গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজেও পার্থক্য ছিল বিভিন্ন বয়স-শ্রেণীর মাঝে। আবার সমাজের সাধারণ সদস্য ও ধর্মীয় নেতাদের (যেমন, বৃষ্টি-আনয়নকারী) মাঝেও পার্থক্য ছিল। কিন্তু সেগুলো শোষণভিত্তিক বা শত্রুতামূলক সম্পর্ক ছিল না। সামাজিক বিকাশের সঞ্চালক শক্তি হিসেবে শ্রেণীর ধারণাটি তখনো উদ্ভূতই হয়নি। আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক পর্যায়ে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বুঝতে হলে উৎপাদনের মৌলিক শক্তিগুলোর দিকে তাকাতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যে জানলাম, মানবজাতির উদ্ভবের পর তারা প্রথমে পরিবার হিসেবে বাস করত। তারপর আস্তে আস্তে গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির উদ্ভব। এই পরিবার হিসেবে বাস করার ব্যবস্থাটি কীভাবে ভেঙে গেল এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, তা আর অতীতে গিয়ে দেখে আসা সম্ভব না। কিন্তু কিছু পদ্ধতি ও ধারণা ব্যবহার করে তার সম্ভাব্যতম চিত্রটি অনুমান করা সম্ভব। যেমন, বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনে বয়স-শ্রেণীর উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। কারণ একই বয়স-শ্রেণীতে একাধিক পরিবারের অনেক মানুষ অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী মিলে কাজ করতে শুরু করলে সামষ্টিক শ্রমের ধারণাটি আসে। ওপরে ডাহোমির দোকপোয়ে কর্মীদের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ছিল আরও ব্যাপক। গাছপালা সাফ করে ভূমি তৈরি করা এবং গৃহ নির্মাণের মতো ভারী ভারী কাজগুলো করে তারা পুরো সমাজকে উপকৃত করত। পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু খাবার ও ফলের রসের মদ প্রদান করলে একটি কর্মীদল বা "কর্মী মৌমাছি"রা সহজেই তৈরি হয়ে যেত শ্রম দেওয়ার জন্য। বেশির ভাগ আফ্রিকান সমাজেই এমনটি ঘটত। এমনকি উত্তর

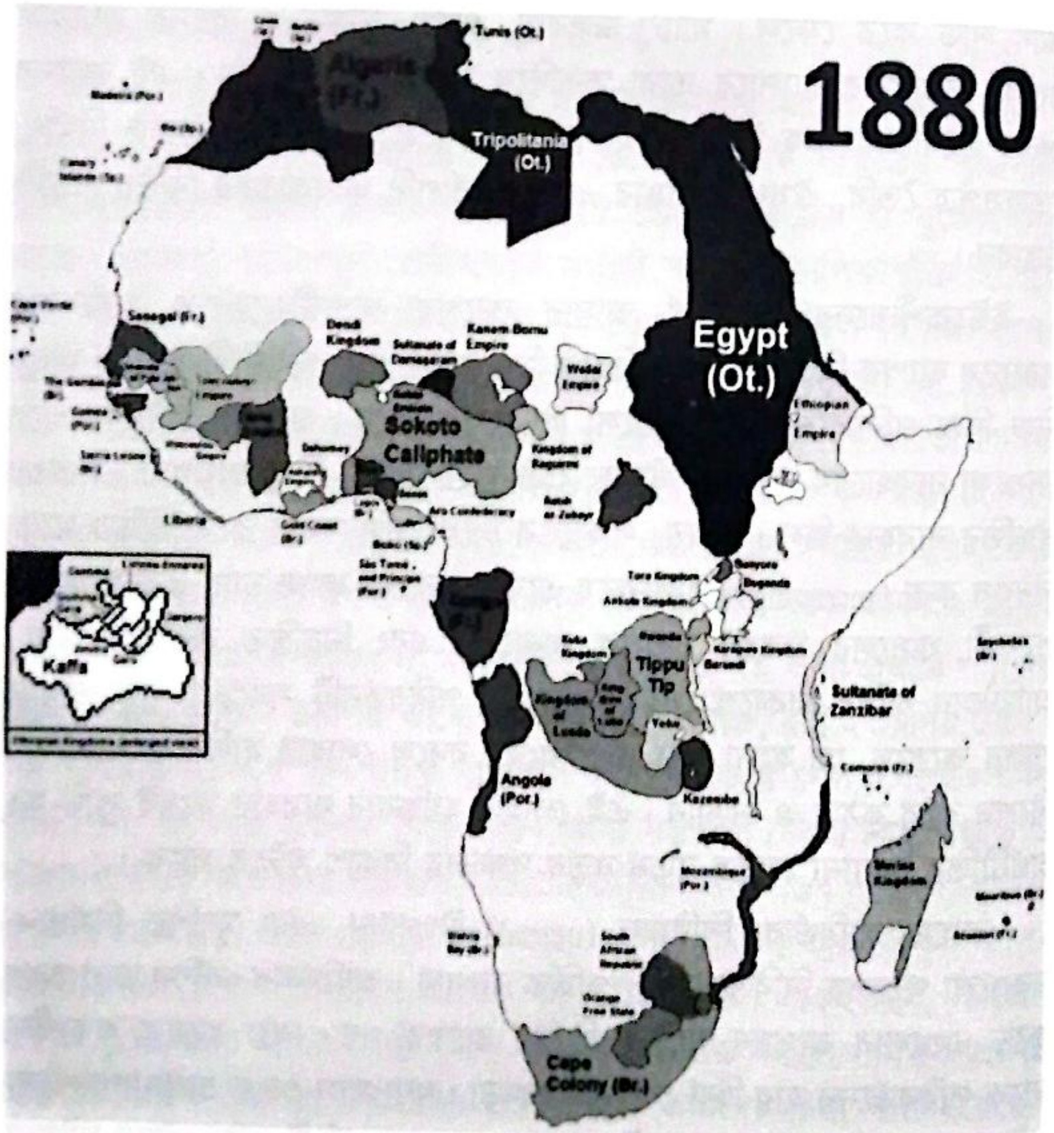
আফ্রিকার উজ্জ্বলতর ত্বকবিশিষ্ট বার্বারদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

শ্রমের সংগঠন অধিকতর উৎপাদনে সহায়ক হয়েছে বটে। কিন্তু উৎপাদক শক্তির প্রধান পরিবর্তনটি হলো নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব। এখানে প্রযুক্তি শব্দটিকে এর ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুল-সহ গোটা পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে যত ধরনের হাতিয়ার ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সবই প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার প্রথম পূর্বশর্ত হলো ওই পরিবেশের ব্যাপারে জ্ঞান। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সব জায়গার আফ্রিকানরাই পুরো বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে ফেলে। মাটি, জলবায়ু, প্রাণী, উদ্ভিদ ও তাদের মধ্যকার বহুবিধ সম্পর্কের ব্যাপারে তারা ততদিনে ভালো করে জানে। এই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের কিছু উদাহরণ হলো ফাঁদ পেতে পশু ধরা, ঘরবাড়ি নির্মাণ, তৈজসপত্র তৈরি, ঔষধ আবিষ্কার, এবং সর্বোপরি কৃষিকাজের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন।

ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার আগের শতাব্দীগুলোতে আফ্রিকার সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তৃত কর্মকাণ্ড ছিল কৃষি। সকল থিতু কৃষিজীবী সমাজে মানুষ নিজ নিজ পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে। তারপর যৌক্তিকভাবে সেগুলো ব্যবহারের কৌশল খোঁজার চেষ্টা করে তারা। কিছু জায়গায় উন্নততর পদ্ধতির ব্যবহার ছিল। যেমন, পাহাড়ের ঢালে জমি সমান করে সিঁড়ির মতো বিন্যাস করা (terracing), পালাক্রমে একেক ধরনের ফসল চাষ, এক ফসলকে পরবর্তী ফসলের ফলনে সহায়ক বানানো, এবং নিয়ন্ত্রিত জলাভূমি চাষ। আফ্রিকান কৃষির বিকাশে যেই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে, তা হলো কাঠ ও পাথরের বদলে লোহার হাতিয়ার ব্যবহার। বিশেষ করে কুঠার ও নিড়ানি। এই লোহার হাতিয়ার ব্যবহার করেই কৃষি-সহ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন নতুন দক্ষতার বিকাশ ঘটতে থাকে।

লোহার আবির্ভাব, সিরিয়াল (cereal) উৎপাদন, এবং মৃৎশিল্প নির্মাণ— সবগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যাপার। আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশ জুড়ে এগুলোর আগমন ঘটেছে খ্রিষ্টের জন্মের পর। অল্প কয়েক শতাব্দীর মাঝে পরিবর্তনের হার ছিল বেশ নজরকাড়া। বন্য ঘাস থেকে চাষযোগ্য শস্যে পরিণত হয় ভুট্টা ও ধান। বাছাইকৃত বন্য মূল থেকে মিষ্টি আলুর উদ্ভব ঘটানো হয়। বেশির ভাগ আফ্রিকান সমাজ তাদের নিজস্ব প্রধান খাদ্যের উৎপাদনকে চারুশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করে। কৃষকরা কোনো জায়গার ঘাস-লতাপাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলত। ওই ছাই কাজ করত মাটির সার হিসেবে। তারপর

সেই খোলা ময়দানে হালকা নিড়ানি দিয়ে তারা রোপণ করত নতুন কোনো ফসল, যা পরপর দুই-তিন মৌসুম ধরে জন্মাত। প্রথম প্রথম ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা এসে একে বাচ্চামো ভেবে হাসাহাসি করত। আসলে মোটেই এরকম ছিল না বিষয়টি। মাটির সক্ষমতাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারার ফলেই কৃষির এই পদ্ধতিটির আবির্ভাব। প্রথম প্রথম ঘাস-লতাপাতার পরিমাণ দেখে যেমন মনে হতো, ওইসব জমি আসলে অতটা উর্বর ছিল না। উপনিবেশবাদীরা যখন পাতলা এই মাটি তছনছ করে দিতে শুরু করে, তার ফলাফল হয় ভয়াবহ।



ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, বহিরাগতরা নতুন কোনো বাস্তুতন্ত্রকে ঠিকমতো না-ও বুঝে উঠতে পারে। এমনকি স্থানীয়দের চেয়ে বহিরাগতরা বেশি দক্ষ হলেও না। বরং কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানকার পরিবেশের সাথে পরিচিত মানুষেরাই হয়তো ভালো জানে কীভাবে সেটিকে ব্যবহার করতে হয়।

"নেটিভ"দের কাছ থেকেও যে কিছু শেখার আছে, বহিরাগত উপনিবেশবাদীরা অহংকারবশে তা মানতে চাইত না। অথচ এই আচরণ রীতিমতো হাস্যকর। তবে এর মানে এই না যে, সে যুগের আফ্রিকান কৃষি অন্যান্য মহাদেশের চেয়ে উন্নততর ছিল। বরং এশিয়া ও ইউরোপের বেশির ভাগ অংশে ভূমি ও প্রাণীসম্পদ প্রতিপালনের যেসব ধারা স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছিল, সেই মানদণ্ডে আফ্রিকার অবস্থান নিচেই থাকবে। আফ্রিকার আপাত দুর্বলতা হলো তিনটি বিষয়ে পেশাদারি আগ্রহের অভাব: আরও বেশি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন, শ্রমের কষ্ট কমানোর জন্য নতুন হাতিয়ার উদ্ভাবন, এবং প্রতিকূল পরিবেশকে মানবীয় কর্মকাণ্ডের উপযোগী স্থানে রূপান্তর। ওদিকে ইউরোপে এই পেশাদারিত্বের ভার গ্রহণ করেছিল এমন এক শ্রেণী, যাদের স্বার্থের মূল জায়গাই ভূমি—অর্থাৎ, সামন্তবাদী জমিদার এবং পরবর্তীকালের পুঁজিবাদী কৃষক।

আগেই বলা হয়েছে যে, উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কই উন্নয়নের গতিপথ অনেকাংশে নির্ধারিত করে দেয়। অর্থাৎ, সম্পদ উৎপাদনে মানুষের ভূমিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কগুলো। পৃথিবীর কিছু জায়গায় জমির মালিক ছিল অল্প কয়েকজন এবং বেশির ভাগই ছিল প্রজা। এই বৈষম্যের ফলে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ওই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরা তাদের জমিকে উন্নত করার দিকে মনোযোগ প্রদান করে। পক্ষান্তরে গোষ্ঠীতান্ত্রিক আফ্রিকায় প্রতিটি আফ্রিকানই নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমির অধিকারী হওয়ার আশ্বাস পায়। পরিবার বা সমাজের সদস্য হওয়াটাই এই অধিকার দেয় তাকে। তাই জমির এক ধরনের প্রাচুর্য বিরাজমান ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যে কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হবে, এরকম সামাজিক চাপ বা প্রণোদনা ছিল না বললেই চলে।

এশিয়ায় বেশির ভাগ জমির মালিকানা ছিল সামষ্টিক। সেখানে কিছু প্রকারের কৃষিকাজে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়, বিশেষত সেচভিত্তিক কৃষিতে। কারণ ভারত, চীন, সিলন, ও অন্যান্য স্থানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক পরিসরে সেচ ও অন্যান্য জলভিত্তিক কাজে লিপ্ত হতো। উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এই জায়গাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এশিয়ার অনুরূপ বিবর্তন-ধারা অনুসরণ করেছে। আফ্রিকার ভূমিরূপের সাথে এশিয়ার মিল বেশি, ইউরোপের কম। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে উন্নত আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোও কৃষিকাজে উন্নতির সূচনাকারী বা পৃষ্ঠপোষকতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেনি। একটি কারণ হতে পারে জনসংখ্যার চাপ না থাকা। এজন্যই লোকালয় গড়ে উঠেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাকি সব পণ্য বাদ দিয়ে শুধু অ-কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় মনোযোগ প্রদানও আরেকটি কারণ

হতে পারে। আফ্রিকান সমাজগুলো যখন এই মহাদেশের বাইরের সামাজিক ব্যবস্থাগুলোর সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করে, তখন স্বভাবতই কৃষির প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

শ্বেতাঙ্গদের আগমনের পূর্বে আফ্রিকায় তৈরি-পণ্য কীরকম ছিল, সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এই ক্ষেত্রেও অবমূল্যায়ন করা হয়েছে আফ্রিকার অর্জনকে। ইউরোপীয় লেখকরা রীতিমতো ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করেছে আফ্রিকান প্রস্তুতকারকদের। কারণ ম্যানুফ্যাকচার শব্দটির যে আধুনিক অর্থ, তাতে শুধু কারখানা আর যন্ত্রের কথাই মাথায় আসে। কিন্তু "ম্যানুফ্যাকচারস"-এর আক্ষরিক অর্থ হলো "হাতে তৈরি শিল্প"। সেই অর্থে আফ্রিকার প্রস্তুতকৃত পণ্যগুলো ছিল প্রশংসনীয় মাত্রায় উন্নত। বেশির ভাগ আফ্রিকান সমাজ তাদের নানারকম গৃহস্থালি জিনিস, কৃষিজ হাতিয়ার, এবং অস্ত্রের চাহিদা নিজেরাই পূরণ করত।

পাঁচ শতাব্দী আগেকার আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা বিচার করার একটি মানদণ্ড হলো পণ্যের মান। এখানে অল্প কয়েকটি পণ্যের উদাহরণ তুলে ধরা হবে, যেগুলো বহির্বিশ্বের নজর কেড়েছিল।

- উত্তর আফ্রিকার মাধ্যমে ইউরোপীয়রা উন্নততর এক ধরনের লাল চামড়ার সাথে পরিচিত হয়। একে নাম দেওয়া হয় "মরোক্কান লেদার"। আসলে এগুলো শুকানো ও রং করার কাজ করত উত্তর নাইজেরিয়া ও মালির হাউসা ও মান্দিঙ্গা কারিগরেরা।
- পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলসমূহে যখন ইউরোপীয় ও আফ্রিকানদের মাঝে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আরও অনেক আকর্ষণীয় জিনিসের প্রদর্শনী করা হয়। পর্তুগিজরা পুরাতন কঙ্গো রাজ্যে পৌঁছানো মাত্রই দেশে খবর পাঠায় যে, তারা এখানে গাছের বাকল ও তালের আঁশ থেকে বানানো অসাধারণ এক কাপড়ের সন্ধান পেয়েছে। এই কাপড়ের মান প্রায় মখমলের সাথে তুলনীয়।
- বাঙ্গান্দা জাতিও ছিল ছালের কাপড় তৈরিতে সুদক্ষ। সুতি কাপড়ে আফ্রিকার অবদান ছিল আরও বড়। ইউরোপীয়দের আসার আগে থেকেই ব্যাপক পরিমাণে প্রস্তুতকৃত হয়ে আসছিল সেগুলো। এই শতাব্দীতেও ম্যানচেস্টার সুতি কাপড়ের চেয়েও টেকসই ছিল গিনি উপকূল থেকে আসা স্থানীয় সুতি।
- ইউরোপীয় পণ্য আফ্রিকায় পৌঁছানোর পর আফ্রিকানরাও নিজেদের পণ্য ও বাইরে-থেকে-আসা পণ্যের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ পায়। কাতাঙ্গা ও জাম্বিয়াতে আমদানিকৃত তামার তুলনায় স্থানীয় তামাই প্রাধান্য পেতে থাকে।

সিয়েরা লিওনের মতো জায়গায় লোহার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আফ্রিকান তৈরি-পণ্য যেই জায়গাটায় সুবিধা করতে পারেনি, তা হলো উৎপাদনের পরিমাণ। অর্থাৎ, কাপড়ের চরকা ছিল ছোট, কামারের কর্মশালা ছিল ছোট, আর মৃৎপাত্র চাকার বদলে হাতে ঘোরানো হতো খুব ধীরে ধীরে। অবশ্য কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল। গোষ্ঠীতন্ত্রে প্রতিটি বাড়িতে পোশাক, পাত্র, মাদুর ইত্যাদি বানানোর মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা নিজেরাই পূরণ করত। প্রতিটি মহাদেশের ক্ষেত্রেই তা সত্য। কিন্তু এর পর থেকে নিয়ে অর্থনৈতিক বিস্তার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বিশেষ দক্ষতা এবং শিল্পের স্থানীয়করণের ওপর। অর্থাৎ, মানুষের চাহিদা পূরণ করা হয় বিনিময়ের মাধ্যমে। এই প্রবণতা আফ্রিকার প্রধান. প্রধান প্রস্তুতকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যেতে শুরু করে। বিশেষত পোশাকশিল্পে। সুতার তন্তুকে আগে বীজ থেকে আলাদা করতে হতো, তারপর চরকায় কেটে সুতায় পরিণত করা। এরপর বুনন। সুতা বা বুনন-করা কাপড়কে রং করতে হতো। আবার রং তৈরি করাটাও আরেকটা জটিল প্রক্রিয়া। এককালে একটা পরিবার একাই সব কাজ করত। আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে, পরিবারের নারীরা, যেমনটা করত ইয়োরুবা জাতি। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে আলাদা হয়ে যায় কাপড় বানানো আর রং করার কাজ। আলাদা হয়ে যায় চরকা কাটা ও সেলাই। প্রতিটি পৃথকীকরণের ফলে অধিকতর বিশেষায়িত দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে। উৎপাদনের পরিমাণ ও মানেও আসে পরিবর্তন।

ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্র নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এসকল গবেষণামতে, শিল্পের প্রসারের সবচেয়ে বড় প্রভাবক নিত্যনতুন যন্ত্রের আবিষ্কার নয়। বরং উৎপাদন কর্মযজ্ঞ গৃহস্থালি পর্যায় থেকে বের হয়ে কারখানায় স্থানান্তরিত হওয়াটাই শিল্পের প্রবৃদ্ধির কারণ। এই রূপান্তরের একটি মধ্যবর্তী পর্যায় ছিল বিশেষ দক্ষতার অধিকারী কারিগরদের সংঘ। এই কারিগরেরা ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে তাদের কারিগরি জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিত। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভবন নির্মাণ করত আলাদা করে। আফ্রিকাতেও এই সংঘব্যবস্থার প্রমাণ মেলে।

- টিম্বাকতুতে দর্জিদের সংঘ ছিল।
- বেনিনে পিতল ও ব্রোঞ্জ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখেছিল একটি নির্দিষ্ট জাতের মানুষদের সংঘ।
- ন্যুপে (বর্তমান উত্তর নাইজেরিয়ায়) কাঁচ ও সীসার শিল্প পরিচালিত হতো সংঘের মাধ্যমে। প্রতিটি ন্যুপ সংঘের ছিল আলাদা কর্মশালা ও একজন

গুরু। নেতৃস্থানীয় এই ব্যক্তিটি গ্রাহকদের সাথে চুক্তি করত, সংঘের অর্থায়ন করত, এবং পণ্য চালান দিত। তার আত্মীয় ও অপরিচিত কেউ চাইলেই সংঘে যোগ দিয়ে কাঁচ শিল্পের বিশেষ দক্ষতা শিখে নিতে পারত। এর ফলে বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্র ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাগ হয়ে যেতে থাকে শ্রম।

প্রাচীন আফ্রিকান অর্থনীতিকে সাধারণত "সাবসিস্টেন্স" অর্থনীতি বলা হয়। ছোট ছোট গ্রাম নিজেরাই কৃষি, শিকার, মাছ ধরা, ও নিজেদের দেখভালের কাজ করত। এ ব্যাপারে মহাদেশের বাকি অংশের সাথে তেমন লেনাদেনা ছিল না। অথচ একইসাথে বিপুল সংখ্যক আফ্রিকান সমাজ তাদের অল্প কয়েকটি চাহিদা পূরণ করত বাণিজ্যের মাধ্যমে। আফ্রিকা অগণিত বাণিজ্যপথে ছাওয়া এক মহাদেশ। কোনো কোনোটির দৈর্ঘ্যও ছিল বিশাল। যেমন সাহারার মধ্য দিয়ে চলে-যাওয়া পথগুলো কিংবা কাতাঙ্গা থেকে তামা আদান-প্রদানের সড়কসমূহ। তবে প্রধানত এসকল বাণিজ্য সংঘটিত হতো পার্শ্ববর্তী বা অল্প দূরে অবস্থিত সমাজগুলোর সাথে। এসকল বাণিজ্যও উৎপাদনেরই অংশ।

একেক সমাজের কাছে কোনো না কোনো উৎপাদের উদ্বৃত্ত অংশ থাকত। সেটার বিনিময়ে তারা অন্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করত এমন পণ্য, যেটা তাদের নিজেদের নেই বা কম আছে। ফলে এক অঞ্চলে লবণের শিল্প গড়ে উঠত, আরেক অঞ্চলে বেড়ে উঠত লৌহশিল্প। উপকূলীয় অথবা হ্রদ বা নদীর তীরবর্তী এলাকায় হয়তো শুঁটকির ব্যবসা লাভজনক। আবার অন্য কোনো স্থান রপ্তানির জন্য উৎপাদন করত প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলু ও ভুট্টা। দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝে মহাদেশের একেক অংশের বাণিজ্যকে একদম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এটি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের এক অসাধারণ সূচক। পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ হাসিলের সাথেসাথেই এগুলো সংঘটিত হয়।

বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার অংশ হিসেবে পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থা সরে যেতে থাকে। তার স্থান দখল করতে থাকে কোনো-না-কোনো ধরনের মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা। ব্যবসার আকার যখন ছোট ছিল এবং অল্প কিছু পণ্যের ব্যবসা করা হতো, তখন পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। কিন্তু বাণিজ্য যখন জটিলতর হতে থাকে, তখন নির্দিষ্ট কিছু পণ্যকে অন্যান্য পণ্যের পরিমাপক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। এই পণ্যগুলো সম্পদ হিসেবে জমা থাকত। প্রয়োজনসাপেক্ষে অন্যান্য পণ্যে রূপান্তরিত করা যায় এদের। যেমন: লবণ, কাপড়, লোহার নিড়ানি, ও কড়ি ছিল আফ্রিকার বহুল ব্যবহৃত কিছু

মুদ্রা। সোনা আর তামা তো ছিলই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্লভ বলে শুধুমাত্র বেশি দামি জিনিস পরিমাপ করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো সেগুলো। উত্তর আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, ও কঙ্গোর মতো অল্প কিছু জায়গায় মুদ্রাব্যবস্থা ছিল বেশ আধুনিক। সহজসরল পণ্য-বিনিময় বা সাবসিস্টেন্স ব্যবস্থাকে বহুল ব্যবধানে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেসকল দেশ।

উৎপাদনশীল শক্তির সম্প্রসারণের সাথে সাথে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরেও অন্যান্য বহু পরিবর্তন আসে। আসলে কৃষি কর্মকাণ্ড, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ, আর রাজনৈতিক কাঠামো প্রায় অবিচ্ছেদ্য। প্রতিটিই বাকিগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে চলে। যেসব জায়গায় এই সকল উপাদান একত্র হয়, সেগুলো ছিল আফ্রিকার সবচেয়ে উন্নত অঞ্চল। উন্নয়নের অকাট্য সূচক হিসেবে কাজ করে দুটি সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। একটি হলো সামাজিক স্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আরেকটি হলো সুসংহত রাষ্ট্র গঠন।

পরিবার ও বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন নীতি আস্তে আস্তে ভেঙে যেতে থাকে। ইউরোপীয়রা এখানে পৌঁছানোর আগে কয়েক শতাব্দী জুড়েই ঘটতে থাকে এই ঘটনা। প্রযুক্তি ও শ্রমবিভাজনে পরিবর্তন আসার ফলে এই ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যেমন লোহার চল শুরু হওয়ার পর যারা এটি তৈরি ও অর্জন করতে পারত, তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে এগিয়ে যায়। উন্নত হাতিয়ার মানে অধিকতর খাদ্য ও বৃহত্তর জনসংখ্যা। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে বস্তুগত সম্পদের সরবরাহে টান পড়ার আশঙ্কা। লোহার মালিক হওয়ার ফলে সম্পদ বাড়ানোর যে সম্ভাবনা তৈরি হয়, তা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের সুবিধার্থে লুফে নেয়। লোহা, পোশাক, মৃৎশিল্প, চামড়া, ও লবণ-তৈরিতে দক্ষ কর্মীরা তাদের ঘনিষ্ঠ দলকে এই দক্ষতা শিখিয়ে দিতে থাকে। এসকল দলকে বলা হয় জাত।

এতে করে শ্রমের বিভাজনকে নিজেদের সুবিধামতো প্রবাহিত করতে সক্ষম হয় তারা। কারণ তাদের এই অবস্থান সুবিধাজনক ও কৌশলগত। কিছু আফ্রিকান সমাজে লৌহকর্মীরা বিশেষ আনুকূল্যের অধিকারী ছিল। সেখানে তারা হয় শাসকগোষ্ঠী, আর নয়তো সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপরের শ্রেণী। শ্রমের বিভাজন অবস্তুগত পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়ে। আবির্ভাব ঘটে রাখাল কবি ও ইতিহাসবিদদের। তাদেরও ছিল কিছু বিশেষ অধিকার ও সুবিধা, বিশেষত প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই স্বাধীনভাবে সমালোচনা করতে পারার সক্ষমতা। কিছু ক্ষেত্রে দক্ষতার অধিকারী জাতের মর্যাদা খুবই কমে যায়। কিন্তু এমনটা দুর্লভ। আবার গোষ্ঠীতন্ত্র ভেঙে যে একের পর এক স্তরবিভাজন

হচ্ছে, সেই বাস্তবতাও পালটে যায়নি এর ফলে।

সামাজিক স্তরবিভাজনের ফলে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আরও আসে সামাজিক শত্রুতা। পূর্বেকার গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজে যেসব শত্রুতাবিহীন পার্থক্য ছিল, সেগুলোর একরকম পরবর্তী ধাপ হিসেবেই এই নতুন বিষয়গুলোর আবির্ভাব। যেমন : বৃদ্ধরা জমিবণ্টন, দেনমোহর, ও অন্যান্য প্রচলিত বিনিময়ের ওপর নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারত। এর মাধ্যমে সুবিধাভোগী অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে তারা। বর্তমান লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, ও গিনি অঞ্চলগুলোতে গড়ে ওঠে গোপন কিছু সংগঠন। তারা বয়ঃবৃদ্ধদের কাছে এবং মূলত বিশেষ বংশের বয়ঃবৃদ্ধদের কাছে জ্ঞান, ক্ষমতা, ও সম্পদের হস্তান্তর নিশ্চিত করে।

নবীন ও প্রবীণদের মাঝে যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল, তা সহিংস বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার মতো না। কিন্তু বৃদ্ধদের ওপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে ক্ষেপে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল যুবকদের। বিশেষত বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপারেও যখন তাদের হস্তক্ষেপ ঘটে। অসন্তোষ চরমে পৌঁছলে তারা গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের আলাদা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর নয়তো সমাজের ভেতরকার এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কিছু ব্যক্তি ও পরিবার অন্যদের চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করে। এরপর ওই পরিবারগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে স্থায়ী শাসক হিসেবে। তখন বয়স আর অত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিবেচ্য বিষয় থাকে না। কারণ রাজরক্ত বা রাজবংশের ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কমবয়সি ছেলেও হতে পারে বাবার উত্তরসূরি।

রূপান্তর চলাকালীন আফ্রিকান সমাজে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে, যেগুলো নিঃসন্দেহে গোষ্ঠীতান্ত্রিক। কিন্তু কিছু পরিবার বা গোত্র বা বংশ যে অন্যদের ওপর রাজত্ব করবে, সেটাকেও একরকম মূলনীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। এটা শুধু কৃষিজীবীদের ক্ষেত্রেই না, বরং পশুপালকদের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রাণীসম্পদের অসম বণ্টন ঘটেছে জমির তুলনায় বেশ দ্রুতগতিতে। সবচেয়ে বড় পশুপালের মালিক পরিবারগুলো হয়ে ওঠে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যশালী।

সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রক্রিয়ার আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন পরস্পরের সংস্পর্শে আসা। কৃষকদের সাথে জেলেদের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়ে, পশুপালকদের সাথে আবার কৃষকদের। এমনকি শিকারি-সংগ্রাহকদের মতো সামাজিক সংগঠনও বিদ্যমান

ছিল, যারা তখনো গোষ্ঠীতান্ত্রিক সহযোগিতার যুগেও প্রবেশ করেনি। এসকল সম্পর্ক প্রায়শ হতো শান্তিপূর্ণ। আফ্রিকার বহু জায়গায় গড়ে ওঠে এক ধরনের "মিথোজীবিতা"। অর্থাৎ, বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা উপার্জনকারী বিভিন্ন দল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার মানে, তারা পারস্পরিক সুবিধা লাভের জন্য নিজেদের মাঝে পণ্য বিনিময় করতে ও সহাবস্থান করতে সম্মত হয়। অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণ দ্বন্দ্বের জায়গাও ছিল। এক দল যখন বলপ্রয়োগে আরেক দলের ওপর চেপে বসত, তখন তারা হয়ে যেত সামাজিক শ্রেণী। এই শ্রেণিবিন্যাসে বিজয়ীরা ওপরে এবং বিজিতরা নিচে।

বিভিন্ন রকম সামাজিক সংগঠনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হতো, তার মাঝে সবচেয়ে বেশি ছিল পশুপালক ও কৃষিজীবীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। কিছু জায়গায় কৃষিজীবীরা জয়ী হয়। যেমন পশ্চিম আফ্রিকায় মান্দিঙ্গা ও হাউসা কৃষকরা ছিল কর্তৃত্বশালী। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ফুলানি পশুপালকদের ওপর আধিপত্য খাটিয়ে গেছে তারা। এর উলটোটা আবার ঘটেছে আফ্রিকার শৃঙ্গ এবং পূর্ব আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশে। আরেক ধরনের দ্বন্দ্বে হানাদাররা আক্রমণ করে কৃষিজীবীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিত। অ্যাঙ্গোলা এবং সাহারার ভেতরে ও আশপাশে এমনটি ঘটেছে। এসব জায়গায় মুর ও তুয়ারেগরা তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ও থিতু জাতিদের কাছ থেকে কর আদায় করত এবং এমনকি দাসও বানিয়ে ফেলত তাদের। এসকল দ্বন্দ্বের ফলে তুলনামূলক ছোট একটি দল বেশির ভাগ জমি এবং (যেখানে প্রযোজ্য, সেখানে) গবাদি পশু, খনি, ও দূরবর্তী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করে ফেলে। এর আরেকটি ফল হলো, সংখ্যালঘু দলটি তাদের প্রজাদের শ্রমের ওপর দাবি আরোপ করত আত্মীয়তার ভিত্তিতে না। বরং শাসন করা ও পরাধীন রাখার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটার ভিত্তিতে।

সত্যিকারের গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজে নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল ধর্ম ও পারিবারিক বন্ধন। সমাজের জ্যেষ্ঠ সদস্যরা অন্যদের সাথে মিলে কাজ করত। মোট উৎপাদের অংশ ভোগ করতও মোটামুটি সমপরিমাণে। একদল অনাহারে মরছে, আরেকদল পেট ভরে খেয়ে বাকিটা ফেলে দিচ্ছে—এমনটা মোটেও হয়নি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিবর্তন, যুদ্ধজয়, বা বাণিজ্যের মাধ্যমে আফ্রিকান সমাজ যখন সম্প্রসারিত হতে শুরু করে, তখন শাসক গোষ্ঠীর জীবনধারায় আসে চোখে-পড়ার-মতো পরিবর্তন। সমাজের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধাগুলো তারা ভোগ করতে শুরু করে। অথচ কৃষিকাজ, পশুপালন, বা মাছ ধরার মতো কাজগুলোর মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদনের সাথে তাদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকত সবচেয়ে কম। শাসক শ্রেণী ও বিশেষ করে রাজাদের আদেশে সাধারণ

মানুষরা কোনো প্রকল্পের জন্য বছরে নির্দিষ্ট কিছু দিন শ্রম প্রদান করবে। এটা কর্ভেই শ্রম নামে পরিচিত। সামন্তবাদী ফ্রান্সে প্রচলিত অনুরূপ একটি প্রথা থেকে এই নামটির উদ্ভব। এরকম ব্যবস্থার ফলে শোষণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় উৎপাদনশীল সম্পদের উন্নয়নও।

ওপরে বর্ণিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে হাত ধরাধরি করে চলে রাষ্ট্রের উত্থান। রাজবংশ ও সাধারণ মানুষের পার্থক্যের ধারণাটি তখনই অর্থপূর্ণ হবে, যদি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা সহকারে একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে। বিশ্বের বড় বড় রাজবংশগুলো যে সামন্তবাদী রাষ্ট্রের শাসক ছিল, এই ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপীয় বা ইউরোপ-প্রভাবিত কানে টিউডোর, বুর্খবোন, হোহেনযোলার্ন, ও রোমানোভ রাজবংশগুলোর নাম ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। জাপানে ছিল কামাকুরা ও তোকুগাওয়া; চীনে তাং ও মিং; ভারতে গুপ্ত ও মারাঠা ইত্যাদি। এই সবগুলোই ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজবংশ। খ্রিষ্টের জন্মের কিছু শতাব্দী পরে এগুলো অস্তিত্বমান ছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও শ্রেণীসম্পর্কের ধারণাগুলো যখনো পুরোপুরি সুগঠিত হয়ে ওঠেনি, ওইরকম সময়েও এই প্রতিটি দেশে কোনো না কোনো রাজবংশীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল। তার মানে ইউরোপ ও এশিয়ায় যে সামন্তবাদে রূপান্তর ঘটেছে, তখন শাসক গোষ্ঠীর উত্থান এবং রাষ্ট্রের উত্থানকে দেখা হতো একই প্রক্রিয়ার পরস্পর-নির্ভরশীল অংশ হিসেবে। আফ্রিকাও এদিক থেকে ভিন্ন কিছু না।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আফ্রিকায় গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে রূপান্তরের যুগটি ছিল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার যুগ। শুরুতে (এবং বহু শতাব্দী যাবৎ) রাষ্ট্র ছিল দুর্বল ও অপরিপক্ব। এগুলোর সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমারেখা ছিল বটে। কিন্তু ওই সীমানার ভেতরে প্রজারা বাস করত নিজ নিজ সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে। বার্ষিক কর বা রাজস্ব প্রদানের উপলক্ষ্য ছাড়া শাসক শ্রেণীর সাথে তেমন একটা যোগাযোগ হতো না তাদের। রাষ্ট্রের ভেতরকার কোনো দল যদি কর দিতে অস্বীকৃতি জানাত, তাহলেই কেবল ওইসব রাষ্ট্রের শক্তিপ্রয়োগকারী অঙ্গগুলো সক্রিয় হয়ে উঠত। অর্থাৎ, সেনাবাহিনী এসে প্রজাদের কাছে কর দাবি করত, যা তাদের মতে রাষ্ট্রের অধিকার। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নাগরিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন করে। তারা কর্ভেই শ্রম আদায় করতে থাকে, সৈনিকদলে নিয়োগ বাড়ায়, এবং নিয়মিত কর-সংগ্রাহক ও স্থানীয় প্রশাসক নিয়োগ দেয়। আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে শ্রম-সম্পর্ক আস্তে আস্তে গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে, ঠিক ওই অঞ্চলগুলোতেই গড়ে উঠতে থাকে সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের উদ্ভব স্বয়ং এক ধরনের উন্নতি। এর ফলে আফ্রিকান রাজনীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী পরস্পর মিশে গিয়ে জাতীয়তার অনুরূপ বৃহত্তর পরিচয় গড়ে উঠতে থাকে।

রাজনৈতিক রাষ্ট্রের বিকাশকে মাঝেমাঝে একটু বেশিই গুরুত্ব দেওয়া হয়। জাতিরাষ্ট্রের ধারণাটি ভালোভাবে পূর্ণতা পেয়েছে ইউরোপে। সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে "সভ্যতা"র একটি মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেয় ইউরোপীয়রা। এই মনোভাব পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ আফ্রিকায় এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক এককের অস্তিত্ব ছিল, যাদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত বেশি অগ্রসর। যেমন, নাইজেরিয়ার ইবো কিংবা কেনিয়ার কিকুয়ু জাতি কখনোই সেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার-ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি। কিন্তু উভয় জাতিরই ছিল বেশ সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতি। এগুলোর ভিত্তি ছিল গোত্র এবং (ইবো জাতির ক্ষেত্রে) ধর্মীয় গণক ও "গোপন সংস্থা"। উভয় জাতিই ছিল দক্ষ কৃষিজীবী ও লোহার কর্মী। আর ইবো জাতি অন্তত নবম খ্রিষ্টীয় শতাব্দী থেকেই পিতল ও ব্রোঞ্জের পণ্য প্রস্তুত করে আসছে।

তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সার্বিকভাবে বৃহত্তর আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোই সবচেয়ে কার্যকর রাজনৈতিক কাঠামোর অধিকারী ছিল। সেইসাথে তাদের খাদ্য, পোশাক, খনিজ সম্পদ, ও অন্যান্য হস্তনির্মিত বস্তু উৎপাদনের সক্ষমতাও ছিল বেশি। যেসব সমাজে শাসক শ্রেণী ছিল, সেসব সমাজ মূলত বিলাসিতা ও সম্মানসূচক জিনিস অর্জনে ব্যস্ত ছিল। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণকারী সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলো চাইত, যেন পণ্য তৈরিকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি ব্যবসার মাধ্যমেও সেগুলো অর্জন করা যায়। শাসক শ্রেণী তাড়া দিতে শুরু করেছিল বলেই শ্রমের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদন করা হয়, যা নিতান্ত বেঁচে থাকার চাহিদা মেটানোর চেয়ে বেশি। আর এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই তারা বিশেষ দক্ষতা ও শ্রমবিভাজনকে উৎসাহিত করে।

বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই রাষ্ট্রের অধিকারী ও "রাষ্ট্রবিহীন" আফ্রিকান গোষ্ঠীর মাঝে পার্থক্য করেন। মাঝেমাঝে তো "রাষ্ট্রবিহীন" কথাটি একদম এলোপাতাড়ি বা এমনকি দোষারোপের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু জনগোষ্ঠীতে পরিবার বা গ্রামের চেয়ে বৃহত্তর কোনো রাজনৈতিক এককের ধারণাটাই ছিল না। ছিল না গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর সরকারি পর্যায় থেকে বলপ্রয়োগের মতো কোনো কাঠামো। রাষ্ট্রধারী-রাষ্ট্রবিহীন বিভাজনে এসকল জনগোষ্ঠীর কথা উঠেই আসে না। সমাজে যদি শ্রেণীবিভেদই না থাকে, তাহলে তো রাষ্ট্রও থাকবে না। কারণ রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে নির্দিষ্ট কারণে। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী তাদের স্বার্থ রক্ষা

করার জন্য সমাজের বাকিদের নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। এরই উপকরণ হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে রাষ্ট্র। সাধারণভাবে বললে, আফ্রিকার রাষ্ট্রবিহীন সমাজগুলোকে প্রাচীনতর সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়। আর বড় রাষ্ট্রগুলো ছিল গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সামনে বিবর্তিত হওয়ার উদাহরণ, যেগুলো কিছু ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

আবারও একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। ইউরোপীয়দের আগমনের আগেকার আফ্রিকাকে পর্যবেক্ষণ করলে উন্নয়নের অসমতা বেশ উল্লেখযোগ্য হারে চোখে পড়বে। দেখা যাবে শিকারি দল, গোষ্ঠীতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, এবং শেষোক্ত দুটির মধ্যবর্তী অনেক ধাপ। এই পরিচ্ছেদের বাকি অংশের আলোচ্য বিষয় হবে আফ্রিকার সবচেয়ে উন্নত কিছু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা। ইউরোপের স্থায়ী সংস্পর্শে আসার আগের প্রায় এক হাজার বছরে এগুলোর উদ্ভব ঘটেছে আফ্রিকাতে। আলোচ্য অঞ্চলগুলো হলো মিশর, ইথিওপিয়া, নুবিয়া, মরক্কো, পশ্চিম সুদান, পূর্ব আফ্রিকার হ্রদঘেরা অঞ্চল, এবং জিম্বাবুয়ে। অতীতের আফ্রিকাতে উন্নয়নের মানে কী ছিল এবং সামাজিক অগ্রযাত্রার অভিমুখ কোনদিকে ছিল—উল্লিখিত অঞ্চলগুলো তারই একেকটি উদাহরণ।

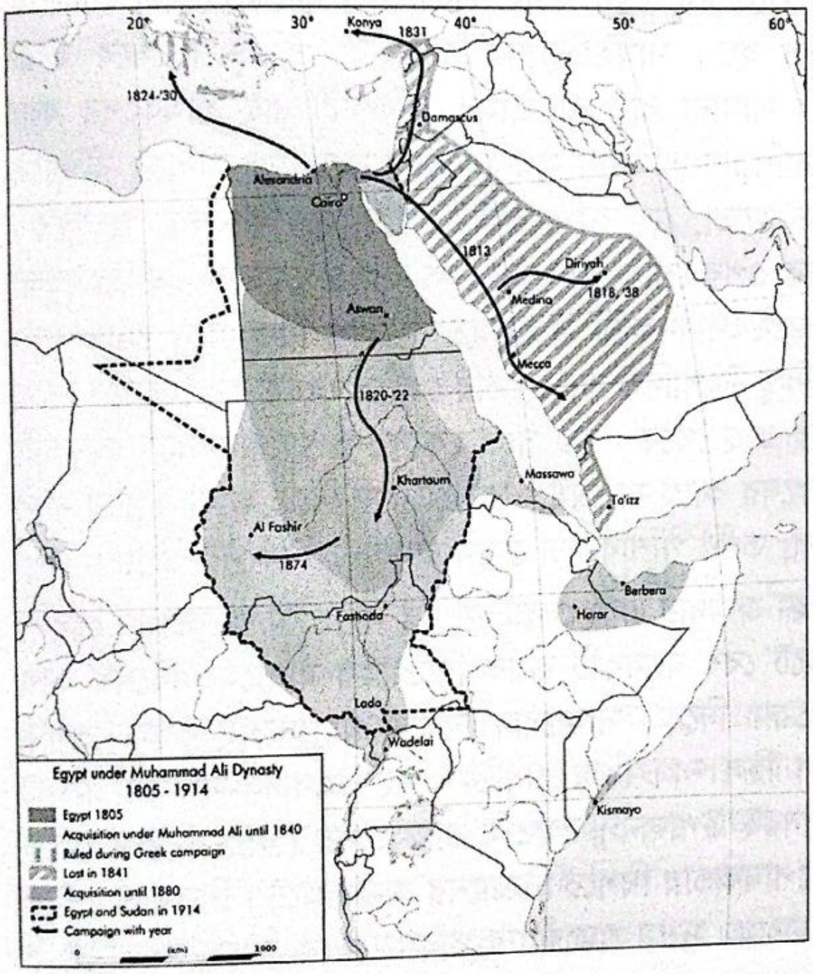
প্রতিটিই আবার ছিল বিভিন্ন মাত্রায় এই মহাদেশের নেতৃস্থানীয় শক্তি। নেতৃস্থানীয় এই অর্থে যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদেরও নিজেদের সাথে করে নিয়ে সামনে এগিয়েছে। সেটা ওই প্রতিবেশীদের গ্রাস করে ফেলার মাধ্যমে হোক, অথবা আরও পরোক্ষ উপায়ে প্রভাবিত করার মাধ্যমে হোক।

কিছু বাস্তব উদাহরণ

মিশর

মিশরকে দিয়ে শুরু করাটাই যৌক্তিক, কারণ এটি প্রাচীনতম বিখ্যাত আফ্রিকান সংস্কৃতি। ফারাওদের অধীনে মিশরের দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এককালে বলা বা ধারণা করা হতো যে, প্রাচীন মিশর আসলে "আফ্রিকান" ছিল না। অবশ্য এই মতটি এখন আর কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তবে আমাদের আলোচনার যে উদ্দেশ্য, তার সাথে বেশি প্রাসঙ্গিক হলো আরব ও তুর্কি শাসনাধীন মিশর। সপ্তম শতাব্দী থেকে এর সূচনা। এই সময়কালে শাসক শ্রেণী ছিল বিদেশি। তার মানে মিশরের

অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অন্যান্য দেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, বিশেষ করে আরব ও তুরস্কের সাথে। উপনিবেশায়িত মিশর খাদ্য ও রাজস্ব আকারে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিদেশে পাঠিয়ে দিত। এটা খুবই নেতিবাচক একটি বিষয়। কিন্তু বিদেশি এই শাসকদের মূল প্রবণতা ছিল, তাদের ঊর্ধ্বতন সম্রাটের অধীনতা থেকে কোনোক্রমে মুক্ত হয়ে যাওয়া। মিশরের ভেতরেই অভিজাত শাসকশ্রেণী হয়ে থাকাটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ফলে মিশর হয়ে ওঠে স্বাধীন সামন্তবাদী একটি রাষ্ট্র।



সামন্তবাদের যেসব বৈশিষ্ট্য মিশরে আগমন করে, তার মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে সামরিক দিকটি। আরব, তুর্কি, ও সিরকাসিয়ান হানাদাররা সকলেই ছিল সামরিক প্রবণতার অধিকারী। মামলুকদের ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যারা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্ষমতার অধিকারী হয়।

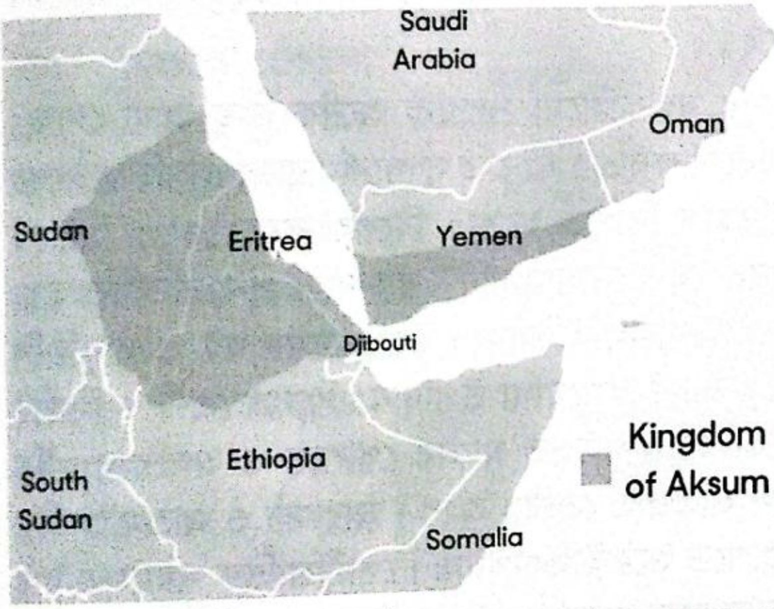
সপ্তম শতাব্দী থেকে মিশরের রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল সামরিক অভিজাতদের হাতে, যারা আসল প্রশাসনের দায়িত্ব আমলাদের হাতে হস্তান্তরিত করে। ফলে সৃষ্টি হয় চীন বা ইন্দোচীনের অনুরূপ পরিস্থিতি। এর চেয়েও বড় মৌলিক পরিবর্তন আসে জমির অধিকারভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এর ফলে দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটে সত্যিকারের এক সামন্ত শ্রেণীর। সকল বিজেতা তাদের অনুসারী ও সামরিক অধিনায়কদের জমি প্রদান করে। শুরুতে মিশরে

জমি ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, যা কৃষকদের ভাড়া দেওয়া হতো। ওই জমি পুনরায় অধিগ্রহণ করে অন্য কাউকে প্রদান করার অধিকারও ছিল রাষ্ট্রের। গ্রাম্য সমাজের নেতা যেমন আত্মীয়তাবিশিষ্ট পরিবারগুলোর জমিজমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে, সেরকম। কিন্তু সামরিক শাসক ব্যক্তিরাও জমিদারদের নতুন শ্রেণীতে পরিণত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী আসতে আসতে মিশরের বেশির ভাগ ভূমির মালিক হয়ে যায় সুলতান ও তার সামরিক নেতারা।

ছোট একটি শ্রেণী যদি বেশির ভাগ জমি কুক্ষিগত করে রাখে, তাহলে জমিহীন বিশাল এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটাই স্বাভাবিক। কৃষক প্রজারা অচিরেই কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। সামন্তপ্রভুদের প্রজা বা প্রতিভূ হিসেবে তারা জমির সাথে বাঁধা। সামান্য বা শূন্য জমির অধিকারী এই শ্রমিকদের বলা হতো ফেল্লাহিন। রাশিয়ার ভূমিদাস মুযহিকরা সামন্ততন্ত্রের অধীনে কীভাবে নিষ্পেষিত-নিপীড়িত হতো, সে ব্যাপারে ইউরোপে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। মিশরে ফেল্লাহিনদের ওপর শোষণের মাত্রা ছিল আরও ভয়ানক। সামন্তপ্রভুরা ফেল্লাহিনদের রাজস্ব উৎপাদনকারী সত্তার চেয়ে বেশি কিছু মনে করত না। এসকল শ্রমিক যা কিছু উৎপাদিত করত, তার বেশির ভাগই কর হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতো তাদের কাছ থেকে। কর সংগ্রাহকদের ওপর আরেকটি জাদুকরী দায়িত্ব ছিল। শ্রমিকদের কাছে যা নেই, সেটাও নিয়ে নিতে হবে! তাদের দাবি যখন পূরণ হতো না, তখন পাশবিকতা নেমে আসত শ্রমিকদের ওপর।

সামন্তবাদী যোদ্ধা জমিদার এবং ফেল্লাহিনদের মাঝে যে শত্রুতাপূর্ণ দ্বৈরথ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বেশ কয়েকটি কৃষক-বিদ্রোহের মাধ্যমে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। সামন্তবাদ কোনো মহাদেশেই কৃষক শ্রেণীর জন্য আনন্দের যুগ ছিল না। কিন্তু প্রযুক্তি এবং উৎপাদন-সক্ষমতা ঠিকই বেড়েছে, যা উন্নয়নেরই উপাদান। ফাতিমি রাজবংশের (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরে বিজ্ঞানের স্ফূরণ ঘটে। শিল্পখাত পৌঁছে যায় এক নতুন উচ্চতায়। দশম শতাব্দীতে পারস্য থেকে আসে উইন্ডমিল ও ওয়াটারহুইলের ধারণা। নতুন নতুন শিল্প প্রবর্তিত হয়—কাগজ তৈরি, চিনি পরিশোধন, চীনামাটি, এবং গ্যাসোলিনের পাতন। তৈরি-পোশাক, চামড়া, ও ধাতুর পুরাতন শিল্পগুলোর উন্নতি ঘটে। পরবর্তী আইয়ূবী ও মামলুক রাজবংশদ্বয়ের অর্জনও প্রচুর। বিশেষত খাল, বাধ, সেতু, ও কৃত্রিম নালা নির্মাণ, এবং ইউরোপের সাথে বাণিজ্য ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে। মিশর তখনো ইউরোপকে অনেক কিছু শেখাতে সক্ষম। বিনিময়ে নতুন নতুন কৌশল শেখার জন্য যথেষ্ট নমনীয়ও।

সামন্ততন্ত্র যদিও জমিভিত্তিক, তারপরও এটি সাধারণত গ্রামাঞ্চল কমিয়ে নগর গড়ে তোলার কাজ করে। মিশরীয় সামন্তবাদী সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সময়গুলো নগর নির্মাণের কারণে সুপরিচিত। ফাতিমিরা কায়রোর গোড়াপত্তন করে, যা বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বধারী শহরে পরিণত হয়। একই সময়ে তারা প্রতিষ্ঠিত করে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আজও এটি টিকে আছে। এটা ঠিক যে, সামন্তপ্রভু ও ধনাঢ্য বণিকরাই উপকৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার কারিগর ও অন্য অধিবাসীরাও কিছু মাত্রায় শহরের আরামদায়ক জীবনের অংশীদার হতে পেরেছে।



ইথিওপিয়া

পরাশক্তি হিসেবে ইথিওপিয়ার ইতিহাসের শুরুটাও হয়েছে বিদেশি শাসনের মাধ্যমে। যেসকল কেন্দ্রকে ঘিরে কালক্রমে সামন্তবাদী ইথিওপিয়ার আবির্ভাব ঘটে, তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আকসুম রাজ্য। আকসুম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লোহিত সাগরের উপকূলের কাছে। সাগরের অপর পাড় থেকে সাবিয়ান বংশোদ্ভূত এক রাজবংশ এটির গোড়াপত্তন করে। কিন্তু আকসুমের রাজারা কখনোই বিদেশি শক্তির প্রতিনিধি ছিল না। পুরোপুরি আফ্রিকায়িত হয়ে যায় তারা। আকসুমের প্রতিষ্ঠাকাল প্রথম খ্রিষ্টীয় শতাব্দী। এর শাসক শ্রেণী অল্প কয়েক শতাব্দীর মাঝেই খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর তারা দেশটির ভেতর দিকে ঢুকে পড়ে এবং খ্রিষ্টান সামন্তবাদী ইথিওপিয়া রাষ্ট্রের বিকাশে অংশ নেয়।

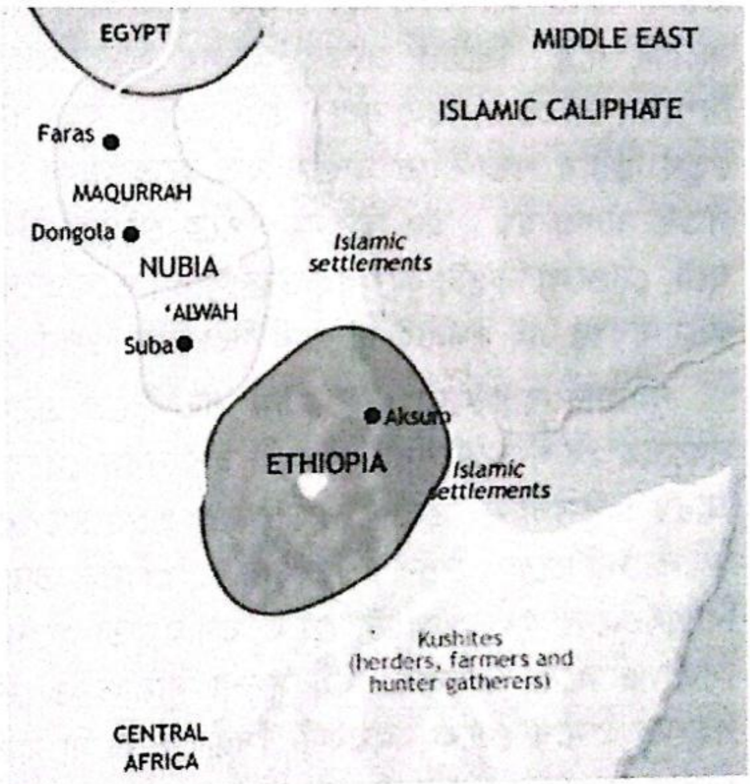
ইথিওপিয়ান, টাইগ্রিয়ান, ও আমহারিক শাসক শ্রেণী সগর্বে নিজেদের সোলায়মানের বংশধর হিসেবে দাবি করে। রাষ্ট্র হিসেবে এটি নিজের ভেতর আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র ও রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তাই সামন্তবাদী অস্ট্রিয়া বা প্রুশিয়াকে যে অর্থে সাম্রাজ্য বলা হয়, তা ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রেও

খাটে। "ইয়াহুদা গোত্রের বিজয়ী সিংহ, ঈশ্বরের মনোনীত, ইথিওপিয়ার সম্রাট, রাজাধিরাজ" বলে সম্বোধন করা হতো ইথিওপিয়ার সম্রাটকে। কিন্তু বাস্তবে তাদের "সোলায়মানি" বংশধারা অবিচ্ছিন্ন ছিল না। দ্বাদশ শতকে ইথিওপিয়া মালভূমির বেশির ভাগ অংশকে সুসংহত করার কাজটি করে এক হানাদার রাজবংশ যাগওয়ে। তারা মূসার বংশধর দাবিদার। যাগওয়ে রাজারা পাথর কেটে বেশ কয়েকটি গির্জা তৈরি করে বিশিষ্টতা অর্জন করে। স্থাপত্যবিদ্যার এসকল অর্জন থেকে বোঝা যায়, ইথিওপিয়া তখন কী পরিমাণ দক্ষতার অধিকারী ছিল। আরও বোঝা যায়, রাষ্ট্র হিসেবে এটি কত বিপুল পরিমাণ শ্রমের আদেশ দিতে সক্ষম। এত বড় বড় কাজ কোনো পরিবারের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। বরং গোটা একটি শ্রেণীকে শোষণের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়েছে।

ইথিওপিয়ান সাম্রাজ্যের মহাকাঠামো সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। বিশেষত এর খ্রিষ্টান ধর্ম এবং সাক্ষরতার সংস্কৃতি সম্পর্কে। রাজা ও অভিজাতদের স্তুতি করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস লিখিত হতো। বিশেষ করে ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে যাগওয়ে-কে উৎখাত করে যে "সোলায়মানি" রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের অধীনে রচিত হতো এসকল ইতিহাস। উন্নতমানের বই ও পাণ্ডুলিপি হয়ে ওঠে আমহারিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান। শাসক শ্রেণী ও গির্জার জন্য উৎপাদিত করা হতো অনুরূপ উন্নত মানের পোশাক ও অলংকার। উঁচু পর্যায়ের ধর্মযাজকরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর অংশ। আর মঠ ও আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিপুল পরিমাণে গড়ে ওঠে ইথিওপিয়ায়। গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজেও রাষ্ট্র এবং সুসংগঠিত ধর্ম পরোক্ষভাবে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মাঝে তেমন পার্থক্য করা হতো না। সামন্ততন্ত্রের অধীনে সব জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর রাষ্ট্রের মাঝে ছিল ঘনিষ্ঠ মিত্রতা। সামন্তবাদী ভিয়েতনাম, বার্মা, ও জাপানে বৌদ্ধরা ছিল বেশি প্রভাবশালী। চীনের ক্ষেত্রেও কিছু মাত্রায় এ কথা প্রযোজ্য। ভারতে সীমিত বৌদ্ধ প্রভাবকে গ্রাস করে ফেলে হিন্দু ও মুসলিমদের প্রতিপত্তি। আর সামন্তবাদী ইউরোপে ক্যাথোলিক চার্চ যে ভূমিকা পালন করত, ইথিওপিয়ায় সেই ভূমিকাতেই থাকে অর্থোডক্স চার্চ।

ইথিওপিয়ার সম্পদ আসত একটি কৃষিনির্ভর ভিত্তি থেকে। উর্বর উচ্চভূমি সিরিয়াল উৎপাদনের উপযোগী। তার সাথে ছিল ঘোড়া-সহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রাণীসম্পদ। বেশ কিছু পরিমণ্ডলে কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ঘটে। বিদেশি কারিগরদেরও উৎসাহ জোগানো হয়। যেমন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তুর্কি কারিগররা এসে এ দেশে স্থায়ী হয়। ইথিওপিয়ান সেনাবাহিনীর

জন্য বর্ম ও অস্ত্র তৈরি করত তারা। মিশর থেকে কপ্টিকদেরও নিয়ে আসা হয় অর্থব্যবস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য। ওই শতাব্দীগুলোতে যে ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রে "সামন্ততান্ত্রিক" শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। কারণ জমিদার ও কৃষকদের মাঝে সেখানে স্পষ্ট একটি শ্রেণীবিভেদ বিরাজমান ছিল। এই সম্পর্কগুলো গড়ে উঠেছে গোষ্ঠীতন্ত্রের পরবর্তী ফলাফল হিসেবে। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের মতো সামন্তবাদের বহু আগে ইথিওপিয়াতেও বিরাজ করত গোষ্ঠীতন্ত্র।



সামন্তবাদী ইথিওপিয়ায় এমন জমি ছিল, যেগুলো কোনো গ্রাম বা নৃগোষ্ঠীর সামষ্টিক মালিকানাধীন। আবার কিছু জমি সরাসরি রাজমালিকানার অধীনে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিজেতা আমহারিক রাজবংশ তাদের রাজপরিবারের সদস্য, সৈনিক ও যাজকদের জমি প্রদান করত। বিশাল পরিমাণ জমি লাভকারীরা হয়ে ওঠে রাস (Ras)[৪], অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসক।

আর তাদের সাথে থাকত সম্রাটের নিয়োগ দেওয়া বিচারকবৃন্দ। তাদের শাসনাঞ্চলের কৃষকরা ভাড়াটে প্রজার পর্যায়ে নেমে যায়। এদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায় জমিদারকে ফসল এবং রাষ্ট্রকে কর (বা ফসল) প্রদান করা। জমিদাররা করের আওতামুক্ত—সামন্তবাদী সমাজে যেমনটা হয় আরকি। ইউরোপে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এটার ফলেই। বুর্জোয়া শ্রেণী যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তারা এই ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে। সামন্তবাদীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে

[৪] ইথিওপিয়ার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি উপাধি। যার মানে "প্রাদেশিক শাসক" বা "গভর্নর"।
—সম্পাদক

নিজেদের ছাড়া বাকি সবার থেকে কর আদায় করছে, এটার বিরোধিতা করে বুর্জোয়ারা। ইথিওপিয়াতে অবশ্য পুঁজিবাদে রূপান্তরের সেই যুগটি কখনোই আসেনি। তবে সামন্তবাদে যে রূপান্তর ঘটেছিল, এতটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট।

নুবিয়া

নুবিয়া ছিল আফ্রিকার আরেকটি খ্রিষ্টান অঞ্চল। কিন্তু ইথিওপিয়ার মতো এটি অতটা নামকরা নয়। ষষ্ঠ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে নীলনদের মাঝামাঝি অঞ্চলে খ্রিষ্টান ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এই জেলাগুলো শাসন করত বিখ্যাত কুশ বা মারোই রাষ্ট্র। খ্রিষ্টের জন্মের আগের সময়টিতে জাঁকজমকের দিক থেকে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কুশ। এটি কয়েক বছর মিশরকে শাসনও করেছিল। চতুর্থ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে সম্প্রসারিত হতে থাকা আকসুমের আক্রমণে কুশের পতন সম্পন্ন হয়। এর কিছুকাল পরে যে তিনটি ছোট নুবিয়ান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, সেগুলো কিছুটা কুশেরই উত্তরসূরি। তবে এদের খ্রিষ্টান হিসেবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর এই ধর্মটিই নুবিয়ান সংস্কৃতির ওপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

নুবিয়ান রাষ্ট্রগুলো (যা অষ্টম শতাব্দীতে ক্রমে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়) সবচেয়ে বেশি অর্জনের অধিকারী হয় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীগুলোতে। আরব ও ইসলামি শত্রুদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপের পরও এসকল অর্জন সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। চতুর্দশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত তারা হার মানেনি। নুবিয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মূল আগ্রহটা যে জায়গায়, তা হলো লাল ইটের বিশাল বিশাল গির্জা ও মঠের ধ্বংসাবশেষ। সুদৃশ্য ম্যুরাল ও দেওয়ালচিত্রে এগুলো ভর্তি। বস্তুগত প্রমাণ থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, ওইসব গির্জা নির্মাণ করতে বিপুল পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন ছিল। এর অনেকগুলোকেই ঘিরে তৈরি করা হয়েছে পাথরের প্রতিরক্ষাব্যূহ। মিশরের পিরামিড ও ইউরোপের সামন্তযুগের দুর্গগুলোর মতো এগুলোর নির্মাতাদেরও নিদারুণভাবে শোষণ করা হয়েছে। আর খুব সম্ভবত বলপ্রয়োগও করা হয়েছে তাদের ওপর। দ্বিতীয়ত, ইট তৈরি ও স্থাপত্য নির্মাণে অত্যন্ত দক্ষ শ্রমের ব্যবহার হয়েছে। চিত্রকর্মগুলো দেখে বোঝা যায়, শুধু শারীরিক দক্ষতা দিয়েই এগুলো করা হয়নি। নুবিয়া থেকে উদ্ধারকৃত নকশাদার মৃৎপাত্রের টুকরোগুলোতেও দেখা যায় একইরকম শিল্পদক্ষতা।

ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে যে, ইথিওপিয়াতে গির্জা ও মঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মঠ ছিল উৎপাদনের একটি প্রধান একক। প্রতিটি মঠকে ঘিরে গড়ে উঠত কৃষকদের অসংখ্য কুঁড়েঘর। তাই ইউরোপের

জমিদারদের প্রাসাদের মতোই কাজ করে এগুলো। গির্জার ভেতর জড়ো করা সব সম্পদের সাথে কৃষকরা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। ওদিকে অবস্তুগত সংস্কৃতির সবচেয়ে অসাধারণ বিষয়গুলো (যেমন, বই) থাকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতের নাগালে। কৃষকরা শুধু নিরক্ষরই ছিল না, বহু ক্ষেত্রেই তারা ছিল অ-খ্রিষ্টান বা নামেমাত্র খ্রিষ্টান। ওই সময়কার ইথিওপিয়ান উদাহরণগুলোর সাথে তুলনা করলে এই বাস্তবতাই উঠে আসে। মুসলিমরা এসে যখন নুবিয়ার খ্রিষ্টান শাসক শ্রেণীকে হটিয়ে দেয়, তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বুনটে আগেকার রাষ্ট্রের কোনো উপাদানই অবশিষ্ট থাকেনি। মানবজাতির অভিজ্ঞতায় ইতিহাসের স্রোত এরকম উলটোদিকে ঘুরে যাওয়ার উদাহরণ নেহাত কম নয়। শেষমেশ উন্নয়নই হবে বটে, তবে মাঝখানে কিছু জোয়ার-ভাটার সংঘটন অনিবার্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর নুবিয়ান রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্ব থাকেনি। কিন্তু আফ্রিকান উন্নয়নের সক্ষমতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

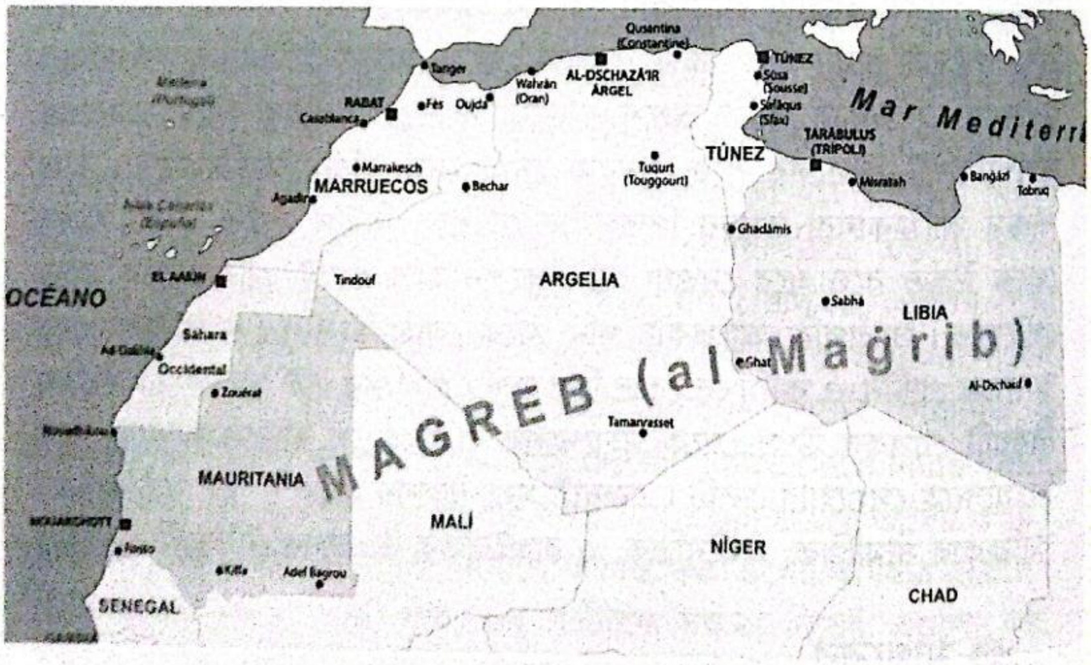
এর চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আরেকটি দাবি করা যায়। কুশ রাজ্য যখন অবক্ষয়ের শিকার হয় এবং খ্রিষ্টান নুবিয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়, এর বহুকাল পরেও রাজ্যটি আফ্রিকার উন্নয়নে ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে। কুশ স্পষ্টতই এমন এক কেন্দ্র, যেখান থেকে অনেক ইতিবাচক সাংস্কৃতিক উপাদান আফ্রিকার বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। মারোইর সাথে চমকপ্রদ সাদৃশ্যবিশিষ্ট পিতলের কাজ পুনরায় দেখা দেয় পশ্চিম আফ্রিকাতে। আর পশ্চিম আফ্রিকানরা তাদের পিতল যে কৌশলে নির্মাণ করত, সেটি মিশর থেকে উদ্ভূত বলে ধরে নেওয়া হয়। কুশের হাত হয়েই এটি তাদের কাছে পৌঁছেছে। সর্বোপরি, আফ্রিকায় খনি থেকে লোহা উত্তোলন ও পরিশোধনের অন্যতম প্রাচীন ও কর্মমুখর কেন্দ্র ছিল কুশ। প্রযুক্তির এই অত্যন্ত তাৎপর্যময় বিষয়টি যেসকল উৎস থেকে মহাদেশের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়েছে, কুশ নিঃসন্দেহে সেগুলোর একটি। এজন্যই মধ্য-নীলনদ অঞ্চলটি ছিল সার্বিকভাবে আফ্রিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক উন্নয়নের নেতৃস্থানীয় শক্তি।

মাগরেব

নবি মুহাম্মাদ যখন সপ্তম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে মারা যান, তার কয়েক বছরের মধ্যেই আফ্রিকা, এশিয়া, ও ইউরোপে বিস্তৃত হয়ে যায় ইসলামি সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তটি মাগরেব নামে পরিচিত। মাগরেবে সামন্ততান্ত্রিক উন্নয়নের যুগে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে যে "আসমানি" ধর্ম, তা হলো

ইসলাম। সাম্রাজ্য নির্মাণে ধর্মের যে ভূমিকা, ইসলামের পতাকাতলে আরবের কার্যক্রম তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইবনু খালদুন চতুর্দশ শতাব্দীর একজন উত্তর আফ্রিকান ইতিহাসবিদ। তার মতে, এককালে আরবরা নিজেদের মাঝে ক্রমাগত ঠোকাঠুকিতে লিপ্ত ছিল। ইসলামের কারণেই ছোট পরিবারভিত্তিক সমাজের সংকীর্ণ সীমানাকে তারা ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে। তিনি লিখেছেন:

> আরবীয় গৌরব, জাত্যাভিমান ও ক্ষমতার প্রতি প্রচণ্ড ঈর্ষার কারণে তাদের পক্ষে কোনো বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব। যখন তাদের স্বভাবপ্রকৃতিতে একটি ধর্মীয় তাড়না প্রবেশ করে, কেবল তখনই গিয়ে তাদের মাঝে পরিবর্তন আসে। ফলে নৈরাজ্যের প্রবণতাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে আসে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার এক চেতনা। ধর্ম যখন তাদের নীতিমালার মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, সেটি তাদের একটি একক ধর্মীয় আইনবিধান মানতে বাধ্য করে। এই বিধানের উদ্দেশ্যই হলো সভ্যতার নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থকে উৎসাহিত করা। নবিজির [মুহাম্মাদের] কয়েকজন প্রতিনিধির [খলিফার] শাসনকালেই দেখুন তাদের সাম্রাজ্য কতটা সুবিস্তৃত হয়ে গেছে এবং কতটা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।



ইবনু খালদুনের উপর্যুক্ত মন্তব্যে আরব সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের কেবল একটি দিক উঠে এসেছে। তবে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মতাদর্শের যে আবশ্যিক ভূমিকা, তা তুলে ধরা হয়েছে এখানে। তবে সেটাকে বিবেচনা করতে হবে বস্তুগত অবস্থার সাপেক্ষে এবং সহকারে। উৎপাদনের আরও বেশি সম্প্রসারণ এবং সমাজের শক্তি আরও বৃদ্ধি করার ভিত্তি হিসেবে

কাজ করতে পারে ওই সময়কার বস্তুগত অবস্থা। এই অবস্থাটিকে পর্যালোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক ধারাকেও বিবেচনায় নিতে হবে। ইসলামি রাজবংশ-শাসিত মাগরেব এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরি, যেমনটি ছিল ইসলামি মিশর ও খ্রিষ্টান নুবিয়া। মাগরেব একসময়কার কার্থেজ সমাজের আবাসস্থল, যা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল ১২০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রিষ্টপূর্বের মধ্যবর্তী সময়ে। কার্থেজ ছিল ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচ্যের বিদেশি প্রভাব এবং মাগরেবের বার্বারদের এক সংমিশ্রণ। অঞ্চলটি পরবর্তীকালে রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। মুসলিম হওয়ার আগে মাগরেব একটি অসনাতন খ্রিষ্টান ধারার কেন্দ্র হিসেবে অনন্য হয়ে ওঠে, যে ধারাটির নাম ছিল ডোনেটিজম।

নৌপথ, সামরিক, বাণিজ্যিক, ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মুসলিম মাগরেবের চমকপ্রদ সব অর্জন। তাদের নৌবাহিনী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াত। আর তাদের সেনাবাহিনী পর্তুগাল ও স্পেনের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেয়। ইউরোপে মুসলিম অগ্রযাত্রা যখন ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিহত হয়ে যায়, ততদিনে ফ্রান্সের বেশ ভেতরে ঢুকে পড়েছে উত্তর আফ্রিকান সেনারা।

আল-মুরাবিতুন রাজবংশ একাদশ শতাব্দীতে সেনেগাল ও মৌরিতানিয়ার অভ্যন্তর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। তারপর জিব্রাল্টার প্রণালীতে হামলা করে স্পেনে ইসলাম পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে, যেটি তখন ছিল খ্রিষ্টান রাজাদের হুমকির সম্মুখীন। প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ উত্তর আফ্রিকা ও ইবেরিয়ার আল-মুরাবিতুন শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্যিক সম্পদের ছড়াছড়ি এবং ঝলমলে সাহিত্যিক ও স্থাপত্যগত অর্জন। স্পেন থেকে ১২৩০-এর দশকে উৎখাত হওয়ার পর মাগরেবি মুসলিমরা (যাদের আরেক নাম ছিল মুর) আফ্রিকান মাটিতে এক গতিশীল সমাজজীবন অব্যাহত রাখে। মাগরেবের শহরগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল হাম্মামখানা, যেগুলোকে সামাজিক জীবনমানের একটি সূচক হিসেবে ধরা যায়। ওদিকে অক্সফোর্ডে তখনো মানুষ বিশ্বাস করত যে, শরীর পরিষ্কার করা একটি বিপজ্জনক কাজ।

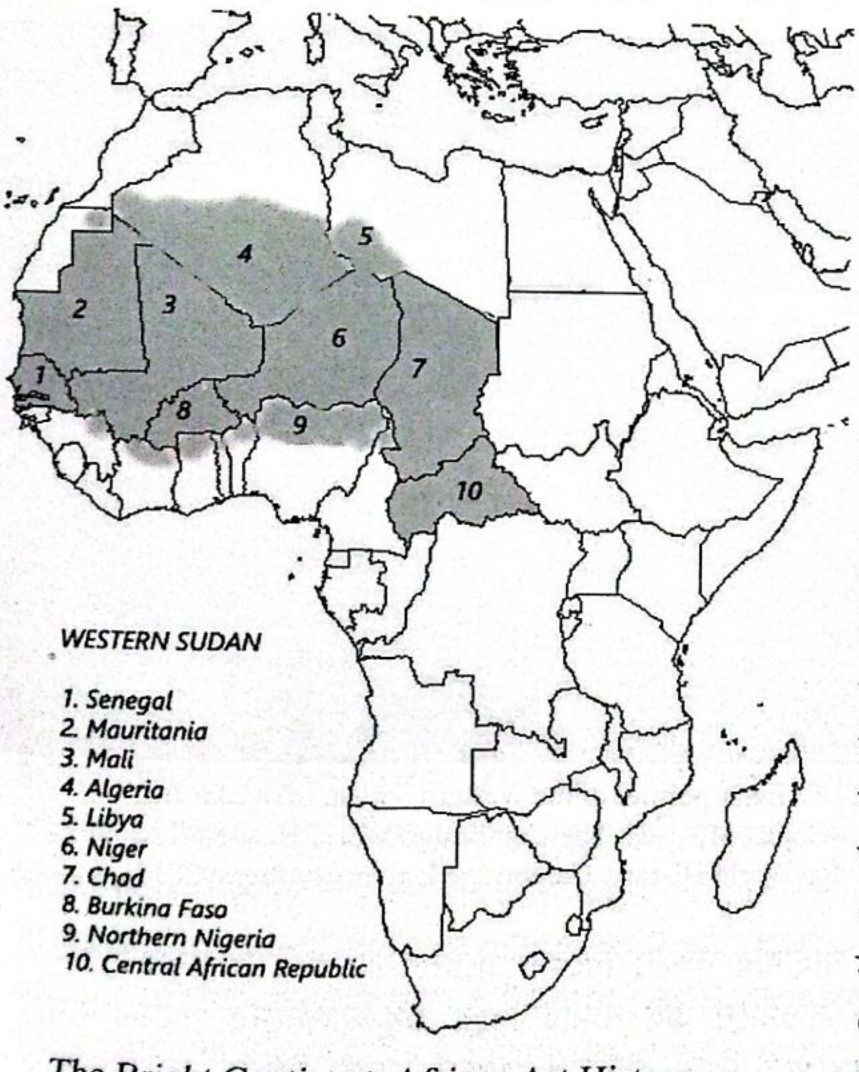
মাগরেবের ইতিহাসের অন্যতম একটি শিক্ষণীয় দিক হলো, সামাজিক সংগঠনের মিথস্ক্রিয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব। একটা বড় সমস্যা ছিল বিচ্ছিন্ন বার্বার দলগুলোকে এক করে বৃহত্তর রাজনৈতিক গোষ্ঠী নির্মাণ করা। তা ছাড়া থিতু জনগোষ্ঠী এবং যাযাবর পশুপালক মানুষদের মাঝেও বেশ দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল।

বার্বাররা ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক গোত্রে বসবাসকারী পশুপালক দল। এই গোত্রগুলো মিলে আবার তৈরি হতো গোত্রসমষ্টি। গোত্রসমষ্টিগুলোর সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নিয়ে গঠিত হতো একটি গণতান্ত্রিক পরিষদ। পশুচারণভূমি ছিল সামষ্টিক মালিকানাধীন। সেচকর্ম সম্পাদন করাও কৃষিজীবীদের সামষ্টিক দায়িত্ব। তারপরও আত্মীয়গোষ্ঠীর মাঝে সহযোগিতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল রক্তসম্পর্কবিহীন মানুষদের মাঝে শত্রুতা। আরব হানাদারদের আক্রমণের মুখেই অবশেষে ঐক্য গড়ে তোলে বার্বাররা। এর ভিত্তি হিসেবে তারা একটি অসনাতন খারিজি ইসলামি মতাদর্শকে ব্যবহার করে। খ্রিষ্টীয় ৭৩৯ সালের খারিজি বিদ্রোহকে এক দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী ধরা যায়। আবার আরেক দিক দিয়ে এটি সনাতন সুন্নি ইসলামের অনুসারী আরব সামরিক, আমলাতান্ত্রিক, ও ধর্মীয় অভিজাতদের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর বিদ্রোহ। বার্বার জনগণের এই বিদ্রোহ মরোক্কান জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়ে দেয়। তিন শতাব্দী পর আল-মুওয়াহহিদ রাজবংশ (১১৪৭-১২৭০) গোটা মাগরেবে রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে আসে। এটি ছিল রাষ্ট্রনির্মাণের ক্ষেত্রে বার্বার ও আরবদের অর্জনের সমন্বিত ফলাফল।

দুর্ভাগ্যবশত, মাগরেব জাতি বেশিদিন টেকেনি। এর বদলে অঞ্চলটি তিনটি জাতিরাষ্ট্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়—মরক্কো, আলজেরিয়া, ও তিউনিসিয়া। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই তিনটি অঞ্চলেই বিভেদের প্রবণতা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যেমন, তিউনিসিয়ার শাসক হাবশি রাজবংশ একের পর এক স্থানীয় বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করার কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত। আগেই বলা হয়েছে যে, আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের রাজনৈতিক রাষ্ট্রগুলো ছিল উৎপাদন শক্তির উন্নয়নের ফলাফল। কিন্তু এরপর রাষ্ট্রও আবার অর্থনীতির অগ্রগতির হার নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ এই দুটি উপাদানের মাঝে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মাগরেব যে একটি জাতিরাষ্ট্র তৈরি করতে পারল না এবং মরক্কো, আলজেরিয়া, ও তিউনিসিয়াতেও রাষ্ট্রশক্তি সুসংহত হতে পারল না—এই দুটি কারণে অঞ্চলটির আরও উন্নতি ব্যাহত হয়। তা ছাড়া রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে বিদেশি শত্রুদের সাপেক্ষে মাগরেব দুর্বল হয়ে পড়ে। অচিরেই এসব অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৪১৫ সাল থেকে আক্রমণ শুরু করতে চলেছে ইউরোপ।

মাগরেবের এই অভিজ্ঞতা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, উৎপাদনের একটি ধরন থেকে আরেক ধরনে রূপান্তর এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস কয়েক শতাব্দী জুড়েও পরস্পর সহাবস্থান করতে পারে। যেই সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তার

পুরোটা জুড়ে আফ্রিকার বহু অংশে সামষ্টিক মালিকানা ও পারিবারিক শ্রমের নীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এরই মাঝে তৈরি হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাস। আবির্ভূত হয়েছে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন একাধিক শ্রেণী। এই সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপে ছিল দাস বা হাররাতিন। তাদের অধিকাংশই সাহারার দক্ষিণের কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। এদের ওপরে রয়েছে আখাম বা জমিহীন শ্রমিক। তারা জমিদারদের জমিতে কাজ করত এবং মোট উৎপাদনের চার-পঞ্চমাংশ তাদের দিয়ে দিতে বাধ্য ছিল। নারীদের অবস্থান আলাদাভাবে উল্লেখিত হওয়ার দাবিদার। তারা নিজেরা কোনো শ্রেণী না। কিন্তু নিজের শ্রেণীর পুরুষ এবং পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত শাসক শ্রেণীর হাতে বঞ্চনার শিকার হতো তারা। তাই আখাম শ্রেণীর নারীদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। সমাজের উচ্চতম ধাপে ছিল বড় জমিদাররা। ইসলাম ধর্মের অন্যান্য সেবকের পাশাপাশি এরাও ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী।

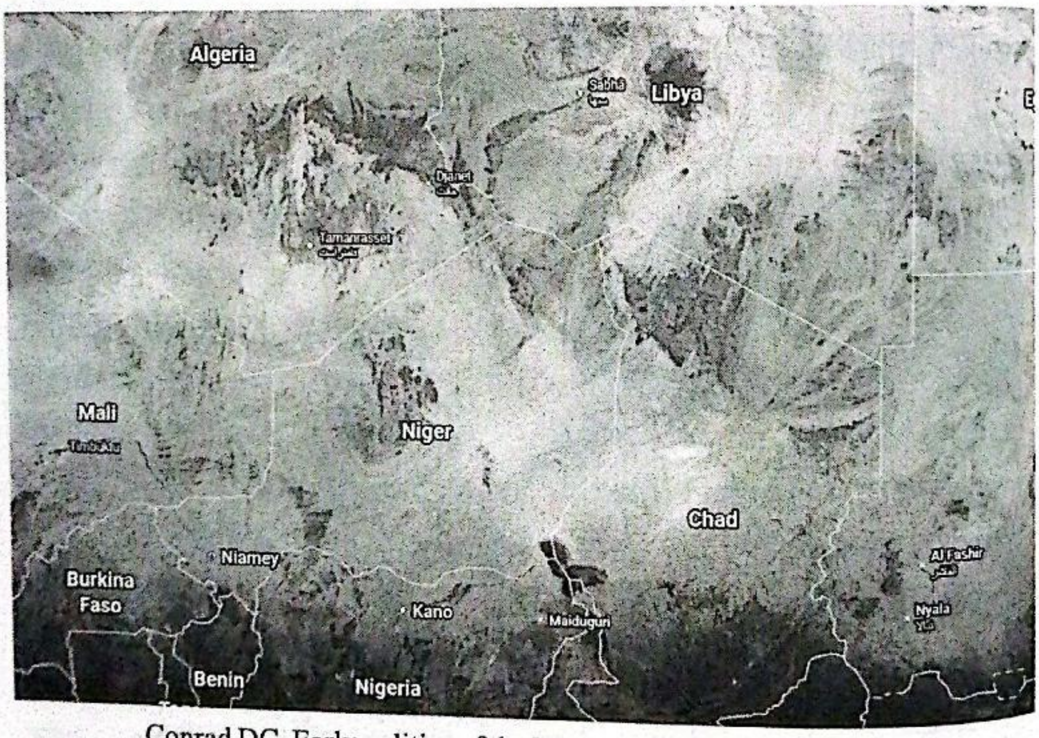


The Bright Continent: African Art History
by Kathy Curnow

এ পর্যন্ত আলোচিত কোনো আফ্রিকান সমাজই ওই অর্থে পুঁজিবাদের সূচনা ঘটায়নি, যেখানে পুঁজি সঞ্চয় করাটাই প্রধান উদ্দীপক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তাদের সকলেরই ছিল প্রাচুর্যময় বাণিজ্য খাত, অর্থ ঋণদাতা, এবং মজবুত হস্তশিল্প। এসকল বৈশিষ্ট্যই শেষমেশ আধুনিক

পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে বিবর্তন ও বিপ্লবের মাধ্যমে। মাগরেবের ব্যবসায়ীরা ছিল বেশ ধনাঢ্য। কৃষিজীবী, পশুপালক, ও রাখালদের শক্তি থেকে তারা লাভবান হতো। তামা, সীসা, অ্যান্টিমোনি, ও লোহার খনিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা শ্রমের নিয়োগ ঘটিয়েছে। তৈরি-পোশাক, মাদুর, চামড়া, মৃৎপাত্র, এবং পিতল ও লোহার জিনিস উৎপাদনকারী কারিগরদের দক্ষতা থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ হস্তগত করত তারা। ব্যবসায়ীরা ছিল জমাকারী শ্রেণী। তাদের কার্যক্রম শুধু মাগরেবেই না, বরং সাহারা ও সাহারা পেরিয়ে পশ্চিম আফ্রিকাতেও প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিম সুদান নামে যে অঞ্চলটি পরিচিত, সেটার উন্নয়নের পেছনেও একদিক দিয়ে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে মাগরেবের উন্নয়ন।

পশ্চিম সুদান



Conrad DC. Early polities of the Western Sudan. In: Kedar BZ, Wiesner-Hanks ME, eds. The Cambridge World History. The Cambridge World History. Cambridge University Press; 2015

আরবদের কাছে সাহারার দক্ষিণ দিকের পুরো আফ্রিকাই বিলাদুস সুদান— কালোদের ভূমি। বর্তমানে এই নামটি দিয়ে শুধু নীলনদের পাড়ের সুদান প্রজাতন্ত্রকেই বোঝায়। কিন্তু অতীতে পশ্চিম সুদান বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হতো, সেখানে রয়েছে সেনেগাল, মালি, উচ্চতর ভোল্টা, ও

নাইজার, সেইসাথে মৌরিতানিয়া, গিনি, ও নাইজেরিয়ার একাংশ। অতীত আফ্রিকার অর্জন নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, সেখানে ঘানা, মালি, ও সংঘাইয়ের সুদানি সাম্রাজ্যগুলো হয়ে ওঠে বহুল-ব্যবহৃত কিছু শব্দ। শ্বেতাঙ্গরা আসার আগেও যে আফ্রিকা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ও সামরিক প্রতাপ অর্জন করতে সক্ষম ছিল—এই ব্যাপারটি প্রমাণ করার জন্য আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল শ্বেতাঙ্গরা এই অঞ্চলটিকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু ইতিহাসবিদরা কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দেবেন, তা জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে আফ্রিকার জনগণ চায় "উন্নয়ন" এবং পূর্ণাঙ্গ মুক্তি। পশ্চিম সুদানের ইতিহাস আলোচনার সময়ও এই বিষয়গুলোই মাথায় রাখা উচিত। আফ্রিকার হৃদপিণ্ডে অবস্থিত কিছু রাষ্ট্র যে দুর্দান্ত উন্নতি সাধন করেছিল, তার পেছনে থাকা মূলনীতিগুলোই হবে আমাদের আলোচ্য।

ঘানা সাম্রাজ্যের উদ্ভব পঞ্চম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে। কিন্তু এটি শিখরে আরোহণ করে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। মালির স্বর্ণযুগ ছিল ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী, আর সংঘাইয়ের এর পরের দুটি শতাব্দী। তিনটির অবস্থান ঠিক একই জায়গায় না। আর তিন জায়গার শাসক শ্রেণীর নৃতাত্ত্বিক উদ্ভবও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এদের একে অপরের "উত্তরসূরি রাষ্ট্র" হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এই সবগুলোই মৌলিকভাবে বিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির একই ধারা অনুসরণ করে চলেছে। এদের প্রায়ই অভিহিত করা হয় ব্যবসায়ী রাষ্ট্র বলে। এর ফলে আমরা ভুলেই যাই যে, সেখানকার জনগণের প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল কৃষি। এই এলাকায় ভুট্টার বেশ কিছু প্রজাতির চাষ শুরু হয়।

সেইসাথে ছিল এক জাতের ধান, বেশ কয়েক ধরনের ভোজ্য উদ্ভিদ, এবং অন্তত এক জাতের তুলা। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলক আগেই লোহার সাথে পরিচিত হয়েছে এই অঞ্চলটি। আর তা হলো খ্রিষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী সহস্রাব্দ। লোহার হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে কৃষিও উপকৃত হয়েছে অনুরূপভাবে। পশ্চিম সুদানের উন্মুক্ত স্যাভানা প্রান্তরগুলো প্রাণীসম্পদের জন্যেও ছিল অনুকূল। ফুলানি গোত্রের মতো কিছু গোষ্ঠী ছিল পুরোদমে পশুপালক। তবে এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে প্রাণীসম্পদের সহজলভ্যতার মাত্রা বিভিন্ন রকম। গবাদি পশু ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গৃহপালিত প্রাণী, এর পরেই রয়েছে ছাগল। ঘোড়া, খচ্চর, ও গাধাও পালন করা হতো। অঞ্চলটি ৎসেৎসে মাছিমুক্ত হওয়ার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। এতে আরও বৈচিত্র্য যোগ করে বিশাল নাইজার নদী, যার ফলে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন জেলেদের উদ্ভব ঘটে।

উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো জনসংখ্যা। সেটি এই অঞ্চলে এত

বেশি ঘন হতে পেরেছে খাবারের ক্রমবর্ধমান সহজলভ্যতার কারণে। হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে মূলত কৃষিজ উৎপাদের থেকেই। তুলা চাষের ফলে এত বৈচিত্র্যময় সুতি কাপড় তৈরি হয় যে, একেক ধরনের সুতি কাপড়ের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলত। যেমন ফুতা জাল্লোনের অধুনিত সুতা এবং জেন্নের নীল কাপড়। পশুপালনের ফলে নানারকম পণ্য তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে গবাদি পশু ও ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি হতো জুতা, সামরিক ব্যবহারের জন্য চামড়ার জ্যাকেট, মাদুলির জন্য চামড়ার থলি ইত্যাদি। ঘোড়া ছিল শাসক শ্রেণীর বাহন। যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের আকৃতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এগুলো। আন্তঃপ্রজননের উদ্দেশ্যে উত্তর আফ্রিকা থেকে ঘোড়া আমদানি করা হয়, যেখানে সবচেয়ে ভালো মানের কুলীন আরব ঘোড়া পাওয়া যেত। মালামাল পরিবহনের জন্য অবশ্য বেশি মানানসই ছিল গাধা। উচ্চতর ভোল্টার মসি রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে এসকল মালবাহী পশু উৎপাদনে দক্ষতার অধিকারী ছিল। রাজ্যটি এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বিখ্যাত। সাহারার প্রান্তে সেই ভূমিকা দখল করে উট। এটি উত্তর দিক থেকে আনীত আরও একটি "প্রযুক্তিগত" সম্পদ।

খনি খনন এমন এক জায়গা, যেখানে উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম সুদানের কিছু রাজগোত্র ছিল বিশেষজ্ঞ কামার। যেমন, কান্তে গোত্র। যুদ্ধের মাধ্যমে সীমান্ত সম্প্রসারণ ঘটছিল যে যুগে, সে যুগে লোহার মজুদ এবং লোহার কাজে দক্ষতা ছিল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তা ছাড়া দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পণ্য ছিল লবণ ও স্বর্ণ। উভয়টিই অর্জিত হয় প্রধানত খনি থেকে। লোহা বা স্বর্ণ কোনোটির জোগানই ঘানা অঞ্চলের ভেতর ছিল না। কিন্তু তারা বাণিজ্য ও সীমান্ত-সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ করার উদ্যোগ নেয়। ঘানা তাই উত্তর দিকে সাহারায় আক্রমণ করে।

দশম শতাব্দীর শেষের দিকে গিয়ে বার্বারদের কাছ থেকে আওদাগাস্ত শহরের দখল ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় তারা। মরুভূমিস্থ খনি থেকে আহরিত লবণ আসত এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটিতে। একইভাবে মালি ও সংঘাই চেষ্টা করে তাঘাযার নিয়ন্ত্রণ দখলের জন্য। এটি ছিল লবণ উত্তোলনের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। সংঘাই এই বহুলাকাঙ্ক্ষিত তাঘাযার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয় মরুর বার্বারদের কাছ থেকে। মরক্কোর পক্ষ থেকে অবিরাম বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু বছর তারা এটি ধরে রাখতে সমর্থ হয়। উৎপাদনের বিন্যাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায়শ নজরের আড়ালে থেকে যায়। তা হলো সাহারার তামা খনির ওপর মালি ও সংঘাই উভয়ের মালিকানা।

ঘানার দক্ষিণ দিকে রয়েছে স্বর্ণের দুই গুরুত্বপূর্ণ উৎস উচ্চতর সেনেগাল ও এর করদ ফালেমে। বলা হয় ঘানা স্বর্ণ অর্জন করত "নীরব" বা "বোবা" পদ্ধতিতে বিনিময়ের মাধ্যমে। এর বর্ণনা এরকম :

ব্যবসায়ীরা বড় বড় ঢাক পিটিয়ে স্থানীয় লোকদের আহ্বান করত। উলঙ্গ এই লোকগুলো বাস করত মাটিতে গর্তের ভেতর। নিঃসন্দেহে এসকল গর্ত থেকেই সোনা খুঁড়ত তারা। বিদেশি বণিকদের উপস্থিতিতে তারা এসকল গর্ত থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানাত। বণিকরা তাই নদীর পাড়ে তাদের ব্যবসায়িক মালামাল সাজিয়ে রেখে চলে যেত দৃষ্টির আড়ালে। স্থানীয়রা এরপর গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটা স্তূপের পাশে এক স্তূপ করে স্বর্ণ রেখে চলে যেত। বণিকরা সন্তুষ্ট হলে এই স্বর্ণ নিয়ে ফিরে আসত। ঢাক বাজিয়ে জানিয়ে দিত যে, তাদের লেনদেন শেষ।

ওপরের লাইনগুলোর লেখক ই.ডাব্লিও. বোভিল পশ্চিম সুদানের ওপর ইউরোপের এক কথিত বিশেষজ্ঞ। এর পরে তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিটি শতাব্দীতে নীরব বাণিজ্য বা বোবা লেনদেনই ছিল পশ্চিম সুদানের স্বর্ণ-ব্যবসার পদ্ধতি। একদমই বকওয়াস যাকে বলে। পশ্চিম আফ্রিকায় বোবা লেনদেনের এই গল্প বেশ কয়েকটি বর্ণনায় এসেছে, যার শুরুটা হয়েছে প্রাচীন গ্রিক লেখালেখি থেকে। অপরিচিত লোকদের সংস্পর্শে এসে একটি জাতি প্রথমবার যেভাবে লেনদেনের চেষ্টা করে, সেটারই মোটামুটি এক অনুমান এসকল বর্ণনা। এটি মোটেও স্থায়ী কোনো পদ্ধতি হয়ে ওঠেনি। ঘানার শাসনামলে স্বর্ণখনির দুটি প্রধান অঞ্চল ছিল বাম্বুক ও বুরে।

পশ্চিম সুদান এই দুই জায়গার লোকদের সাথে নিয়মিত ব্যবসায়িক সম্পর্কে গড়ে তোলে। সম্ভবত ঘানা এবং নিশ্চিতভাবে মালি এই দুটি অঞ্চলের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্যের অধিকারী ছিল। সেখানে স্বর্ণের খনন ও বণ্টন হয়ে ওঠে অত্যন্ত জটিল এক প্রক্রিয়া। মালি যেসব শতাব্দীতে প্রতাপশালী ছিল, তখন তারা ট্রান্স-সাহারান স্বর্ণবাণিজ্যের জন্য বর্তমান ঘানার বন থেকে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ আহরণ করা শুরু করে। স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয় সামাল দেওয়ার জন্য বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় এবং শক্তিশালী সব রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। পশ্চিম সুদানের বড় বড় শহর থেকে আগত ব্যবসায়ীদের স্বর্ণ কিনতে হতো ওজনের ভিত্তিতে। এর জন্য ব্যবহার করা হতো বেন্দা নামক ছোট ও সূক্ষ্ম একক।

পর্তুগিজরা যখন গাম্বিয়া নদীতে আসে, তখন নদীর উজানের দিকে সংঘটিত স্বর্ণ বাণিজ্যের একটি ঝলক দেখতে পায় তারা। মান্দিঙ্গা ব্যবসায়ীদের

ব্যবসায়িক নৈপুণ্য দেখে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই ব্যবসায়ীদের সাথে থাকত খুবই সূক্ষ্ম ভারসাম্যপূর্ণ নিক্তি। এগুলো রুপা দিয়ে বাঁধাই করা এবং প্যাঁচানো রেশমের সুতলি থেকে ঝোলানো। সোনার গুঁড়ি ও দলার ওজন করা হতো পিতলের বাটখারা দিয়ে। স্বর্ণ পরিমাপ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজে মান্দিঙ্গাদের দক্ষতার কারণ হলো এই নৃগোষ্ঠীটির মাঝে পেশাদার বণিকদের একটি দল ছিল। এরা সাধারণভাবে দিওউলা নামে পরিচিত। খুব একটা বড়লোক নয় এরা। কিন্তু পশ্চিম সুদানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হাজারো মাইল ভ্রমণ করতে তারা বেশ আগ্রহী। গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, আইভোরি কোস্ট, ও ঘানার উপকূলে বা উপকূলের খুব নিকটেও তারা পৌঁছেছিল। দিওউলাদের লেনদেনকৃত আফ্রিকান পণ্যের তালিকা ছিল বিশাল—আটলান্টিক উপকূল ও সাহারার লবণ; লাইবেরিয়া ও আইভোরি কোস্টের বনের কোলা বাদাম; বর্তমান ঘানার অ্যাকানের স্বর্ণ; হাউসাল্যান্ডের চামড়া; উপকূলের শুঁটকি; বিভিন্ন জেলার এবং বিশেষ করে পশ্চিম সুদানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সুতি কাপড়; বর্তমান গিনির ফুতা জাল্লোনের লোহা; গাম্বিয়ার ঊর্ধ্বাঞ্চলের শ্যে মাখন; এবং আরও এক ঝাঁক স্থানীয় পণ্য। তার ওপর উত্তর আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত পণ্যের লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত ছিল পশ্চিম সুদানের ব্যবসায়ে। বিশেষ করে মিশর ও মাগরেবের কাপড় এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলস্থ কেউটার প্রবাল গুটিকা। তার মানে পশ্চিম সুদানীয় ও ট্রান্স-সাহারান বাণিজ্যের মধ্যে ছিল ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত নানা স্থানের নানা ধরনের দ্রব্য।

সাহারার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দূরপাল্লার বাণিজ্যের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিছু বিশেষজ্ঞ উটকে বলেছেন সাহারার জাহাজ। মরুভূমির দুই দিকে যেসব শহরে উটের কাফেলা ঢুকত, সেগুলোকে বলা হতো "বন্দর"। আসলে ট্রান্স-সাহারান বাণিজ্য অনেকটা মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার মতোই সাফল্য। এই অঞ্চলের বিখ্যাত কিছু শহরকে প্রাণবন্ত করে তোলে এই বাণিজ্য, যেটা স্থানীয় বাণিজ্যের দ্বারা হতো না। এসব শহরের মাঝে রয়েছে ওয়ালাতা, তিম্বুকতু, গাও, ও জেন্নে। সাক্ষর ইসলামি সংস্কৃতিও এর হাত ধরেই আসে। দূরপাল্লার বাণিজ্যের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। মানে কার্যত ওইসব বংশের ক্ষমতা বাড়ে, যারা অভিজাত হিসেবে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের। কিন্তু ট্রান্স-সাহারান বাণিজ্যকেই যদি পশ্চিম সুদানি সাম্রাজ্যগুলো নির্মাণের একমাত্র কারণ হিসেবে দাবি করা হয়, তা হবে এক বিশ্রী অতিসরলীকরণ। ঘানা, মালি, ও সংঘাই গড়ে উঠেছে তাদের নিজেদের পরিবেশ থেকে, এবং তাদের নিজ নিজ জনমানুষের প্রচেষ্টার ফলে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়

পর্যন্ত যাবার পরই তাদের শাসক শ্রেণী দূরপাল্লার বাণিজ্যে আগ্রহ দেখানোর সামর্থ্য অর্জন করে। বাণিজ্য যাতে ঠিকমতো বিকশিত হয়, সেরকম নিরাপত্তা দানের মতো সক্ষমতা লাভ করে তারা।

পশ্চিম সুদান যে কখনোই ট্রান্স-সাহারান বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো পুঁজি সরবরাহ করেনি, এ ব্যাপারটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই পুঁজি এসেছে ফেয, তলেমসেন, ও মাগরেবের অন্যান্য শহরের বণিকদের থেকে। তারা তাদের প্রতিনিধিদের পাঠাত পশ্চিম সুদানে বসবাস করার জন্য। এটা কিছু মাত্রায় ঔপনিবেশিক সম্পর্ক ছিল বটে। কারণ এই অসম লেনদেন থেকে উত্তর আফ্রিকাই উপকৃত হতো। তবে স্বর্ণের ব্যবসা অন্তত পশ্চিম আফ্রিকার ভেতরকার উৎপাদন শক্তির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম ছিল। এর পাশাপাশি চলতে-থাকা দাসব্যবসার সেরকম কোনো উপকার ছিল না। ঘানা, মালি, ও সংঘাই সকলেই অল্প সংখ্যক দাস রপ্তানি করত। কানেম-বোরনু সাম্রাজ্য দাস রপ্তানির ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করত। কারণ স্বর্ণের জোগানের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাদের। কানেম-বোরনু তার শক্তি ব্যবহার করে দক্ষিণ দিকে বর্তমান ক্যামেরুনের আডামাওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করত বন্দি ধরার উদ্দেশ্যে। এহেন নীতিমালার নেতিবাচক পরিণাম পুরোদমে দেখা দিতে চলেছে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে। পশ্চিম আফ্রিকার অল্প কিছু জায়গা থেকে সাহারা পেরিয়ে দাসদের এই ছোট ধারার সাথে তখন এসে যোগ দেয় আরেকটি বিশাল স্রোত। সেই স্রোতে মহাদেশটির বিপুল পরিমাণ মানুষ চলে যেতে থাকে ইউরোপীয়দের নামকরণ-করা বিভিন্ন গন্তব্যের দিকে।

পশ্চিম আফ্রিকা সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ের বেশ আগেই থেমে গেছে। কিন্তু ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম সুদানের রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া ছিল আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশের চেয়ে বেশি অগ্রসর। ঘানা, মালি, সংঘাই, ও কানেম-বোরনু ছাড়াও হাউসাল্যান্ডে, মসিতে, সেনেগালে, গিনির ফুতা জাল্লোন পাহাড়ে, আর নাইজার নদীর উপনদী বেন্যুর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল দুর্দান্ত সব রাজ্য। রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রশাসনের পশ্চিম সুদানি পদ্ধতিগুলো পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রভাবিত করে সেনেগাল নদী থেকে ক্যামেরুন পাহাড় পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চল-জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছোট রাষ্ট্রের উত্থানকে। অনেক রাজ্যেই কিছু সুনির্দিষ্ট সুদানি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়, বিশেষত রাজনৈতিক কাঠামোতে "রানি মা"-এর অবস্থান।

পশ্চিম সুদানি রাষ্ট্রগুলোর শক্তি ও দুর্বলতা দেখে বোঝা যায় যে, গোষ্ঠীতন্ত্র

থেকে বেরিয়ে এসে তারা কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক ও উৎপাদনের পরিমাণের ক্ষেত্রে এসেছে এসকল পরিবর্তন। বেশ কিছু সাংঘর্ষিক সামাজিক সংগঠন ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে একসাথে ধরে রাখত রাষ্ট্র। কানেম-বোরনুতে পশুপালক ও কৃষিজীবীরা মরুভূমির উটওয়ালা যাযাবরদেরও নিজেদের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আরেক জায়গায় তুয়ারেগ যাযাবরদের দূরে রাখা হয়, যাতে কৃষিজীবী ও অন্যান্য থিতু জনগোষ্ঠী শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। মানুষ, গৃহপালিত পশু, ও পণ্য হাজার হাজার মাইল নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্র তখনো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার বাধাগুলো ভেঙে দেয়নি। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল এমন এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যেটির কাজ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে কর আদায় করা এবং তাদের ঠোকাঠুকি থেকে বিরত রাখা। দুর্বলতার সময়গুলোতে রাষ্ট্রের মহাকাঠামো প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বিভাজনমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতাগুলোর লাগাম খুলে যায় এর ফলে। একের পর এক উদ্ভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিটিই ছিল ঐক্যের এই সমস্যাকে সামাল দেওয়ার নতুন এক পরীক্ষাগার। কখনো এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতো সচেতনভাবে, কখনো বা টিকে থাকার সংগ্রামের এক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে।

অতএব, প্রথম দিককার ওসব রাষ্ট্রকে তাদের প্রতিটি প্রজার ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চর্চা থেকে বিরত রেখেছিল কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামন্ততন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী প্রথমবারের মতো সেসব প্রতিষ্ঠানকে ছিঁড়ে ফেলে। অর্থাৎ, জমিদার শাসক ও জমিহীন প্রজাদের মধ্যে ধারাবাহিক কিছু বাধ্যতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত করে সামন্ততন্ত্র। পশ্চিম সুদানে স্পষ্ট শ্রেণীবিভাজনের অস্তিত্ব ছিল না। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মালি যখন প্রতাপশালী হয়ে ওঠে, ততদিনে স্বল্প পরিমাণে কিছু স্থানীয় দাসব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। আর পঞ্চদশ শতক শেষ হতে হতে বংশানুক্রমিক দাস ও "গৃহস্থালি দাস" উভয়েরই উদ্ভব হয়, যেগুলো সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাসের সাথে তুলনীয়। যেমন, সেনেগালে আগত পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা এমন কিছু মানুষ দেখতে পায়, যারা বেশির ভাগ দিনে তাদের প্রভুদের জন্য এবং মাসে অল্প কিছুদিন নিজেদের জন্য কাজ করে। একটি সামন্তবাদী প্রবণতার প্রাথমিক রূপ বলা চলে একে। কিন্তু তারপরও বেশির ভাগ মানুষই তাদের আত্মীয়দের মাধ্যমে জমির ওপর যথেষ্ট অধিকারের ভাগিদার ছিল। রাজনৈতিক পরিভাষায় এর অর্থ হলো, শাসক শ্রেণী তাদের প্রভাব খাটাত পরিবার ও গোত্রের প্রধানদের ওপর। আলাদা আলাদা করে প্রতিটি নাগরিকের ওপর না।

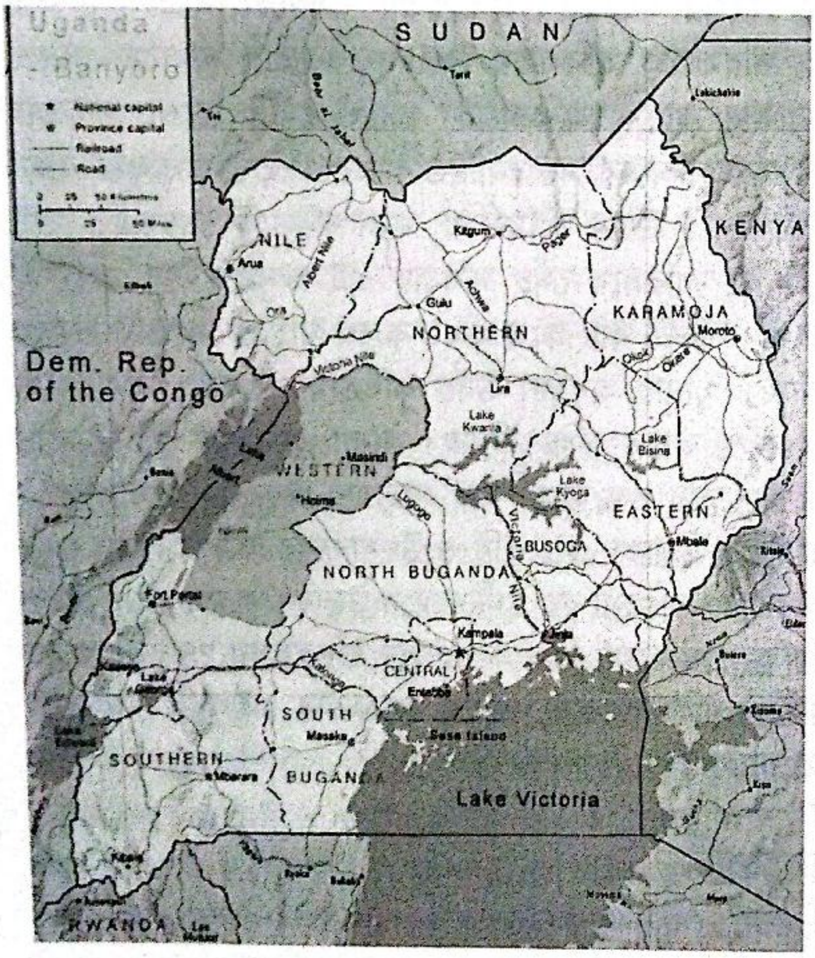
গোষ্ঠীতান্ত্রিক সাম্যবাদ যদিও বিদায়ের পথে, তারপরও গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্কগুলো তখনো বিদ্যমান। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে এগুলো পশ্চিম সুদানের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনধারণের চাহিদার চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত যে সম্পদ আসছিল, তা আসছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর থেকে আদায়কৃত কর থেকে। সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে শোষক শ্রেণীর হাতে না। এতে করে পুরাতন সামাজিক সংগঠনগুলো টিকিয়ে রাখার প্রেরণা পাওয়া যায়, যদিও সেগুলো আরও বড় মাত্রায় শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে অপারগ। এমতাবস্থায় সহিংস সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এহেন পরিস্থিতিতে আরও বেশি পরিবর্তন সংঘটিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রযুক্তিতে বড় মাপের অগ্রগতি। অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত ছিল বিভিন্ন পরিমণ্ডলে অধিকতর উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে—আরও বেশি বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা, শ্রমবিভাজনে আরও বেশি বিশেষ দক্ষতার ব্যবস্থা করা, এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের সম্ভাবনা তৈরি করা। কিন্তু চাকাযুক্ত বাহন ও লাঙ্গলের আবির্ভাব ঘটে উত্তর আফ্রিকায়, বড় পরিসরে সেচকর্মও ঘটে সেখানেই। আসলে বড় পরিসরে সেচ সুবিধার এই অনুপস্থিতির কারণেই পশ্চিম সুদানের উৎপাদন ভিত্তি বরং কমে যায়। কারণ সাহারা মরুভূমি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘানার অবস্থান উর্বর কৃষিভূমির ওপর। কিন্তু মালি ও সংঘাই উভয়ের কেন্দ্র আরও দক্ষিণ দিকে। কারণ এককালে যেটা ঘানার উত্তরাঞ্চল ছিল, এখন সেটা শুষ্ক হয়ে গিয়ে সাহারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যেসকল কৌশল দরকার, সেগুলো হয় স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবন করতে হবে অথবা বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আফ্রিকার ইতিহাসের পরবর্তী অংশে যখন সাদা মানুষদের আবির্ভাব ঘটে, পশ্চিম আফ্রিকায় এই দুটি সম্ভাবনাই কার্যত বাতিল হয়ে যায়।

❁ হ্রদঘেরা অঞ্চল

পশ্চিম সুদানের দারুণ সামাজিক বিবর্তন এক দীর্ঘ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কারও মতে এটি ইউরোপের মতো সামন্ততন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। কারও মতে একে বরং এশিয়ার বড় বড় সাম্রাজ্যের সাথে এক কাতারে ফেলা উচিত। মতান্তরে এটি নিজেই আরেকটি নতুন ও স্বতন্ত্র প্রকার। একই যুগে মহাদেশের পূর্ব দিকের উন্নয়ন ছিল ধীরতর। একটি কারণ হলো, পূর্ব আফ্রিকার জনগণ লোহার হাতিয়ার ব্যবহার করা শুরু করেছে তাদের উত্তর ও পশ্চিমের ভাইদের

তুলনায় বেশ দেরিতে। দ্বিতীয় কারণ, তাদের প্রযুক্তি ও দক্ষতার পরিসর ছিল আরও ছোট। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রাষ্ট্রের গঠন-প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। আর এই প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের যেসকল মূলনীতি ফুটে উঠেছে, সেগুলো যথাযথ মনোযোগের দাবিদার। বিশেষভাবে আলোকপাত করা উচিত আফ্রিকার বড় বড় হ্রদ এবং সেগুলোকে ঘিরে থাকা অঞ্চলটির ওপর। ব্রিটিশরা নিজ বদান্যতায় এগুলোর নামকরণ করেছে তাদের রাজপরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নামে—ভিক্টোরিয়া, অ্যালবার্ট, এডওয়ার্ড, জর্জ। এই হ্রদঘেরা অঞ্চলে কালক্রমে কয়েকটি বিখ্যাত রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। এর মাঝে অন্যতম প্রথম ও বৃহৎ রাষ্ট্র বুনিয়োরো-কিতারা।



বর্তমানে যেগুলো বুনিয়োরো, অ্যাংকোলে, তোরো, কারগোয়ে, ও বুগান্ডা—সেগুলোর পুরোটা বা অংশবিশেষ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বুনিয়োরো-কিতারা। এদের মাঝে কারাগোয়ে শুধু তানজানিয়ায় অবস্থিত, বাকিগুলো উগান্ডায়। কোনো না কোনো সময়ে বুনিয়োরো-কিতারার সীমানার ভেতরে পড়েছে, এরকম বিভিন্ন জাতি মৌখিকভাবে এর ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। এসকল ঐতিহাসিক বর্ণনা তাদের শাসক রাজবংশকে নিয়ে, যারা বাচওয়েযি নামে পরিচিত। বাচওয়েযিদের ব্যাপারে বলা হয়, তারা অন্যত্র থেকে আগত একটি পশুপালক দল। লম্বা শিং ও কুঁজবিশিষ্ট গবাদিপশু নিয়ে আসে তারা।

এগুলোই পরবর্তীকালে হ্রদঘেরা অঞ্চলের প্রধান প্রজাতিতে পরিণত হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসকল প্রাণীর মালিকানা নিঃসন্দেহে তাদের শাসক শ্রেণী হিসেবে আসীন হতে সাহায্য করেছে। আগে থেকে বিদ্যমান যেকোনো গোত্রের চেয়ে তারা একটি উচ্চতর সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। ওই গোত্রগুলোর তুলনায় তাদের অধীনস্থ ভূমির পরিমাণও ছিল বেশি। বাচওয়েযি-আধিপত্যের যুগটি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্যও সুপরিচিত। যেমন: লোহার কাজ, ছালের কাপড় তৈরি, পাথরের ভেতর দিয়ে কুয়ার খাদ তৈরি করা, এবং (সবচেয়ে চমকপ্রদটি হলো) বিশাল পরিমাণে মাটির বাঁধ নির্মাণ। এসকল বাঁধ সম্ভবত প্রতিরক্ষার জন্য যেমন ব্যবহৃত হতো, তেমনি হতো বড় পশুপালকে ঘেরাও দেওয়ার জন্য। সবচেয়ে বড় মাটির বাঁধ ছিল বিগোতে। তাতে ছিল সাড়ে ছয় মাইলের চেয়েও বড় বড় পরিখা।

হ্রদঘেরা অঞ্চলে শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছে পশুপালক ও কৃষিজীবীদের মাঝে শ্রমবিভাজন এবং তাদের মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি। পশুপালক বাহিমা জাতি নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে দেয় কৃষিজীবী বাইরুদের ওপর। শ্রমসম্পর্ক পালটে যাচ্ছে, এরকম এক পরিস্থিতি থেকে তৈরি হয় সামাজিক শ্রেণীবিভেদ। বিগো ও অন্যান্য স্থানের মাটির বাঁধ কোনো পারিবারিক স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি। তা ছাড়া, কৃষিজীবীরা যেন তাদের নতুন প্রভুদের জন্য উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন করে, সেজন্য নিশ্চয়ই তাদের ওপর কোনোভাবে জোর খাটানো হয়ে থাকবে। যেমন বাচওয়েযিদের সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে যুবকদের নাম লেখাতে হতো। সেনাদলের ভরণপোষণ দেওয়া হতো বাইরুদের মালিকানাধীন ও চাষকৃত জমি থেকে। দাস কারিগর ও প্রশাসকের প্রচলনও ঘটায় তারা। অভিজাতদের পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হতো। এটি ছিল সামন্ততান্ত্রিক জায়গীর প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ, যেমনটি হয়েছিল ইথিওপিয়ায়। জমি অর্পণ করার বিষয়টি তখনো উদ্ভাবিত হয়নি বটে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে, গবাদি পশু বণ্টনে অসমতা মানেই হলো উৎপাদনের মাধ্যমের ওপর অসম অধিকার।

বাচওয়েযিদের ঠিক ঠিক পরিচয়কে ঘিরে বেশ অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। হতে পারে তারা অন্যত্র থেকে আগত না। তারপরও সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, তারা উত্তর দিক থেকে আগত ফর্সা ত্বকবিশিষ্ট পশুপালক। এসকল তথ্যকে সঠিক ধরে নিয়ে একটি ব্যাপার মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে হ্রদঘেরা অঞ্চলে যা কিছু অর্জন হয়েছে, তা সার্বিকভাবে আফ্রিকান সমাজের বিবর্তনের ফল। বহিরাগত কোনো প্রভাব নয়। পূর্ব

আফ্রিকার এসকল ঘটনা যে গোটা মানবজাতির সর্বজনীন অর্জনেরই অংশ, তা বোঝার জন্য ভারতের একটি অনুরূপ উদাহরণ টানা যায়। খ্রিষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে উত্তর ভারতেও আগমন ঘটে গৌরবর্ণের বহিরাগত পশুপালক আর্য জাতির। এককালে ভারতীয় সংস্কৃতির সবকিছুকেই আর্যদের বলে ভাবা হতো। কিন্তু সতর্ক যাচাইয়ের ফলে বেরিয়ে আসে যে, তাদের আগেই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে দ্রাবিড় জাতি। তাই উত্তর ভারতের অর্জনগুলোকে আর্য ও দ্রাবিড়দের যৌথ প্রয়াসের ফল বলে বিবেচনা করাটাই এখন অনেক বেশি যৌক্তিক। একইভাবে উত্তর আফ্রিকাতেও নতুন ও পুরাতনদের মধ্যে সমন্বয়ের উপাদান খুঁজে বের করা দরকার। আর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে হ্রদঘেরা অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যত এই সমন্বয়ের মাধ্যমেই ঘটেছে।

আগেই যেমনটি বলা হলো, লোহার কাজ ও ছালের কাপড় তৈরির মতো বিভিন্ন কৌশলের সাথে বাচওয়েযিদের সম্পর্কিত করা হয় বটে। কিন্তু এসকল কৌশল তারাই প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত করেছিল কি না, তা স্পষ্ট না। প্রবর্তনের বদলে বরং তারা এসকল দক্ষতার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে, এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাচওয়েযি যুগের কয়েক শতাব্দী আগেও পূর্ব আফ্রিকায় লোহা ব্যবহারকারী সমাজের কথা জানা যায়। বর্তমান কেনিয়া-তানজানিয়া সীমান্তের ঠিক দক্ষিণেই অবস্থিত ছিল এঙ্গারুকা। সেখানে লৌহযুগের ছোট-কিন্তু-দারুণ এক সমাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রথম খ্রিষ্টীয় সহস্রাব্দের (১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) কিছু আগেই বিকাশ ঘটেছিল এর। এঙ্গারুকা ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট কৃষিজীবী লোকালয়। টেরাসিং, সেচ, ও দেয়াল নির্মাণের কাজকর্মে জড়িত ছিল তারা। দেয়াল নির্মাণে ব্যবহৃত হতো শুকনো পাথর। এগুলো জোড়া লাগিয়ে রাখার জন্য কোনো চুনের প্রয়োজন হতো না। স্বয়ং হ্রদঘেরা অঞ্চলের ভেতরেই কলা-নির্ভর এক কৃষিজীবী সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল। বিশাল এক থিতু জনগোষ্ঠীর ভরণপোষণ হতো এর মাধ্যমে। গোষ্ঠীতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এরকমই পূর্বশর্ত দরকার।

মৌখিকভাবে সংরক্ষিত কাহিনি থেকে বোঝা যায় যে, বাচওয়েযির আগেও বুনিয়োরো ও কারাগোয়েতে রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। বহিরাগতদের যখন আগমন ঘটে, রাষ্ট্র ততদিনে তার ভ্রূণাবস্থায় পৌঁছে গেছে। বেশিদিন হয়তো তারা বহিরাগত থাকেওনি। ভারতের আর্যরা যেমন নিজেদের সবকিছু চাপিয়ে দিয়েছিল, বাচওয়েযি তা করেনি। এমনকি নিজেদের ভাষাটাও চাপিয়ে দেয়নি। বরং স্থানীয় অধিবাসীদের বান্টু ভাষাকে গ্রহণ করে নেয় তারা। তার মানে সমন্বয়ের মাঝে বহিরাগত উপাদানগুলো না, বরং স্থানীয় উপাদানগুলোই

ছিল বেশি জোরালো। আর ঘটনা যা-ই হোক, তার সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল আফ্রিকান। বিভিন্ন সামাজিক গঠনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া এবং স্থানীয় বিবর্তনের সমন্বয়ে সারা মহাদেশজুড়ে যে উন্নয়ন ঘটছিল, প্রতিটি ঘটনা সেই উন্নয়নেরই অংশ।

হ্রদঘেরা রাজ্যগুলোতে বাচওয়েযি যেসকল অবদান রেখেছে বলে ধরা হয়, তার মাঝে একটি হলো চাঁদের অবস্থানভিত্তিক একটি ধর্মের প্রবর্তন। এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো উদাহরণ আলোচিত হলো, সবগুলোতেই রাষ্ট্র নির্মাণকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ধর্ম। এটি সমাজকে পারিবারিক গোষ্ঠীর মতো সরল সংগঠন থেকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। আফ্রিকার ভেতরে ও বাহিরে বড় মাপে রাষ্ট্র নির্মাণের কৃতিত্ব বহুলাংশে দেওয়া হয় খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামকে। ধর্মীয় বিশ্বাস কী, সেটা এখানে বিবেচ্য না। কথা হলো একটি শক্তিশালী সর্বজনীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়াটা। এতে করে একটি তরুণ রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী বহু সুবিধা লাভ করে। একজন খ্রিষ্টান বা মুসলিম শাসক লিখতে-পড়তে জানে এবং বৃহত্তর এক বিশ্বের সাথে পরিচিত। ওই ধর্মের বহু বণিক ও কারিগরের সাথে তার লেনদেন আছে। শিক্ষিত প্রশাসক ও ধর্মযাজকদের ব্যবহার করতে পারে সে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সে ভ্রমণ করে, যেমন মক্কা।

সর্বোপরি, এই বিশ্বজনীন ধর্মগুলো এসে আফ্রিকার "সনাতন" পূর্বপুরুষভিত্তিক ধর্মগুলোকে সরিয়ে দেয়। ইথিওপিয়া, সুদান, মিশর, মাগরেব, ও কালক্রমে পশ্চিম সুদানে এই ঘটনা ঘটে। কারণ খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট পারিবারিক গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ না। এর ফলে বহু গোষ্ঠীকে একত্র করে রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। তাই রাষ্ট্র গঠন করার ক্ষেত্রে এ দুটি ধর্ম বেশ কার্যকর। কিন্তু আবার একটি নির্দিষ্ট গোত্রের বা নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসকে হুবহু বা ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে গোটা রাষ্ট্রের ধর্মে উন্নীত করাও সম্ভব। হ্রদঘেরা অঞ্চলগুলোতে ঠিক এমনটিই ঘটেছে। এ পর্যন্ত বর্ণিত অঞ্চলগুলোর বাইরে আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশের ক্ষেত্রেও এ কথাই প্রযোজ্য।

❁ জিম্বাবুয়ে

জিম্বাবুয়ের একটি বিশাল ইটনির্মিত দালানকে (প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়) অভিহিত করা হয় "মন্দির" হিসেবে। কারণ এটি কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। এই উদীয়মান আফ্রিকান সমাজটিতে মানুষে-মানুষে বন্ধন দৃঢ় করার ক্ষেত্রে ধর্ম যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছে, স্বল্প প্রমাণ থেকেই তা বেশ স্পষ্ট। যেমন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে জিম্বাবুয়ের মুতাপা সাম্রাজ্যের শাসক শ্রেণী ছিল পশুপালক। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এমনসব বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলো গবাদি পশুর প্রতীক। বুনিয়োরো ও কারাগোয়ের মতো হ্রদঘেরা রাজ্যগুলোতেও এমনটি পাওয়া যেত। বলাবাহুল্য, ধর্মীয় আচারগুলোতেও ছিল পশুর মালিকদের প্রাধান্য। আগে থেকে বিদ্যমান কৃষিজীবীদের ধ্যানধারণাগুলোর প্রতিও তারা সম্মান জানাত। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাথে স্থিতিশীল এক সমন্বয় গড়ে তোলা। এই সার্বিক চিত্রের বিস্তারিত খুঁটিনাটি এখনো আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেটা বোঝা দরকার, তা হলো আফ্রিকান ধর্মগুলো গতিশীল ও বিবর্তনময় বিষয়। এ সংক্রান্ত যেকোনো আলাপেই তাকে এভাবেই তুলে ধরা উচিত। পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ধরন ও প্রতিষ্ঠানের সাপেক্ষে বুঝতে হবে একে। এই বইয়ের পরিসরে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই জিম্বাবুয়ে নিয়ে আমাদের নিরীক্ষার উদ্দেশ্য আগের পরিচ্ছেদগুলোর মতোই। এটিও এমন একটি অঞ্চল, যেখানে উৎপাদনের ভিত্তি এবং রাজনৈতিক মহাকাঠামো যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয়েছে। আফ্রিকা ইউরোপের সংস্পর্শে আসার কয়েক শতাব্দী আগেই সংঘটিত হয়েছে এই বিকাশপ্রক্রিয়া।

মহাদেশের একদম দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অঞ্চলটি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই তার নজরকাড়া সব অর্জনের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অঞ্চলটি যাম্বেযি ও লিম্পোপো নদীর মাঝে অবস্থিত। এই জায়গাগুলো পরবর্তীকালে পরিচিত হতে চলেছে মোজাম্বিক ও রোডেশিয়া নামে। লোহা-ব্যবহারকারী এবং রাষ্ট্র-নির্মাণকারী বিভিন্ন জাতি সেখানে প্রথম খ্রিষ্টীয় সহস্রাব্দ থেকেই সক্রিয় ছিল। কালক্রমে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেখানে এক সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে, যেটিকে ইউরোপীয়রা ডাকত মনোমোটাপা নামে। ইউরোপীয়রা আসার অল্প কয়েক শতাব্দী আগেকার যাম্বেযি-লিম্পোপো সংস্কৃতিকে বোঝাতে এখানে "জিম্বাবুয়ে" শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে এই জায়গায় এমন কিছু সমাজের বিকাশ ঘটে, যেগুলো একত্রে জিম্বাবুয়ে নামে পরিচিত। এদের সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য ছিল পাথরের বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা।

জিম্বাবুয়ে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এসকল দালানকোঠা নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। এগুলো গ্রানাইট পাথরে ভরা পরিবেশের এক সরাসরি ফল। দালানগুলো যেমন গ্রানাইটের পাহাড়ের ওপর নির্মিত, তেমনি পরতে পরতে কাটা গ্রানাইট দিয়ে গড়া। এসকল পাথুরে ধ্বংসাবশেষের সবচেয়ে বিখ্যাত স্থান হলো গ্রেট জিম্বাবুয়ে, যা সাবি নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত।

গ্রেট জিম্বাবুয়ের একটি প্রধান স্থাপনার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০০ ফিট আর প্রস্থ ২২০ ফিট। এর দেয়ালগুলো ৩০ ফিট উঁচু ও ২০ ফিট পুরু। একের পর এক ইট বসিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে চুনের কোনো ব্যবহার ছাড়াই, ঠিক উত্তর তানজানিয়ার এঙ্গারুকার মতো একই কৌশলে। এটি আসলে আফ্রিকার বস্তুগত সংস্কৃতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইথিওপিয়া ও সুদানেও এরকম অহরহ পাওয়া যায়। গ্রেট জিম্বাবুয়ে ও অন্যান্য স্থানে যেভাবে দালানগুলো ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, সেটাও আফ্রিকারই স্বতন্ত্র নিদর্শন। কারণ এগুলো বান্টু-ভাষী বিভিন্ন জাতির বানানো মাটির দেয়াল তথা ক্রালেরই উন্নততর রূপ।

জনৈক ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের বরাত দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, জিম্বাবুয়ের এসকল স্থাপনার পেছনে মিশরের পিরামিডের সমান শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি। কারণ পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে দাসদের দিয়ে অবিশ্বাস্য মাত্রায় পরিশ্রম করানোর মাধ্যমে। জিম্বাবুয়ের শাসকদের কাছে ওইরকম দাস থাকা অসম্ভব। তবে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত জিম্বাবুয়ের ভেতরে এসকল স্থাপনা নির্মাণে কী পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়েছিল, তা অবশ্যই ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। এই শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীর সদস্যও হয়ে থাকতে পারে, যারা হয়তো অন্য নৃগোষ্ঠীর হাতে পরাধীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরাধীনতার এই প্রক্রিয়ায় তারা এমন এক সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে, যাদের থেকে শ্রম আদায় করা হতো শোষণের মাধ্যমে। আবার এগুলো স্রেফ কায়িক শ্রমই ছিল না। দক্ষতা, সৃজনশীলতা, ও শিল্পও ব্যবহৃত হয় এসকল দেয়ালের নির্মাণকাজে। বিশেষত নকশা, অভ্যন্তরীণ খুপড়ি, ও দরজাগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য।

সেসিল রোডস যখন চুরি-ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তার প্রতিনিধিদের জিম্বাবুয়েতে পাঠান, তারা ও অন্য ইউরোপীয়রা জিম্বাবুয়ে সংস্কৃতির এসকল ধ্বংসাবশেষ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ধরেই নেয় যে, এগুলো শ্বেতাঙ্গদের বানানো। এমনকি আজও এসকল অর্জনকে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের চোখে দেখার একটি প্রবণতা রয়ে গেছে। আফ্রিকার মানবীয় সামাজিক উন্নয়নের স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই যে এগুলোর উদ্ভব, তা মেনে নিতে যেন সকলের খুব আপত্তি। অথচ এটি সেই সর্বজনীন প্রক্রিয়ারই অংশ, যেখানে মানবশ্রমের মাধ্যমে নতুন সব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এহেন অবিশ্বাসী মনোভাব দূর করার একমাত্র উপায় হলো এই বিষয়টাকে স্পষ্ট করে তোলা যে, উন্নত কৃষি ও খনন দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই স্থাপত্যকলা। শত শত বছরের বিবর্তনে এসকল দক্ষতার আবির্ভাব ঘটেছে।

জিম্বাবুয়ে ছিল এক মিশ্র কৃষির অঞ্চল। গবাদি পশু এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অঞ্চলটি ৎসেৎসে মাছিমুক্ত। সেচ ও টেরাসিং উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি করেছে। এশিয়া বা রোমের সাথে তুলনীয় একটাও বাঁধ বা কৃত্রিম নালা এখানে নেই। কিন্তু ছোট ছোট অগণিত জলধারার গতিপথ বদলে পাহাড়ের চারপাশে প্রবাহিত করা হয়েছে। পানিপ্রবাহের বৈজ্ঞানিক নীতি সম্পর্কে সচেতনতা ফুটে ওঠে এখান থেকে। সত্যি বলতে, জিম্বাবুয়ের মানুষেরা বস্তুগত পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানের বদৌলতে রীতিমতো "পানি-বিশেষজ্ঞ" তৈরি করতে সক্ষম হয়। খনি খননবিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়। আলোচ্য অঞ্চলের আফ্রিকান মানুষেরা খনিজবিদ ও "ভূতত্ত্ববিদ" তৈরি করে ফেলে, যারা মাটির নিচে স্বর্ণ ও তামার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা এসে দেখে যে, স্বর্ণ ও তামাবিশিষ্ট প্রায় সকল খনিতেই আফ্রিকানরা ইতিপূর্বে খননকার্য চালিয়ে ফেলেছে। অবশ্য ইউরোপীয়রা তাদের ড্রিলিং যন্ত্রপাতি দিয়ে যেরকম বড় পরিসরে কাজ করতে পারে, সেরকম না। জিম্বাবুয়ে জাতির মাঝে কারিগরদেরও উদ্ভব ঘটে। দুর্দান্ত দক্ষতা ও হাতের জাদুকরী স্পর্শে স্বর্ণকে গহনায় পরিণত করত তারা।

বিশেষ করে স্বর্ণের অস্তিত্বের ফলে বহির্বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। কালক্রমে এই রপ্তানি চাহিদার ফলেই ত্বরান্বিত হয় খনন-কার্যক্রম। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকগুলিতে যাম্বেযির ঠিক উত্তর দিকে ইংওম্বে ইলেডেতে স্বর্ণ-ব্যবহারকারী এক অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। বোঝা যায়, তারা এসকল স্বর্ণের জোগান পেত দক্ষিণ দিকের খনি থেকে। তবে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ শুধু এরকম সমাজেই প্রয়োজন, যেখানে বিশাল মাত্রায় অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বিদ্যমান। সেইসাথে উদ্বৃত্ত স্বর্ণের একাংশকে রূপান্তরিত করতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হবে। সেটা হতে পারে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন ভারত) অথবা হতে পারে পুঁজিবাদ সম্প্রসারিত করার জন্য টাকায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে (যেমন পশ্চিম ইউরোপ)। প্রাক-সামন্তবাদী আফ্রিকান সমাজে এরকম উদ্বৃত্ত থাকত না। আবার এরকম সামাজিক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল না, যার ফলে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যাপক মাত্রায় স্বর্ণ লেনদেন করার প্রয়োজন পড়ে। তাই সুদূর দক্ষিণে মোজাম্বিকের সোফালায় আরব বণিকদের উপস্থিতির কারণেই জিম্বাবুয়েতে আরও স্বর্ণ উত্তোলন করা শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানি। একাদশ শতাব্দীর ঠিক ওই সময়টিতেই শুরু হচ্ছিল পাথরের স্থাপত্যকলা। ফলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য একসাথে দেখা দিতে শুরু করে: যথা সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাষ্ট্রের সুসংহতি, উৎপাদন ও নির্মাণের কৌশল, এবং বাণিজ্য।

জিম্বাবুইয়ান সমাজে বেশ কিছু পৃথক নৃগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। এলাকাটির প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী ছিল "বুশমেন" ও খোইসান ধাঁচের শিকারিরা। বর্তমানে আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে শুধু এদের মুষ্টিমেয় অস্তিত্ব বিদ্যমান। আরও উত্তর দিকের বান্টুভাষী নবাগতদের সাথে তারা একীভূত হয়ে যায়। ওই এলাকার বান্টু ভাষায় তাদের নিজস্ব অবদানও রয়েছে বটে। বান্টুভাষীদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় আগমন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে পাওয়া যায় নানা ধাঁচের কাব্যভঙ্গি, বিপরীতধর্মী দাফন-প্রক্রিয়া, এবং কঙ্কালের হাড়ের বিভিন্ন রকম গড়ন। অন্যান্য বস্তুগত প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, কয়েক শতাব্দী জুড়ে জিম্বাবুয়ে অঞ্চলে বহু সমাজ বসবাস করেছে। এক গোষ্ঠীর ভেতরে আরেক গোষ্ঠীর আগমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হতো শান্তিপূর্ণ। আবার একইসাথে সুরক্ষিত পাহাড়ি দুর্গ ও পাথুরে নিরাপত্তাব্যবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রগুলো টিকে-থাকা ও আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া কিছু নৃগোষ্ঠীকে নিশ্চয়ই চিরতরে নিম্ন স্তরে ঠেলে দেওয়া হয়ে থাকবে, যাতে করে কৃষি, নির্মাণ ও খননকাজে তাদের থেকে শ্রম আদায় করা যায়। অন্য বিভিন্ন গোত্রের কারও দক্ষতা ছিল পশুপালন, কারও যুদ্ধবিদ্যা, কারও ধর্মীয় কার্যক্রম, যেমন : দেবত্ব ও বৃষ্টিবর্ষণ।

ধরা হয়, একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর জিম্বাবুয়েবাসীদের ভাষা ছিল সোথো। কিন্তু পর্তুগিজদের যখন আগমন ঘটে, ততদিনে বেশির ভাগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে শোনাভাষী রাজবংশ। এরা হলো রোজউই গোত্র, যারা যাম্বেযি ও লিম্পোপোর মাঝে মুতাপা রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিল। শাসকদের অভিহিত করা হতো মুয়েনে মুতাপা নামে। নিজের অনুসারীদের কাছে দৃশ্যত এর অর্থ ছিল "মুতাপার মহান প্রভু"। কিন্তু যেসকল বিজিত জাতিকে তিনি একই সাম্রাজ্যে একীভূত করেছেন, তাদের কাছে এর অর্থ ছিল "জঘন্য ডাকাত"। মুয়েনে মুতাপা খেতাবের অধিকারী প্রথম ব্যক্তিটি শাসন করেন প্রায় ১৪১৫ থেকে ১৪৫০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তার বেশ আগে থেকেই রাজবংশটি প্রতিপত্তি লাভ করতে শুরু করেছে। প্রথমে গ্রেট জিম্বাবুয়েতে রাজধানী স্থাপিত করা হয়, পরে তা সরিয়ে নেওয়া হয় উত্তর দিকে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, মুয়েনে মুতাপা রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন স্থানে প্রশাসক নিয়োগ দেন। পশ্চিম সুদানি সাম্রাজ্য বা হ্রদঘেরা বাচওয়েযি রাষ্ট্রেও ঠিক এমনটিই হতো।

মুতাপার রোজউই প্রভুরা রপ্তানিবাণিজ্য ত্বরান্বিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে সোনা, হাতির দাঁত, ও তামা। আরব বণিকরা রাজ্যের ভেতরে বসবাস করার জন্য আগমন করে। ভারত মহাসাগরভিত্তিক বাণিজ্যের

নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে যায় জিম্বাবুয়ে অঞ্চল। এর ফলে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ও চীনের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। মুতাপার রোজউই শাসকদের অন্যতম একটি অর্জন ছিল উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য একটি একক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে তারা কর আদায় করত। এটি একদিকে যেমন সার্বভৌমত্বের প্রতীক, আরেকদিকে এক ধরনের ব্যবসাও, কারণ এর ফলে পণ্যের পরিবহন ত্বরান্বিত হয়। বিদেশি বাণিজ্য যে মুতাপাকে শক্তিশালী করেছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু এর ফলে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে শাসক শ্রেণীটি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর একচেটিয়া অধিকার ছিল তাদের।

তৎকালীন আফ্রিকার অন্যান্য অংশের অভিজাতদের তুলনায় জিম্বাবুয়ের রোজউইরা তখনো বেশ পিছিয়ে। ইথিওপিয়ার আমহারিক অভিজাত কিংবা মাগরেবের আরব-বার্বার সামন্তপ্রভুদের সমপর্যায়ে ছিল না এরা। বাইরের কিছু প্রভাব আত্মস্থ করলেও এরা ভ্রমণ করত না। মালি ও সংঘাইয়ের শাসকরা যেমন মক্কায় হজ করতে যেত, এদের সেরকম কোনো বিষয় নেই। তখনো পর্যন্ত এদের পোশাক প্রধানত পশুর চামড়া। অন্য যেসকল পোশাক এরা ব্যবহার করত, সেগুলো আরব বণিকদের থেকে সম্প্রতি আমদানিকৃত। এই ময়দানে এদের নিজস্ব দক্ষতার কোনো বিকাশ ঘটেনি। এদিক দিয়ে জিম্বাবুয়ে আরও বেশি কিছু প্রারম্ভিক আফ্রিকান রাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে ছিল, যেমন ইয়োরুবাল্যান্ডের ওয়ো, একই জায়গার বেনিন, এবং চতুর্দশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য কঙ্গো (ইউরোপীয়দের আগমনের সময় এটিকে তারা আখ্যায়িত করে সবচেয়ে প্রতাপশালী পশ্চিম আফ্রিকান সাম্রাজ্য হিসেবে)।

ইউরোপীয়দের আগমনের আগে আফ্রিকার এসব অঞ্চলে অসামান্য উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছিল। তাই বোঝানোর সুবিধার্থে কয়েকটির (সবগুলোর না) বর্ণনা তুলে ধরলাম। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, অসংখ্য গ্রামও রাষ্ট্র হিসেবে উদীয়মান ছিল সেই সময়ে। সেগুলো আকারে ছোট, কিন্তু দারুণভাবে শ্রেণীবিভাজনের অধিকারী। বস্তুগত ক্ষেত্রে তাদের ছিল চমকে দেওয়ার মতো অগ্রগতি। ওপরে বর্ণিত উদাহরণগুলো এই বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর আফ্রিকা নিতান্ত কিছু "গোত্রের" জগাখিচুড়ি ছিল না। বরং সেখানে ছিল চোখে পড়ার মতো একটি বিন্যাস এবং স্পষ্ট ঐতিহাসিক পরিক্রমা। উন্নয়নের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল ইথিওপিয়া ও মিশর। জিম্বাবুয়ে এবং বাচওয়েযি রাষ্ট্রগুলোও স্পষ্টতই ছিল গোষ্ঠীতান্ত্রিক পর্যায় থেকে অগ্রসরমান। তবে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে। পশ্চিম সুদানেও কিছু রাষ্ট্র ছিল, যেগুলো তখনো সামন্ততান্ত্রিক

হয়ে ওঠেনি।

উপসংহার

উৎপাদন-সক্ষমতা ধীরে ধীরে ও সূক্ষ্মভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকলেও একসময় গিয়ে গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করে। সমাজ নতুন এক পর্যায়ে পদার্পণ করলে কখনো বা সামাজিক সহিংসতার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। উন্নয়নের ধারণাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে এই বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সে অর্থে আফ্রিকান সমাজগুলো তখনো সেরকম নতুন কোনো পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যেটা গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে স্পষ্টত আলাদা। তাই সেটিকে সতর্কতাবশত "রূপান্তরমান" যুগ হিসেবে অভিহিত করা উচিত। আরও লক্ষণীয়, কোনো জায়গায় কখনোই কোনো সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। ইউরোপ এবং বিশ্বের ইতিহাসের অন্য যেসব জায়গায় তা হয়েছিল, সেগুলোর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এমনিতে আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু সেসব স্থানে শ্রেণীবিভাজন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যার ফলে প্রক্রিয়াটির ওপর বিশাল মাত্রায় মানবীয় হস্তক্ষেপ তথা বিপ্লব ঘটে। এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকার উন্নয়নের স্বরূপ বোঝা সহজ হয়। আফ্রিকার উন্নয়ন তখন যে পর্যায়ে ছিল, তা পরিপক্ব ও শ্রেণীবিভাজন-সম্বলিত সামন্তবাদের চেয়ে পেছনে।

আবারও মনে করিয়ে দিই, উৎপাদনের ধরন হিসেবে আফ্রিকার কোনো সমাজেই দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠীতান্ত্রিক সাম্যবাদ থেকে বেরিয়ে যেসকল সমাজ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, সেসব জায়গায় কিছু দাসের দেখা মেলে। বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার বৃহত্তর কাঠামোর ভেতরে এটি আফ্রিকান স্বতন্ত্রতার এক অসামান্য বৈশিষ্ট্য। আফ্রিকান ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায় নিয়ে গবেষণার একটি প্যারাডক্স হলো, একে পুরোপুরি বুঝে উঠতে হলে আগে বিশ্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এরপর আলাদাভাবে আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে বিস্তর পড়াশোনা করতে হবে, যা দীর্ঘকাল অবহেলার শিকার ছিল। তারপর গিয়ে মানুষের ও সমাজের উন্নয়নের একটি সত্যিকার চিত্র দাঁড় করানো যাবে।

তুলনা করা ছাড়া এখানে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা অসম্ভব। আর এসকল তুলনা দেখানো হয়েছে শুধুমাত্র ইউরোপের সংকীর্ণ পরিসরে, যদিও এশিয়ান ইতিহাস থেকেও তা দেখানো যেত। ইউরোপের শিক্ষায় শিক্ষিত কানে

(ফরাসি) কাপিশান বা (প্রুশিয়ান) হহেনযোলার্ন যতটা পরিচিত, ভিয়েতনামের ইদ বা ত্রান রাজবংশের নাম অতটা পরিচিত লাগে না। শেষোক্ত উদাহরণগুলো তার কাছে হয় অজানা, আর নাহয় গুরুত্বহীন, অথবা হয়তো উচ্চারণ করাও কঠিন! এই হলো সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের ফল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মহাদেশের উন্নত অঞ্চলগুলোর সাথে একই যুগের ইউরোপীয় অঞ্চলসমূহের তুলনা করলে বলতে হয়, আফ্রিকার অবস্থান মোটেও পশ্চাৎপদ ছিল না। আফ্রিকার বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ এই ব্যাপারটি দেখিয়েছেন। বরং সমুদ্রপথে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকায় আসা প্রথম ইউরোপীয়দের মতেই আফ্রিকার উন্নয়ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের স্বদেশের সাথে তুলনীয়। একটা উদাহরণ শুধু দিই। বেনিনে আসা ডাচরা এর বর্ণনা দিয়েছে এভাবে :

> শহরটা দেখতে দারুণ। ঢুকলেই দেখবেন বিশাল এক প্রশস্ত রাস্তা। পাকা না। আমস্টারডামের ওয়ারমোসের চেয়ে সাত বা আটগুণ প্রশস্ত হবে হয়তো... রাজার প্রাসাদ কয়েকটি দালানের সমন্বয়ে গঠিত। গোটা হার্লেম শহরের সমপরিমাণ জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। এটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। শাসকের মন্ত্রীদের জন্য রয়েছে অসংখ্য কক্ষ এবং দৃষ্টিনন্দন গ্যালারি। এগুলোর বেশির ভাগই আমস্টারডামের এক্সচেইঞ্জের সমান বড়। তামার আবরণ দেওয়া কাঠের খুঁটি দিয়ে দাঁড় করানো। এখানে তাদের যুদ্ধজয়ের ছবি স্থাপিত রয়েছে এবং বেশ যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখা হয়। শহরটি ত্রিশটি প্রধান সড়ক নিয়ে গঠিত। একদম টানটান সোজা এবং ১২০ ফিট চওড়া। অগণিত সব পার্শ্বরাস্তা গেছে এর মাঝে দিয়ে। ঘরগুলো একটা আরেকটার কাছাকাছি, সুন্দর বিন্যাসে সাজানো। পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এই জাতি কোনো দিক দিয়ে ডাচদের থেকে কম না। নিজেদের বাড়িঘর এত ভালো করে ধোয়ামাজা করে যে, আয়নার মতো চকচক করে সেগুলো।

কিন্তু সব জিনিসই বেনিন আর হল্যান্ডে হুবহু একরকম ছিল, এরকম ভাবাটা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। ইউরোপীয় সমাজ ততদিনে অধিকতর আক্রমণাত্মক, সম্প্রসারণবাদী, এবং নতুন নতুন ধরন উদ্ভাবনে অধিক গতিময়। ইউরোপের এই গতিশীলতা বণিক ও নির্মাতা শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। আমস্টারডামের এক্সচেইঞ্জ গ্যালারিতে বসা থাকত ডাচ বার্গাররা—আধুনিক শিল্পকারখানা ও অর্থখাতের বুর্জোয়াদের পূর্বসূরি। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের এই শ্রেণীটি সামন্তপ্রভুদের সামনে বা পাশে ঠেলে দিতে সক্ষম ছিল। তারা রক্ষণশীলতাকে বাতিল করে দেয় এবং এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে পরিবর্তন ছিল এক আরাধ্য বিষয়। প্রযুক্তিতে নব উদ্ভাবনের

এক চেতনা গড়ে ওঠে। উৎপাদনের মাধ্যম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ইউরোপ ও আফ্রিকা যখন বাণিজ্যের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে, পাল্লা তখন ইউরোপের দিকে কিছুটা ঝোঁকানো। এই পাল্লার একদিকে রয়েছে সবেগে ধাবমান এক পুঁজিবাদী সমাজ, অপর পাল্লায় তখনো গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা আরেক সমাজ।

বিস্তারিত দেখুন :

আফ্রিকার অতীত ইতিহাসের ওপর গবেষণা অপ্রতুল অনেক কারণেই। এর সবচেয়ে স্পষ্ট কারণটা হলো উপনিবেশকদের অবহেলা। তারা বহুকাল যাবৎ আফ্রিকার ইতিহাসকে গুরুত্বহীন ভেবে তাচ্ছিল্য করে এসেছে। আরেকটি প্রধান কারণ, আফ্রিকা নিয়ে গবেষণা করেছে মূলত ইউরোপীয় বুর্জোয়া নৃবিজ্ঞানীগণ। "আদিম সমাজ"-এর ব্যাপারে তাদের ধরাবাঁধা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাই আফ্রিকান সমাজকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে ফেলেছে তারা। মাইক্রো-ইউনিটের ওপর মনোযোগ দিতে গিয়ে তারা সার্বিক বিন্যাসের দিকে ফিরেও তাকায়নি। নয়া জমানার আফ্রিকান স্কলারশিপের বয়স বেশিদিন হয়নি। তাই উল্লেখযোগ্য কোনো পালটা জবাব বেরিয়ে আসেনি এখনো পর্যন্ত। নিম্নে উল্লেখিত হাতে-গোনা বইগুলো সেই নতুন চিন্তাপদ্ধতিরই উদাহরণ।

বাসিল ডেভিডসন, *আফ্রিকা ইন হিস্ট্রি*, নিউ ইয়র্ক : ম্যাকমিলান, ১৯৬৮।

হেনরি লাবুরেট, *আফ্রিকা বিফোর দ্য ওয়াইট মেন*, নিউ ইয়র্ক : ওয়াকার অ্যান্ড কোং, ১৯৬৩।

মার্গারেট শিনি, *এনশিয়েন্ট আফ্রিকান কিংডমস*, নিউ ইয়র্ক : সেন্ট মার্টিন'স প্রেস, ১৯৬৫।

কে.এম. পানিক্কার, *দ্য সার্পেন্ট অ্যান্ড দ্য ক্রিসেন্ট*, নিউ ইয়র্ক : এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৩।

ওপরে উল্লেখিত বইগুলো অনাফ্রিকানদের লেখা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সহানুভূতিশীল এবং মূল্যায়ন পর্যাপ্ত। তাই আফ্রিকায় তারা যথেষ্ট সম্মানিত ও তাদের কাজগুলো বহুল-পঠিত। কে. এম. পানিক্কার এক জুড়িহীন দৃষ্টান্ত। এশিয়ান এই বিশেষজ্ঞ পেশাগতভাবেই আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে আগ্রহী।

জে. আজায়ি এবং আই.এসপি (সম্পাদক), *আ থাউজেন্ড ইয়ারস অব ওয়েস্ট আফ্রিকান হিস্ট্রি*, নিউ ইয়র্ক : হিউম্যানিটিজ প্রেস, ১৯৬৯।

বি.এ. ওগোট এবং জে.এ. কিয়েরান (সম্পাদক), *যামানি, আ সার্ভে অব ইস্ট আফ্রিকান হিস্ট্রি*, নিউ ইয়র্ক : হিউম্যানিটিজ প্রেস, ১৯৬৮।

আফ্রিকান ইতিহাসবিদগণ মিলে এই মহাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরছেন।

একেকজন কাজ করছেন একেক অংশ নিয়ে—যেমনটা ওপরের দুটি উদাহরণের ক্ষেত্রে দেখা গেল। দুঃখের ব্যাপার, সবগুলো সমমানের নয়। তা ছাড়া, যিনি যে অংশ নিয়ে কাজ করছেন, সে ব্যাপারে এই আফ্রিকান লেখকরা এখনো সুসমন্বিত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি তুলে আনতে পারেননি।

জি.জে. আফোলাবি ওজ, *ইয়োরুবা কালচার, আ জিওগ্রাফিকাল অ্যানালিসিস*। লন্ডন: ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন প্রেস, ১৯৬৭।

বি.এম. ফেগান, *সাউদার্ন আফ্রিকা ডিউরিং দি আয়রন এইজ*, নিউ ইয়র্ক: প্রেজার, ১৯৭৫।

বই দুটি এমনিতে একটা আরেকটা থেকে আলাদা। কিন্তু তাদের মাঝে একটি বিষয় একইরকম—বস্তুগত পরিবেশের ব্যাপারে সচেতনতা। আফোলাবি ওজো একজন নাইজেরীয় ভূগোলবিদ। আর বি.এম. ফেগান ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ।

৬

ইউরোপীয় পুঁজিবাদী উন্নয়নে আফ্রিকার অবদান (প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ)

ব্রিটিশদের ব্যবসা হলো আমেরিকান বাণিজ্যিক ও নৌশক্তির এক অনিন্দ্যসুন্দর মহাকাঠামো, যা গড়ে উঠেছে আফ্রিকান ভিত্তির ওপর।

—ম্যালাকি পসলথোয়েট, *দি আফ্রিকান ট্রেড, দ্য গ্রেট পিলার অ্যান্ড সাপোর্ট অব দ্য ব্রিটিশ প্ল্যান্টেশান ট্রেড ইন নর্থ অ্যামেরিকা*, ১৭৪৫

আপনি এখন প্রতিবছর আপনার উপনিবেশগুলো থেকে ২০ কোটি লিভ্রা উপার্জন করেন। আপনার হস্তশিল্প নির্মাতাদের খাওয়া-পরা, নৌবাহিনীর ভরণপোষণ, অব্যাহত কৃষিকাজ, আমদানির মূল্য পরিশোধ, বিলাসি চাহিদা পূরণ, ইউরোপ ও এশিয়ার সাথে ব্যবসায় সুবিধাজনক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উপনিবেশগুলোর সাথে ব্যবসাই আপনার মূল ভরসা। এই অর্থ যদি আপনার হারাতে হয়, তাহলে আমি বলব রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

—বিশপ মাউরি (ফ্রান্স); ফ্রান্সের দাসব্যবসা শেষ করা এবং দাস উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করার বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তি; উপস্থাপন করা হয়েছে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে, ১৭৯১।

ইউরোপ যেভাবে বাণিজ্যব্যবস্থার অধিপতি হয়ে উঠল

"অনুন্নয়ন"কে বোঝার অনেক পদ্ধতিই বেশ ভাসাভাসা। এর ফলে উদ্ভূত হয়েছে বহু ভুল ধারণা। তাই আরও এক বার জোর দিয়ে বলে রাখা দরকার যে, উন্নতি ও অনুন্নয়ন কেবলই আপেক্ষিক বা তুলনামূলক পরিভাষা নয়। বরং তাদের

নিজেদের মাঝে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কও রয়েছে। অর্থাৎ, মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তারা একটি আরেকটিকে জন্ম দেয়। পশ্চিম ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে এমন এক সম্পর্ক ছিল, যার ফলে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে সম্পদ স্থানান্তর নিশ্চিত করা হয়। এই স্থানান্তর তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন বাণিজ্য সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক। আর এর জন্য ফিরে যেতে হয় সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে, যখন আফ্রিকা ও ইউরোপ প্রথমবারের মতো পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত হয়। এশিয়া ও দুই আমেরিকার সাথেও অবশ্য তা-ই ঘটেছে। বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী অংশের উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলো সাড়ে চার শতাব্দী যাবৎ পরস্পরের অব্যাহত সংস্পর্শে রয়েছে। তর্কটা এখানে যে—এই সময়কালে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়নে আফ্রিকা ঠিক ততটুকুই সহায়তা করেছে, যতটুকু সহায়তা পশ্চিম ইউরোপ করেছে আফ্রিকাকে অনুন্নত করার ক্ষেত্রে।

বাণিজ্যের আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, পঞ্চদশ শতাব্দীতে এর সূচনাটা করেছে ইউরোপ। তারাই গেছে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে। কোনো চীনা জাহাজ ইউরোপে যায়নি। আর যদি কোনো আফ্রিকান ডিঙি আমেরিকায় গিয়েও থাকে (যেমনটা মাঝেমাঝে ধারণা করা হয়), তাতেও উভমুখী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেটাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়, সেটা ইউরোপীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পেছনকার কৌশল এবং একে জিইয়ে রাখা উৎপাদন—দুইই ছিল ইউরোপীয়দের মুষ্টির ভেতর। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, উত্তর সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সমুদ্রগামী দেশগুলোর কবজায়। বিশ্বের সমুদ্রগামী বাহনের বেশির ভাগ তাদের মালিকানা ও দিক-নির্দেশনার অধীন। চার মহাদেশের মাঝে বাণিজ্যের অর্থায়নকেও নিয়ন্ত্রণ করত তারাই। আফ্রিকা, ইউরোপ, ও আমেরিকার মাঝে ত্রি-মহাদেশীয় যোগাযোগের ব্যাপারে আফ্রিকা তেমন কিছুই জানত না। আন্তর্জাতিক লেনদেনের সার্বিক চিত্রের জ্ঞান একচ্ছত্রভাবে ইউরোপেরই ছিল। কারণ শুধু পশ্চিম ইউরোপই পুরো ব্যবস্থাটিকে দেখতে সক্ষম।

ইউরোপীয়রা তাদের জাহাজ ও কামানের শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীর জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, যেটি পশ্চিম ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে উত্তর আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। পর্তুগিজরা যখন ১৪১৫ সালে জিব্রাল্টারের নিকটে সিউটা দখল করে, তখন তারা মাগরেবের বিরুদ্ধে আক্রমণ জারি রাখে। পরবর্তী ষাট বছরের মধ্যে আরযিলা, আল-কাসরুস সগির, ও তানজিয়ারের মতো বন্দরগুলো দখল ও সুরক্ষিত করে ফেলে তারা। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝে মরক্কোর আটলান্টিক উপকূলের নিয়ন্ত্রণ

চলে যায় পর্তুগিজদের হাতে। এখানকার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সুবিধাকে ব্যবহার করে তারা আরও সমুদ্রপথ খুঁজে বের করার প্রস্তুতি নেয়। এরই হাত ধরে কালক্রমে তারা ১৪৯৫ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে জাহাজ পার করতে সক্ষম হয়। তখনো পূর্ব আফ্রিকাকে ভারত ও বাকি এশিয়ার সাথে সংযুক্তকারী একমাত্র বণিকগোষ্ঠী ছিল আরবরা। পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর পর সেই অবস্থান থেকে তারা আরবদের কিছু মাত্রায় হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পূর্ব আফ্রিকার যত গজদন্ত ভারতে বাজারজাত করা হতো, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার বেশির ভাগই পর্তুগিজরা করেছে। আবার ভারতের কাপড় ও পুঁতির মালা এনে পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় বিক্রি করে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ও ফরাসিরা। ইস্ট ইন্ডিজের কড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এভাবে সাগরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আফ্রিকা ও এশিয়াকে অর্থনৈতিক স্যাটেলাইটে পরিণত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেয় ইউরোপীয়রা।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বিশ্ববাণিজ্যের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ পর্তুগিজ ও স্প্যানিশদের হাতে থাকে। একই সময়ে তারা ভারত থেকে তুলা কেনে, যাতে এর বিনিময়ে আফ্রিকা থেকে দাস ক্রয় করা যায়। এদের দিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্বর্ণের খনিতে কাজ করানো হবে। আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণের একাংশ ব্যবহার করে তারপর মশলা ও রেশম কেনা হবে দূরপ্রাচ্য থেকে। আফ্রিকা যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই জালে আটকা পড়ে যায়, তখন মেট্রোপোল ও নির্ভরশীল দেশের ধারণাগুলো আপনাআপনিই চলে আসে। একদিকে ইউরোপীয় দেশগুলো ঠিক করত আফ্রিকান অর্থনীতি কী ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে আফ্রিকা হয়ে ওঠে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী বাজারেরই এক বর্ধিতাংশ। ইউরোপীয়রা কী কিনতে ও বেচতে রাজি, বিদেশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আফ্রিকা সেটার ওপর নির্ভরশীল।

আফ্রিকাতে ইউরোপ এমনসব পণ্য রপ্তানি করত, যেগুলো ইতিমধ্যে স্বয়ং ইউরোপে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে—ডাচ লিনেন, স্প্যানিশ লোহা, ইংলিশ পিউটার, পর্তুগিজ ওয়াইন, ফরাসি ব্র্যান্ডি, ভেনেশিয়ান কাঁচের গুটি, জার্মান মাস্কেট। যেসব পণ্য ইউরোপে বিক্রির অযোগ্য হয়ে গেছে, সেগুলোও আফ্রিকা মহাদেশে খালাস করতে সক্ষম হয় তারা। ফলে পুরোনো চাদর, ফেলে দেওয়া ইউনিফর্ম, আদিকেলে আগ্নেয়াস্ত্র, এবং আরও অনেক টুকিটাকি হাবিজাবি জিনিস আফ্রিকায় নিশ্চিত বাজার খুঁজে পায়। উন্নততর পণ্য আমদানির জন্য যে দাবি তোলা যায় এবং অর্জনও করে নেওয়া যায়, সে সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হতে থাকে আফ্রিকানরা। ইউরোপীয় জাহাজের ক্যাপ্টেনদের ওপর ওই

অনুযায়ী চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু হামবুর্গ, কোপেনহেগেন, ও লিভারপুলের মতো ইউরোপীয় বন্দরগুলো থেকে সার্বিকভাবে কী ধরনের মালামাল জাহাজে উঠবে, তা একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো ইউরোপের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও ভোগের ধরন অনুযায়ী।

শুরু থেকেই ইউরোপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত প্রদানের মূল কর্তা। একটি ব্যাপার থেকে তা চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। গভীর সমুদ্রে সকল দেশের জন্য আচরণবিধি সহকারে যে তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, তা আসলে ইউরোপীয় আইন ছাড়া কিছুই নয়। এই আইন তৈরিতে আফ্রিকানদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। আর অনেক ক্ষেত্রেই আফ্রিকান জনগণ ছিল স্রেফ ভুক্তভোগী। কারণ আইনমতে তারা নিতান্ত পরিবহনযোগ্য পণ্য। মাঝসমুদ্রে যদি কোনো আফ্রিকান দাসকে সাগরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে একটাই আইনি ঝামেলা দেখা দেয়। তা হলো, জামিনদারের কাছ থেকে দাসবাহী জাহাজটি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে কি না! সবচেয়ে বড় কথা—আফ্রিকা কী রপ্তানি করবে, তাও ইউরোপই ঠিক করে দিত।

পর্তুগিজ জাহাজগুলোর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বর্ণ অনুসন্ধান। সাহারা পেরিয়ে ইউরোপে যে পশ্চিম আফ্রিকান স্বর্ণ যায়, সে ব্যাপারে সর্বজনবিদিত তথ্যটি এর একটি কারণ। আরেকটি কারণ হলো স্রেফ আন্দাজ। পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশে এবং মধ্য আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে পর্তুগিজরা স্বর্ণ আদায় করতে সক্ষম হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে গোল্ড কোস্ট। ওই জায়গায় নির্মিত দুর্গের সংখ্যাই এর সাক্ষী। এই কাজে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর মাঝে রয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও প্রুশিয়ানরাও (জার্মান)। আর ব্রিটিশ, ডাচ ও পর্তুগিজদের মতো ঔপনিবেশিক মহারথীদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

বর্ধমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে স্বর্ণমুদ্রার তুমুল চাহিদা রয়েছে। এজন্যই ইউরোপীয়রা স্বর্ণের জন্য এতটা মরিয়া। ইউরোপীয়দের তৎকালীন জ্ঞান অনুযায়ী, আফ্রিকার খুব সীমিত এলাকা জুড়েই স্বর্ণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাই আফ্রিকার প্রধান রপ্তানিপণ্য হয়ে ওঠে মানুষ। আর কোনো জাতির আর কোনো পণ্যের রপ্তানি এতটা দামি হয়ে উঠেছে, এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। যেমন: সেনেগালে ছিল আঠা, সিয়েরা লিওনে চন্দনকাঠ, আর মোজাম্বিকে হাতির দাঁত। কিন্তু এগুলোকে গোনায় ধরলেও আফ্রিকাকে মূলত মানববন্দির জোগানদাতা বলেই ভাবত ইউরোপ। এই বন্দিদের বিশ্বের বিভিন্ন অংশে দাস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

ইউরোপীয়রা যখন আমেরিকায় পৌঁছায়, তখন তারা সেখানকার সোনা-রুপা ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের অমিত সম্ভাবনা টের পায়। কিন্তু যথেষ্ট শ্রমের জোগান না থাকলে ওই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দান করা যাবে না। স্থানীয় ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী ইউরোপীয়দের নিয়ে আসা বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ সামাল দিতে পারেনি, যেমন গুটিবসন্ত। মাত্রই শিকারি পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা এই জাতিটি উপনিবেশ ও খনিতে দাস হিসেবে শ্রম দেওয়ার ধকলও সইতে পারেনি। ফলে কিউবা ও হিস্প্যানিওলার মতো দ্বীপগুলো থেকে স্থানীয় ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় শ্বেতাঙ্গ হায়েনাদের হাতে। আবার একই সময়ে ইউরোপের জনসংখ্যাও ছিল খুবই কম। আমেরিকার সম্পদ উত্তোলন করতে যে শ্রম দরকার, তা তারা জোগান দিতে অক্ষম। ফলে তাদের মনোযোগ ঘুরে যায় নিকটতম মহাদেশ আফ্রিকার দিকে। কাকতালীয়ভাবে সেখানকার জনগণ আবার থিতু কৃষিকাজে অভ্যস্ত। এছাড়া আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রমের অভ্যাস আছে তাদের। ইউরোপীয় দাসব্যবসা শুরুর পেছনে এগুলোই ছিল লক্ষ্য। আর ঠিক এসব কারণেই ইউরোপের পুঁজিবাদী শ্রেণী নিশ্চিত করে, যেন আফ্রিকা বন্দি রপ্তানিতে দক্ষ হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে এই বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউরোপীয় পুঁজিবাদীরা।

আফ্রিকা কী রপ্তানি করবে, সে সিদ্ধান্ত যদি ইউরোপ দেয়—তাহলে তা নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় ক্ষমতার প্রদর্শনী। কিন্তু সেটাকে শুধুই সামরিক ক্ষমতা ভেবে বসলে ভুল হবে। বাণিজ্যের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলোয় আফ্রিকাকে পদানত করাটা ইউরোপীয়দের কাছে অসম্ভব ঠেকে। উপকূলের কিছু বিচ্ছিন্ন স্থানেই তাদের সাফল্য তখন সীমাবদ্ধ। ইউরোপীয়রা বাস করত তাদের নিজেদের উৎপাদন-ব্যবস্থার ভেতরে, যা সমসাময়িক আফ্রিকার চেয়ে কিছুটা ওপরের ধাপে অবস্থিত। ইউরোপীয় সমাজ তখন সামন্তবাদ ত্যাগ করে পুঁজিবাদের দিকে এগোচ্ছে। আর আফ্রিকান সমাজ তখন প্রবেশ করছে এমন এক পর্যায়ে, যা সামন্তবাদের সাথে তুলনীয়।

পৃথিবীর যে অংশটি সবার আগে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর হয়, তা ইউরোপ। এর ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য স্থানের মানবজাতির চেয়ে বেশ এগিয়ে যায়। এগুলো হলো: বিশ্বজগতের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া, হাতিয়ার নির্মাণ, এবং শ্রমের কার্যকর বণ্টন-বিন্যাস। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে ইউরোপের কৌশলগত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। কিন্তু যে অল্প কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তারা অগ্রগতি অর্জন করে, সেগুলোই পাশার দান উলটে দেয়। যেমন, নীলনদ ও সেনেগালের উপকূলে আফ্রিকান

জাহাজগুলো ছিল বেশ উঁচু মানের। কিন্তু সে যুগে কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্র মহাসাগর, যেখানে চলে ইউরোপীয় জাহাজের আধিপত্য। নাইজেরিয়ার বহু জায়গায় পশ্চিম আফ্রিকানরা ধাতুর জিনিস নির্মাণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন ইউরোপীয়দের সাথে মোকাবিলা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সুন্দরতম পিতলের দ্রব্যটাও জঘন্যতম কামানের কাছে নস্যি। আফ্রিকান কাঠের তৈজসপত্র দেখতে যত চমৎকারই হোক না কেন, ইউরোপের উৎপাদিত পাত্র ও তাওয়ার রয়েছে অনেক বাস্তবসম্মত সুবিধা। সাক্ষরতা, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, এবং অসীম হারে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-সক্ষমতাও ইউরোপের পাল্লা ভারী করে তোলে।

আফ্রিকানদের সাথে বাণিজ্যের শুরুর বছরগুলোতে ইউরোপ থেকে প্রায়ই নিম্নমানের তৈরি-পণ্য আসত। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সেগুলো নতুন বলে আফ্রিকানদের কাছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিউবার দাস উপনিবেশ থেকে পালিয়ে আসা একজন ব্যক্তি এস্টাবান মন্টেজো। তার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, লাল রঙের লোভে পড়ে দাসপ্রথায় বন্দি হয়ে গিয়েছিল তার জাতি। তিনি বলেন :

> আফ্রিকানদের মাথা খেয়েছে টকটকে লাল। কী রাজা, কী প্রজা—সকলে বিনাযুদ্ধে মাথানত করে দেয়। রাজারা দেখল শ্বেতাঙ্গরা পকেট থেকে এসব লাল রুমাল বের করে আনছে। যেন রুমাল নাড়িয়ে ডাকছে তাদের। তখন রাজারা কৃষ্ণাঙ্গদের বলল, "যাও তাহলে, গিয়ে একটা লাল রুমাল নিয়ে এসো।" কৃষ্ণাঙ্গরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, ভেড়ার মতো দৌড়ে গেল জাহাজের দিকে। হয়ে গেল বন্দি।

দাসপ্রথার এক ভুক্তভোগীর এসব কথা বেশি কাব্যিক। এর সোজাসাপটা মানে হলো, কিছু আফ্রিকান শাসক ইউরোপীয় পণ্যকে যথেষ্ট আরাধ্য মনে করেছে। দাস বিক্রির মাধ্যমে এগুলো কিনে নিতে চায় তারা। অচিরেই এক গোষ্ঠীর সাথে আরেক গোষ্ঠীর যুদ্ধ বেঁধে যায়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রির জন্য কয়েদি সংগ্রহ করা। এমনকি কিছু গোষ্ঠীর শাসক তো নিজের প্রজাদের বন্দি করেও বেচে দিতে উদ্যত হয়। দাসদের (এবং শুধুই দাসদের) ব্যাপারে ইউরোপের যে চাহিদা এবং এর বিনিময়ে তারা যেসব পণ্য প্রদান করতে রাজি, এর ফলে এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আফ্রিকান সমাজের মধ্যকার বিভাজনের সাথে এই প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগের ব্যাপারে প্রায়ই বলা হয় যে, আফ্রিকার অভ্যন্তরে

উঁচু-নিচু বিভাজনের ফলে তাদের বিজিত হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। আফ্রিকা যেভাবে দাসব্যবসার সাথে জড়িয়ে যায়, সেটার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি আরও বেশি সত্য। পরিপক্ক সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের একটি ফলাফল হলো জাতীয় ঐক্য। এভাবে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যা আফ্রিকায় হয়নি। আফ্রিকায় যত বেশি রাজনৈতিক বিভাজন ছিল, ইউরোপে ছিল তার চেয়ে অনেক কম। কারণ গোষ্ঠীতন্ত্র মানেই রাজনৈতিক বিভেদ। পরিবারই যেহেতু এই ব্যবস্থার কেন্দ্র, সেহেতু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পেরেছে হাতে-গোনা কিছু রাষ্ট্র। তা ছাড়া আফ্রিকান শাসকের কাছ থেকে দাস পাওয়ার ব্যাপারে কখনো কখনো দুটি ইউরোপীয় দেশ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। প্রতিযোগিতায় যে-ই জিতুক, লাভ কিন্তু ইউরোপেরই। যে ইউরোপীয় বণিকই পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে নামত, সে-ই উপকৃত হতো সেখানকার রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে। যেমন, ছোট যে অঞ্চলটিকে পর্তুগিজরা পরবর্তীকালে গিনি-বিসাউ নাম দেয়, সেখানে ছিল এক ডজনেরও বেশি নৃগোষ্ঠী। তাদের একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া এতই সহজ ছিল যে, ইউরোপীয়রা এই অঞ্চলটিকে "দাসব্যবসার স্বর্গরাজ্য" বলে আখ্যায়িত করে।

আফ্রিকান সমাজে সেরকম খোলাখুলি শ্রেণীবিভাজন ছিল না। তবুও তা ইউরোপের কাজ আরও সহজ করে দেয়। ফলে আফ্রিকা মহাদেশের বিশাল অংশের ওপর তারা নিজেদের বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। শাসকদের এক ধরনের বিশেষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ছিল। তারা যখন ইউরোপীয় পণ্যের গোলকধাঁধায় প্রলুব্ধ হয়ে যায়, তখন এই কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে। এমনকি চড়াও হয় নিজ গোষ্ঠীর প্রজাদের ওপরেও। একদম সরলতম কিছু সমাজে রাজা বলতে কিছুই ছিল না। কিছু কিছু স্থানে ইউরোপীয়রা এরকম মিত্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, যারা তাদের দাস সরবরাহ করে দেবে। যেসব সমাজে শাসক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, সেখানে তাদের সাথে ইউরোপীয়দের যোগসাজশ সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর ইউরোপীয়রা বিদ্যমান শ্রেণীবিভাজনকে আরও শক্তিশালী করতে থাকে। তৈরি করে নতুন আরও অনেক বিভেদ।

উন্নয়নের ভিন্ন এক পর্যায়ে অবস্থানরত ইউরোপীয়রা যখন আগমন করে, আফ্রিকার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য তখন তার দুর্বলতায় পরিণত হয়। তারপরও দাসপ্রথার মাধ্যমে আফ্রিকাকে পদানত করার প্রক্রিয়াটা প্রথম প্রথম বেশ ধীরগতির ছিল। কিছু ক্ষেত্রে আফ্রিকান বিরোধিতা বা অনীহারও মোকাবিলা করতে হয়েছে ইউরোপীয়দের। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে কঙ্গো রাষ্ট্রের রাজা দাসব্যবসার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তোলেন ও এর বিরোধিতা করেন। তিনি

চেয়েছিলেন রাজমিস্ত্রী, যাজক, কেরানি ও চিকিৎসাবিদ। এর বদলে পর্তুগাল থেকে আসতে থাকে একের পর এক দাসবাহী জাহাজ। এক দুষ্ট ব্যবসার সূচনা ঘটে, যেখানে কঙ্গো রাজ্যের একাংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হতে থাকে। কঙ্গোর রাজা ভেবেছিলেন, তার জাতি ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মাঝে ব্যবসায়িক বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক উপকার লাভ করা যাবে। কিন্তু ইউরোপীয়রা তাকে শুধুই মানবপণ্য রপ্তানি করতে বাধ্য করে। একটা ব্যাপার বেশ মজার। বেনিনের ওবা (রাজা) অল্প কিছু নারী বন্দিকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন বটে। কিন্তু পুরুষ যুদ্ধবন্দি বিক্রিতে তিনি একদমই রাজি ছিলেন না। ইউরোপীয়রা প্রচুর দেনদরবার ও চাপাচাপি করে অবশেষে তা আদায় করে। তা না হলে এই যুদ্ধবন্দিরা একসময় বেনিন সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

একবার যখন আফ্রিকার কোনো একটি অংশে দাসব্যবসা শুরু হয়ে যায়, তখন কোনো আফ্রিকান রাষ্ট্রের পক্ষে একা এই পরিস্থিতি পরিবর্তিত করা স্পষ্টতই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাঙ্গোলাতে পর্তুগিজরা অস্বাভাবিক পরিমাণে নিজস্ব সেনা মোতায়েন করে। চেষ্টা করে আফ্রিকানদের কাছ থেকে সেখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার। কোয়াঙ্গো নদীর তীরে অ্যাঙ্গোলান রাষ্ট্র মাতাম্বার গোড়াপত্তন হয় ১৬৩০ সালের দিকে। এটি পর্তুগিজদের প্রতি এক সরাসরি প্রতিক্রিয়ার ফল। রানি এনযিঙ্গার নেতৃত্বে মাতাম্বা চেষ্টা করে অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। কিন্তু পর্তুগাল ১৬৪৮ সালে জয়লাভ করে ফেলে। এর ফলে একা হয়ে পড়ে মাতাম্বা। কিন্তু চিরকাল দূরে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব না। যতদিন তারা পর্তুগিজ বাণিজ্যের বিরোধী, ততদিন তারা প্রতিবেশী আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর কাছে শত্রু। কারণ সেগুলো ইউরোপীয়দের সাথে সমঝোতা করে তাদের সাথে দাসবাণিজ্যে লিপ্ত। ফলে ১৬৫৬ সালে পর্তুগিজদের সাথে পুনরায় ব্যবসা শুরু করেন রানি এনযিঙ্গা। অ্যাঙ্গোলার অর্থনীতিতে ইউরোপীয়দের খবরদারিকে স্বীকার করে নেওয়া হয় এর ফলে।

দাসব্যবসার বিরুদ্ধে আফ্রিকান প্রতিরোধের আরেকটি উদাহরণ বাগা জাতি। বর্তমান গিনি প্রজাতন্ত্র ছিল তাদের বাসস্থান। বাগারা বসবাস করত ছোট ছোট রাষ্ট্রে। প্রায় ১৭২০ সালের দিকে তাদের এক নেতা (যার নাম তোম্বা) এই দাস-পাচার কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য একটি জোট গঠনের চেষ্টা চালান। কিন্তু স্থানীয়ভাবে বসবাসকারী ইউরোপীয় বণিক, মুলাটো, ও অন্যান্য দাস-ব্যবসায়ী আফ্রিকানদের হাতে পরাজিত হন তিনি। তোম্বা ও তার বাগা জাতি ইউরোপীয়দের ঠিক-করে-দেওয়া ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাই স্বভাবতই তা দেখামাত্র পদক্ষেপ নেয় ইউরোপীয়রা। এর

অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ চীনে ইউরোপীয়দের ঘোষিত "আফিম যুদ্ধ"। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা পুঁজিবাদীরা নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য চীনাদের মাদকাসক্ত বানাতে উঠে পড়ে লেগেছিল।

পুঁজিবাদী মেট্রোপোলগুলো অবশ্য অস্ত্রশক্তিকে ব্যবহার করত একদম শেষ উপায় হিসেবে। এমনিতে এসকল নির্ভরশীল অঞ্চলকে বাধ্যগত রাখতে অর্থনৈতিক অস্ত্রই যথেষ্ট ছিল। ডাহোমি ১৭২০-এর দশকে দাসবাণিজ্যের বিরোধিতা করে। ফলে আমদানিকৃত ইউরোপীয় পণ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তাদের। ততদিনে এরকম কিছু পণ্য তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ডাহোমির সবচেয়ে প্রতাপশালী রাজা আগাজা ট্রুডো ইউরোপের দাসব্যবসাকে ডাহোমির স্বার্থের পরিপন্থি বলে মানতেন।

ডাহোমির ভেতরে ও চারপাশে ইউরোপীয়দের দাস-চাহিদা ডাহোমির উন্নয়নের পথে বাধা। তাই ১৭২৪ থেকে ১৭২৬ সালের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ইউরোপীয় দুর্গ ও দাসশিবিরে লুটপাট করেন ও সেগুলো পুড়িয়ে দেন। "দাস উপকূল" থেকে চলমান এই ব্যবসাকে একেবারে সীমিত করে দিতে সমর্থ হন তিনি। কারণ অভ্যন্তরীণ যেসব অঞ্চল থেকে দাসের জোগান আসত, সেসব জায়গায় যাওয়ার পথ তিনি বন্ধ করে দেন। ইউরোপীয় দাস-বণিকরা দারুণ ক্ষেপে যায় এর ফলে। আগাজা ট্রুডোর বিরুদ্ধে তারা বেশ কিছু আফ্রিকান দালালকে টাকা খাইয়েছিল। কিন্তু তাকে উৎখাত করতে বা ডাহোমি রাষ্ট্রকে গুঁড়িয়ে দিতে তারা ব্যর্থ হয়। কিন্তু উলটো দিকে আগাজাও তাদের নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করতে রাজি করাতে পারেননি। যেমন, স্থানীয়ভাবে কৃষিকাজ করা। এদিকে তিনি ইউরোপীয়দের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কড়ি পেতে উদগ্রীব। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ১৭৩০ সালে দাসব্যবসা পুনরায় চালু করতে রাজি হন।

১৭৩০ সালের পর থেকে রাজার তত্ত্বাবধানেই ডাহোমিয়ান দাসবাণিজ্য চলতে থাকে। ফলে আগের চেয়ে বেশ সংকীর্ণ হয়ে যায় এই ব্যবসা। কিন্তু দাসব্যবসার বিরুদ্ধে এত শক্ত একটা প্রচেষ্টাও যে ব্যর্থ হয়ে গেল, এ থেকে প্রমাণিত হয়—সে-সময় কোনো আফ্রিকান রাষ্ট্রের পক্ষে একা একা ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। একে তো আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো আকারে ছোট। তার ওপর রয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক ভেদাভেদ। ফলে ইউরোপীয়রাই ঠিক করে দিতে থাকে যে, বৈশ্বিক উৎপাদন ও বাণিজ্যে আফ্রিকার ভূমিকা কী হবে।

দাসব্যবসা দারুণ অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছে। ইউরোপীয়রা জানে,

তারাই এই ব্যবসা চালিয়ে নিচ্ছিল। আফ্রিকানরা জানে যে, কিছু আফ্রিকান এসব দাসবাহী জাহাজকে সহযোগিতা না করলে এই ব্যবসাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যেত। অপরাধবোধ হালকা করার জন্য ইউরোপীয়রা দাসব্যবসার প্রধান দায়ভার আফ্রিকানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। দাসব্যবসা সম্পর্কে জনৈক ইউরোপীয় লেখকের এক বইয়ের নাম যথার্থই সিনস অব আওয়ার ফাদারস। বহু শ্বেতাঙ্গ তাকে অনুরোধ করেছিল, যেন তিনি দাসব্যবসাকে আফ্রিকান নেতাদের দোষ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইউরোপীয়রা সেখানে ছিল নিতান্ত যুদ্ধবন্দিদের ক্রেতা। যেন ইউরোপীয়দের চাহিদা না থাকলে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দি সাগরপাড়ে আকুল নয়নে বসে থাকত! যাকগে, এসব কথা এই বইয়ের আলোচ্য না। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। ইউরোপ তখন বৈশ্বিক বাণিজ্য-ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাই দাসপ্রথা এবং আটলান্টিক দাসব্যবসার মূল হোতা আর কেউ নয়, এই ইউরোপীয় পুঁজিবাদীরাই।[৫]

আফ্রিকায় এই আদম-ব্যবসা ছিল অনেকগুলো বহিরাগত প্রভাবকের প্রতিক্রিয়া। প্রথমে পর্তুগাল, স্পেন, ও আটলান্টিক দ্বীপসমূহে (যেমন: সাও টোমে, কেইপ ভার্দে, দ্য ক্যানারিজ) শ্রমশক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। এরপর বৃহত্তর অ্যান্টিলিজ এবং স্প্যানিশ-আমেরিকান মূল ভূখণ্ডে লোকবল দরকার পড়ে। কারণ গণহত্যার ফলে সেখানকার ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরপর ক্যারিবিয়ান-সহ বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সমাজের চাহিদা পূরণ করা লাগে। নথিপত্র থেকে জানা যায়, আমেরিকান উপনিবেশের অর্থনীতিতে ইউরোপের শ্রমচাহিদা যত বেড়েছে, আফ্রিকা থেকে দাস রপ্তানি করার হারও বেড়েছে আনুপাতিকভাবে। ডাচরা ১৬৩৪ সালে ব্রাজিলের পার্নামবুকো দখল করে। এরপর ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির পরিচালক সাথে সাথে গোল্ড কোস্টে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে বার্তা পাঠান।

ভোল্টার পূর্বদিকে সংলগ্ন উপকূলে দাসব্যবসা শুরু করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে বলেন তাদের। এরই ফলে জন্ম নেয় অঞ্চলটির কুখ্যাত সেই নাম "স্লেইভ কোস্ট"। ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপগুলো যখন আখ উৎপাদনে জড়িত হয়, তখন একদম প্রথম দিকে সাড়া দেয় গাম্বিয়া। এই ব্যবসা যতদিন চলেছে, পুরোটা সময় জুড়ে এরকম বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ দেওয়া যাবে। আর এতে পূর্ব আফ্রিকাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে

[৫] ৩০০ বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরে ৩৬,০০০ বার জাহাজ আসা-যাওয়া করেছে শুধুমাত্র দাস আনা নেওয়ার জন্য এবং প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন (১ কোটি ২৫ লাখ) আফ্রিকানকে আমেরিকাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 'অপহরণ' করে। আফ্রিকা থেকে ইউরোপ আমেরিকায় এই দাসব্যবসাকে বলা হয় 'ট্রান্স আটলান্টিক দাসব্যবসা'। [www.slavevoyages.org]

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপের বাজার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর ব্রাজিলের মতো স্থানগুলোয় যে চাহিদা উদ্ভূত হয়, তার ফলে মোজাম্বিকান দাসদের বহনকারী জাহাজ চলাচল করত উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে।

পুঁজিবাদী ইউরোপের অর্থনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আফ্রিকার অবদান

বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ইউরোপ যেসকল উপকার লাভ করেছে, সেগুলো সকলেই জানে। কিন্তু ইউরোপীয় উন্নয়নে আফ্রিকার যে বিশাল অবদান, সেটা সাধারণত উল্লেখ করা হয় না। সুনির্দিষ্টভাবে এই বিষয়ে লিখিত রচনাগুলোতেই কেবল এর উল্লেখ থাকে। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ প্রায়শ এমন মনোভাব দেখান, যেন ইউরোপীয় অর্থনীতি পুরোপুরি স্বনির্ভর ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদরা মোটেও সেরকম কোনো বিভ্রাটের শিকার হননি। নিজেদের জাতীয় অর্থনীতি এবং সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বের মাঝে আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে ভালো করেই জানা ছিল তাদের। জে.এস. মিল ব্রিটিশ পুঁজিবাদের এক মুখপাত্র হিসেবে ইংল্যান্ডের ব্যাপারে বলেছেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাণিজ্যকে বিদেশি বাণিজ্য ভাবার সুযোগ নেই বললেই চলে। এটি বরং শহর ও গ্রামের মাঝে পণ্য চলাচলের মতো।" "ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাণিজ্য" বলতে মিল বুঝিয়েছেন আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার বাণিজ্য। কারণ আফ্রিকান শ্রম ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ মূল্যহীন। ইউরোপীয় পুঁজিবাদীরা যেভাবে আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ও লাতিন আমেরিকাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আবদ্ধ করেছে, সে ব্যাপারে কার্ল মার্কসও মন্তব্য করেছেন। আমরা জানি, মার্কস পুঁজিবাদের কঠোরতম সমালোচক। তাই তিনি দেখিয়েছেন, ইউরোপ তার নিজের জন্য ভালো সবকিছু অর্জন করেছে শুধুমাত্র আফ্রিকান ও আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে। মার্কস বলেছেন, "আমেরিকায় সোনা ও রুপা আবিষ্কৃত হওয়া, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা, দাস বানানো ও খনির ভেতর তাদের কবর দেওয়া, আফ্রিকাকে কালো চামড়া শিকারের বাণিজ্যিক ভূমিতে পরিণত করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী যুগের শুভসূচনা ঘটে।"

দাসব্যবসার মাধ্যমে ইউরোপ আসলে যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে, টাকার অঙ্কে তা হিসাব করার কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল। এর সীমা-পরিসীমা নির্ধারিত করাটা সহজ না। কিন্তু মুনাফার পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য। জন হকিন্স

১৫৬০-এর দশকে পশ্চিম আফ্রিকায় তিন বার ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে আফ্রিকানদের চুরি করে এনে আমেরিকায় স্প্যানিশদের কাছে তাদের বিক্রি করেন। প্রথম যাত্রায় ইংল্যান্ডে ফেরার পর তার মুনাফা এত মোটা অঙ্কের ছিল যে, তার পরবর্তী যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন রানি প্রথম এলিজাবেথ। সে উদ্দেশ্যে তিনি জিসাস নামের একটি জাহাজও প্রদান করেন। জিসাস-এ চড়ে আরও কিছু আফ্রিকানকে দাস বানানোর উদ্দেশ্যে রওনা দেন হকিন্স। তারপর এই পরিমাণ লভ্যাংশ নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরেন যে, রানি এলিজাবেথ তাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। শেকলবন্দি এক আফ্রিকানের ছবিকে হকিন্স নিজ পদবির নিশান হিসেবে নির্ধারিত করেন।

হ্যাঁ, কিছু যাত্রা তো ব্যর্থ হয়েছেই। সাগরে হারিয়ে গেছে কিছু দাসবাহী জাহাজ। ব্যবসা মাঝেমাঝে আফ্রিকায় ভালো চলত, মাঝেমাঝে আমেরিকায়। লাভ-ক্ষতি সবকিছু কাটাকাটি করলে শেষমেশ এই ব্যবসা লাভজনক অঙ্কেই ঠেকে। ফলে তা টিকিয়ে রাখা হয় শতকের পর শতক ধরে। অল্প কিছু বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ দাবি করতে চেয়েছে, টাকার অঙ্কে দাসব্যবসা নাকি খুব একটা লাভজনক ছিল না। যেসব উদ্যোক্তাকে অন্যান্য প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী উন্নয়নের বীর সেনানী হিসেবে তুলে ধরা হয়, তারাই নাকি দাসব্যবসার ক্ষেত্রে এসে হয়ে যেতেন বোকার হদ্দ। তাই তারা এমন এক অলাভজনক কাজে কয়েক শতক ধরে ব্যস্ত রেখেছিলেন নিজেদের! শ্বেতাঙ্গ বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ মহলের যুক্তির দৌড় ওই পর্যন্তই। তাই এগুলোকে অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া শুধু পুঁজি জমানোটাই আফ্রিকার সাথে ইউরোপের বাণিজ্যের একমাত্র ফলাফল নয়। বরং এর ফলে ইউরোপের প্রবৃদ্ধির অসংখ্য কারণ তৈরি হয়।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার খনি থেকে সোনা ও রুপা উত্তোলন করা হতো আফ্রিকান দাসদের দিয়ে। পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মুদ্রার যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সেটা পূরণে এসকল সোনা-রুপা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর আফ্রিকান স্বর্ণের বদৌলতে পর্তুগিজরা তাদের নৌপথের খরচ জোগাতে সক্ষম হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে তারা এশিয়ায় যাতায়াত করতে থাকে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচ স্বর্ণমুদ্রা তৈরির প্রধান উৎসও ছিল আফ্রিকান স্বর্ণ। এর ফলে আমস্টারডাম ওই যুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক রাজধানীতে পরিণত হয়। ইংরেজরা ১৬৬৩ সালে নতুন স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করে যে এর নাম রেখেছিল "গিনি", তা কোনো কাকতাল নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে জানা যায়, গিনি ছিল "এককালে যুক্তরাজ্যে প্রচলিত একটি স্বর্ণমুদ্রা। এটি প্রথম প্রচলিত করা হয় ১৬৬৩ সালে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে। পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূল

থেকে আমদানিকৃত সোনা থেকে এটি তৈরি। ব্রিটিশ রাজের এক আদেশবলে বাণিজ্যরত এক কোম্পানি এটি আমদানি করে। এ কারণেই মুদ্রাটির এই নাম।"

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরোটা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় জুড়ে আফ্রিকার শোষণ চলতে থাকে। আফ্রিকান শ্রমের বদৌলতে জমা হতে থাকে পুঁজি। এসকল উৎস থেকে প্রাপ্ত পুঁজি পুনর্বিনিয়োগ হতে থাকে পশ্চিম ইউরোপে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদের নানারকম গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রবৃদ্ধিতে আফ্রিকার অবদান রয়েছে। যেমন : জাহাজ পরিবহন, বীমা, কোম্পানি গঠন, পুঁজিবাদী কৃষি, প্রযুক্তি, এবং যন্ত্রপাতি তৈরি। এর প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, পাঠকদের নজরে তার অনেকগুলো ধরাই পড়ে না। যেমন, ফরাসি দাস-উপনিবেশগুলোয় নতুন বাজার তৈরি হওয়ার ফলে পুনরায় প্রাণ ফিরে পায় ফ্রেঞ্চ সেইন্ট-মেলো ফিশিং ইন্ডাস্ট্রি। আর ইউরোপের পর্তুগিজরা ছিল আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে আনীত নীল, চন্দন, ব্রাজিল কাঠ, ও রঞ্জকের ওপর নির্ভরশীল। তৈরি-পোশাক শিল্পেও ভূমিকা পালন করে আফ্রিকার আঠা। এই শিল্পখাতটি ইউরোপীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির এক অন্যতম শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে স্বীকৃত। তারপর ধরুন, আফ্রিকা থেকে আনা গজদন্ত। লন্ডনের মিন্সিং লেইনের বহু ব্যবসায়ী ধনাঢ্য হয়ে ওঠে এর ফলে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ও উত্তর আমেরিকার শিল্পে কাঁচামাল হিসেবেও কাজ করে এটি। এ থেকে তৈরি হয় ছুরির হাতল থেকে শুরু করে পিয়ানোর চাবির মতো হরেক কিসিমের জিনিস।

আফ্রিকাকে নিজের কক্ষপথে আটকে ফেলার পর পশ্চিম ইউরোপ প্রযুক্তিতে তরতর করে এগিয়ে যেতে শুরু করে। যেমন, ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ জাহাজ-নির্মাণে যে উন্নতি করেছে, তা সেই যুগে তাদের একচেটিয়া সমুদ্রবাণিজ্যের সরাসরি ফল। সে-সময় উত্তর আফ্রিকানরা শুধু ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাতেই আটকে থেকেছে। ইউরোপীয়রা শুরুতে তাদের কাছ থেকে নৌচলাচল সংক্রান্ত বহু প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখেছিল বটে। কিন্তু এর পরে উত্তর আফ্রিকানরা বলার মতো আর তেমন কোনো উন্নতি করেনি। ইউরোপীয়রা যেখানে নিজে থেকে শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত করতে পারেনি, সেখানে তারা ইচ্ছে করে অন্যদের প্রচেষ্টায় বাধ সাধে। যেমন, ইংরেজ নৌচালনা আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে ভারতীয় নৌবাহিনী বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অথচ নতুন ও উন্নততর ইউরোপীয় জাহাজ নির্মাণে যে খরচ হতো, তা আসত ভারত ও আফ্রিকার সাথে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের মুনাফা থেকে। ওলন্দাজরা হালকা ক্যারাভেল জাহাজকে উন্নত করার পথিকৃৎ। এই

জাহাজই স্প্যানিশ ও পর্তুগিজদের আটলান্টিক পাড়ি দিতে সাহায্য করে। এশিয়া, আফ্রিকা, ও আমেরিকায় কার্যক্রম চালানো ডাচ কোম্পানিগুলো ছিল পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে দক্ষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটিশরা ডাচদের জ্ঞান-গরিমাকে ব্যবহার করে স্বয়ং ডাচদেরই টেক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আর তাদের গবেষণাগার ছিল আটলান্টিক। দাসব্যবসাকে বলা হতো ব্রিটিশ নাবিকদের প্রশিক্ষণ-ময়দান। সম্ভবত এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো, নৌপ্রযুক্তির অনবরত উন্নয়নে উদ্দীপনা জুগিয়ে চলে আটলান্টিক বাণিজ্য।

আফ্রিকান বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়টি সবচেয়ে চমকপ্রদ, তা হলো সমুদ্রবন্দর নগরীর উত্থান। এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রিস্টল, লিভারপুল, নান্ট, বর্ডো, ও সেভিল। এসকল বন্দরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে আবির্ভূত হয় বহু উৎপাদন কারখানা, যেগুলোর হাত ধরে একসময় শিল্পবিল্পব সংঘটিত হয়। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রথম কেন্দ্র ছিল ল্যাংকাশায়ার কাউন্টি। আর দাসব্যবসার মাধ্যমে লিভারপুল বন্দরনগরী গড়ে ওঠার ফলেই ল্যাংকাশায়ারের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

দাসপ্রথা ও ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদী অগ্রগতির মাঝে যে সম্পর্ক, এরিক উইলিয়ামস তার বিখ্যাত বই *ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড স্লেভারি*-তে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। দাসদের বেচাকেনা ও শোষণের মাধ্যমে ইংল্যান্ড যে অসংখ্য সুবিধা লাভ করেছে, তার এক স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। এসকল সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তি ও পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানকে তিনি নাম ধরে ধরে উল্লেখ করেছেন। এরকম দুটি বিশিষ্ট উদাহরণ হলেন ডেভিড ও আলেকজান্ডার বারক্লে। তারা ১৭৫৬ সালে দাসব্যবসায় জড়িত হন এবং পরবর্তীকালে সেই লুটের মালে গড়ে তোলেন Barclays ব্যাংক। লয়েডদের ক্ষেত্রেও ঘটে অনুরূপ ঘটনা। দাসব্যবসার মুনাফায় ডুব দিয়ে ওঠার পর তারা লন্ডনের এক ছোট্ট কফি হাউজ থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব্যাংকিং ও বীমা কর্তৃপক্ষে পরিণত হন। তারপর আছেন জেমস ওয়াট, যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দাস-মালিকদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। তারা তার বিখ্যাত স্টিম ইঞ্জিনের অর্থ জোগানদাতা। তাদেরই অর্থায়নে এই জিনিসটি ড্রয়িং বোর্ড থেকে উঠে কারখানায় গিয়ে পৌঁছায়।

ফরাসি পুঁজিবাদ ও দাসব্যবসার বিস্তারিত অধ্যয়ন থেকেও উঠে আসবে একইরকম চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বিদেশি বাণিজ্যের ২০ শতাংশই ঘটত ওয়েস্ট ইন্ডিজে। বর্তমানে গোটা আফ্রিকাও অত বড় অংশের অধিকারী নয়। আটলান্টিক বাণিজ্যে প্রতিটা ইউরোপীয় রাষ্ট্রই যে তার সংশ্লিষ্টতার

অনুপাতে মুনাফা হাসিল করত, তা না। পর্তুগিজরা বৈদেশিক বাণিজ্য করে যে পেল্লায় মুনাফা কামাই করেছিল, তা দ্রুতই চলে যায় আরও বেশি উন্নত পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোর হাতে। তারা পর্তুগালকে পুঁজি, জাহাজ, ও ব্যবসায়িক পণ্যের জোগান দিত। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ও ফ্রান্সের সাথে সাথে জার্মানিও এই দলভুক্ত দেশ।

আফ্রিকান বাণিজ্যের ফলে পশ্চিম ইউরোপের ভেতরে আন্তর্জাতিক সংযোগও দারুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকান উৎপাদও আফ্রিকান শ্রমেরই ফসল। যেমন, ব্রাজিলীয় রঞ্জক কাঠ পর্তুগাল থেকে পুনরায় রপ্তানি করা হতো ভূমধ্যসাগর, উত্তর সাগর, ও বাল্টিকে। এর মাধ্যমে সেগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর কন্টিনেন্টাল (ব্রিটেন বাদে বাকি ইউরোপের) পোশাক শিল্পে প্রবেশ করে। ক্যারিবিয়ান থেকে আসা চিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স থেকে পুনঃরপ্তানি করা হতো ইউরোপের অন্যান্য অংশে। এর ফলে জার্মানির হামবুর্গ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের বৃহত্তম চিনি-শোধনাগারে পরিণত হয়। জার্মানি তাদের তৈরি পণ্য সরবরাহ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও পর্তুগালের কাছে। তারা আবার সেটা আফ্রিকায় পুনরায় বিক্রি করে। নিজেদের মাঝে নানা শ্রেণীর পণ্য আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ও হল্যান্ড। আর ওদিকে আফ্রিকা থেকে বরং স্বর্ণ, দাস, আর হাতির দাঁত আনানোটাই ভালো বলে মনে হয় তাদের কাছে। জেনোয়ার অর্থ-জোগানদাতা ও বণিকরা ছিল লিসবন ও সেভিলের বাজারের পেছনকার আসল শক্তি। আর স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা পালন করে ডাচ ব্যাংকাররা।

সামন্তবাদ যে পুঁজিবাদকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভেতর তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে পশ্চিম ইউরোপে। (পূর্ব ইউরোপে পঞ্চদশ শতকেও সামন্তবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।) ইংল্যান্ডে জমি থেকে শ্রমিকদের বেরিয়ে যেতে হচ্ছিল। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর হয়ে ওঠে কৃষিকাজ। এতে করে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও তুলা উৎপাদিত হতে থাকে, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভরণপোষণ জোগাতে সক্ষম। বিশেষ করে তুলা ও লিনেন শিল্পের অধিকতর সুবিধাজনক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এর ফলে। শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত ভিত্তি যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি পালটে যেতে থাকে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠন। আফ্রিকান বাণিজ্য বেশ কিছু বিষয়কে ত্বরান্বিত করে। পশ্চিম ইউরোপের সেচব্যবস্থা সেগুলোর মাঝে একটি। তাই আফ্রিকা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেই ভূমিকা রাখেনি (যা একটি পরিমাণগত বিষয়), বরং সত্যিকার অর্থে উন্নয়নেও ভূমিকা রেখেছে। এটা এই অর্থে যে,

আফ্রিকার অবদানের ফলে পশ্চিম ইউরোপের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপের দাসব্যবসার আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনা ছাড়া উপায় নেই। কারণ, একে তো এখানকার প্রধান জনগোষ্ঠীটি ইউরোপীয়। তার ওপর, ইউরোপ তার পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে স্থানান্তরিত করতে পেরেছে উত্তর আমেরিকায়। পৃথিবীর আর কোথাও এ ব্যাপারে তারা এতটা সফল হয়নি। এখানে পুঁজিবাদের একটি শক্তিশালী রূপ প্রতিষ্ঠিত করে তারা। আর সেটা সম্ভব হয়েছে স্থানীয় আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করা এবং লাখো আফ্রিকানের শ্রমকে শোষণ করার মাধ্যমে। ব্রিটিশ রাজের মালিকানাধীন আমেরিকান উপনিবেশগুলো ব্যবহৃত হতো ইউরোপের জন্য প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। এই পুঁজি পুনরায় রপ্তানি করে উপার্জন বৃদ্ধি করে ইউরোপ। নতুন বিশ্বের অন্যান্য অংশের উপনিবেশের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণ দিকের উপনিবেশ এবং ব্রিটিশ ও ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত ওয়েস্ট ইন্ডিজে যে দাসব্যবসা হতো, তা থেকে উত্তর দিকের উপনিবেশগুলোও উপকৃত হয়েছে। দাসবাণিজ্য থেকে যে মুনাফা আসত, সেটা ইউরোপ বাদেও প্রথমে যেত বাণিজ্যিক বন্দর ও শিল্প এলাকাসমূহে। অর্থাৎ, প্রধানত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূলের জেলা নিউ ইংল্যান্ড ও নিউ ইয়র্কে। আমেরিকান দাসবাণিজ্যের ওপর এক গবেষণায় ১৮৬২ সালের এক প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন সর্ব-আফ্রিকানবাদী লেখক ডাব্লিও.ই.বি. ডু বোইস :

> দাসব্যবসায় জড়িত মানুষের সংখ্যা এবং এতে ব্যবহৃত পুঁজির পরিমাণ হিসাব করা মানবীয় সাধ্যের বাইরে। বহুদিন পর্যন্ত (১৮৬২) এই কুখ্যাত ব্যবসার প্রধান বন্দর ছিল নিউ ইয়র্ক। পোর্টল্যান্ড ও বোস্টোন শহর তার চেয়ে পিছিয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আমেরিকান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পুরোপুরিই নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর। আর এই বাণিজ্যের এক প্রধান স্তম্ভ ছিল দাসব্যবসা। আঠারোশ ত্রিশের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি আয়ের অর্ধেকই আসত দাসদের উৎপাদিত তুলা থেকে। আবার অষ্টাদশ শতকের আমেরিকান উপনিবেশগুলোর ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আফ্রিকার অবদান এখানে বহুমাত্রিক। একটির সূত্র ধরে আরেকটির আগমন। যেমন : আফ্রিকা, ইউরোপ, ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে নিউ ইংল্যান্ড দাসব্যবসা এবং দাসদের-উৎপাদিত-পণ্যের ব্যবসা করে। এর ফলে তাদের সমুদ্রগামী বণিকদের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা হয়, জাহাজনির্মাণ শিল্পের উন্নতি

ঘটে, নতুন নতুন শহর ও নগর সৃষ্টি হয়, এবং তারা নিজেদের বনাঞ্চল, মৎস্যসম্পদ ও মাটিকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দাস উপনিবেশ এবং ইউরোপের মাঝে ব্যবসার বদৌলতেই আমেরিকান উপনিবেশগুলো একসময় ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। আর আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন যে নিউ ইংল্যান্ডের একটি প্রধান শহর বোস্টোন থেকে শুরু হয়েছিল, তা মোটেও কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার রাজনৈতিক সমৃদ্ধিতে পরোক্ষ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে আফ্রিকা। দাসব্যবসার মুনাফা যেতে থাকে রাজনীতিবিদদের পকেটে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র নামক অঞ্চলটির ওপর ইউরোপীয় আধিপত্য বিস্তারের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আফ্রিকান মুনাফা ও কৃষ্ণাঙ্গদের শ্রম। এই আধিপত্য যদিও বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেইসাথে "ওয়াইল্ড ওয়েস্ট" অঞ্চলটিও অন্তর্ভুক্ত। এখানেই সক্রিয় ছিল কৃষ্ণাঙ্গ রাখালরা।

দাসব্যবসা প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য উপকারী বটে। কিন্তু তা শিল্পোন্নয়নের জন্য অনুপযোগী। দাসদের দিতে হতো রুক্ষ অভঙ্গুর হাতিয়ার, যা কৃষি ও শিল্পের পুঁজিবাদী উন্নয়নের লাগাম টেনে ধরে রাখে। এ থেকেই বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল কেন দক্ষিণের চেয়ে অনেক বেশি শিল্পসুবিধা পাচ্ছিল। দক্ষিণের মাটিতে দাসব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল, তাই। অবশেষে আমেরিকান সিভিল ওয়ারের সময়ে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আগমন ঘটে, যখন উত্তরাঞ্চলের পুঁজিবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা উচ্ছেদের লড়াই শুরু করে। এতে করে পুরো দেশটি একযোগে পুঁজিবাদের উচ্চতর একটি পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে।

দক্ষিণাঞ্চলে যে দাস-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা সার্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ভিত্তির সম্প্রসারণের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শুরু হয় এক সহিংস সংঘাত। এরই সূত্র ধরে আইনত স্বাধীন শ্রমভিত্তিক পুঁজিবাদী সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপ শুধু সেসব স্থানেই দাসপ্রথা জিইয়ে রেখেছিল, যেগুলো ভৌগোলিকভাবে ইউরোপীয় সমাজ থেকে বেশ দূরবর্তী।[৬] ফলে আমেরিকার ভেতর পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের পথে

---

[৬] ১৮৩৩ সালে ব্রিটেনে slavery abolishing act পাশ করা হয়। তবে এর শর্ত ছিল— যেসকল দেশ ইস্ট ইন্ডিয়া 'কোম্পানি'র অধীনে ছিল, সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে না, সেসকল দেশ ব্যতীত। মানে যেসব দেশ থেকে বৃটেনের কাঁচামাল আসে, সম্পদ আসে, সেখানে তারা দাসপ্রথা চালু রাখবে, শোষণ-নির্যাতন করবে। তাদের দেশে তো দাসপ্রথার দরকার নেই, দরকার তো ভারতে, যেখানে কাঁচামাল প্রোডাকশান হয়। ৩০ বছর পরেও ১৮৬২ সালে আসাম-বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা

দাসব্যবস্থা যেভাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, স্বয়ং ইউরোপে তেমনটি ঘটেনি। কিন্তু এমনকি ইউরোপেও এমন একটি সময় আসে, যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের উন্নয়নের জন্য দাসব্যবসা ও আমেরিকায় দাসশ্রমের পেছনে আর কোনো স্বার্থ দেখতে পাচ্ছিল না। ব্রিটেন এই সিদ্ধান্ত নেয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। পরে একই পথে হাঁটে ফ্রান্সও।

উৎপাদনের অন্য যেকোনো ধরনের মতোই পুঁজিবাদও একটি সার্বিক ব্যবস্থা, যার একটি মতাদর্শিক দিক রয়েছে। তাই ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজের মহাকাঠামোর ভেতরকার ধ্যানধারণার বিকাশে আফ্রিকার যে প্রভাব, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। নিঃসন্দেহে এই পরিমণ্ডলের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিকটি হলো বর্ণবাদ। এই জিনিসটি ইউরোপীয় চিন্তায় বিশাল পরিসরে ও গভীরে প্রোথিত উপাদানে পরিণত হয়। বর্ণবাদী কুসংস্কার ও মতাদর্শের প্রচারে দাসপ্রথার ভূমিকাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে কিছু জায়গায়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। একটি জাতি আরেকটি জাতিকে শত শত বছর ধরে দাস বানিয়ে রাখবে, অথচ তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অনুভূতি তৈরি হবে না—এমনটি স্রেফ অসম্ভব। আর ওই দুই জাতির গাত্রবর্ণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য যদি হয় একেবারেই আলাদা, তাহলে তো কথাই নেই। স্বয়ং আফ্রিকার ভেতরেই দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ প্রদেশের ক্ষেত্রে একই কথা খাটে। সেখানে ১৬৫০ সাল থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর সামরিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করে আসছে শ্বেতাঙ্গ লোকেরা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলোতে আফ্রিকান দাসত্ব ও কৃষ্ণাঙ্গদের শোষণের ফলেই যে ইউরোপের সকল বর্ণবাদী কুসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে—এমন ঢালাও মন্তব্য মোটেও সঠিক নয়। ইউরোপের ভেতরে এরও বেশ আগে থেকে ইহুদিবিদ্বেষের অস্তিত্ব ছিল। আবার দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এক জায়গায় হলে কিছু না কিছু সন্দেহ ও অবোধ্যতার অবকাশ থাকেই। কিন্তু কোনো রাখঢাক ছাড়াই দাবি করা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ আদতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমন না যে, একজন কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি নির্দিষ্ট একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। ইউরোপের বর্ণবাদ একগুচ্ছ ধারণার সমষ্টি, যেগুলো সারা পৃথিবীকে সাদা-কালো দুইভাগে ভাগ করে দেখে। এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

মিলিয়ে ৪১ লক্ষ ৫৩ হাজার দাস।

এমনকি ১৮৩৩ সালে দাসপ্রথা বিলোপ আইনের পরও ব্রিটিশরা হাভানা ও রিও-ডি-জেনিরোতে বেড়ী-শিকল রপ্তানি করেছে।

[বিস্তারিত দেখোতে: শামসুল আরেফীন, ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা, মাকতাবাতুল আযহার]

না থাকলেও ধর্মতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানের প্রতিটি পরিমণ্ডলে এগুলোকে পবিত্র বাক্যের মতো তুলে ধরা হয়েছে।

ইউরোপীয়রা বর্ণবাদের কারণে আফ্রিকানদের দাস বানিয়েছে, এটা ভুল ধারণা। ইউরোপীয় কৃষিজীবী ও খনিজীবীরা আফ্রিকানদের দাস বানিয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। যাতে করে তাদের শ্রমকে শোষণ করা যায়। আফ্রিকান শ্রম যদি না থাকত, তাহলে নতুন বিশ্বকে অবিরত সম্পদ-উৎপাদনযন্ত্রে পরিণত করাটা কখনোই সম্ভব হতো না। আর কোনো বিকল্পও ছিল না এখানে। আমেরিকান (রেড ইন্ডিয়ান) জনগোষ্ঠী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তখন। আর ইউরোপের জনসংখ্যা তখন এত কম ছিল যে, বিদেশে গিয়ে লোকালয় গড়ে তোলা তাদের পক্ষে অসম্ভব। ফলে তারা আফ্রিকান শ্রমের ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, এই শোষণের পেছনে বর্ণবাদী যুক্তি খাড়া করা ছাড়া ইউরোপের আর উপায় থাকেনি। তাই আফ্রিকান জনগণের ওপর অর্থনৈতিক কারণে যে অত্যাচার করা হয়, তা বর্ণবাদী অত্যাচারের সহযোগী হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দুটির মাঝে পার্থক্য করাও হয়ে পড়ে দুরূহ।

বিশিষ্ট সর্ব-আফ্রিকানবাদী এবং মার্কসবাদী লেখক সি.এল.আর. জেইমস একবার মন্তব্য করেছেন :

> বর্ণবৈষম্যের প্রসঙ্গটি শ্রেণীবৈষম্যের প্রসঙ্গেরই অধীন। বর্ণবাদকে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি মনে করা মারাত্মক ভুল। কিন্তু বর্ণবাদকে নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা ভাবাটাও ছোটখাটো কোনো ভুল নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পুঁজিবাদী বিশ্বে (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে) সাদা বর্ণবাদ এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে যে, এটিই কৃষ্ণাঙ্গদের নিপীড়ন করার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুনাফা অর্জনের কারণটি চলে যায় দ্বিতীয় সারিতে।

স্বল্পমেয়াদে বর্ণবাদ ইউরোপীয়দের কোনো ক্ষতি করেনি বলেই মনে হয়। ঔপনিবেশিক যুগে নন-ইউরোপীয়দের ওপর আধিপত্যের অজুহাত হিসেবে এই ভ্রান্ত যুক্তিকে ব্যবহার করে তারা। কিন্তু গোঁড়া ও অবৈজ্ঞানিক বর্ণবাদী ধ্যানধারণা যখন আন্তর্জাতিকভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, তখন দীর্ঘমেয়াদে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ইউরোপীয়রা যে তাদের লক্ষ লক্ষ (ইহুদি) ভাইকে নাৎসি ওভেনের ভেতর পুড়তে দিয়েছে, তা ছিল ওই দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবেরই ধারাবাহিকতা। "গণতান্ত্রিক" ইউরোপের ভেতর এহেন আচরণ মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। একদিকে ইউরোপের ভেতরে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রচার এবং অন্যদিকে আফ্রিকানদের ওপর আধিপত্যবাদী ও

ডাকাতসুলভ আচরণ—এ দুয়ের মাঝে চিরকালই বৈপরীত্য বিদ্যমান। "মুক্তি, সাম্য, ভ্রার্তৃত্বে"র নামে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়, কিন্তু কালো আফ্রিকানদের ওপর এসব নীতিকথা প্রযোজ্য হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ও ভারত মহাসাগরে এই ফরাসিরাই দাস বানিয়ে রেখেছিল কৃষ্ণাঙ্গদের। বরং তাদের মুক্তিচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে ফরাসিরা। তাদের বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতারা সোজাসাপটা বলে দিয়েছিল যে, এই আন্দোলন কালোদের জন্য না।

পুঁজিবাদ বিদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলেও তার আঁতুরঘর ইউরোপে করেছে—এমনটাও সত্য নয়। স্বদেশে সে স্বাধীনতার কিছু গৎবাঁধা বুলি আওড়েছে কেবল। কিন্তু বুর্জোয়াদের গামলা চুঁইয়ে তার একটা ফোঁটাও কখনো নিপীড়িত শ্রমিকদের থালায় পড়েনি। আর আফ্রিকানদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছিল, তার ফলে এহেন ভণ্ডামি ইউরোপীয় জীবনের অভ্যাসে পরিণত হয়। বিশেষত শাসক শ্রেণীর মাঝে তো বটেই। নাহলে খ্রিষ্টান চার্চ যে একদিকে দাসপ্রথা জিইয়ে রাখে এবং আরেকদিকে আত্মার মুক্তির কথা বলে—এই জিনিসের আপনি কী ব্যাখ্যা দেবেন! এই ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা দেখা দেয় যুক্তরাষ্ট্রে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ ছিলেন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ক্রিসপাস অ্যাটাকস। দাস ও আজাদ উভয় ধরনের আফ্রিকানই ওয়াশিংটনের সেনাদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারপরও আমেরিকার সংবিধান আফ্রিকান দাসত্ব বহাল রাখাকে বৈধতা দেয়। সম্প্রতি কিছু উদারপন্থি ভেবেই পাচ্ছে না যে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটা দেশ কীভাবে ভিয়েতনামে মি-লাই গ্রামে গণহত্যার আদেশ দিতে পারে। কিন্তু সত্যটা হলো, মি-লাইয়ের ম্যাসাকার সূচিত হয়েছিল আফ্রিকান ও আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের দাস বানানোর মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সূচনার যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকেই বর্ণবাদ, সহিংসতা, ও পাশবিকতা ছিল তার ঘনিষ্ঠ সহচর।

বিস্তারিত দেখুন :

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল ইউরোপের উন্নয়নে আফ্রিকার অবদান। লেখকরা কীভাবে বাস্তবতাকে সীমিতভাবে উপস্থাপন করেন, তার বেশ কিছু কারণ বেরিয়ে আসে এই বিষয়টি থেকে। যেমন, ভাষা ও জাতীয়তা হলো যোগাযোগের পথে দুটি বড় বাধা। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে ফ্রান্স, হল্যান্ড, বা পর্তুগাল দাসব্যবসা-সহ আরও অনেক ধরনের বাণিজ্যে অংশ নিয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আফ্রিকানদের শোষণ করা হয়েছে। এর ফলে উক্ত দেশগুলোতে কীরকম প্রভাব পড়েছে, ইংরেজি ভাষার লেখালেখিতে

সেগুলো প্রায় কখনোই উঠে আসে না। বেশির ভাগ বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের মতো বিষয়গুলো নিয়ে লেখেন ঠিকই। কিন্তু প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ইউরোপীয় দাসব্যবসা যে ভূমিকা রেখেছে, সেটা বেমালুম চেপে যান। মতাদর্শিক ভিন্নতাই এহেন অবহেলার পেছনে দায়ী। মার্ক্স নিজেই বৈদেশিক পুঁজি সংগ্রহের উৎসের ওপর খুব জোরারোপ করেছেন। অথচ এমনকি মার্ক্সবাদীরাও বহুকাল যাবৎ এই বিষয়ে মন দেননি। ইউরোপের ভেতরে সামন্তবাদ থেকে কীভাবে পুঁজির বিবর্তন ঘটেছে, তা-ই নিরীক্ষা করেছেন তারা। আফ্রিকান, এশীয়, ও আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ওপর যে ব্যাপক শোষণ সংঘটিত হয়েছে, সেটার উল্লেখ করেছেন কালেভদ্রে। মরিস ডব এবং ই.জে. হবসবমের মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন।

এরিক উইলিয়ামস, *ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড স্লেভারি*। চ্যাপেল হিল : ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা প্রেস, ১৯৪৪।

সিলভার কক্স, *ক্যাপিটালিজম অ্যাজ আ সিস্টেম*। নিউ ইয়র্ক : মান্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৬৪।

কক্স একজন আফ্রিকান আমেরিকান। তিনি মৌলিক একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে, পুঁজিবাদ বেশ আগে থেকেই একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান লেখক এরিক উইলিয়ামস অত্যন্ত নিপুণভাবে ও খুবই বিস্তারিত আকারে দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ পুঁজিবাদ এবং আফ্রিকানদের দাসত্ব কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত।

ডাব্লিও.ই.বি. *দ্যু বোই, দ্য সাপ্রেশান অব দি আটলান্টিক স্লেইভ-ট্রেড টু দ্য ইউনাইটেড স্টেইটস অব আমেরিকা—১৬৩৮-১৮৭০*। নিউ ইয়র্ক : সোশ্যাল সায়েন্সেস প্রেস, ১৯৫৪।

রিচার্ড পেয়ার্স, *ইয়াংকীজ অ্যান্ড ক্রিওলস : দ্য ট্রেড বিটুইন নর্থ আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিফোর দি আমেরিকান রেভোল্যুশান*। লন্ডন : লংম্যানস গ্রীন, ১৯৫৬।

দাসপ্রথার যুগে যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদের বিকাশে আফ্রিকান শ্রম কীভাবে অবদান রেখেছে, সে সম্পর্কিত উপাত্ত পাওয়া যাবে উভয়টি থেকে।

লিও হিউবারম্যান, *ম্যান'স ওয়ার্ল্ডলি গুডস : দ্য স্টোরি অব দ্য ওয়েলথ অব নেশানস*। নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন : হার্পার ব্রাদার্স, ১৯৩৬।

এফ. ক্লেয়ারমন্টে, *একোনমিক লিবারেলিজম অ্যান্ড আন্ডারডেভেলাপমেন্ট*।

সামন্ততন্ত্র থেকে ইউরোপে কীভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে, হিউবারম্যানের বইটি সে বিষয়ক এক দুর্দান্ত সার্বিক বিশ্লেষণ। এর একটি

পরিচ্ছেদে দাসপ্রথার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ক্লেয়ারমন্টের গবেষণাটি ইউরোপ গঠনে ভারতীয় উপমহাদেশের ভূমিকার স্বীকৃতি।

ফিলিপ ডি. কার্টিন, *দি ইমেইজ অব আফ্রিকা*, ম্যাডিসন : ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন প্রেস, ১৯৬৪।

উইনথ্রপ জর্ডান, *ওয়াইট ওভার ব্ল্যাক : আমেরিকান অ্যাটিচিউডস টুওয়ার্ডস দ্য নিগ্রো।* চ্যাপেল হিল : প্রকাশিত হয়েছে দি ইন্সটিটিউট অব আর্লি আমেরিকান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অ্যাট উইলিয়ামসবার্গের জন্য, ১৯৬৮।

এই দুটি বই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদের উত্থান প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক। অবশ্য কোনোটিতেই বর্ণবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পর্যাপ্ত খোলাখুলি আলোচনা নেই।

৪

ইউরোপ এবং আফ্রিকান অনুন্নতির শেকড় (১৮৮৫ পর্যন্ত)

আফ্রিকার জনগণের দুর্দশা এবং তাদের ওপর শোষণের মাত্রা ও প্রকৃতি স্পষ্টতই পরস্পর সম্পর্কিত। আফ্রিকার শরীরে দাসব্যবসায়ীদের দগদগে অপরাধের চিহ্ন। জনসংখ্যার অভাব এখন পর্যন্ত তার সকল সম্ভাবনাকে টেনে ধরে রেখেছে।

— আহমেদ সেকউ তুরে, রিপাবলিক অব গিনি, ১৯৬২

আফ্রিকার অনুন্নয়নের মৌলিক প্রভাবক হিসেবে ইউরোপীয় দাসব্যবসা

ঔপনিবেশিক শাসনের আগেকার চার শতাব্দী আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে ব্যবসার আলোচনা মানে প্রায় শুধুই দাসব্যবসার আলোচনা। আফ্রিকান ব্যক্তি তখনই দাস হয়েছে, যখন সে দাস হিসেবে কাজ করা একটি সমাজের অংশ হয়েছে। এর আগ পর্যন্ত প্রথমে সে ছিল স্বাধীন ব্যক্তি এবং পরে বন্দি। তারপরও জাহাজে করে আফ্রিকান বন্দিদের নিয়ে যাওয়াকে দাসব্যবসা হিসেবে আখ্যায়িত করা ভুল নয়। এভাবে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, যেখানে তারা ইউরোপীয়দের সম্পত্তি হিসেবে বসবাস করতে থাকে। চলমান পরিচ্ছেদের এরকম শিরোনাম দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য হলো, একটি বাস্তবতার দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করানো। তা হলো, জাহাজে দাসবহনের এই পুরো কার্যক্রম পরিচালিত করেছে ইউরোপীয়রা, তাও আবার তাদেরই নিয়ন্ত্রিত বাজারের উদ্দেশ্যে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই ছিল না এখানে। পূর্ব আফ্রিকা ও সুদান থেকে আরবরা

বহু আফ্রিকানকে ধরে নিয়ে গিয়ে আরব ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেছিল। (ইউরোপীয় বইপুস্তকে) এটি "আরব দাসব্যবসা" নামে পরিচিত। তাহলে ইউরোপীয়রা যখন আফ্রিকানদের ধরে নিয়ে গিয়ে ইউরোপীয় ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে, সেটার নাম নিশ্চয়ই "ইউরোপীয় দাসব্যবসা" হওয়াটাই সমীচীন।

হকিন্সের মতো অল্প কিছু মানুষ ছাড়া সকল ইউরোপীয় ক্রেতাই বন্দিদের খরিদ করত আফ্রিকার বিভিন্ন উপকূল থেকে। তাদের ও আফ্রিকানদের মাঝে এই বিনিময় নিঃসন্দেহে এক প্রকারের ব্যবসা। এও সত্য যে, দেশের ভেতর থেকে উপকূলে জাহাজে ওঠার আগ পর্যন্ত একেকজন বন্দি প্রায়ই কয়েক হাত ঘুরে একাধিকবার বিক্রি হতো। এটাও এক প্রকারের ব্যবসা। কিন্তু আফ্রিকান মাটি থেকে যে উপায়ে বন্দি সংগ্রহ করা হতো, সার্বিকভাবে তা মোটেও ব্যবসা নয়। সেটা করা হতো যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতারণা, ডাকাতি, ও অপহরণের মাধ্যমে। তাই আফ্রিকা মহাদেশের ওপর ইউরোপীয় দাসব্যবসার প্রভাব পরিমাপ করতে হলে একটা ব্যাপার মাথায় রাখা চাই। তা হলো এটা ঠিক আভিধানিক অর্থে ব্যবসা না, বরং সামাজিক সহিংসতা।

দাসব্যবসা এবং আফ্রিকার ওপর এর প্রভাব-সম্পর্কিত অনেক বিষয়ই এখনো ধোঁয়াশা। কিন্তু সার্বিক যে ধ্বংসাত্মক চিত্র, তা একদম সুস্পষ্ট। আফ্রিকা থেকে যে প্রক্রিয়ায় বন্দি সংগ্রহ করা হতো, এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা সেটারই যৌক্তিক পরিণাম। একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয় হলো, আমদানিকৃত আফ্রিকান দাসের সংখ্যাগত অনিশ্চয়তা। বহুকাল এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে কয়েক লক্ষ থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত সংখ্যা। সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, প্রায় এক কোটি আফ্রিকান জীবিত অবস্থায় আমেরিকা, আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ, ও ইউরোপে গিয়েছে। সংখ্যাটা যেহেতু কম, তাই ইউরোপীয় কিছু বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যে এটিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কারণ তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর দীর্ঘ নিপীড়নমূলক ইতিহাসের পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকেন।

ইউরোপীয় দাসব্যবসার মুখের কালি দূর করতে তারা আলোচনা শুরু করেন সংখ্যাটাকে কমিয়ে দেখানোর মাধ্যমে। বিদ্যমান নথিপত্রের ভিত্তিতে আমেরিকায় আমদানিকৃত আফ্রিকানদের যে সংখ্যাই প্রস্তাব করা হবে, সেটাই অত্যন্ত কম হতে বাধ্য। কারণ সে সময়ে এমন বহু লোকের অস্তিত্ব ছিল, দাস-পাচারের সাথে যাদের স্বার্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট। (ফলে তারা তথ্য-উপাত্ত গোপন রাখে।) সে যা-ই হোক, এক কোটি সংখ্যাটাকেই মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে ধরা যাক। এতেও সার্বিকভাবে আফ্রিকায় দাসব্যবসার ব্যাপারে যে

উপসংহার টানা যায়, সেটাও যথেষ্ট ভয়াবহ। যারা ১৪৪৫ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত আফ্রিকানদের ধর্ষণের অভিজ্ঞতাকে হালকা করে দেখাতে চায়, তাদেরও গোমর ফাঁস হয়ে যাবে এর ফলে।

আমেরিকায় গমনকারী আফ্রিকানদের যে সংখ্যাকেই সঠিক ধরা হোক, এখান থেকে বেশ কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে আসা যাবে। এর শুরুটা হবে যাত্রাপথে মৃতের সংখ্যা দিয়ে। আটলান্টিক পার হওয়ার পথটিকে ইউরোপীয় দাসব্যবসায়ীরা ডাকত "মিড্‌ল প্যাসেজ"। কুখ্যাত এই পথ পার হতে গিয়ে যত মানুষ মারা গেছে, তার সংখ্যা মোট যাত্রীর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। বন্দি করার সময় থেকে নিয়ে জাহাজে তোলার মধ্যবর্তী সময়েও সংঘটিত হয়েছে অগণিত মৃত্যু। বিশেষত যখন বন্দিকে উপকূল পর্যন্ত শত শত মাইল ভ্রমণ করতে হতো, সেসব ক্ষেত্রে। সর্বোপরি, বন্দি সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম ছিল যুদ্ধবিগ্রহ। তাই নিহত ও আহত মানুষের সংখ্যা হিসাব করা ছাড়া জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় বিক্রি হওয়া মানুষের সংখ্যা বোঝা যাবে না। তাই সব মিলিয়ে যে সংখ্যা দাঁড়াবে, সেটা আফ্রিকার বাইরে অবতরণকারী লক্ষ লক্ষ সংখ্যার কয়েক গুণ। ইউরোপীয় দাসব্যবসার ফলে ঠিক এই পরিমাণ জনশক্তি ও শ্রমশক্তি বের হয়ে গেছে আফ্রিকা থেকে।

আফ্রিকান শ্রমশক্তির এই বিরাট লোকসান আরও গুরুতর হয়ে ওঠে, কারণ এরা সবাই ছিল সুস্থ-সবল যুবক ও যুবতী। দাসব্যবসায়ীদের পছন্দের বয়সসীমা পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ। বিশের কোঠার দিকে থাকলে আরও ভালো। পুরুষ ও নারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল ২ : ১। ইউরোপীয়রা মাঝেমাঝে আফ্রিকান বাচ্চাদেরও নিত, কিন্তু বৃদ্ধদের একদমই না। সবচেয়ে স্বাস্থ্যবানদের পাঠিয়ে দিত যেখানে-সেখানে। ইতিমধ্যে যারা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছে, কষ্ট করে তাদের বাছাই করত। কারণ এদের আর দ্বিতীয়বার রোগ হবে না। তৎকালীন বিশ্বে এটি ছিল অন্যতম প্রাণঘাতী রোগ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফ্রিকার জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। তাই জনশক্তি লোকসানের ফলাফল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। কিন্তু যত শতক ধরে দাসব্যবসা চলমান ছিল, ওই সময়ে মহাদেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও জানা যায় না। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তখন ঠিকই জনসংখ্যা বাড়ছিল। সন্তান জন্মদানে সক্ষম লাখো মানুষকে যদি এভাবে সরিয়ে নেওয়া না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই আরও শিশুর জন্ম হতো। পাশাপাশি এও স্বীকার করতে হবে যে, আটলান্টিক মহাসাগরভিত্তিক দাসব্যবসাই আফ্রিকার সাথে ইউরোপের একমাত্র সংযোগ

নয়। ভারত মহাসাগরভিত্তিক দাসব্যবসাকে দীর্ঘকাল যাবৎ আখ্যায়িত করা হয়েছে "উত্তর আফ্রিকান দাসব্যবসা" এবং "আরব দাসব্যবসা" নামে। তাই ইউরোপীয় দাসব্যবসার ব্যাপ্তি যে আসলে কত বড়, তা ঢাকা পড়ে গেছে এইসব নামের আড়ালে। পূর্ব আফ্রিকা থেকে আনীত দাসের ব্যবসা সবচেয়ে বেড়ে যায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে। বেশির ভাগ বন্দির গন্তব্য ছিল উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপীয়-মালিকানাধীন বিভিন্ন ঔপনিবেশিক এলাকায়। যেমন মরিশাস, রেউনিয়োঁ, সেশেল্জ এবং আমেরিকা। তা ছাড়া, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকান দাসেরা কিছু কিছু আরব-দেশে মূলত ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সেবক ছিল। কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবসাই দাসদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। যেমন, আরব প্রভুদের তত্ত্বাবধানে যানযিবারে উৎপাদিত লবঙ্গ।

দাসব্যবসার কয়েক শতাব্দী যাবৎ সব স্থান ও গন্তব্য মিলিয়ে আফ্রিকার কী পরিমাণ জনশক্তি ক্ষয় হয়েছে, তার সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারেনি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বাকি সকল মহাদেশে ধারাবাহিকভাবে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ রীতিমতো নজরকাড়া। অবাক করা ব্যাপার হলো, আফ্রিকা এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যার নিম্নলিখিত অনুমান উপস্থাপিত করেছেন (প্রতি লাখে) :

	১৬৫০	১৭৫০	১৮৫০	১৯০০
আফ্রিকা	১০০০	১০০০	১০০০	১২০০
ইউরোপ	১০৩০	১৪৪০	২৭৪০	৪২৩০
এশিয়া	২৫৭০	৪৩৭০	৬৫৬০	৮৫৭০

ওপরের উপাত্তগুলো পুরোপুরি যথাযথ না। কিন্তু গবেষকদের মাঝে এই ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা যায় যে, বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা দীর্ঘকাল যাবৎ অস্বাভাবিক হারে স্থবির হয়ে ছিল। দাসব্যবসা ছাড়া আর কোনো কিছুকেই এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে তুলে ধরা যায় না।

জনসংখ্যার এই বিশাল ক্ষতি নিঃসন্দেহে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে প্রাসঙ্গিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইউরোপীয় উন্নয়নে প্রধান এক ভূমিকা পালন করেছিল। এর ফলে তারা শ্রম, বাজার, ও অধিকতর অগ্রগতির প্রণোদনা লাভ করে। জাপানি জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও ছিল একই ধরনের ইতিবাচক প্রভাব। আর এশিয়ার যেসব অঞ্চল প্রাক-পুঁজিবাদী পর্যায়ে ছিল, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির

ফলে ভূমির ব্যবহার আরও বেশি জোরদার হয়। জনশক্তিবঞ্চিত আফ্রিকায় কস্মিনকালেও এমনটা ঘটেনি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব যতদিন কম ছিল, ততদিন পর্যন্ত শ্রমের একক হিসেবে জমির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষ। এরকম পরিস্থিতিতে উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক যে জনসংখ্যা, এ ব্যাপারে আফ্রিকার জনগণ সচেতন ছিল। মহাদেশের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত এই পর্যবেক্ষণের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া সহজ। যেমন, বেম্বা জাতি ভূমির তুলনায় প্রজাদের সংখ্যাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করত। তানজানিয়ার শাম্বালা জাতির একটি প্রবাদের অর্থ, "রাজাই জনগণ।" এখান থেকেও একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। গিনি-বিসাউর বালান্তা জাতির কাছে কোনো জাতির শক্তি পরিমাপের একক হলো, জমি চাষের জন্য তাদের কাছে বিদ্যমান হাতের সংখ্যা। হ্যাঁ, বহু আফ্রিকান শাসক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীরবে ইউরোপীয় দাসব্যবসাকে মেনে নিয়েছিল বটে। কিন্তু জনসংখ্যা এভাবে ক্ষয় হয়ে যাওয়াটা আফ্রিকান সমাজের জন্য সবদিক দিয়েই ছিল বিপর্যয়কর। কোনো যুক্তিতেই এর অন্যথা বলা সম্ভব না।

জনসংখ্যা ক্ষয়ের ফলে আফ্রিকান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই প্রভাবিত হয়। যেমন ধরুন, মাছিবিশিষ্ট কোনো এলাকায় মানুষের সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কমে গেল। তখন বাকি সবাইকেও ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। দাসব্যবস্থার ফলে এই মানুষগুলো প্রকৃতিকে বশ করা ও ব্যবহার করার যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিল। অথচ এই যুদ্ধই উন্নয়নের একটি ভিত্তিমূল। সহিংসতা মানেই অনিরাপত্তা। বিভিন্ন আফ্রিকান সমাজের মাঝে ও অভ্যন্তরে বিশাল মাত্রায় সামাজিক সহিংসতার এক প্রধান (যদিও একমাত্র না) কারণে পরিণত হয় ইউরোপীয় দাসব্যবসায়ীরা। নিয়মমাফিক যুদ্ধের চেয়ে বরং হামলা ও অপহরণের রূপ ধারণ করে এসকল সহিংসতা। আর এর ফলে বেড়ে চলে ভীতি ও অনিশ্চয়তা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সব ইউরোপীয় শক্তি ভালো করেই জানত যে, বন্দি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড তাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। খোলাখুলি ও পরোক্ষ উভয় উপায়েই তাদের এই সচেতনতার ইঙ্গিত মেলে। এই সময়টায় ব্রিটেন বিশেষ করে চাইত, যেন আফ্রিকানদের দিয়ে রাবার সংগ্রহ ও কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করানো যায়। তাহলে এরপর ব্রিটেন সেগুলো রপ্তানি করতে পারত। দাস দিয়ে তাদের কোনো কাজ নেই। পশ্চিম, পূর্ব, ও মধ্য আফ্রিকায় বন্দি অপহরণ করাটা তখন তাদের উক্ত

উদ্দেশ্যের সাথে মারাত্মকভাবে সাংঘর্ষিক। নিজেদের স্বার্থ যখন জড়িত, তখন ইউরোপীয়রা এই বাস্তবতা ঠিকই স্বীকার করে নেয়। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজ ও ওলন্দাজরা গোল্ড কোস্টে দাসব্যবসাকে বরং নিরুৎসাহিত করত। কারণ এতে করে তাদের স্বর্ণব্যবসা ব্যাহত হবে। কিন্তু ওই শতাব্দীর শেষ দিকে গিয়ে ব্রাজিলে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয়ে যায়। আফ্রিকা থেকে স্বর্ণের জোগানের গুরুত্ব কমে যায় এর ফলে। পুরো আটলান্টিক অঞ্চলে স্বর্ণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দাস। হোয়াইদাস (ডাহোমি) এবং আকরাতে স্বর্ণের বিনিময়ে আফ্রিকান বন্দির চাহিদা তৈরি হয়। ওই সময়ে গোল্ড কোস্টের অর্থনীতির ওপর প্রাধান্য পায় দাসব্যবসা। স্বর্ণব্যবসা ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। দাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আক্রমণ ও অপহরণ কার্যক্রমের ফলে খনিতে কাজ করা অনিরাপদ হয়ে যায়। স্বর্ণ সাথে করে নিয়ে চলাফেরা করাও ঝুঁকিপূর্ণ। স্বর্ণের খনি খননের চেয়ে বেশি লাভজনক হয়ে ওঠে বন্দি অপহরণ। সমসাময়িক এক ইউরোপীয় বলেছেন, "একটা আক্রমণ সফলভাবে করতে পারলেই যেহেতু রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়া যায়, সেহেতু স্থানীয়রা প্রাণপণে যুদ্ধ, ডাকাতি ও লুটপাট করতে শুরু করে। স্বর্ণ খনন ও সংগ্রহের পুরাতন ব্যবসা আর টানে না তাদের।"

স্বর্ণখনন ছেড়ে দাস অপহরণে মত্ত হওয়ার এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় ১৭০০ থেকে ১৭১০ সালের মধ্যে অল্প কয়েক বছরে। এসময় গোল্ড কোস্ট থেকে প্রতি বছর পাঁচ থেকে ছয় হাজার দাসের জোগান মিলত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গোল্ড কোস্ট থেকে রপ্তানিকৃত বন্দির সংখ্যা অনেক কমে যায়। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার, তা ততদিনে হয়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, দাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয়রা পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার একেক অঞ্চলে একেক বার মনোযোগ দিত। আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বেশি দাস-জোগানদাতা ছিল একেক সময়ে একেক অঞ্চল। তার মানে সেনেগাল ও কুনেনা নদীর মধ্যবর্তী যে বিশাল পশ্চিম উপকূল, তার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলই দাসব্যবসার ক্ষেত্রে অন্তত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আর এর যত পরিণাম, সেগুলোও ভোগ করেছে তারা। তা ছাড়া, কিছু দেশ টানা কয়েক দশক যাবৎ গড়ে বার্ষিক কয়েক হাজার করে দাসের জোগান দিয়েছে। যেমন পূর্ব নাইজেরিয়া, কঙ্গো, উত্তর অ্যাঙ্গোলা, ও ডাহোমি। আফ্রিকান প্রেক্ষাপটে এসব অঞ্চলের বেশির ভাগই অপেক্ষাকৃত বেশ উন্নত। আফ্রিকার ভেতর তারা ছিল নেতৃস্থানীয় শক্তি। অথচ এই শক্তিকে তারা নিজেদের উন্নতি এবং গোটা মহাদেশের অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করতে পারত।

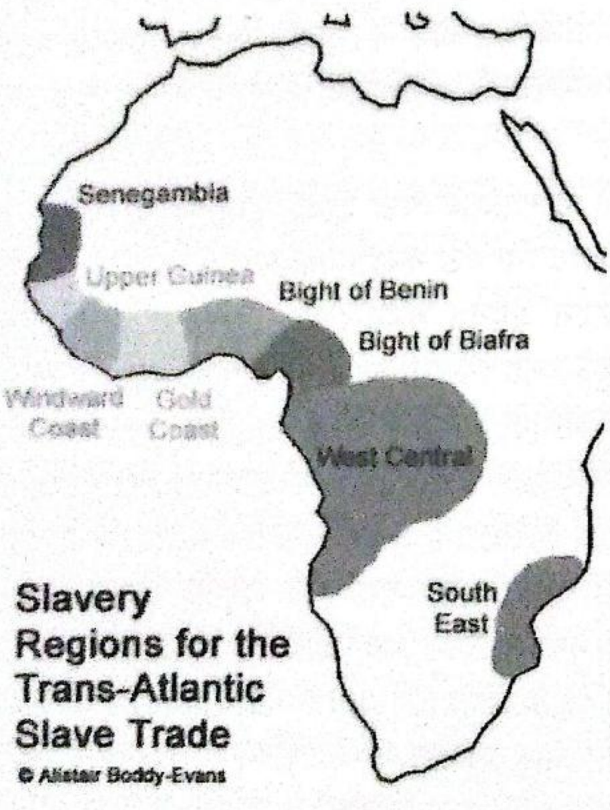
যুদ্ধবিগ্রহ ও অপহরণে মত্ত হওয়ার এই বিষয়টি নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ডের সকল শাখাকেই প্রভাবিত করে থাকবে। বিশেষ করে কৃষিখাতকে। কালেভদ্রে বিশেষ কিছু অঞ্চলে খাদ্যের উৎপাদন বেড়ে যেত, যাতে দাসবাহী জাহাজের চাহিদা মেটানো যায়। কিন্তু পশ্চিম, পূর্ব, ও মধ্য আফ্রিকায় দাসব্যবসার সার্বিক পরিণতি ছিল নেতিবাচক। কৃষিখাত থেকে জনশক্তি শুষে নেওয়া হয়। পরিস্থিতি হয়ে যায় অস্থিতিশীল। বর্তমান টোগোর বিভিন্ন অংশে খাদ্য রপ্তানি করার জন্য ষোড়শ শতাব্দীতে ডাহোমি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিল। সেই তারাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। ঔপনিবেশিক যুগে যখন সুস্থ-সমর্থ লোকদের বিদেশে নিয়ে দাস বানানো হয়, স্বদেশের কৃষি-কর্মসূচি তখন ব্যাহত হতে শুরু করে। প্রায়ই দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। আফ্রিকানদের বর্তমান প্রজন্মের এই ব্যাপারটি ভালো করেই মনে থাকার কথা। দাসব্যবসা মানে এমনভাবে শ্রমশক্তির অপসারণ, যা শতগুণে বেশি নিষ্ঠুর ও বিঘ্নসৃষ্টিকারী।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত হলো, দেশের শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। সাধারণত, এর জন্য চাই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি। তবে ইতিহাসে এমনও সময় গেছে, যখন প্রতিবেশীদের নারী, গবাদি পশু, ও মালামাল লুট করে কোনো জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কারণ এসব "গনিমত" তারা ব্যবহার করত নিজ গোষ্ঠীর উপকারার্থে। আফ্রিকার দাসব্যবসা থেকে এমনকি ওই উপকারটাও পাওয়া যায়নি। বন্দিদের জাহাজে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো বিদেশে। এমনকি ভিন্ন কোনো আফ্রিকান গোষ্ঠীর কাছে না, যারা এসকল বন্দিকে ব্যবহার করে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করতে পারত। নিতান্ত দুর্ঘটনাক্রমে কিছু জায়গার আফ্রিকানরা টের পেয়ে গিয়েছিল যে, এসব বন্দিকে ইউরোপীয়দের কাছে বেচে না দিয়ে নিজেরা রেখে দেওয়াই বেশি লাভজনক। সে যা-ই হোক, দাসব্যবসার ফলে জনসংখ্যার বাকি অংশটি কৃষি ও শিল্পখাতে ভালোভাবে জড়িত হতে পারেনি। এর বদলে তারা পেশাদার দাস-শিকারি ও যোদ্ধাদের নিয়োগ দিতে থাকে। গড়ার বদলে চলতে থাকে ধ্বংস। নৈতিকতার কথা বাদ দিন। মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথাও বাদ। ইউরোপীয় দাসব্যবসা অর্থনৈতিকভাবেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আফ্রিকার উন্নয়নে এর কোনো ভূমিকাই নেই।

কিছু কারণে আলোচনা আরেকটু সুনির্দিষ্ট করা উচিত। পুরো মহাদেশব্যাপী দাসব্যবসার আলোচনার চেয়ে বরং কয়েকটি অঞ্চলে এর বিভিন্ন মাত্রার প্রভাব আলোচনা করা যায়। একেক এলাকায় যে দাস-অপহরণের মাত্রা একেক রকম ছিল, তা সর্বজনবিদিত। বোয়ারদের হাতে কিছু দক্ষিণ আফ্রিকান এবং ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের হাতে কিছু উত্তর আফ্রিকান মুসলিম দাস হয়েছিল

বটে। কিন্তু সেগুলো নগণ্য ঘটনা। মানব-রপ্তানির জন্য সবচেয়ে কুখ্যাত অঞ্চলগুলোর মাঝে প্রথমেই রয়েছে সেনেগাল থেকে অ্যাঙ্গোলা পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার একটি বেল্ট। ভূমির ভেতর দিকে এর দৈর্ঘ্য প্রায় দুইশ মাইল। দ্বিতীয় স্থানে আছে পূর্ব-মধ্য আফ্রিকার একাংশ। বর্তমানে এই অঞ্চলটিতে অবস্থিত দেশগুলো হলো তানজানিয়া, মোজাম্বিক, মালাওয়ি, উত্তর জাম্বিয়া, এবং পূর্ব কঙ্গো। তা ছাড়া, এই অঞ্চলগুলোর ভেতরেও আরও সূক্ষ্ম প্রভেদ করা সম্ভব।



এতে করে মনে হতে পারে যে, দাসব্যবসার ফলে আফ্রিকার কিছু অংশে উন্নয়নের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়েনি। কারণ ওইসব অঞ্চল থেকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল শূন্য অথবা কম। কিন্তু ইউরোপীয় দাসব্যবসা যে পুরো মহাদেশের অনুন্নতির জন্যই দায়ী, এই ব্যাপারটা একদম চোখের সামনে রাখা উচিত। কারণ আফ্রিকার সাথে ব্যবসা না-করা আফ্রিকান জেলাগুলো যে ইউরোপের চাপানো প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পারত, তা না। ইউরোপীয় ব্যবসায়িক পণ্যগুলো পিলপিল করে ঢুকে পড়ত একদম ভেতরের সব অঞ্চলে। আর (তার চেয়ে বড় কথা,) মহাদেশের বড় অংশগুলো মানব-রপ্তানির দিকে ঝুঁকে পড়া মানে অন্যান্য অংশেও এর কোনো-না-কোনো প্রভাব পড়া।

ওপরের চিত্রটি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে কিছু তুলনামূলক আলোচনা থেকে। যেকোনো দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদান একটি অপরটির অবস্থা নির্দেশ করে। তাই একটি খাতে মন্দা দেখা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা কিছুটা হলেও অন্যান্য খাতকে প্রভাবিত করবে। একইভাবে, এক খাতের প্রাচুর্য প্রভাবিত করবে অন্যগুলোকে। জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গে আসি। পরিবেশের একটি পরিবর্তন (যেমন, কোনো এক জাতের শামুক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া)

অন্যান্য এমনসব পরিমণ্ডলে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরস্পর-সম্পর্কহীন। বাস্তুবিদ্যার শিক্ষার্থীরা এই ব্যাপারটি অবশ্যই স্বীকার করবে। আফ্রিকার যেসব অঞ্চল বন্দিরপ্তানি থেকে "ছাড়" পেয়েছিল, তারাও এই বিপুল মাত্রার জনসংখ্যা-পাচারের ফলে প্রভাবিত হওয়ার কথা। সেটাও এমনভাবে, যেটা বোঝা একদমই সহজ নয়। কারণ "কী হয়েছে"র চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো "কী হতে পারত"।

"যদি এমন হতো, তাহলে কেমন হতো?" এরকম কাল্পনিক প্রশ্নগুলো অনেকসময় উদ্ভট অনুমানের জন্ম দেয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন সম্পূর্ণ যৌক্তিক। যেমন "মধ্য আফ্রিকার পুরো বেল্টজুড়ে যদি গণহারে দাসব্যবসা শুরু না হতো, তাহলে বেল্টের ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বারোতসেল্যান্ডের (দক্ষিণ জাম্বিয়া) অবস্থা কেমন হতো?" "কাতাঙ্গিয যদি ইউরোপীয়দের কাছে দাস বেচার বদলে বুগান্ডার কাছে তামা বেচায় মন দিত, তাহলে বুগান্ডার অবস্থা কেমন হতো?"

ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশরা আফ্রিকানদের এই গান গাইতে বাধ্য করত,

জয় ব্রিটানিয়া, ব্রিটানিয়া সাগরের প্রভু,
ব্রিটোনরা হবে না হবে না কারও দাস কভু।

ব্রিটিশরা নিজেরা এই গান গাইতে শুরু করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে। আফ্রিকান দাসের চল তখন তুঙ্গে। "ব্রিটেনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়ে যদি কয়েক শতাব্দী যাবৎ স্বদেশের বাইরে কোথাও দাস হিসেবে কাজ করানো হতো, তাহলে ব্রিটেনের উন্নয়নের মাত্রা কতটুকু হতো?" এই অসাধারণ মানুষগুলো তো হবে না হবে না কারও দাস কভু। তো ব্রিটেন বাদে বাকি ইউরোপ যদি দাসে পরিণত হতো, তাহলে কেমন হতো তাদের উন্নয়ন? তা-ই যদি হতো, তাহলে ব্রিটেন তার নিকটতম প্রতিবেশীদের সাথেও ব্যবসা করার সুযোগ হারাত। হাজার হোক, বাল্টিক ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মতো জায়গাগুলোর সাথে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসার ফলেই ইংরেজ অর্থনীতি প্রথমবারের মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সামন্তবাদের শেষদিকে ও পুঁজিবাদের শুরুর দিকে এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো গতি ছিল না। কারণ তখনো বৈদেশিক ব্যবসার যুগ শুরুই হয়নি। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।

- কিছু ইউরোপীয় (এবং আমেরিকান) বিশেষজ্ঞ ইদানীং আরেকটা কৌশল অবলম্বন করছেন। তাদের মতে ইউরোপীয় দাসব্যবসা নিঃসন্দেহে নৈতিকভাবে মন্দ, কিন্তু তা আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিকভাবে ভালো ছিল। এখানে তাদের অল্প কিছু যুক্তির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি। এ

থেকেই বোঝা যাবে, তাদের কথাগুলো কতটা হাস্যকর। একটা যুক্তি হলো, আফ্রিকান শাসক ও অন্য ব্যক্তিরা বন্দিদের বিনিময়ে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য হাসিল করত। আর এভাবেই "সম্পদ"-এর মালিক হয়ে ওঠে আফ্রিকানরা। এখানে যে বাস্তবতাটা বিবেচনায় নেওয়া হয় না, তা হলো আমদানিকৃত ইউরোপীয় পণ্যগুলো আফ্রিকান পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর বিক্রি স্থবিরও করে দেয়। ইউরোপীয় পণ্যের যে বিশাল তালিকা, তার একটাও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংযোজিত করার মতো না। বরং এগুলো হয় দ্রুত ভোগ করা, আর নয়তো অযথা জমিয়ে রাখার মতো জিনিস। সর্বোপরি, আমদানিকৃত পণ্যের বেশির ভাগই ছিল একদম বাজে মানের। এমনকি ভোগ্যপণ্যগুলোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সস্তা মদ, সস্তা বারুদ, ফুটোয় ভরা পাত্র আর কেতলি, পুঁতির মালা-সহ নানারকম বাছাইকৃত আবর্জনা।

❒ ওপরের যুক্তির সূত্র ধরেই এরপর দাবি করা হয়, কিছু আফ্রিকান রাজ্য ইউরোপীয়দের সাথে ব্যবসার পরিণামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী কিছু পশ্চিম আফ্রিকান রাজ্যকে। যেমন ওয়ো, বেনিন, ডাহোমি, ও আসান্তে। ওয়ো আর বেনিন ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার বহু আগে থেকেই প্রতাপশালী ছিল। ডাহোমি আর আসান্তে ইউরোপীয় দাসব্যবসার যুগেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে বটে। কিন্তু তাদের সেসব অর্জনের শেকড় তারও বহু আগের বছরগুলোতে প্রোথিত। দাসব্যবসার সাফাই-গায়কদের আরেকটি বড় দুর্বলতা দেখুন। ইউরোপীয়দের কাছে বন্দি বিক্রি করার সময়টিতেই কোনো আফ্রিকান রাষ্ট্রের রাজনৈতিকভাবে আরও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার অর্থ এই না যে, এর কৃতিত্ব দাসব্যবসার। কলেরা মহামারিতে কোনো দেশের হাজারো মানুষ মারা গেলেও কখনো দেখা যায় মোট জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধি কলেরার কারণে ঘটেনি, বরং ঘটেছে কলেরা সত্ত্বেও। ইউরোপীয় দাসব্যবসা থেকে আফ্রিকার উপকৃত হওয়া নিয়ে যারা কথা বলে, তারা এই সহজ ব্যাপারটাই ধরতে পারে না। দাসব্যবসার ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে স্পষ্টতই প্রমাণ করা সম্ভব। দাসব্যবসার যুগে যে রাষ্ট্রই আপাত উন্নতি লাভ করেছে, সেটা হয়েছে দাসব্যবসার সকল বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও। আর এই প্রক্রিয়া কলেরার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক। যেমন, ডাহোমির অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এই উপসংহারেই উপনীত হতে হয়। দাসব্যবসায় জড়িত থাকা অবস্থাতেই ডাহোমি তার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তৃত করার

সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল বটে। কিন্তু এহেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির মারাত্মক অপব্যবহার হয়। ফলে আগের চেয়ে বেশ খারাপ হয়ে যায় তার অবস্থা।

- কিছু যুক্তির মূল বক্তব্য : লক্ষ লক্ষ বন্দিকে রপ্তানি করে দেওয়ার ফলে আফ্রিকা নাকি অনাহার থেকে বেঁচে গেছে! এই কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টাও বড় বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এই উদ্ভট যুক্তিরই আরেকটু সূক্ষ্ম এক রূপ আছে, যেটা হয়তো জবাব পাওয়ার যোগ্য। এই যুক্তিমতে, দাসব্যবসার ফলে আমেরিকা মহাদেশ থেকে নতুন ফসলের আগমন ঘটে, যেগুলো পরবর্তীকালে আফ্রিকার প্রধান খাদ্যশস্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য শস্যগুলো হলো ভুট্টা আর কাসাভা। এগুলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকার প্রধান খাদ্যশস্যে পরিণত হয়। কিন্তু এক স্থান থেকে আরেক স্থানে খাদ্যশস্যের বিস্তৃতি পুরো মানব ইতিহাসেরই সাধারণ একটি ঘটনা। বেশির ভাগ ফসলের জন্ম যেকোনো একটি মহাদেশে। তারপর সামাজিক সংস্পর্শের ফলে তা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। দাসব্যবসার এখানে আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই। যেকোনো ব্যবসার ফলাফল একই হতো। আজ ইটালীয়দের প্রধান খাদ্য স্প্যাগেটি আর ম্যাকারোনির মতো (শক্ত) গমজাত খাবার। ওদিকে বেশির ভাগ ইউরোপীয় ব্যবহার করে আলু। মার্কো পোলো চীন থেকে ভ্রমণ করে আসার পর চীনা নুড্‌ল থেকে ইটালীয়রা স্প্যাগেটি-জাতীয় খাবারের ধারণা লাভ করে। ইউরোপীয়রা আলু খাওয়া শুরু করেছে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের দেখে। এসকল উপকার লাভের জন্য ইউরোপকে দাস হতে হয়নি। এগুলো মানবজাতির চিরন্তন ঐতিহ্য। কিন্তু আফ্রিকানদের নাকি ইউরোপকে নমঃ নমঃ করতে হবে, কারণ ওরা আমাদের ভুট্টা আর কাসাভা খাওয়া শিখিয়েছে।

ওপরের সবগুলো যুক্তি সম্প্রতি-প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এগুলো বড় বড় ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ফল। সব ইউরোপীয় বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ হয়তো এভাবে ভাবে না। কিন্তু এগুলো এক ক্রমবর্ধমান প্রবণতার ইঙ্গিত। মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী দেশসমূহে এগুলো চিন্তার মূলধারা হয়ে উঠতে চলেছে। আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বি-উপনিবেশায়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের যে প্রচেষ্টা, তার সাথে এগুলো দারুণভাবে মিলে যায়। একদিক দিয়ে ভাবলে, এসব আবর্জনাকে উপেক্ষা করাই ভালো ছিল। আমাদের যুবসমাজ যেন এগুলোর পঙ্কিল সংস্পর্শে না আসতে পারে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, পুঁজিবাদী প্রকাশক ও বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে

দৃশ্যপট দখল করে রেখেছে। বিশ্বের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা। এটি বর্তমানে আফ্রিকান অনুন্নতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এজন্যই দাসব্যবসার সাফাই-গাওয়া লেখালেখির বর্ণবাদী বুর্জোয়া মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তবতা বা যুক্তির সাথে এসকল প্রোপাগান্ডার কোনো সম্পর্ক নেই, এ কেবল ইতিহাসের প্রশ্ন নয়, বরং আফ্রিকার বর্তমান মুক্তিসংগ্রামের সাথে প্রাসঙ্গিক।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে কারিগরি স্থবিরতা এবং আফ্রিকান অর্থনীতির বিকৃতি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় প্রযুক্তি বাকি বিশ্বের চেয়ে এমন কোনো শ্রেষ্ঠ ছিল না। ইতিমধ্যে ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছিল, যেগুলো ইউরোপীয়দের জন্য খুবই সুবিধাজনক—যেমন জাহাজ-পরিবহন এবং (আরেকটু কম মাত্রায়) বন্দুক। আফ্রিকায় ব্যবসাকারী ইউরোপীয়দের ব্যবহার করতে হচ্ছিল এশিয়ান ও আফ্রিকান ভোগ্যপণ্য। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থা একদম বিশ্বসেরা ছিল না। বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি ব্যাপার হলো, ইউরোপীয়রা ছিল ভারতীয় পোশাকের ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। এগুলো তারা আফ্রিকায় পুনর্বিক্রয় করত। পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা থেকেও কাপড় কিনত অন্যত্র বিক্রি করার উদ্দেশ্যে।

মরক্কো, মৌরিতানিয়া, সেনেগাম্বিয়া, আইভোরি কোস্ট, বেনিন, ইয়োরুবাল্যান্ড, আর লোনাগো সবগুলো অঞ্চলই আফ্রিকার অন্যান্য অংশে জিনিস রপ্তানি করত—ইউরোপীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে। অথচ আফ্রিকা যখন ঔপনিবেশিক যুগে প্রবেশ করে, ততদিনে তাদের প্রায় পুরো মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল তুলা রপ্তানি এবং তৈরিকৃত সুতি পোশাক আমদানির ওপর। এমন অদ্ভুতভাবে গতিপথ পরিবর্তন করার কারণ হলো ইউরোপের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সেই ইউরোপের সাথে ব্যবসার কারণে আফ্রিকার প্রযুক্তিতে স্থবিরতা।

পুরো বিশ্বের পোশাক খাতই একটি ধাপ অতিক্রম করেছে, যখন হাতে-ঘোরানো চরকার মাধ্যমে স্বল্প মাত্রায় উৎপাদন সংঘটিত হতো। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয়া, ও ইউরোপের সার্বিক বিন্যাস এরকমই ছিল। এদের মাঝে এশিয়ানরা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ পোশাক-প্রস্তুতকারী। ভারত

এরকম এক ঐতিহাসিক উদাহরণ। ব্রিটিশরা সেখানকার পোশাকশিল্পকে খুন করার জন্য সবকিছু করেছে, যাতে ভারত-সহ সব জায়গায় ব্রিটিশ পোশাক বিক্রি করা যায়। আফ্রিকার অবস্থা অতটা সোজাসাপটা না। আফ্রিকান পোশাকখাতকে ধ্বংস করতে ইউরোপীয়দের অত বেশি কষ্টও করতে হয়নি। কিন্তু কাজের ধারাটা ছিল একই। ইউরোপ তার বৈদেশিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে প্রযুক্তিগত উপকার লাভ করেছে। আর আফ্রিকা হয় উপকার বাগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে, আর নয়তো উলটো ক্ষতির শিকার হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে পাওয়া মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করার বদৌলতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে শুরু হয় নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। বাণিজ্য আর দাসব্যবসা করে যে প্রাথমিক পুঁজি একাট্টা করা গেছে, সেটা বিনিয়োগ করার ফল নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। আফ্রিকান ও ভারতীয় ব্যবসা ব্রিটিশ শিল্পখাতকে শক্তিশালী করেছে। সেটা আবার ধ্বংস করে দিয়েছে বর্তমান "অনুন্নত" দেশগুলোতে বিদ্যমান শিল্পগুলোকে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ, ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কাপড়ের জন্য আফ্রিকার চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে। তাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড় তো বিক্রি হতোই, ইউরোপ ও এশিয়া থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের জন্যও ছিল যথেষ্ট সুযোগ। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পখাত যেহেতু লালায়িত পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত, সেহেতু তার উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, আর কয়লার শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল রপ্ত করে তারা। ভারত ও আফ্রিকার কেতাদুরস্ত নকশাকে নকল করতে শিখে যায় ইউরোপীয় পোশাকশিল্প। একসময় তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেই জায়গা দখল করে। কালক্রমে আফ্রিকার পোশাক উৎপাদনের সম্প্রসারণকে বন্ধ করে দিতে সফল হয় ইউরোপীয়রা। এর একটি কারণ ছিল আফ্রিকার উপকূল ঘিরে পোশাক বণ্টনের একটা শক্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে পারা। আরেকটি কারণ, বিপুল পরিমাণে কাপড় আমদানি করে আফ্রিকান পণ্যগুলো ডুবিয়ে দেওয়া।

স্বল্পমাত্রার হস্তনির্মাণ প্রযুক্তি থেকে একটা সমাজ কালক্রমে নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করে প্রকৃতির শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখে। এর ফলে শ্রমের কার্যকারিতা বাড়ে। সমাজ কখন এই পরিবর্তনে সক্ষম হয়ে ওঠে, তা নির্ধারিত হয় অনেকগুলো সামাজিক নিয়ামকের সমন্বয়ে। এর মধ্যে অন্যতম হলো হাতে নির্মাণযোগ্য কোনো পণ্যের এত বেশি চাহিদা থাকা, যার ফলে প্রযুক্তি এই সামাজিক চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য হয়। পোশাকের ক্ষেত্রে এই কথাটা খাটে। আফ্রিকান বাজারে ইউরোপীয় পোশাকের আধিপত্য মানে এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা থেকে আফ্রিকান উৎপাদকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। সস্তা

ও সহজলভ্য ইউরোপীয় পোশাকের চাপে পড়ে হস্তনির্মাতারা হয় কাজ করা ছেড়ে দেয়, আর নয়তো নিজেদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে স্থানীয় বাজারের জন্য নতুন ধাঁচ ও ধরন সৃষ্টি করতে শুরু করে। এর ফলে যে ব্যাপারটা ঘটে, তাকেই আমরা বলি "প্রযুক্তিগত স্থবিরতা"। কিছু ক্ষেত্রে স্থবিরতার বদলে বরং পশ্চাদপসরণ তৈরি হয়। কারণ মানুষ তাদের বাপ-দাদাদের সহজসরল কৌশলগুলোও ভুলে যেতে বসে। আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশে লোহা গলানোর ঐতিহ্য ত্যাগ করাটা সম্ভবত প্রযুক্তিগত পশ্চাদপসরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

উন্নয়ন মানে স্বনির্ভর উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সক্ষমতা। অর্থাৎ, অর্থনীতিকে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির আরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের মানদণ্ডে দেখলেও বলতে হয়, আফ্রিকায় শিল্প ও দক্ষতার লোকসান হয়েছিল খুবই সামান্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একটা ধাপে আটকে যাওয়া মানে পরবর্তী ধাপে যাওয়াটাও অসম্ভব হয়ে পড়া। যেই লোক দুই বছর পড়ার পর প্রাইমারি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, সে তো বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যন্ত-পড়ুয়া লোকের চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হবেই। বাণিজ্যের প্রথম শতাব্দীগুলোয় আফ্রিকার যেটা হয়েছে, তা হলো উন্নয়নের সুযোগ হারানো। অথচ এই জিনিসের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চেতনা। এই চেতনা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এরই হাত ধরে সংঘটিত হয় উদ্‌ঘাটন ও উদ্ভাবন। পুঁজিবাদী উন্নয়নের যুগে ইউরোপের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজদের উদ্ভাবনী চেতনার ওপর বেশ জোরারোপ করেন ইতিহাসবিদরা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উদ্ভাবনকে স্রেফ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় না—তারা সক্রিয়ভাবে উদ্ভাবনের প্রবণতাকে পরিচর্যা করে। যেমন, জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের তরুণরা ১৯৫৮ সালে "ইয়াং ইনোভেটরস' ফেয়ার" প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজতান্ত্রিক তরুণদের আহ্বান জানায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতা দেখানোর জন্য। ফলে দশ বছরের মধ্যে দুই হাজারেরও বেশি নতুন উদ্ভাবন উপস্থাপিত করা হয় সেই মেলায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের চেতনা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ইউরোপীয় দাসব্যবসা ছিল প্রত্যক্ষ বাধা। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ তরুণ-

যুবককে সরিয়ে ফেলা হয়, যারা উদ্ভাবন কর্মকাণ্ডের মূল কারিগর। দাস অপহরণের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যারা বাকি রয়ে যায়, তারা মূলত নিজেদের স্বাধীনতার জন্যই ব্যস্ত থাকে। উৎপাদনে উন্নতি ঘটানোর মতো ফুরসত তাদের নেই। তা ছাড়া পশ্চিম, মধ্য, বা পূর্ব আফ্রিকার ব্যস্ততম আফ্রিকান ব্যক্তিটিও উৎপাদনের বদলে ব্যবসা নিয়ে পড়ে ছিল। কারণ ইউরোপের সাথে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতিটাই এমন। এহেন পরিস্থিতি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য সহায়ক না। আফ্রিকার এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় সব মানবগোষ্ঠীও ব্যস্ত হয়ে পড়ে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে। বিশেষ করে উচ্চতর গিনির আফ্রো-পর্তুগিজ মধ্যস্বত্বভোগী, অ্যাকান বাজারের নারীরা, মোজাম্বিকের আরও বণিকরা, এবং পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলি ও ওয়ানিয়ামওয়েযি। বন্দি ও গজদন্তের মতো রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্যবসা করত তারা। এগুলোর জন্য যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে না। এর বাইরে তাদের আরেকটি কাজ ছিল আমদানিকৃত ইউরোপীয় পণ্যের বন্টন-প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা।

ব্রিটেন যখন বিশ্বের নেতৃস্থানীয় অর্থনৈতিক শক্তি ছিল, তখন তাদের বলা হতো দোকানদারদের জাতি। কিন্তু নিজেদের দোকানের বেশির ভাগ পণ্য তারা নিজেরাই উৎপাদিত করত। উৎপাদনের ফলে যখন নানারকম সমস্যার উদ্ভব ঘটে, তখনই কেবল তাদের প্রকৌশলীরা এগিয়ে আসে নানারকম উদ্ভাবন নিয়ে। আফ্রিকায় ব্যবসারত গোষ্ঠীগুলো প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকার ফলে উৎপাদনের পেছনে শক্তি ও মেধা খরচ করতে পারেনি তারা।

উদ্ভাবনের পাশাপাশি প্রযুক্তি ধার করার ব্যাপারটিও বিবেচনায় নিতে হবে। একটা সমাজ যে কারণেই হোক, প্রযুক্তিতে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়লে ধার নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সমান হতে চায়। স্বতন্ত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে না। মানবজাতির বড় কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মানুষ আলাদা আলাদাভাবে আবিষ্কার করেছে—এরকম উদাহরণ বিরল। একবার যখন কোনো সূত্র বা হাতিয়ার উদ্ভাবিত হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে তা অন্যান্য জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে এত শতাব্দী ধরে দুই মহাদেশের মাঝে যোগাযোগ থাকাকালীনও ইউরোপীয় প্রযুক্তি আফ্রিকায় ঢুকতে ব্যর্থ হলো কেন? মৌলিক কারণটা হলো, আফ্রো-ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রকৃতিটাই এরকম। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে আফ্রিকান প্রাক-পুঁজিবাদী (গোষ্ঠীতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, ও প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক) উৎপাদন-ব্যবস্থায় ইতিবাচক ধ্যানধারণা ও কলাকৌশল স্থানান্তরের জন্য এটা অত্যন্ত প্রতিকূল।

একমাত্র যে অ-ইউরোপীয় সমাজটি ইউরোপের কাছ থেকে ভালোভাবে ধার করতে পেরেছে এবং নিজেরাও পুঁজিবাদী হয়ে উঠেছে, তা হলো জাপান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাপান নিজেই ছিল অত্যন্ত উন্নত এক সামন্তবাদী সমাজ, যেটি তখন পুঁজিবাদের নিজস্ব এক সংস্করণের দিকে অগ্রসরমান। এখানকার জনগোষ্ঠী কখনোই ইউরোপীয়দের হাতে দাস বা উপনিবেশায়িত হয়নি। আর তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কও ছিল বেশ সুবিধাপূর্ণ। যেমন, জাপানি তৈরি-পোশাক উৎপাদকদের জন্য প্রণোদনা হিসেবে ছিল তাদের নিজস্ব ও ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বাজার। দেশের বাইরে এশিয়া ও ইউরোপেও ছিল কিছু না কিছু চাহিদা।

এহেন পরিস্থিতিতে উদীয়মান জাপানি পুঁজিপতি শ্রেণী (যেখানে বহু সাবেক সামন্তবাদী জমিদারও অন্তর্ভুক্ত) ইউরোপের কাছ থেকে প্রযুক্তি ধার করে। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সফলভাবে আত্মস্থ করে নেয় সেগুলোকে। আফ্রিকা ইউরোপীয় প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারত, যদি তার চাহিদাটা তৈরি হতো আফ্রিকার ভেতর থেকে। বিশেষ করে এমন কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে, যারা নতুন প্রযুক্তিতে মুনাফা দেখতে পায়। এই ব্যাপারটা বোঝাতেই জাপানের উদাহরণ টানা হলো। ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে প্রযুক্তি স্থানান্তরিত করার আগ্রহ যেমন থাকতে হবে, তেমনি সেই প্রযুক্তি ব্যবহার ও আত্মস্থ করতে পারার মতো আর্থ-সামাজিক কাঠামোও থাকতে হবে আফ্রিকায়।

হাতি বা বন্দি শিকার করার জন্য আফ্রিকায় আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আর কোনো প্রযুক্তির চাহিদা সৃষ্টি হয়নি। বিদেশি বাণিজ্যের সাথে যেসকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িত ছিল, সেগুলো হয় ধ্বংসাত্মক (যেমন দাসব্যবসা), আর নয়তো বড়জোর শিকার ও কাটাকাটি ধাঁচের (যেমন হাতির দাঁত শিকার বা চন্দন কাঠ সংগ্রহ)। তাই ইউরোপীয় দক্ষতা শিখে সেগুলো কাজে লাগানোর কোনো প্রয়োজন পড়েনি। নেতিবাচক প্রকৃতির রপ্তানিকর্ম যদি পুরোপুরি বন্ধ না করা হয়, তাহলে আফ্রিকান অর্থনীতিতে এসকল দক্ষতা ব্যবহারের কোনো অবকাশই থাকবে না। একটা দারুণ বিষয়কে প্রায়ই অগ্রাহ্য করা হয় যে, কিছু জায়গার কয়েকজন আফ্রিকান শাসক এই পরিস্থিতি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিল। অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য ইউরোপীয় প্রযুক্তি গ্রহণ করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু এর অর্থ হলো, প্রযুক্তির বিনিময়ে দাসব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া।

ইউরোপীয়রা ইচ্ছে করেই সেসব আফ্রিকান অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে। এমনটি ঘটেছিল ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে কঙ্গোতে। ইথিওপিয়াতেও

একই ঘটনা ঘটেছিল, যদিও ইথিওপিয়ার সাথে ইউরোপীয়দের কোনো দাসব্যবসা ছিল না। এক পর্তুগিজ প্রতিনিধিদল ১৫২০ সালে রাজদরবারে যায়। পর্তুগিজদের তরবারি, মাস্কেট, পোশাক, বইপত্র, ও অন্যান্য জিনিস পরখ করে দেখেন সম্রাট লেবনা ডেঙ্গেল। ইথিওপিয়ায় ইউরোপীয় কারিগরি জ্ঞানের প্রচলন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তিনি। সম্রাট ও ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যে বার্তা আদানপ্রদান চলে। এই শাসকদের মধ্যে রয়েছেন পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েল ও তৃতীয় জন, পোপ দশম লিও প্রমুখ। সম্রাট অনুরোধ করেন, যেন ইথিওপিয়ার শিল্পখাতে ইউরোপ সহযোগিতা করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তক এসকল অনুরোধ বারবার করে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু তেমন কোনো সাফল্য ছাড়াই।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এরকম আরও দুটো উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে আফ্রিকান শাসকরা ইউরোপীয় প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ দেখায়। দাসবাহী জাহাজ না চেয়ে বরং নতুন দক্ষতা শিখতে চায় তারা। ডাহোমির আগাজা ট্রুডো দাসব্যবসা বন্ধ করে দিতে চান এবং ইউরোপীয় হস্তশিল্পীদের কাছে আবেদন জানান। এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন প্রতিনিধিকে পাঠান লন্ডনে। জনৈক ইউরোপীয় ব্যক্তি ১৭২০-এর দশকে ডাহোমির রাজদরবারে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার স্বদেশিদের বার্তা পাঠান, "যদি কোনো দর্জি, কাঠমিস্ত্রি, কামার বা অন্য যেকোনো শ্বেতাঙ্গ এখানে আসতে ইচ্ছুক থাকে, তাহলে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এক পরিবেশের দেখা পাবে।" আসান্তের ওপোকু ওয়ারেও (৭২০-৫০) ইউরোপীয়দের অনুরোধ করেন, যেন তারা আসান্তেতে কারখানা ও শোধনাগার স্থাপন করে। কিন্তু এগুলোর কোনো জবাবই পাননি তিনি।

জাপানের ইতিহাস মাথায় রাখলে লক্ষণীয় যে, কৌশলগত সহযোগিতার প্রথম অনুরোধগুলো আসে ইথিওপিয়া ও কঙ্গো সাম্রাজ্যদ্বয় থেকে। এ দুটি সাম্রাজ্য ষোড়শ শতাব্দীতে যে অবস্থায় ছিল, তা নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় সামন্তবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তুলনীয়। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হলো, তারা তখনো পুঁজিবাদের বীজ উৎপন্ন করেনি। অষ্টাদশ শতকে আফ্রিকান রাষ্ট্র ডাহোমি ও আসান্তে বেশ প্রতাপশালী হয়ে ওঠে। গোষ্ঠীতান্ত্রিক পর্যায় অতিক্রম করে এক ধরনের সামন্তবাদী শ্রেণীবিভাজন অর্জন করে তারা। স্বর্ণ, লোহা, ও পোশাকের মতো নানারকম কাজের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন পৃথক কর্মীশ্রেণী। ওপোকু ওয়ারের নেতৃত্বে আসান্তে সমাজের উদ্ভাবন-সক্ষমতা ততদিনে বেশ স্পষ্ট। আমদানিকৃত রেশম নিয়ে গবেষণা করে তারা এর সাথে সুতি কাপড়ের সমন্বয় ঘটিয়েছে। তৈরি করেছে বিখ্যাত কেন্টল কাপড়। মোটকথা, এরকম আফ্রিকান সমাজগুলো সুযোগ পেলে বিনাক্লেশে ইউরোপীয়

কারিগরি দক্ষতা শিখে নিতে পারত। তাদের ও ইউরোপের দক্ষতার মাঝে তখন যে সামান্যই ব্যবধান ছিল, সেটাও খুব সহজে পূরণ করে ফেলতে পারত তারা।

ঊনবিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার বেশ পরেও আফ্রিকা এরকম ব্যবহারিক সহযোগিতার আবেদন করে যেতে থাকে। যথারীতি সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে যেতে থাকে ইউরোপীয়রা। অথচ ততদিনে আফ্রিকান শাসক ও ইউরোপীয় পুঁজিবাদী উভয় পক্ষই দাসব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে (পূর্ব নাইজেরিয়ার) কালাবারের এক রাজা ব্রিটিশদের কাছে চিঠি লিখে একটি চিনি-শোধনাগার স্থাপনের অনুরোধ জানান। আর ১৮০৪ সালের দিকে ডাহোমির রাজা আদান্দোযান সাহস করে একটা আগ্নেয়াস্ত্র-কারখানার অনুরোধও করে বসেন! ততদিনে কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকার বহু অংশই যুদ্ধে যাচ্ছে ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদ সহকারে। ডাহোমিতে প্রবাদ তৈরি হয়ে যায়, "বারুদ আছে যার, যুদ্ধজয় তার।" এর মাধ্যমে কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হলো যে, অস্ত্রপ্রযুক্তির ময়দানে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের সামনে আফ্রিকার পতন অত্যাসন্ন। ইউরোপীয়রাও ভালো করেই জানত, তাদের অস্ত্রপ্রযুক্তি এখন ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে। তাই তারা আফ্রিকানদের আগ্নেয়াস্ত্র আর গোলাবারুদ বানানো শেখাতে রাজি হবে, তার লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই।

ইউরোপের সাথে আফ্রিকার বাণিজ্যের যে পরিস্থিতি, সেটা প্রযুক্তির চাহিদা তৈরির প্রতিকূল। তাই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রযুক্তির প্রতি ধারাবাহিক চাহিদা সৃষ্টি হয়নি আফ্রিকায়। যারাও-বা চাহিদার কথা জানিয়েছে, পুঁজিবাদীরা তাদের অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করে গেছে। যত যা-ই হোক, আফ্রিকার উন্নয়ন ঘটানোটা পুঁজিবাদের স্বার্থবিরোধী। আরও সাম্প্রতিক সময়ের উদাহরণও দেখানো যায়। কোয়ামে এনক্রুমার নেতৃত্বাধীন ঘানার জন্য ভোল্টা নদী বাঁধ তৈরি করে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে পশ্চিমা পুঁজিবাদীরা। পরে চেকোস্লোভাকিয়ানরা সেই কাজ করে দিতে রাজি হয়েছে। মিশরের জন্য তারা আসওয়ান বাঁধ তৈরি করে দিতেও রাজি হয়নি। শেষে তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। একইভাবে, তানজানিয়া থেকে জাম্বিয়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের পথেও তারা বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই আফ্রিকান কৃষক-শ্রমিকদের সাথে সংহতি জানাতে এগিয়ে এসেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন। পুরো ব্যাপারটাকে ইতিহাসের সাপেক্ষে দেখলে বুঝবেন, পুঁজিবাদ চিরকালই আফ্রিকার প্রযুক্তিগত বিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকাকে কখনো তারা নিজেদের প্রযুক্তির ধারেকাছে আসতে দেয়নি। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখব, আফ্রিকায় পুঁজিবাদ তার বস্তুগত

সংস্কৃতির সীমিত কিছু জিনিসকে ঢুকতে দিয়েছে। শোষণ জোরদার করার জন্য দরকারি ছিল এগুলো। কিন্তু পুঁজিবাদের সার্বিক প্রবণতা ছিল আফ্রিকাকে প্রযুক্তিতে অনুন্নত করে রাখা।

ইউরোপীয় দাসব্যবসা এবং সার্বিকভাবে পুরো বৈদেশিক বাণিজ্যই ইউরোপের উন্নয়নে খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একে রীতিমতো বলা চলে "গুণোত্তর প্রভাব"। অর্থাৎ, বিদেশি সংস্পর্শের উপকারী প্রভাব ইউরোপীয় জীবনের এমনসব জায়গাতেও পড়েছে, যেগুলো সরাসরি বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত না।

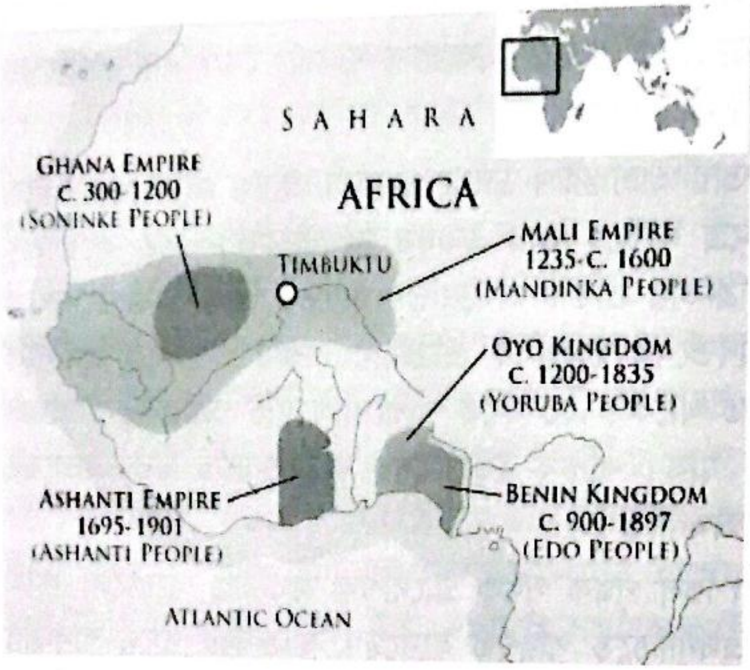
পুরো সমাজটাই তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য আরও বেশি প্রস্তুত হয়ে ওঠে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে ঘটেছে তার একদম বিপরীতটা। এতে করে শুধু প্রযুক্তিই না, বরং আফ্রিকার প্রতিটি অর্থনৈতিক খাতের আকৃতি ও উদ্দেশ্যও প্রভাবিত হয়েছে। বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটি অঞ্চলের অর্থনীতি ধীরস্থিরভাবে বড় হতে থাকে। এর ফলে পাশাপাশি দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল একসময় একত্র হয়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে ঠিক এভাবেই তৈরি হয়েছে জাতীয় অর্থনীতি।

একসময় যেগুলো ছিল পৃথক পৃথক প্রাদেশিক অর্থনীতি, সেগুলো ক্রমে একত্র হয়ে দেশের অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। আফ্রিকার সাথে ব্যবসার ফলে ইউরোপের দেশগুলোর জাতীয় অর্থনীতি হয়েছে আরও সুসংহত। কিন্তু আফ্রিকায় স্থানীয় পর্যায়ে দেখা দিয়েছে বাধাবিঘ্ন ও বিচ্ছিন্নতা। আবার, একেকটা স্থানীয় অর্থনীতিও আর সেখানকার অধিবাসীদের চাহিদা মেটানোর জন্য কাজ করেনি। করলেও সেটা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকেনি। আর (ওই জায়গার আফ্রিকানরা সেটা স্বীকার করুক বা না করুক,) তাদের অর্থনীতি বৈদেশিক স্বার্থের সেবা করে গেছে কেবল। সেইসাথে তারা হয়ে পড়েছে পশ্চিম ইউরোপের ওইসকল বৈদেশিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। গোটা আফ্রিকান অর্থনীতি অতীতে উন্নয়নের যে পথ ধরে এগোচ্ছিল, তা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। হয়ে যায় বিকৃত।

বর্তমানে আফ্রিকায় সত্যিকারের শিল্পায়ন কেন সহজে সম্ভব না, তার কিছু প্রধান কারণ এখন সর্বজনবিদিত। প্রথমত, যেকোনো আফ্রিকান দেশেই তৈরি-পণ্যের বাজার অত্যন্ত ছোট। দ্বিতীয়ত, আফ্রিকার বড় অংশজুড়ে বাজারগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের সমন্বয় নেই। একদম শুরু থেকে ইউরোপের সাথে আফ্রিকার সম্পর্ক যেরকম ছিল, তা স্থানীয় বাজার সমন্বয়ের একদম বিপরীত দিকে কাজ করেছে। মহাদেশটিতে স্থাপিত কিছু আন্তর্জাতিক সংযোগ পঞ্চদশ

শতাব্দীর পরে ভেঙে যায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবে।

পশ্চিম আফ্রিকান উপকূল থেকে অ্যাঙ্গোলা পর্যন্ত এরকম বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। কারণ সেসব অঞ্চলে ইউরোপীয় বাণিজ্যের আকৃতি ছিল সবচেয়ে বড়। এ সংক্রান্ত যেসব লিখিত নথিপত্র টিকে আছে, সেগুলো থেকেও এই বৃহদাকৃতির প্রমাণ মেলে।



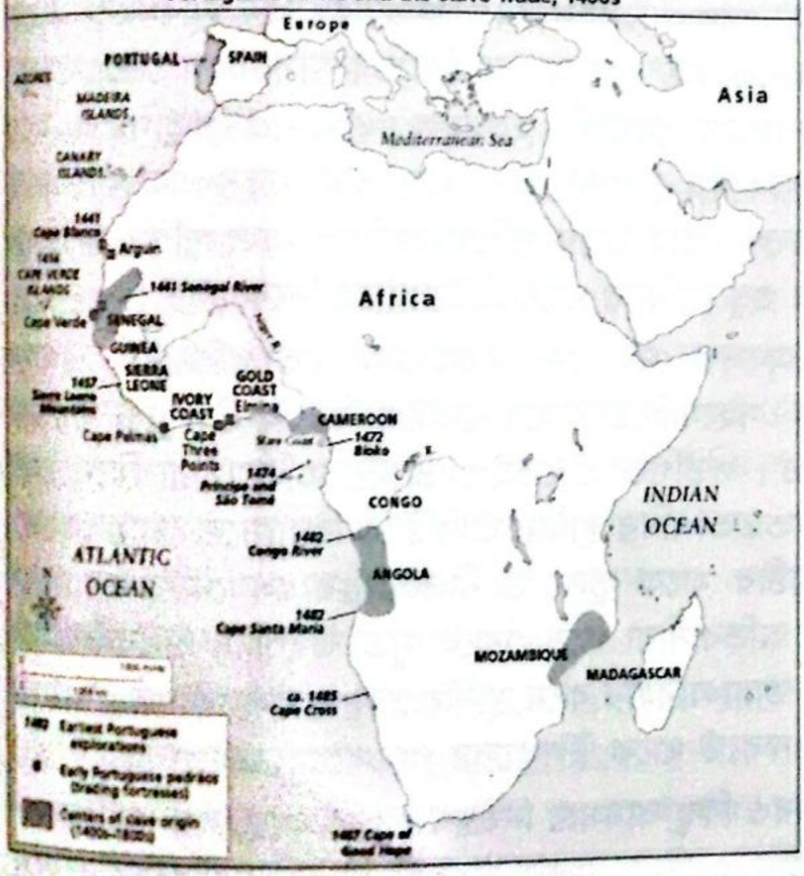
বর্তমান ঘানার অঞ্চলটিতে পর্তুগিজদের আগমন ঘটে ১৪৭০-এর দশকে। ইউরোপীয়রা যে স্বর্ণের জন্য তখন লালায়িত, এর বিনিময়ে প্রদান করার মতো তেমন কোনো পণ্যই পর্তুগিজদের হাতে ছিল না। কিন্তু বেনিন থেকে তারা কিছু সুতি কাপড়, পুঁতির মালা, আর দাসীকে নাইজেরিয়ায় স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়। এগুলো গোল্ড কোস্টে বিক্রি করার মতো জিনিস।

পর্তুগিজরা গোল্ড কোস্টে এমন কিছু চাহিদা পূরণ করছিল, যেগুলোর অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল। তার মানে নিশ্চয়ই বেনিন এবং গোল্ড কোস্টের (বিশেষ করে অ্যাকানের) মানুষদের মধ্যে আগে থেকেই ব্যবসা চলমান থেকে থাকবে। অ্যাকানরা ছিল স্বর্ণ উৎপাদক। আর বেনিনের লোকেরা বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হস্তনির্মাতা, যাদের কাছে নিজেদের তৈরি কাপড় ও পুঁতির মালা উদ্বৃত্ত থাকত। আবার বেনিন যেহেতু বিশাল সেনাদলের অধিকারী এক সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র, তাই যুদ্ধবন্দিও ছিল তাদের হাতে।

অ্যাকান খুব সম্ভবত নিজেদের জনশক্তি আর শ্রমশক্তি নির্মাণেই ব্যস্ত। তাই বেনিনের কাছ থেকে তারা দাসী সংগ্রহ করে দ্রুত তাদের স্ত্রী হিসেবে নিজেদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। পর্তুগিজরা এই লেনদেনে হস্তক্ষেপ করেছে ইউরোপীয় বাণিজ্যের স্বার্থেই। পর্তুগিজ ও অন্য ইউরোপীয় দেশগুলো

একসময় যথেষ্ট পণ্যের অধিকারী হয়ে যায়। ফলে তারা আর বেনিন থেকে পণ্য কিনে তা পুনরায় রপ্তানি করার মুখাপেক্ষী রইল না। ততদিনে গোল্ড কোস্টের সাথে বেনিনের সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। উভয়ের যোগাযোগ এখন পৃথক পৃথকভাবে শুধু ইউরোপের সাথে।

বর্তমানে যে অঞ্চলগুলো ডাহোমি ও টোগো, সেগুলোর পেছনকার খাঁড়িগুলো দিয়েই হয়তো বেনিনের সাথে গোল্ড কোস্টের লেনদেন চলত। তাই ইউরোপীয়রা খোলা সমুদ্রপথ দিয়ে সরাসরি সংযোগ খুলে দেওয়ার পর সেটাই অধিকতর সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।



Portuguese Africa and the Slave Trade, 1400s

আগেই যেমনটি বলা হয়েছে, সমুদ্রপথে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বই ছিল তাদের সবচেয়ে মূল্যবান কৌশলগত সুবিধা। সেইসাথে সাংগঠনিক সক্ষমতার ব্যাপারটা তো আছেই। কয়েকটি জায়গায় এর প্রতিফলন ঘটে, যার শুরুটা হয় মাগরেব ও মৌরিতানিয়া দিয়ে। পর্তুগিজরা যখন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তখন ঘোড়া, উলের জিনিস, আর পুঁতির মালা সংগ্রহের সুযোগ হয় তাদের। এগুলো তারা বিক্রি করে আরও দক্ষিণ দিকে পশ্চিম আফ্রিকার কাছে। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে স্বর্ণ আর দাস। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত সেনেগাম্বিয়ায় বিক্রির উদ্দেশ্যে পর্তুগিজরা যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ক্রয় করেছে, তা হলো ঘোড়া। একেকটা ঘোড়ার বিনিময়ে তারা পনেরোটা পর্যন্ত দাস পেত। পর্তুগিজরা গাম্বিয়া নদীর তীর এবং আরও দক্ষিণে সিয়েরা লিওন থেকেও স্বর্ণ খরিদ করত। বিনিময়ে প্রদান করত উত্তর আফ্রিকার উলের

জিনিসপাতি এবং পুঁতির মালা।

পশ্চিম আফ্রিকান উপকূল আর উত্তর আফ্রিকার সাথে কিন্তু পশ্চিম সুদানের যোগাযোগ ছিল। ইউরোপীয়রা আসার বহু আগে থেকেই উত্তর আফ্রিকা থেকে ঘোড়া নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম আফ্রিকার স্থানীয় প্রজাতির সাথে প্রজনন ঘটানোর জন্য। ইউরোপীয়দের আগমনের বহু আগে থেকেই আরব ও মৌরিতানীয়রা সেনেগাল নদী ও তার আরও দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করত মান্দিঙ্গা জোলা ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে।

কিউটায় বানানো পুঁতির মালা এবং উত্তর আফ্রিকার ভেড়ার পশম থেকে তৈরি কাপড়-সহ নানা জিনিস বিক্রি করত তাদের কাছে। কিন্তু স্থলপথে দীর্ঘ যাত্রার চেয়ে সমুদ্রপথে পরিবহন বেশ দ্রুততর। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পর্তুগিজরা কার্যত ওই এলাকার অর্থনৈতিক সমন্বয়কে ভেঙে দেয়। বেনিন-অ্যাকানের উদাহরণে যেমনটি হয়েছিল, এখানেও পর্তুগিজরা হয়ে ওঠে মধ্যস্বত্বভোগী। লক্ষণীয় ব্যাপার, এর ফলে তারা নতুন এক বাণিজ্যিক বিন্যাস তৈরি করে ফেলে। তাই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকা পরস্পরকে ভুলে গিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে ইউরোপের দিকে।

উচ্চতর গিনি উপকূলেও দেখা দেয় একইরকম এক পরিস্থিতি। এখানে ইউরোপীয় শোষণকে সহযোগিতা করে কেইপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের উপস্থিতি। পর্তুগিজ ও কেইপ ভার্দের অভিবাসীরা মিলে সেই ১৪৭০-এর দশকেই উচ্চতর গিনির স্থানীয় বাণিজ্যিক বিন্যাসকে ভেঙে ফেলে। বিভিন্ন আফ্রিকান গোষ্ঠীর মাঝে তুলা ও নীল রঙের লেনদেনে বাধ সাধে তারা। কেইপ ভার্দের অভিবাসীরা গড়ে তোলে সুতা উৎপাদন ও তৈরির এক সমৃদ্ধ শিল্প। এ কাজে তারা ব্যবহার করে স্থানীয় শ্রম ও কলাকৌশল। তারপর তৈরিকৃত পণ্য রপ্তানি করতে থাকে উপকূলের পথ ধরে আক্রা পর্যন্ত।

এর পাশাপাশি আরও কিছু ব্যবসার নিয়ন্ত্রণও হাত করে নেয় পর্তুগিজরা। এর মাঝে রয়েছে কঙ্গো ও সমুদ্র থেকে দূরবর্তী দ্বীপগুলোর কড়ির ব্যবসা, অ্যাঙ্গোলান উপকূলে লবণের ব্যবসা, এবং উত্তর ও দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলার মাঝে উন্নত পাম কাপড়ের ব্যবসা। সব ক্ষেত্রেই যে তারা জাহাজ আর ব্যবসায়িক দক্ষতার বলে আধিপত্য লাভ করেছে, তা না। বলপ্রয়োগও করেছে কিছু ক্ষেত্রে। উপকূলে কার্যক্রম চালানোর সময় কামান ব্যবহার করার সুযোগ থাকলে তখন বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিত তারা। যেমন, পূর্ব আফ্রিকায় পর্তুগিজরা সহিংসতার মাধ্যমে আরব ও সোয়াহিলিদের কাছ থেকে ব্যবসার দখল নেয়। আইভোরি কোষ্ট এবং গোল্ড কোস্টের মাঝে ব্যবসা বিঘ্নিত হওয়ার পেছনেও এরকম

সহিংসতাই দায়ী। এই দুই অঞ্চলের মাঝে ডিঙায় করে শক্তিশালী উপকূলীয় বাণিজ্য চলত। লাহোউ অন্তরীপের (বর্তমান আইভোরি কোস্ট) লোকেরা নৌকা বেয়ে থ্রি পয়েন্টস অন্তরীপ পার হয়ে যেত। পূর্ব দিকে একদম আক্রা পর্যন্ত যেত কাপড় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। পর্তুগিজরা থ্রি পয়েন্টস অন্তরীপের কাছে আক্সিমে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এর উদ্দেশ্য হলো পেছনের দিকের এলাকায় স্বর্ণের ব্যবসাকে সুবিধাজনক করা। এর আরেকটি উদ্দেশ্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে উপকূলীয় আফ্রিকান ব্যবসার গলা কেটে দেওয়া। আক্সিমের অধিবাসীদের লাহোউ অন্তরীপে যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দেয় তারা। আইভোরি কোস্ট থেকে আগত ডিঙাগুলোকে আক্সিম পেরিয়ে পূর্ব দিকে যেতেও বাধা দেয়। এর মাধ্যমে তারা চেয়েছে দুই অঞ্চলকে পৃথক দুটো অর্থনৈতিক এলাকায় পরিণত করতে, যারা এককভাবে শুধু ইউরোপেরই মুখাপেক্ষী হয়ে রইবে।

ওপরে যেসকল আফ্রিকান বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা হলো, সেগুলোর শেকড় ছিল বেশ গভীরে। ওলন্দাজরা যখন ১৬৩৭ সালে আক্সিম দখল করে নেয়, তখনো সেসব ব্যবসা চলমান দেখতে পায় তারা। গোল্ড কোস্টে কর্মরত ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মীরা এই আফ্রিকান ব্যবসা একেবারে বন্ধ করে দিতে চায়। এই পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয়, তখন তারা আইভোরি কোস্টের জনগণকে বাধ্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওলন্দাজ পণ্য ক্রয় করার জন্য। নিয়ম করে দেয় যে, আক্সিমের ডিঙায় করে যতজন ব্যক্তি লাহোউ অন্তরীপে যাবে, প্রত্যেকের সাথে অন্তত চার আউন্স স্বর্ণ মূল্যমানের ওলন্দাজ পণ্য থাকতে হবে। সম্পূর্ণই আন্তঃআফ্রিকান এক ব্যবসাকে এভাবে তারা ইউরোপীয়-আফ্রিকান ব্যবসায় পরিণত করে।

আফ্রিকানদের নিজস্ব অর্থনীতিকে সমন্বিত করার পথে দ্বিগুণ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় আরেকটি বিষয়। ইউরোপীয়রা স্থানীয় বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে ওঠে মূলত বন্দি সংগ্রহের কাজ সহজ করার উদ্দেশ্যে। তার মানে পুরো আফ্রিকান অর্থনীতিকে তারা ইউরোপীয় দাসব্যবসার স্বার্থের অধীন করে ফেলে। উচ্চতর গিনি এবং কেইপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগিজ ও তাদের মুলাটো বংশধররা নানারকম পণ্যের লেনদেনে জড়িত ছিল। এর মধ্যে রয়েছে তুলা, রং, কোলা বাদাম, এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন পণ্য। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল দাসবাহী জাহাজের সিন্দুক ভারী করা। কঙ্গো আর অ্যাঙ্গোলাতেও দেখা যায় একই চিত্র। পর্তুগিজদের হাতে আসা লবণ, কড়ি, আর রঞ্জক কাপড়ের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। এগুলোর বিনিময়ে উপকূল ও ভূমির অভ্যন্তর থেকে দাস ক্রয় করে চলে তারা।

আফ্রিকার আজকের অনুন্নত অবস্থাকে বুঝাতে হলে মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরশীলতার এই উপাদানগুলো বুঝাতে হবে। আজ থেকে বহু আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যুগে এর শেকড় প্রোথিত। আরও লক্ষণীয় যে, পরনির্ভরশীলতার এই ব্যাপারটিকে আড়াল করে রাখে এক ধরনের মেকি সমন্বয়। পৃথিবীর যেসব অংশ একসময় উপনিবেশায়িত ছিল, সেখানে বর্তমানে স্থাপিত মুক্তবাণিজ্য এলাকাগুলো এই মেকি সমন্বয়ের একটি রূপ। এই মুক্তবাণিজ্য অঞ্চলগুলো স্থাপন করা হয়েছে, যাতে বহুজাতিক কর্পোরেশানগুলো সহজে সেঁধিয়ে যেতে পারে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নিয়ে মেকি সমন্বয়ের আবির্ভাব ঘটছে নানা রূপে। তখন উপকূল থেকে দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত বিভিন্ন আফ্রিকান অঞ্চলকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে করে মানব-বন্দি ও গজদন্ত পরিবহন করা সহজ হয়। ভূমির অভ্যন্তরের কোনো একটি জায়গা থেকে আটলান্টিক বা ভারত মহাসাগরের কোনো একটি বন্দর পর্যন্ত বহন করে আনা হতো এদের। যেমন, কঙ্গো থেকে ধৃত বন্দিদের পার করানো হতো বর্তমান জাম্বিয়া ও মালাওয়ি থেকে মোজাম্বিক পর্যন্ত। এখান থেকে তাদের কিনে নিত পর্তুগিজ, আরব, বা ফরাসি ক্রেতারা। এটাকে মোটেও আফ্রিকান অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক সমন্বয় বলা চলে না। এ থেকে বরং বোঝা যায়, বিদেশি হানাদাররা কতটা পঙ্গু করে দিয়েছিল স্থানীয় বাণিজ্যকে।

পশ্চিম আফ্রিকার স্বর্ণব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়নি বটে, কিন্তু এটি সরাসরি ইউরোপীয় ক্রেতাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সাহারার এপাশ থেকে ওপাশে উত্তরমুখী পথ ধরে আর এই ব্যবসা সংঘটিত হয় না। পশ্চিম সুদানের সাভানা বেল্টের ভেতর এই ট্রান্স-সাহারান স্বর্ণব্যবসা একসময় রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে উন্নত আফ্রিকান অঞ্চলগুলোকে পরিপুষ্ট করে চলেছিল। সেই পঞ্চম শতাব্দী থেকেই চলমান ছিল এই ধারা। কিন্তু ইউরোপীয়দের জন্য উত্তর আফ্রিকান মাধ্যম বাদ দিয়ে সরাসরি পশ্চিম উপকূল থেকে স্বর্ণ হাসিল করা বেশি সহজ।

সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়েও যদি স্বর্ণব্যবসা নির্বিঘ্নে চলতে পারত, তাহলে পশ্চিম সুদান (সাহেল অঞ্চল বুঝাচ্ছে, বর্তমান সুদান নয়) যে কোথায় গিয়ে পৌঁছাত, কল্পনাই করা যায় না। সে যাকগে। এই বিশেষ বস্তুটির ক্ষেত্রে ইউরোপের সাথে ব্যবসায় অবশ্য আফ্রিকার কিছু উপকার হয়েছে বলা চলে। স্বর্ণ উৎপাদন মানে খনি খনন এবং আফ্রিকার মধ্যে বন্টনের এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। অ্যাকান অঞ্চল এবং জিম্বাবুয়ে ও মোজাম্বিকের অংশবিশেষ মূলত

এই স্বর্ণ উৎপাদনের বদৌলতেই উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমৃদ্ধ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সহকারে টিকে থাকে।

হাতির দাঁত রপ্তানির ফলেও কিছু উপকার লাভ হয়। একেক সময় পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড হয়ে ওঠে গজদন্ত অনুসন্ধান। কখনো বা বন্দিব্যবসার সাথে এটা ছিল যৌথভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তানজানিয়ার ওয়ানিয়ামোয়েযিরা ছিল পূর্ব আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। তানজানিকা হ্রদ থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত শত শত মাইল পথ পেরিয়ে পণ্য পরিবহন করার জন্য সুনামের অধিকারী। ওয়ানিয়ামোয়েযিরা যখন গজদন্ত রপ্তানির দিকে মন দেয়, এর ফলে শুরু হয়ে যায় আরও কিছু উপকারী উন্নয়ন। যেমন, তাদের ও প্রতিবেশীদের মাঝে নিড়ানি, খাদ্য, ও লবণের ব্যবসা বেড়ে যাওয়া।

তারপরও হাতির দাঁত এমন এক সম্পদ, যা কোনো অঞ্চলে খুব দ্রুতই ফুরিয়ে যেতে পারে। নতুন জোগান সংগ্রহের জন্য এমনসব সহিংসতা সংঘটিত হতে পারে, যেমনটা দাস অপহরণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তা ছাড়া গজদন্তের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, চাহিদা বাড়লেই এর উৎপাদন বাড়ে না। আফ্রিকার ভেতরে কোনো সমাজেই হাতির দাঁতের বিশাল কোনো চাহিদা নেই। ইউরোপ বা এশিয়া থেকে চাহিদা আসার আগ পর্যন্ত কোনো আফ্রিকান সমাজই বিপুল মাত্রায় হাতি শিকার ও দাঁত সংগ্রহের কাজ শুরু করেনি।

যে আফ্রিকান সমাজই গজদন্ত রপ্তানিতে জোরেসোরে মনোযোগ দিত, তারাই নিজেদের গোটা অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে বাধ্য হতো। নাহলে গজদন্ত ব্যবসা সাফল্যের মুখ দেখবে না। এর ফলে একসময় বিদেশি বাজার ও বৈদেশিক অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। হ্যাঁ, বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ে এবং কিছু ইতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বটে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভর সামাজিক অগ্রগতির সক্ষমতা কমে যেতে থাকে।

তা ছাড়া, আফ্রিকায় সংঘটিত বাণিজ্যের দ্বান্দ্বিক বিপরীতকেও মাথায় রাখতে হবে : আর তা হলো ইউরোপে বা ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আমেরিকায় উৎপাদন-কর্মকাণ্ড। হাতি শিকারের নিতান্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে আফ্রিকায় অল্পস্বল্প ইতিবাচক সামাজিক প্রভাব দেখা গেছে। কিন্তু ইউরোপে এই পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট মুনাফা, প্রযুক্তি, ও দক্ষতার কাছে তা নস্যি। এভাবে ক্রমেই বাড়তে থাকে আফ্রিকা ও ইউরোপের ব্যবধান। আর এই ব্যবধানের ভিত্তিতেই তৈরি হয় উন্নয়ন কিংবা অনুন্নতি।

আফ্রিকায় অব্যাহত রাজনৈতিক-সামরিক উন্নয়ন —১৫০০ থেকে ১৮৮৫

আধুনিক আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদগণ যথার্থই বলে থাকেন যে, ইউরোপীয়দের আগমনের বহু আগে থেকেই আফ্রিকার এক অর্থপূর্ণ অতীত ছিল। আরও বলেছেন, ইউরোপের সাথে সংস্পর্শে আসার বহু পরেও আফ্রিকানরা তাদের নিজস্ব ইতিহাস নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে। এমনকি উপনিবেশায়নের যুগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে তা। মহাদেশটির অতীতকে দুইভাবে দেখা যায়। একটা হলো আফ্রিকা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ। আরেকটি হলো বহিস্থ শক্তির ভূমিকা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ। নানারকম পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা এমন বহিস্থ শক্তির মধ্যে একটি হলো দাস, স্বর্ণ, ও হাতির দাঁতের ব্যবসা। এই দুই পদ্ধতিই পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনটি বিষয়কে মাথায় রাখলে এই দুই পদ্ধতির মাঝে মেলবন্ধন ঘটানো সহজ হয়:

(১) বাহ্যিক (এবং প্রধানত ইউরোপীয়) প্রভাব ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ভৌগোলিক বিচারে খুবই অসম ছিল। স্বভাবতই বেশি প্রভাব পড়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর। (২) ইউরোপীয়দের সাথে বাণিজ্য আফ্রিকান জীবনের বিভিন্ন দিককে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। রাজনৈতিক, সামরিক, ও আদর্শিক পরিমণ্ডলে বলতে গেলে তেমন প্রভাবই পড়েনি। (৩) স্বতন্ত্র আফ্রিকান বিবর্তন ও উন্নয়নের নানারকম বৈশিষ্ট্যের (যেগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে) সক্রিয়তা ১৫০০ সালের পরও অব্যাহত থাকে।

দাসব্যবসা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে এবং হয়নি—আফ্রিকার অঞ্চলগুলোকে এরকম শ্রেণীতে ভাগ করতে চাওয়াটা বোকামি। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারটি আমরা আলোচনা করেছি। কারণ পুরো মহাদেশকেই একযোগে এর মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদের আলোচনার স্বার্থে মোটাদাগে এরকম একটা শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এক শ্রেণীতে থাকবে ওইসব অঞ্চল, যেগুলো ইউরোপ-ঘটিত কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িয়ে গেছে। আরেক শ্রেণীতে সেসব অঞ্চল, যেগুলো আপাতদৃষ্টে আগের মতোই জীবনযাপন করে চলেছে।

মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের মতো কিছু অঞ্চলে উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। কারণ স্ব স্ব এলাকায় নিজেদের ইচ্ছেমতো পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীরা ছিল স্বাধীন। আফ্রিকান জনগণ ও আফ্রিকান পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নিত তারা। তা ছাড়া, যেসব সমাজ দাসব্যবসার হামলায় সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিল, সেগুলোরও

রয়েছে নানারকম অর্জন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে, দাসব্যবসার মাধ্যমে আফ্রিকার ওপর ইউরোপের বাণিজ্যিক আধিপত্য কায়েম হয়। কিন্তু ইউরোপীয়রা কোনো আফ্রিকান রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে হটিয়ে দিতে পেরেছে—এরকম উদাহরণ একেবারেই নগণ্য। তাই প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর হাতে রাজনৈতিক বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এবং সেরকম বিকাশ হয়েছেও বটে।

সাম্রাজ্যবাদের আগমনের আগ পর্যন্ত আফ্রিকা সামরিকভাবে বিজিত হয়নি। ইউরোপের সাথে সংস্পর্শের প্রথম কয়েক শতাব্দী ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ। এ সময়ে আফ্রিকান সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। আর একটা সমাজের সশস্ত্র বিভাগের সাথে যত ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় জড়িত, তার সবই ছিল এসকল বাহিনীর। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শিক পরিমণ্ডলে ইউরোপ থেকে সরাসরি আমদানিকৃত উপাদানের পরিমাণ ছিল প্রায় শূন্য। মহাদেশের কিছু অংশে খ্রিষ্টান ধর্ম বিচ্ছিন্নভাবে ও অনিশ্চিতভাবে কিছুটা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেছিল বটে। কিন্তু কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, ও উচ্চতর গিনির মতো অঞ্চলগুলোতে যে অল্প কিছু মিশনারি ছিল, তাদের প্রধান কাজ ছিল দাস হিসেবে জাহাজে উঠতে-চলা আফ্রিকানদের আশীর্বাদ করে দেওয়া। খ্রিষ্টান ধর্মের কার্যক্রম শুধু ইথিওপিয়ায় অব্যাহত থাকে। সেখানে স্থানীয়ভাবে আগে থেকেই অস্তিত্বমান ছিল ধর্মটি। অন্যান্য স্থানে ব্যাপ্তি লাভ করে ইসলাম এবং অন্য এমনসব ধর্ম, যেগুলোর সাথে ইউরোপীয় ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম আগের মতোই মহাকাঠামোর একটি উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যময়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা যতদিন আছে, জনগণ যতদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিতে সক্ষম, এবং একটি সমাজ যতদিন তার নিজস্ব মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার রাখে—ততদিন পর্যন্ত ওই সমাজের জনগণ নিজেদের ভাগ্যের ওপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। এবার বাইরে থেকে যত ধরনের বিধিনিষেধই আরোপিত হোক না কেন। (আফ্রিকা মহাদেশ যখন পুঁজিবাদী ইউরোপের কক্ষপথে উপগ্রহ হিসেবে ঢুকে পড়ে, তখন থেকে তার ওপর এরকম বিধিনিষেধ আরোপিত হয়)। বস্তুগত অবস্থা এবং প্রযুক্তির হাল থেকে ঐতিহাসিক বিকাশকে আলাদা করে দেখা যায় না, এটা ঠিক। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সচেতনতা দিয়েও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এই বিকাশ। ভিত্তি ও মহাকাঠামোর যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা শুরুতেই বলা

হয়েছিল, এটা তারই অংশ।

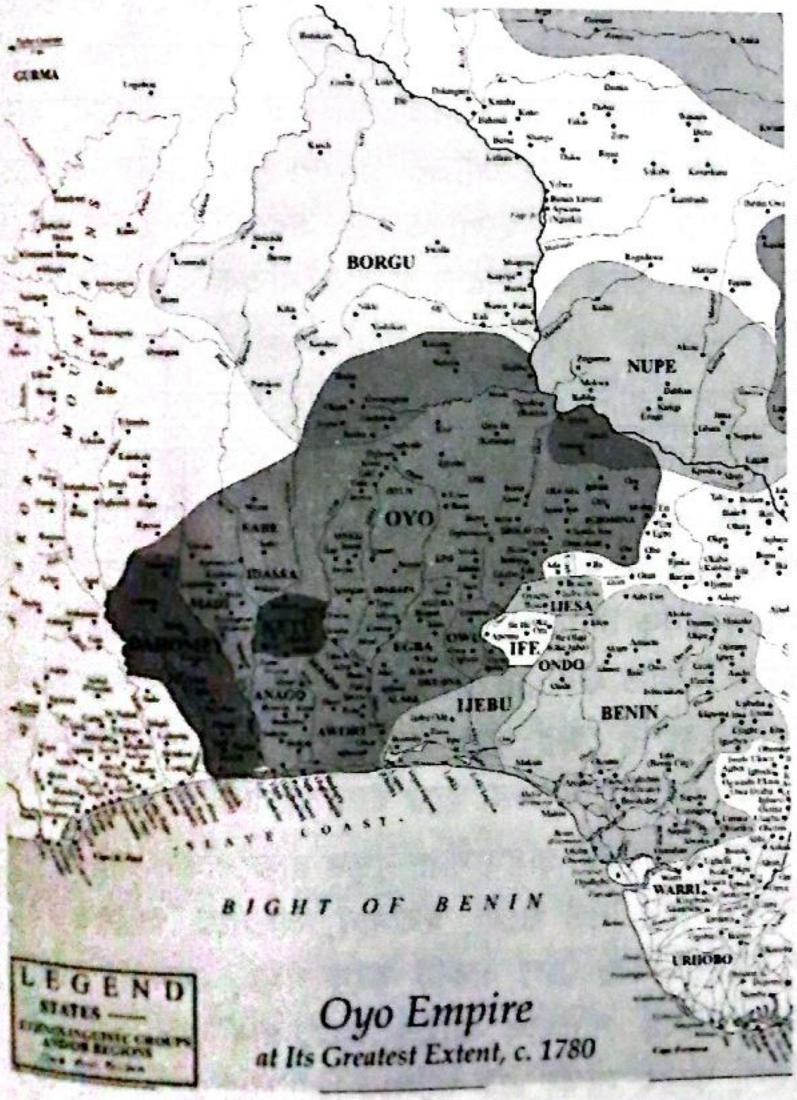
ইতিহাসের একপর্যায়ে সচেতন জনতা বা শ্রেণীর সবচেয়ে নাটকীয় বহিঃপ্রকাশ হলো বিপ্লব। কিন্তু কম-বেশি যা-ই হোক, যেকোনো সমাজের শাসক শ্রেণী সর্বদাই উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট থাকে। তারা পরিবর্তন বা রক্ষণশীলতার সচেতন হাতিয়ার। এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং তার ক্ষমতার সঙ্গী, সামরিক বাহিনী। এমনকি দাসব্যবসার মুখেও আফ্রিকানরা এই পরিমণ্ডলগুলোতে দারুণভাবে এগিয়ে চলতে থাকে।

আফ্রিকায় ১৫০০ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত রাজনৈতিক-সামরিক বিকাশের মানে হলো, আফ্রিকান সমাজব্যবস্থা তার সদস্যদের স্বার্থকে প্রতিরক্ষা করতে আরও বেশি সক্ষম হয়ে উঠেছে। উক্ত সমাজের বাইরের লোকেদের সাংঘর্ষিক স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজ সদস্যদের নিরাপত্তা দিতে পারবে সে। এর আরেকটি অর্থ, রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব ও সামরিকভাবে শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সে বহিস্থ হুমকি থেকে মুক্ত। বাহ্যিক কোনো শক্তি তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার মতো হুমকি দিতে পারবে না। উক্ত সদস্য বিবিধ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা প্রয়োগ করার মতো সুযোগের অধিকারী। সেটা হতে পারে কাব্যরচনা থেকে ব্রোঞ্জের কাজ পর্যন্ত যেকোনো কিছু। এ ব্যাপারে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে রাষ্ট্র। স্বজাতির ধর্মের সংস্কার, বা উন্নততর সংবিধান প্রণয়ন, বা যুদ্ধের নতুন কলাকৌশল আবিষ্কার, বা কৃষি ও বাণিজ্যের অগ্রগতি-সহ বৈচিত্র্যময় সব জায়গায় নিজের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনশীলতাকে ব্যবহার করতে পারবে সে। এটা ঠিক যে, আফ্রিকান সমাজে এই সকল অবদানের উপকার পেয়েছে প্রধানত ছোট একটি গোষ্ঠী। দাসব্যবসার এলাকার ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। কারণ গোষ্ঠীতন্ত্র যত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, বণ্টনে সাম্যবাদের নীতিকে ততই অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মহাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এ সংক্রান্ত বাস্তব ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে। সবগুলোই আলোচ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ঘটনা।

ইয়োরুবা

পূর্বের আলোচনায় ইয়োরুবার ওয়ো রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের আগমনের প্রাক্কালে আফ্রিকার যেরকম উন্নয়ন হয়েছিল, এই রাষ্ট্রটি তার এক দুর্দান্ত প্রতিনিধি। ওয়োর মাতৃরাষ্ট্র আইফি, আর এর সাথে সম্পর্কিত আরেকটি রাষ্ট্র বেনিন। তিনটিই চতুর্দশ ও পঞ্চদশ

শতকে যে শৈল্পিক অগ্রগতি অর্জন করেছিল, তা নিয়ে ভালোমতো গবেষণা হয়েছে। দারুণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে তাদের হাতির দাঁত, পোড়ামাটি, আর ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। শুরুর দিকের ব্রোঞ্জ ছিল একদম সেরা মানের। এরপর ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছুটা অবনতি ও সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ওয়ো এবং বেনিনের মতো রাষ্ট্রগুলো তাদের সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলে ইউরোপীয়দের আগমনের বেশ পর পর্যন্তও জারি থাকে এই সমৃদ্ধি। ওয়ো আর ইয়োরুবা জাতির অবস্থান যেখানে, সেখানে তুমুল গতিতে দাসব্যবসা চলমান ছিল। তাই ১৫০০ থেকে ১৮৮৫ সালে তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বের দাবিদার।



Oyo Empire at Its Greatest Extent, c. 1780

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ওয়ো রাষ্ট্র দাসব্যবসায় যেকোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা পরিহার করে চলে। এর বদলে সেখানকার জনগণ স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসায় মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। ব্যবসাকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করাও ছিল তাদের লক্ষ্য। ওয়ো রাজ্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতেই। কিন্তু পরবর্তী তিন শতক জুড়ে এটি তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি সম্প্রসারিত করতে থাকে। বর্তমানের পশ্চিম নাইজেরিয়া, নাইজার নদীর উত্তর দিকের বড় এলাকা এবং বর্তমান ডাহোমির পুরো অংশ জুড়ে এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যি বলতে, এ ছিল এক

সাম্রাজ্য। এক অভিজাত শ্রেণীর সাথে মিলে জনৈক আলাফিন এটি শাসন করতেন। আলাফিন ও তার প্রধান প্রধান প্রজার মাঝে সম্পর্ক এবং রাজধানী ও বিভিন্ন প্রদেশের মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতো কিছু সূক্ষ্ম সাংবিধানিক নীতিমালা দিয়ে। ষোড়শ, সপ্তদশ, ও অষ্টাদশ শতকে এসকল নীতি সুসংবদ্ধ হয়।

উপকূলের ব্যাপারে ওয়োর যে আগ্রহ ছিল, তা দাসের জন্য না, বরং পোশাকের জন্য। ওয়োর ইয়োরুবা জাতির ভৌগোলিক অবস্থান কিছুটা ভেতরের দিকে। তাই তারা মূলত পেছনের দিকের অঞ্চলগুলোর সাথে সম্পর্কের ওপর মনোযোগ প্রদান করে। এর ফলে পশ্চিম সুদানীয় বাণিজ্যিক এলাকার সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় তাদের। ওয়ো তাদের ঘোড়াগুলো পেত উত্তর দিক থেকে। আর এসকল ঘোড়ার কারণেই তাদের সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে ভীতিকর ও সমীহের অধিকারী। মানুষ ও পরিবেশের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে আফ্রিকায় যে উন্নয়ন ঘটেছিল, ওয়ো তার এক অনন্য উদাহরণ। এই সেই উন্নয়ন, যার শেকড় অতীতের গভীরে প্রোথিত। এই জাতির জনগণ দুটি শক্তির ভিত্তিতে উন্নয়ন সংঘটিত করতে থাকে। একটি হলো তাদের অবচেতনে তৈরি হওয়া শক্তি, আরেকটি হলো সচেতনভাবে ব্যবহার করা রাজনৈতিক কলাকৌশল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ওয়ো এবং সাধারণভাবে ইয়োরুবাল্যান্ড উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দাস রপ্তানি করতে থাকে। এই দাসদের একাংশকে সংগ্রহ করা হতো ইয়োরুবাল্যান্ডের বাইরে থেকে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। আরেকটি অংশ ছিল স্থানীয় দাস। স্থানীয় দাসদের সংগ্রহ করা হতো অপহরণ, সশস্ত্র আক্রমণ, অনিশ্চয়তা, ও বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে। এই বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত হয় অভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক টানাপোড়েন এবং বাইরে থেকে উত্তরাঞ্চলীয় ইসলামি হুমকি। এসবের মিলিত ফল ১৮৩০ সালের মধ্যে ওয়ো সাম্রাজ্যের পতন। দাস হিসেবে অপহরণের জের ধরে ইয়োরুবার বিখ্যাত আদিনিবাস আইফিও ধ্বংস হয়ে যায়। এর নাগরিকেরা হয়ে যায় শরণার্থী।

কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মাঝেই অধিবাসীরা নতুন রাজনৈতিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয় : বিশেষ করে নিউ ওয়ো, ইবাদান, আজায়ে, আবেওকুতা, এবং ইজেবু—প্রতিটি রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল একটি করে শহর, যেখানে রয়েছে সফল কৃষিকাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি। আফ্রিকার এই অংশে কী পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছিল, তারই সাক্ষী এই ঘটনা। ব্রিটিশরা এসে দয়া করে নাইজেরিয়ায় "আইনশৃঙ্খলা" প্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত ইয়োরুবা জাতি নানারকম রাজনৈতিক ধরন নিয়ে নিরীক্ষা চালাতে থাকে। বিশেষ জোরারোপ করে সামরিক বাহিনীর ওপর, ধরে রাখে বাপ-দাদাদের ধর্ম।

সীমান্তের ব্যাপারে সচেতনতার কারণে যেকোনো রাষ্ট্রের অধিবাসী ও শাসকরাই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। সামন্তবাদী যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো বিশেষভাবে নজর দিত তার সামরিক সক্ষমতার ওপর। শাসক শ্রেণীর পুরোটা বা আংশিক জুড়ে থাকত ওই রাষ্ট্রের পেশাদার যোদ্ধা বাহিনী। সমাজের বেশির ভাগ বা উদ্বৃত্ত সম্পদ উপভোগ করার পেছনে তাদের একটা যুক্তি এই ছিল যে, তারা সাধারণ শ্রমিক বা ভূমিদাসদের সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রদান করে। এই ঢালাও যুক্তি ঊনবিংশ শতকের ইয়োরুবাল্যান্ডের ক্ষেত্রে ততটাই সত্য, যতটা সত্য প্রুশিয়া বা জাপানের ক্ষেত্রে। ওই এলাকার আফ্রিকানরা উন্নয়নের যে পথ ধরে চলছিল, এর ফলে তারা সামন্তবাদের সাথে তুলনীয় একটি সামাজিক সংগঠনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ইউরোপ, এশিয়া, এবং আফ্রিকার ইথিওপিয়া ও মাগরেবের মতো অঞ্চলগুলো সেই পর্যায়ে অবস্থান করছে কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই।

ওয়ো সাম্রাজ্যে বেসামরিক শক্তিই ছিল আধিপত্যশালী। আর সামরিক নেতারা ছিল রাজার অধীনস্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে সামরিক পক্ষটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। যেমন, আজায়ে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন কুরুনমি। ওয়ো সাম্রাজ্য পতনের পরবর্তী বিশৃঙ্খল যুগের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক বলা হয় তাকে। ইবাদান এখান থেকে একটু আলাদা। সেখানে একদল সামরিক কর্মকর্তা মিলে একটি রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণী গঠন করে। বেসামরিকদের পুনরায় ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা ছিল দায়সারা ও অসফল। হাজার হোক, শহরটির জন্মই হয়েছে সামরিক শিবির থেকে।

সামরিক শক্তিকে বেসামরিক রাষ্ট্রের একটি বাহু বানানোর সবচেয়ে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করেছে সম্ভবত আবেওকুতা নগররাষ্ট্র। কিন্তু তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দেয়ালঘেরা আবেওকুতা পৌরসভার নিরাপত্তা। আবেওকুতার নিরাপত্তা-প্রাচীর বেশ সুনামের অধিকারী হয়ে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী বহু সেনাদল ভূপাতিত হয়েছে সেখানে। আর এহেন পরিস্থিতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল ওলোগুন তথা যুদ্ধনেতারা।

ইয়োরুবাল্যান্ডে যখন রাজনীতির সামরিকায়ন চলমান, সমাজের গঠনে তখন আসছে পরিবর্তন। এর ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রেণীবিভাজন। যুদ্ধে প্রচুর মানুষ বন্দি হয়, যাদের বেশির ভাগকে বিক্রি করে দেওয়া হতো ইউরোপীয়দের হাতে। ফলে ইয়োরুবাল্যান্ড ১৮৬০-এর দশক পর্যন্ত ওই অঞ্চলের দাস-সরবরাহক হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু বহু যুদ্ধবন্দিকেই আবার দেশেই রেখে দেওয়া হতো। তাদের অবস্থান হতো হয় দাস আর

নয়তো ভূমিদাসের মতো। তারা প্রথম-প্রজন্মের বন্দি কি না, এর ওপর নির্ভর করত তাদের অবস্থান কী হবে। কখনো অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর থেকে পলায়নরত শরণার্থীদেরও একই পরিণতি বরণ করতে হতো। অন্য কোনো মুক্ত ইয়োরুবার সেবক বা ভূমিদাস হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না তাদের। এই শরণার্থীরা তাদের নতুন প্রভুদের সেবা করত ভূমি চাষ করার মাধ্যমে। বিনিময়ে তাদের দেওয়া হতো সশস্ত্র নিরাপত্তা। কিন্তু ভূমিদাসদের আবার সেনা হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ, সামরিক শ্রমের বাধ্যবাধকতা পালন করার শর্তেই উৎপাদনের মাধ্যম (জমি) ব্যবহার করার সুযোগ পেত তারা। আত্মীয়তার নীতি যে কতটা দুর্বল হয়ে এসেছে, এই অবস্থাটি তারই এক নির্দেশক। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরুবাল্যান্ডের ওই রাষ্ট্রগুলো গড়পড়তা গোষ্ঠীতান্ত্রিক গ্রামের মতো না। এরা বরং নাগরিকদের ভূমিকা ও প্রাপ্য নির্ধারণ করত আরোপিত কর্তব্য পালনের ভিত্তিতে। এটা সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্য।

যে যুগটি নিয়ে আলোচনা চলছে, সে-সময় পেশাদার সৈনিকদের উত্থানের সাথে সাথে ইয়োরুবার ভেতর শ্রমবিভাজন বাড়তে থাকে। "যুদ্ধ-বালক" নামে পরিচিত এই পেশাদার সৈনিকরা অভিজাতদের পুত্র। কৃষিকাজকে তারা ঘৃণাভরে চাপিয়ে দিয়েছে বন্দি ও ভূমিদাসদের ঘাড়ে। আর যেহেতু এই বন্দি ও ভূমিদাসরাই সংখ্যায় বেশি, সেহেতু তাদের মাধ্যমে কৃষির প্রাচুর্যও নিশ্চিত করা হয়ে যায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যান্য শাখাও বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে পোশাক ও তালের তেল উৎপাদন এবং বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা। অথচ সে-সময় কিন্তু দুই দিক দিয়ে শ্রমশক্তি ক্ষয় হয়ে চলছিল। একটি হলো রপ্তানি হতে-থাকা দাস, আরেকটি হলো দাস শিকারের কাজে নিয়োজিত লোকবল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও ইয়োরুবাল্যান্ড-ভ্রমণকারী ইউরোপীয়রা এর বস্তুগত সংস্কৃতির সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর অবস্তুগত সংস্কৃতির রং-ঝলমলে ও চোখ-জুড়ানো দিকগুলো তো রয়েছেই। যেমন বার্ষিক "মিষ্টি আলু উৎসব" এবং শাঙ্গো, ওগবোনি ইত্যাদি ধর্মীয় সংঘের আচার-অনুষ্ঠান।

ইউরোপীয় প্রযুক্তির একটি জিনিস আফ্রিকানরা খুব করে চাইত। আর ইউরোপীয়দের কাছ থেকে সেটা অর্জন করাটাও ছিল বেশ সহজ। তা হলো আগ্নেয়াস্ত্র। ইয়োরুবা জাতি ১৮২০-এর দশক থেকে বিশাল সংখ্যক ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র অর্জন করতে থাকে। নিজেদের ব্যবসা, রাজনীতি, ও সামরিক কৌশলের বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে একে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাক্কালে ইয়োরুবা শাসকরা আধুনিকতর বন্দুক এবং এমনকি রকেটও

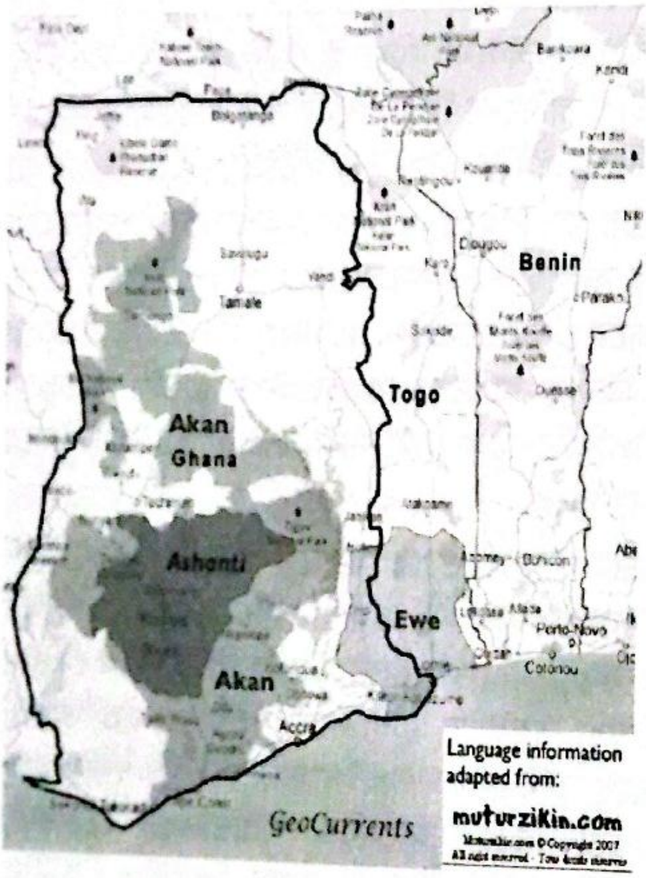
সংগ্রহ করে চলে। কিন্তু এই কার্যক্রম বেশি দূর যাওয়ার আগেই বাধ সেধে বসে ইউরোপীয়রা। লাগোসে ১৮৬০ সাল থেকে শুরু হওয়া কিছু ধারাবাহিক ঘটনার সূত্র ধরে ব্রিটিশরা আফ্রিকার ওই অঞ্চলটিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই ঘটনাপ্রবাহে সশস্ত্র আক্রমণের পাশাপাশি মিশনারি অনুপ্রবেশও রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। জমির মালিকানা এবং শ্রেণীসম্পর্কের সাথে এই বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কিত। ইয়োরুবা জাতির ইতিহাসে এই মৌলিক বিষয়গুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ভাবেই ফুটে উঠেছে। তাদের স্বাধীনতা হারানোর আগের দশকগুলোতে এ ব্যাপারটি লক্ষণীয়। কৃষি উৎপাদন যতদিন ব্যাহত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত যেকোনো ইয়োরুবা রাষ্ট্র শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। ইবাদান একসময় ছিল ইয়োরুবাল্যান্ডের সবচেয়ে প্রতাপশালী সামরিক শক্তি। তারা বন্দিদের বিক্রি যেমন করত, তেমনি নিজের উপকারার্থে অনেককে রেখে দিয়ে শ্রমিক হিসেবেও খাটাত। কিন্তু ইবাদানের কৃষি অঞ্চলগুলো যুদ্ধের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ইবাদানের শাসকরাও কৃষিজমিতে কর্মরত শ্রমিকদের সরিয়ে নিতে থাকে। তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় ইউরোপীয়দের কাছে। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজনেই এই কাজ করে তারা। দাস বিক্রি ছাড়া এই জিনিস পাওয়ার কোনো উপায় নেই। উপকূলে ইউরোপীয় দাসক্রেতাদের উপস্থিতি ঠিক এই সময়টাতেই পুরোদমে তার নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

বন্দি ও ভূমিদাসদের বিক্রি করে দেওয়ার মাধ্যমে ইবাদান তার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ক্ষয় করে ফেলতে থাকে। বন্দিরা যদি সত্যিকার অর্থেই একটি ভূমিদাস-শ্রেণী হয়ে থাকত, তাহলে এভাবে তাদের বিক্রি করে দেওয়া যেত না। ওই জমিতে নিরাপত্তা সহকারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকত তারা। ইউরোপে দাসব্যবসাকে সরিয়ে ভূমিদাসত্ব এবং সামন্তবাদের আগমন ঘটে যেসব কারণে, তার মধ্যে এটি একটি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইয়োরুবা সমাজ তাদের বন্দিদের এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ঠিকই দিয়েছিল। স্থানীয় উৎপাদন-ব্যবস্থার ভেতর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল তাদের। কিন্তু দাসক্রেতা হিসেবে ইউরোপীয়দের উপস্থিতি যে তুফান নিয়ে আসে, তার মুখে তারা টিকে থাকতে পারেনি। উপনিবেশবাদের অধীনে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর এই সমস্যা সমাধানের সব আশা বিলীন হয়ে যায়।

উনবিংশ শতকের ইয়োরুবা রাষ্ট্রগুলো একত্র হয়ে সাবেক ওয়ো সাম্রাজ্যের মতো বড় কোনো সত্তা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাসবিদরা এই বিষয়টার

ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে বসেন। অথচ প্রথমত, কোনো জাতির অর্জনকে মূল্যায়ন করতে হলে তাদের রাজনৈতিক এককের আকৃতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড নয়। আর দ্বিতীয়ত, একটি জাতি প্রথমে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পরে আরও কার্যকরভাবে একত্র হতে পারে। ইবাদান, আবেওকুতা, আজায়ে নামক ইয়োরুবা রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা ছিল ১০০,০০০ পর্যন্ত—সামন্তবাদী জার্মানির বেশির ভাগ নগর-রাষ্ট্র, প্রিন্সিপালিটি, এবং প্যালাটিনেইটের সমান। এই তুলনাটা উল্লেখ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইয়োরুবাল্যান্ডে ভ্রমণ-করা ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকরা এই ব্যাপারটা লক্ষ করেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।



বহু আগে থেকেই গোটা জার্মানির একটি সাধারণ সংস্কৃতি ও ভাষা রয়েছে। আর দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত হোলি রোমান এম্পায়ারের অধীনে একটি রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রিফরমেশান আন্দোলন এবং হোলি রোমান এম্পায়ার ভেঙে পড়ার পর জার্মান জনগণ এতগুলো পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দলে ভাগ হয়ে পড়ে যে, একটা বছরে অতগুলো দিনও নেই। কোনো কোনো দলের আকৃতি একটা পাবলিক পার্কের চেয়ে বড় হবে না। তারপরও জার্মানি জুড়ে অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসম্পর্ক এবং উৎপাদন-শক্তির বিকাশ অব্যাহত থাকে। শেষমেশ ১৮৭০-এর মধ্যে আবারও অর্জিত হয় ঐক্য। সামন্তবাদের জায়গায় আসে শক্তিশালী পুঁজিবাদী জাতিরাষ্ট্র।

কইভাবে, ইয়োরুবা ছিল এক বিশালব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক সত্তা। কিন্তু তাদের ভাষা ছিল একটাই। ওয়ো সাম্রাজ্যের পতনের পর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। কিন্তু কখনো থেমে যায়নি। সেটা

থেমেছে ইউরোপীয় উপনিবেশায়নের আগমনের পর।

পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে দাসব্যবসা চলমান ছিল, সেগুলোতে রাষ্ট্রনির্মাণ-কর্ম চলতে থাকে বিভিন্ন মাত্রার সাফল্য সহকারে। যেমন, ওয়ো সাম্রাজ্যের মতোই দারুণভাবে গড়ে ওঠে অ্যাকান রাষ্ট্রব্যবস্থা। অ্যাকানদের ভাগ্য ভালো, দাসব্যবসা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গিয়ে। ততদিনে আসান্তের মতো একটি রাষ্ট্র যথেষ্ট গভীরে শেকড় প্রোথিত করে ফেলেছে। ফলে দাসব্যবসার বিরূপ প্রভাবের মোকাবিলা করতে তারা সক্ষম। পশ্চিম সুদানের মূল ভূমির ভেতর এর অন্তর্ভুক্তি অব্যাহত থাকে। শেষে ১৮৭০-এর দশকে যখন ব্রিটিশরা আসান্তের ওপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করে, তখন এই বিখ্যাত আফ্রিকান জাতিটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীরবিক্রমে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছে।

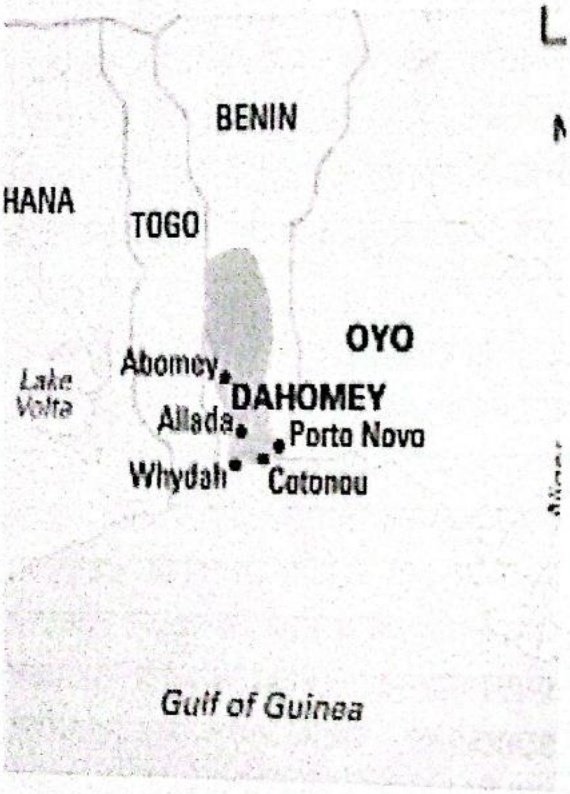
অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসরপ্তানিতে লিপ্ত থাকার সুবাদে আসান্তের শাসকেরা একসময় সম্প্রসারণবাদের ওপর মনোনিবেশ করে। যুদ্ধ ও হামলার মাধ্যমে কিংবা কর হিসেবে বন্দি আনয়ন করতে থাকে তারা। আবার তারা আগে যেখানে বন্দি হিসেবে ছিল, সেখান থেকে ব্যবসার মাধ্যমেও কিনে আনা হতো। তা ছাড়া, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই অ্যাকান দেশ তার জনসম্পদকে রপ্তানি না করে বরং গড়ে তোলার কাজ করে আসছিল। স্থানীয় সমাজের ভেতর বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নেওয়া হয়। উপনিবেশায়নের প্রাক্কালে আসান্তে সমাজের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছিল ওদোঙ্কো-বা, অর্থাৎ এককালের বন্দিদের বংশধর। উক্ত ভূমির শ্রমজীবী অংশ ছিল তারা। শ্রম রপ্তানি বা হারানোর মাধ্যমে উন্নয়ন সংঘটিত হয়নি; বরং তা হয়েছে শ্রম বৃদ্ধি ও সর্বাধিকীকরণের মাধ্যমে।

❁ ডাহোমি

ভোল্টা নদীর ওপাড়ে আসান্তের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী ডাহোমি। ইউরোপীয় দাসব্যবসার সাথে ডাহোমির সম্পর্ক ছিল গভীরতর ও দীর্ঘতর। তাই এর অভিজ্ঞতাকে আরও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হবে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ডাহোমির জনসংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু না হোক, অন্তত স্থবির হয়ে ছিল। দাসরপ্তানি ছাড়া বলতে গেলে এর অর্থনীতির আর কোনো অবলম্বনই ছিল না। এতসব বাধা সত্ত্বেও ডাহোমি যেভাবে সফল হয়েছে, তা গোটা আফ্রিকা মহাদেশে মানবজাতির এক অভূতপূর্ব অর্জন। জেনে রাখা ভালো, আজা বা ফন বা ডাহোমির সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের

ভিত্তি রচিত হয়েছে পশ্চিম আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের আগেই। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই অস্তিত্বলাভ করে আজা রাষ্ট্র আল্লাদা এবং হোয়াইদাহ। আইফির ইয়োরুবাদের সাথে তাদের কিছুটা সম্পর্ক ছিল। আল্লাদা থেকেই ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম হয় ডাহোমির। আর অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আল্লাদা ও হোয়াইদাহ উভয়ই ডাহোমির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।



আল্লাদা ও হোয়াইদাহর রাজারা হয় তাদের নাগরিকদের দাসত্ব থেকে রক্ষা করতে পারেনি, আর নয়তো নিজেরাই তাতে নীরব সম্মতি দিয়েছে। ডাহোমি কখনোই এই ব্যর্থ রাজাদের নীতি অনুসরণ করেনি। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার সাথে এই নীতি সরাসরি সাংঘর্ষিক। বরং পশ্চিম আফ্রিকায় ডাহোমি হয়ে ওঠে দাস-শিকারি রাষ্ট্রের এক ধ্রুপদী উদাহরণ। ইউরোপের কাছে যখন মানুষ ছাড়া অন্য কোনো পণ্যই তারা বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়, তখন এই পথে হাঁটতে শুরু করে তারা। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ডাহোমিকে প্রথমে একটি সুসংবদ্ধ সামরিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হয়েছিল। ওয়োর আলাফিন কিংবা আসান্তের আসান্তেহেনের চেয়েও ডাহোমির রাজারা অধিকতর একনায়কতন্ত্রী বা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ডাহোমি তার সেনাদলের পেছনে প্রচুর সময় ও মেধা খরচ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল নিজের নাগরিকদের প্রতিরক্ষা এবং বাইরে যুদ্ধ ঘোষণার সক্ষমতা অর্জন।

ইউরোপীয় ইতিহাসের এরকম একটি রাষ্ট্র হলো স্পার্টা। এই রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের কলাকৌশলের প্রতি নিবেদিত ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকায় থাকা ইউরোপীয়রা সকলেই ডাহোমিকে বলত কৃষ্ণাঙ্গ স্পার্টা। অষ্টাদশ শতক জুড়ে ডাহোমির পদাতিক সেনারা ওয়োর অশ্বারোহীদের সাথে পেরে উঠত না। তাই ডাহোমি সে-সময় ওয়ো সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ওয়োর পতনের সাথে সাথে ডাহোমি হয়ে ওঠে ওই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিধর সামরিক রাষ্ট্র। সাবেক ইয়োরুবা প্রভুদের ওপর প্রতিশোধের

খড়্গ চালাতে শুরু করে তারা। ডাহোমির বাইরে থেকে দাস সংগ্রহ করা এবং আগ্নেয়াস্ত্র অর্জনের জন্য যুদ্ধের দরকার ছিল। শুধু দরকার না, টিকে থাকার জন্য এটি বরং অপরিহার্য।

সামরিক কর্মকাণ্ডে ডাহোমির গভীর ব্যস্ততাকে নানাভাবে তুলে ধরা যায়। তাদের মূল্যবোধে সাহসী ও বিজয়ীদের জন্য ছিল অপরিসীম সম্মান। আর যারা ভীরু ও যুদ্ধের ময়দানে অসফল, তাদের নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণা করা হতো। এমনকি ত্যাজ্যও করা হতো তাদের। রাজার দুই প্রধান মন্ত্রী ছিল "বাম" ও "ডান" সেনাদলের সেনাপতি। অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তার অধিকারে থাকত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদ। এর ওপর, শিল্পমাধ্যম ক্রমাগত হাওয়া দিত যুদ্ধের পালে। ডাহোমির প্রাসাদের দেয়ালে দেখা যায় অনিন্দ্যসুন্দর সব মোজাইক ও চিত্রকর্ম—প্রতিটিরই বিষয়বস্তু সামরিক বিজয়াভিযান। পেশাদার আবৃত্তিকারদের মুখে ঐতিহাসিক বর্ণনাতেও ফুটে উঠত ওই একই পক্ষপাতিত্ব। পোশাক-কর্মীরা ব্যস্ত থাকত সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর জন্য নিশান, পতাকা, ও ছাতা তৈরির কাজে।

দুটি অসাধারণ উদ্ভাবন ডাহোমিকে তার আফ্রিকান প্রতিবেশিদের থেকে অনন্য করে তোলে। নিজেকে সামন্তবাদী বা অর্ধ-সামন্তবাদী সামরিক সংগঠন হিসেবে দাবি করার বিশেষ অধিকারও প্রদান করে তাকে। প্রথমত, ডাহোমি তার বালকদের যুদ্ধ শিখতে উৎসাহিত করে চলত। এগারো বা বারো বছর বয়সেই প্রতিটি ছেলেকে জুড়ে দেওয়া হতো একেকজন পোড়খাওয়া সৈনিকের সাথে। সৈন্যের রসদ বহন ও যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করত তারা। দ্বিতীয় উদ্ভাবনটি (এবং যেটা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হয়) হলো, সেনাদলে ডাহোমির নারী জনগোষ্ঠীর ব্যবহার।

অষ্টাদশ শতকে রাজপ্রাসাদের স্ত্রীদের সূচনাটা হতো সম্ভবত আনুষ্ঠানিক প্রহরী হিসেবে। ধীরে ধীরে একসময় তারা হয়ে ওঠে ডাহোমির যুদ্ধযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যুদ্ধের কষ্ট ও পুরস্কার তারা সমভাবে ভোগ করত। উনবিংশ শতাব্দীতে ডাহোমির জনসংখ্যা হয়তো দুই লাখের বেশি ছিল না। তারপরও রাষ্ট্রটি তার বার্ষিক যুদ্ধাভিযানে বারো থেকে পনেরো হাজার সক্রিয় সদস্যকে প্রেরণ করতে সক্ষম হতো। ধারণা করা হয়, ১৮৪৫ সালে এদের মাঝে প্রায় পাঁচ হাজার ছিল নারী—ডাহোমির কথিত অ্যামাজন, যারা যুদ্ধে তাদের দুর্ধর্ষতার কারণে সমীহের পাত্রী।

দাসব্যবসা দীর্ঘমেয়াদে ডাহোমির কাল হয়ে দাঁড়ায়। দাস-শিকারের অভিযান ছিল ব্যয়বহুল। সবসময় আশানুরূপ পরিমাণে বন্দি পাওয়াও যেত

না। ইউরোপীয় বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে ক্রেতারাও কিছু বছরে কাজ চালাতে পারেনি। (যেমন আমেরিকান স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব, এবং পরবর্তী বিপ্লবী যুদ্ধগুলোর সময় ডাহোমিয়ান দাস রপ্তানিতে ভাটা পড়ে যায়। কারণ দাস ব্যবসায় নিয়োগ করার মতো ইউরোপীয় জাহাজ অনেক কমে যায় ওই সময়গুলোতে।) বন্দি বিক্রি করতে না পারলে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা যাবে না। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আবার দাস শিকারের যুদ্ধ করা যাবে না। ফলে ডাহোমির গৌরব ও সামরিক মর্যাদা যেন থিতিয়ে আসতে থাকে। রাষ্ট্র ও এর রাজার খ্যাতি তখন ক্রমহ্রাসমান। এই ক্ষতি পূরণের একটি চেষ্টা ছিল মানব-বলিদানে ফিরে যাওয়া। উনবিংশ শতাব্দীর বেনিনের ওবাদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল।

এমনকি এরপরও ডাহোমির বর্বরতার যেসব বিখ্যাত গালগল্প রয়েছে, সেগুলো অবিশ্বাস্য মাত্রায় অতিরঞ্জিত। ডাহোমিয়ান রাষ্ট্র জনশুমারির মতো কার্যক্রমও চালাত। দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর সাথে ছিল কূটনৈতিক সম্পর্ক। সাধারণত যেসব সূক্ষ্মতা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের কথা শুধু "সভ্য" ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেই শোনা যায়, সেইসবও ছিল ডাহোমির। নিজস্ব নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে গড়ে তোলে গোয়েন্দা-সংস্থা ও তথ্যবিভাগ।

সর্বোপরি, ডাহোমিয়ান সমাজে শিল্পীর ভূমিকার ওপর অন্তত সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও আলোকপাত করা চাই। আফ্রিকার শিল্পের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কাজের জিনিসকে কারুকার্যমণ্ডিত করা। যেমন : মৃৎপাত্র ও পোশাক-আশাক। আবার, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় শক্তি উভয়ই শিল্পকর্মকে উৎসাহিত করত। যেমন, আইফির পিতল ও ব্রোঞ্জের জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছিল ধর্মীয় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। আইফির ওনি এবং রাজপরিবারের সাথে এগুলোর সম্পর্ক রয়েছে বলে ধরা হয়। আসলে শিল্পী-সমাজকে জীবিকা ও স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি নিরাপত্তা প্রদান করাটাও সামন্তবাদী শাসক-শ্রেণীর এক সুবিদিত বৈশিষ্ট্য। ম্যান্ডারিন চীনে মৃৎশিল্পী ও অভিনয়-শিল্পীদের ক্ষেত্রে তা সত্য। ষোড়শ শতকের রেনেসাঁকালীন ইটালির ক্ষেত্রেও তা সত্য। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ডাহোমির ক্ষেত্রেও তা-ই।

স্বাধীন প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ডাহোমির শৈল্পিক অর্জন ছিল অনেক। কিন্তু শিল্পীদের নাম কেউ জানে না। অবশ্য সে যুগে কিছু ব্যক্তিকে আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হতো। প্রদান করা হতো সার্বিকভাবে পুরো সমাজের সেবা করার সুযোগ। এদের কাজ ছিল মনজুড়ানো নানারকম জিনিসের মাঝে মানুষের আশা-ভরসাকে জীবিত করে তোলা। যেমন : প্রাসাদের দেয়ালচিত্র, পেটানো লোহার ভাস্কর্য, রাজপরিবারের জন্য

হাতে-সেলাই-করা নকশাদার পোশাক, রাজার প্রতিনিধিদের জন্য নির্মিত কারুকার্যখচিত জিনিসপত্র, আর ডাহোমিয়ান রাজ্যের আদিপিতা কীভাবে চিতাবাঘের পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে ব্যাপারে প্রাণবন্ত কাহিনি। এই শিল্প মূলত রাজপরিবার আর অভিজাতদের ঘিরে আবর্তিত হতো। কিন্তু এ এক জাতীয় সম্পদও বটে। এ এমন এক পরিচয়, যেখানে গোটা জাতি নিজেদের খুঁজে পায়। পরবর্তীকালে এসকল শৈল্পিক দক্ষতা হয় হারিয়ে গেছে, আর নয়তো সংকীর্ণমনা উপনিবেশবাদীদের বর্ণনায় এগুলোকে হেলাফেলা করে উহ্য রাখা হয়েছে।

এখনো কারও কারও ধারণা, কিছু পরিমণ্ডলে ডাহোমির উন্নয়নের কৃতিত্ব দাসব্যবসার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আফ্রিকার যে রাজনৈতিক ও সামরিক বিকাশ, তা আগের যুগে তৈরি হওয়া ভিত্তিরই সম্প্রসারণ মাত্র। এই ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে পরের উদাহরণগুলো থেকে। এবার আমরা এমনসব অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে বিদেশি প্রভাব একেবারেই ছিল না। এরকম একটি উদাহরণ হলো পূর্ব আফ্রিকার হ্রদঘেরা অঞ্চল।

পূর্বদিকের হ্রদঘেরা রাষ্ট্রসমূহ

আগের আলোচনায় বুনিয়োরো-কিতারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে অগ্রসর সামাজিক-রাজনৈতিক অঞ্চল ছিল এটি। এর শাসক বংশ বাচওয়েযির পতন ঘটেছে অজানা কোনো কারণে। উত্তর দিক থেকে আসা নতুন অভিবাসীরা সংখ্যায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাদের। বাচওয়েযিরা ইথিওপিয়ান বংশোদ্ভূত কি না, তা নিয়ে কিছু সন্দেহ আছে বটে। কিন্তু ষোড়শ শতকের অভিবাসীরা যে লুও জাতির লোক, তা স্পষ্টত প্রমাণিত। সুদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নীলনদ এলাকার মানুষ তারা।

লুওদের দেশান্তরের পর বুনিয়োরোর ক্ষমতায় আরোহণ করে বাবিতিও নামক নতুন এক রাজবংশ। একই রাজবংশের আরও কিছু শাখা অন্য কিছু জায়গায় সিংহাসনে আরোহণ করে। কিছু ক্ষেত্রে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায় তারা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসেও টোরোর একটি অংশ নিয়ে আলাদা বাবিতিও রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই মাঝে বাচওয়েযি বা বাহমিনা শাসকেরা দক্ষিণের কিছু অংশে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ায়। বাহিন্দা নামে পরিচিত এক গোত্র হিসেবে তাদের এই নতুন আবির্ভাব সংঘটিত হয়। বাহিন্দারা হলো পুরাতন বুনিয়োরো-কিতারা রাষ্ট্রের একটি পশুপালক গোত্র। ষোড়শ শতক

থেকে তাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল অ্যাঙ্কোলে এবং কারাগোয়ে।

স্বভাবতই নতুন বাবিতিও শাসক শ্রেণী সাথে সাথে ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত আফ্রিকান প্রথার সাথে মিল রাখার উদ্দেশ্যে তারা পরে নিজেদেরকে ওই ভূমির আদি মালিক হিসেবে দাবি করার চেষ্টা চালায়। অর্থাৎ, ক্ষমতা-দখলকারী হিসেবে পরিচয় দিতে তারা নারাজ। বুসোগাতে ছোটখাটো কয়েকজন বাবিতিও রাজা ছিল। রাজবংশের এক সদস্য এবং এক সাধারণ মানুষের মাঝে ভূমি নিয়ে নিম্নের কথোপকথনটি বর্ণনা করেছেন জনৈক গবেষক :

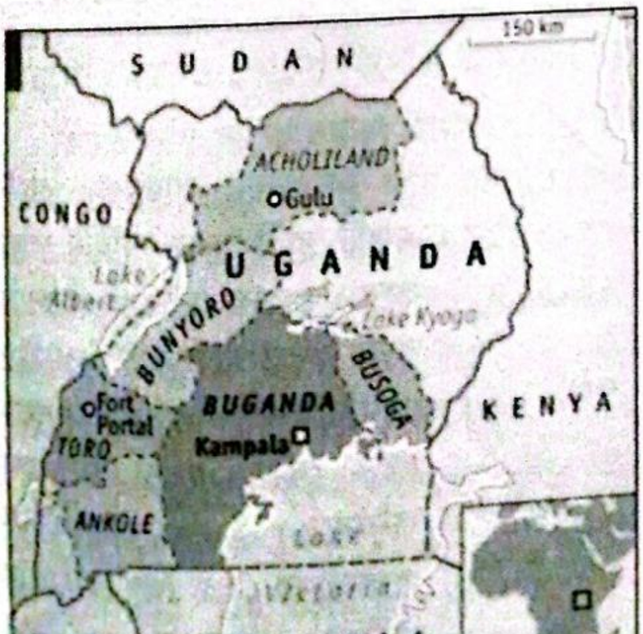
> রাজসদস্য : আমরা এই জায়গাটাকে খালি অবস্থায় পেয়েছি। তারপর সেটাকে একটা চেহারা দিয়েছি। তোমরা পরে এসে ভূমি ভিক্ষা চাইতে শুরু করেছ। তাই দয়া করে কিছুটা দিয়েছি আমরা। তাই স্বভাবতই তোমরা এখন আমাদের দাস।
>
> সাধারণ লোক : কী! এ তো ডাহা মিথ্যা! আমরা এখানে আপনাদের বহু আগে থেকে আছি। আপনারা প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন। আপনাদের রাজকুমাররা হাড়ে হাড়ে বদমাশ!

এসকল হ্রদঘেরা রাষ্ট্রের স্বাধীন ইতিহাসে ভূমি কখনোই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়নি। ইউরোপীয় সামন্তবাদী কাঠামোতে যেমনটা হয়, এখানে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী সেভাবে ভূমির ওপর একচেটিয়া ক্ষমতা পেয়ে বসেনি। একটা সমাজ সামন্তবাদী হয়েছে কি না, সে সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিশেষজ্ঞরা প্রথমে এই বৈশিষ্ট্যটা খোঁজে। কিন্তু আরেকটা বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে ভুলে যায় তারা। তা হলো, এতদসত্ত্বেও ভূমির বণ্টন এবং সম্পদ (বা উৎপাদ) ভোগের অধিকার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে থাকতে পারে। আবার আলোচ্য উদাহরণে গবাদি পশু হলো সম্পদের প্রধান ধরন। তাই এখানে কেউ ব্যক্তিগতভাবে পশুপালের মালিক হওয়া মানেই উৎপাদককে উৎপাদনের মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা। নির্দিষ্ট করে বললে, পশুপালের মালিক সাধারণত বাহিন্দা বা অন্য কোনো বাহিমা বা নতুন বাবিতিও পরিবারগুলো। আর ওইসব পশুর পরিচর্যাকারীরা মালিকের নিতান্ত ভূমিদাস (বা এক্ষেত্রে পশুদাস)। ভূমিতে কাজ করা শ্রমিক তার উৎপাদিত ফসলের ওপর বিপুল পরিমাণ কর পরিশোধ করে। এর ফলে শাসক কর্তৃপক্ষকে আর নিজ হাতে কৃষিকাজ করা লাগে না।

একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। সব মহাদেশ যখন স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হচ্ছিল, তখন গোষ্ঠীতন্ত্র ছাড়া বাকি সব পর্যায়েই উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ার

সাথে সাথে অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় হ্রদঘেরা অঞ্চলটি উপনিবেশ যুগের আগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উন্নত হয়েছে, এর মানে দাঁড়াবে রাষ্ট্রগুলোর উৎপাদন-সক্ষমতাও বেড়েছে। তাহলে এও স্বীকার করতে দোষ নেই যে, সক্ষমতার এই বৃদ্ধি শুধু প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করার ফল নয়। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রমকেও শোষণ করা হয়েছে এখানে। সংখ্যাগুরুরা বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়ে ঘাম ঝরিয়েছে, যাতে প্রাসাদে বাসকারী সংখ্যালঘুর স্বার্থ অক্ষত থাকে।

হ্রদঘেরা রাজ্যগুলো যেখানে ছিল, বর্তমানে সেখানে মূলত উগান্ডা, রুয়ান্ডা, ও বুরুন্ডির অবস্থান। হ্রদঘেরা রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধি শুধু তানজানিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলটি। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে উত্তর-পূর্ব তানজানিয়া ছিল দেশটির সবচেয়ে উন্নত অংশ। কারণ তানজানিয়ার অবশিষ্ট মূল অংশ জুড়ে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য। সেগুলো তখনো গোষ্ঠীতান্ত্রিক পর্যায়ও পুরোপুরি অতিক্রম করেনি। কিন্তু ওই উত্তর-পূর্ব তানজানিয়াতেই আবার কিছু সমস্যারও উদ্ভব ঘটে। ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হওয়ার পর যখন সাম্যবাদের নতুন এক মতাদর্শ প্রচারিত হতে শুরু করে, তখনই দেখা দেয় এসকল সমস্যা। কারণ ততদিনে অসম বণ্টনের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে। ভূমি ও উৎপাদ এবং ব্যক্তির অধিকার তখন আর সমান নেই। সত্যি বলতে, রাজনৈতিকভাবে ওই অঞ্চলটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সামন্তবাদী।



হ্রদঘেরা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বুগান্ডার উৎপত্তি নিয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে। একটি মত অনুসারে, বুনিয়োরোর মতো এর উদ্ভবও লুও থেকে। অন্যদের মতে আবার এটি হলো বাচওয়েযিদের টিকে যাওয়া অংশ। এর সামাজিক কাঠামো অবশ্য বাবিতিও বুনিয়োরোর সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। বুগান্ডায় রাজনীতির লাগাম বাহিমাদের হাতে ছিল না। অর্থাৎ, অ্যাঙ্কোলে থেকে এখানকার পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। বুগান্ডার তারা ছিল স্রেফ গবাদি পশুর মালিক শ্রেণী। বলতে গেলে

রাখাল-দলের চেয়ে বেশি কিছু না। সে যা-ই হোক, বুগান্ডার ইতিহাস হলো ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ ও সুসংহতি লাভের ইতিহাস। কিন্তু সেটার বলি হতে হয়েছে বুনিয়োরো ও অন্যান্য প্রতিবেশীকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে বুগান্ডা গোটা অঞ্চলের সবচেয়ে প্রতাপশালী শক্তিতে পরিণত হয়।

বুগান্ডা রাষ্ট্রের ছিল খুবই মজবুত এক কৃষিজ ভিত্তি। কলা তাদের প্রধান খাদ্য এবং গবাদি পশু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন জিনিস সেখানে সহজলভ্য। তাদের হস্তশিল্পীরা রপ্তানির উদ্দেশ্যে পর্দা তৈরি করত। স্থানীয়ভাবে লোহা আর পাত্র তো উৎপাদিত হতোই, পার্শ্ববর্তী আফ্রিকান গোষ্ঠীদের কাছ থেকে আসত আরও অতিরিক্ত আমদানি। নিজস্ব লবণের ঘাটতি ছিল বলেই তারা ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করার উৎসাহ পায়। এর মাধ্যমে পূরণ করে জোগানের ঘাটতি। বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক বাড়ানোর ফলে কার্যত বিশাল এক অঞ্চলের উৎপাদন শক্তির মাঝে সমন্বয় ঘটে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল পশ্চিম সুদানের ক্ষেত্রে। পূর্ব আফ্রিকায় জার্মান উপনিবেশায়নের এক অগ্রদূত কার্ল পিটার্স। তিনি মন্তব্য করেছেন, "পূর্ব আফ্রিকার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর খুবই কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বুগান্ডায় এত বেশি পণ্য-বিনিময় ঘটত, যা হিসাব করে কুলানো সম্ভব না।" বুগান্ডার ক্ষেত্রে দাসব্যবসার অনুপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর ফলে তারা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও ব্যবসা বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তাই তাদের রাজনৈতিক মহাকাঠামো পেয়েছে একটি সুগঠিত ভিত্তি।



বুগান্ডার রাজারা ছোট একটি স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। তাদের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করত বাহিনীটি। জাতীয় সেনাবাহিনীর বাকি অংশকে গড়ে তোলা হতো প্রয়োজন অনুসারে। রাজনৈতিক প্রশাসনের কেন্দ্র ছিল কাবাকার অধীনে। কাবাকা ও তার পর্ষদের আদেশে নিয়োগ করা হতো বিভিন্ন জেলার শাসকদের। কোনো গোত্রের

হাতে এই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া হতো না। তাই পুরুষানুক্রমে কারও নিয়োগ নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি নেই। স্থানীয় কর্মকর্তাদের এক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই বিশাল রাজ্যকে শাসন করা হতো। এর পরিকল্পনার পেছনে খরচ করা হতো প্রচুর বুদ্ধি। বুগান্ডার রাজনৈতিক সূক্ষ্মতার প্রতি সবচেয়ে অনন্য সম্মান দেখিয়েছে সম্ভবত ব্রিটিশরা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বুগান্ডা ও অন্যান্য পূর্ব আফ্রিকান সামন্তবাদী সমাজের সাথে পরিচিত হওয়ার পর তারা এই সম্মান দেখায়। সম্মান বলা হচ্ছে, কারণ উপনিবেশবাদীরা তাদের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ আর সাংস্কৃতিক অহংকার থেকে নিতান্ত অনিচ্ছায় এই অঞ্চলগুলোকে রেহাই দিয়েছে। এমনিতে তো তারা স্বীকারই করতে চাইত না যে, আফ্রিকা আদৌ নিজ থেকে কিছু করতে সক্ষম।

আসলে ইউরোপীয়রা হ্রদঘেরা অঞ্চলের অবস্থা দেখে এতই মুগ্ধ হয় যে, একটা তত্ত্বই দাঁড় করিয়ে ফেলে তারা। তাদের মতে, এসব রাজনৈতিক রাষ্ট্র কোনো আফ্রিকানের কাজ হতে পারে না। ইথিওপিয়ার শ্বেতাঙ্গ "হ্যামাইট"রাই নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে কোনো এককালে এগুলো গঠন করেছে। বাচওয়েযিরা যেহেতু উজ্জ্বল ত্বকের অধিকারী, সেহেতু কিছুটা সমর্থনও পেয়ে গেছে এই তত্ত্ব। কিন্তু প্রথমত, বাচওয়েযিরা যদি ইথিওপিয়া থেকেই আসত, তাহলে তারা হতো কালো বা বাদামি আফ্রিকান। দ্বিতীয়ত, আগেই যেমনটি বলা হলো, পূর্ব আফ্রিকার সংস্কৃতিগুলো স্থানীয় বিকাশেরই সমষ্টি। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ওইসব নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে থেকে আসা অন্যান্য আফ্রিকান অবদান। এগুলো মোটেও কোনো বিদেশি আমদানি নয়।

বাচওয়েযি বা বাহিমারা ইথিওপিয়া থেকে এসেছে ধরে নিলে বলা যায়, পরে তাদের ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রজাদের মতো তারাও হয়ে গেছে বান্টু-ভাষী। লুও থেকে উদ্ভূত বাবিতিও রাজবংশের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। বোঝা যায়, তারা মিশে গেছে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে। তা ছাড়া, ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝে বাবিতিও এবং বাহিমা/বাহিন্দা জনগোষ্ঠী নিজেদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

মোটকথা, নানারকম নৃগোষ্ঠী, বর্ণ, আর শ্রেণী থেকে আবির্ভূত হচ্ছিল বেশ কয়েকটি "জাতীয়তা"। এই "জাতীয়তা" এমন এক সামাজিক সংগঠন, যা জাতি-রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ঠিক আগের ধাপ। এই সংজ্ঞা বুগান্ডা, বুনিয়োরো, অ্যাঙ্কোলে, কারাগোয়ে, আর টোরোর ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির ক্ষেত্রেও।

রুয়ান্ডা

হ্রদঘেরা অঞ্চলের সবচেয়ে পশ্চিম দিকে ছিল রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি রাজ্যদ্বয়। বর্তমানে যে দুটি দেশ এই নামের অধিকারী, সেগুলো অতীতের রাজ্য দুটিকে ঘিরেই অবস্থিত। রুয়ান্ডার অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পুরাতন বুনিয়োরো-কিতারা রাজ্য এবং এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র অ্যাঙ্কোলের মতো রুয়ান্ডাও দুটি প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। বিশাল ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীটি ছিল কৃষক, যারা বাহুতু নামে পরিচিত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বাতুতসি পশুপালকদের হাতে। তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। এর চেয়েও সংখ্যালঘু ছিল বাতওয়া (প্রায় ১ শতাংশ)। কৃষি-পূর্ব সামাজিক সংগঠনের খুবই নিম্ন এক পর্যায়ে ছিল এরা।

প্রজাতি হিসেবে মানুষের যে বিকাশ, সে সম্পর্কে দারুণ এক পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় রুয়ান্ডার সমাজের এই তিনটি অংশের আপেক্ষিক গঠন থেকে। বাতুতসি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘকায় মানবগোষ্ঠীগুলোর মাঝে অন্যতম। বাহুতুরা বেঁটে ও গাট্টাগোট্টা। বাতওয়ারা পিগমি। সামাজিক পেশা ও খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিতে বহুলাংশে এসব পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। বাতওয়ারা থিতু কৃষিজীবী সমাজে বাস করত না। এর বদলে ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়াত, শিকার ও শেকড় সংগ্রহ করত। তাই পরিমাণে বেশি বা মানে উন্নত খাবার জোটাতে পারেনি তারা।

আরেক প্রান্তে থাকা বাতুতসি পশুপালকরা সর্বদা সহজলভ্য দুধ ও মাংসের মতো উন্নত খাবারের ওপর বেঁচে থাকে। বাহুতুরা সামাজিকভাবে বাতওয়াদের চেয়ে বেশি অগ্রসর। তারা খেতে পায় বেশি পরিমাণে ও নিয়মিত হারে। কারণ তারা প্রকৃতির খেয়ালের প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল না। বাতওয়াদের মতো দুর্লভ শিকারের পেছনে ছুটে বেড়াতে হয় না তাদের। কিন্তু বাতুতসিরা যেরকম প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার পায়, সেরকম মানসম্পন্ন খাবার বাহুতুদের নেই। তাই বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, উৎপাদনের সক্ষমতা এবং খাবারের বণ্টনের ওপর মানুষজাতির শারীরিক বিকাশও নির্ভরশীল।

যাকগে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাতুতসিরা তাদের উচ্চতার কারণে না, বরং রাজনৈতিক ও সামরিক অর্জনের কারণে অনন্য। রুয়ান্ডা রাজ্যে তাদের অবদান চতুর্দশ শতক থেকে শুরু। অর্থাৎ, বাচওয়েযিদের সমসাময়িক কালে। রুয়ান্ডা ও অ্যাঙ্কোলের মাঝে এবং কারাগোয়ে ও বুরুন্ডির মাঝে চমকপ্রদ সাদৃশ্য এবং এমনকি সত্যিকারের সম্পর্কও ছিল। কিন্তু বুনিয়োরো-কিতারা যেমন একটি একক রাজনৈতিক সত্তা ছিল, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে

রুয়ান্ডার অবস্থা মোটেও সেরকম ছিল না। সেখানে বরং ছিল সর্দারদের অধীনে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট এলাকা। রাজ্যটা কেন্দ্রীয় রুয়ান্ডা তুতসি গোত্রেরই এক বর্ধিতাংশ। এই গোত্র ক্রমান্বয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি ছোট ও সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। আরও পরে গিয়ে নিজের সীমানা বৃদ্ধি করে ওই কেন্দ্রীয় রুয়ান্ডা রাষ্ট্র। উপনিবেশবাদীদের আগমনের পরেও অব্যাহত থাকে এই ধারা। যেমন, এম্পোরোর (অ্যাঙ্কোলে) শাসকেরা ততদিনে রুয়ান্ডাকে কর দিতে শুরু করেছে। এই অ্যাঙ্কোলের ঘাড়ে পাড়া দিয়েই বেড়ে উঠছিল রুয়ান্ডা।

রুয়ান্ডা রাজ্যের প্রধান শাসককে বলা হতো মোয়ামি। অন্য অনেক আফ্রিকার শাসকের মতোই তার ক্ষমতাও ধর্মীয় বিশ্বাসবলে প্রতিষ্ঠিত। তাকে ঘিরে থাকত নানারকমের ধর্মীয় আচার। ইউরোপের সামন্তবাদী রাজারা প্রায়ই প্রজাদের বিশ্বাস করাতে চাইত যে, ঈশ্বরই তাদের হাতে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তাই তারা "আসমানি অধিকার"-এর বলে শাসন করছে। রুয়ান্ডার মোয়ামির মতো আফ্রিকান রাজাদের প্রজারাও এরই কাছাকাছি এক ধরনের বিশ্বাস লালন করে চলত। তবে হ্যাঁ, বিশ্বাস করানোর পাশাপাশি রাজার হাতে সত্যিকারের ক্ষমতাও থাকা চাই। রুয়ান্ডার মোয়ামিরা এই ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করেনি।

অষ্টাদশ শতকের একজন বিখ্যাত মোয়ামি ছিলেন রুজুগিরা। স্বাধীন শাসকদের ধারায় সবার শেষে রয়েছেন রুয়াবুগিরি (যিনি চতুর্থ কিগেরি নামেও পরিচিত)। তার মৃত্যু হয় ১৮৯৫ সালে। গাহিন্দিরো হলেন আরও একজন। রাজদরবারের গায়ক ও ইতিহাসবিদরা তার প্রচুর স্তুতি গেয়েছে। উল্লেখিত প্রত্যেক মোয়ামিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামোকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তার মানে, তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ঐতিহাসিক, শ্রেণীগত, ও জাতীয় শক্তির প্রতীক।

অষ্টাদশ শতকের মোয়ামি রুজুগিরা তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ একজন সামরিক নেতার একচ্ছত্র শাসনাধীনে নিয়ে আসার পদক্ষেপ নেন। শক্তিশালী সেনাদল স্থাপিত করেন সেসব স্থানে। এই পদক্ষেপটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ যেকোনো তরুণ ও উদীয়মান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনিশ্চয়তাপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হলো সীমান্তবর্তী এলাকা। রুজুগিরা কার্যত এই সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো সামরিক আইনের অধীনে নিয়ে আসেন। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করেন স্থায়ী সামরিক শিবির।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মোয়ামি গাহিন্দিরো বেসামরিক প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। প্রত্যেক প্রদেশে সৃষ্টি করা হয় একজন ভূমি-নেতা ও একজন পশুপালক-নেতার পদ। একজনের দায়িত্ব ক্ষেতখামারের ভাড়া এবং

আরেকজনের দায়িত্ব গবাদি পশুর চাঁদা। তা ছাড়া, প্রত্যেক প্রদেশের ভেতর ছিল কিছু জেলা কর্তৃপক্ষ বা "পাহাড়-নেতা"। এরা সকলেই বাতুতসি অভিজাত শ্রেণীর সদস্য। পরিকল্পিতভাবে হোক বা দুর্ঘটনাক্রমে হোক, বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বশীল প্রশাসকদের মাঝে হিংসাহিংসি বেঁধে যায়। ফলে মোয়ামির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কোনো ষড়যন্ত্র করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে। "পাহাড়-নেতা"র পদটি পুরুষানুক্রমে অর্পিত হয়ে আসছিল দীর্ঘকাল ধরে। নির্দিষ্ট কোনো বাতুতসি গোত্র বা বংশ এটি লাভ করত। কিন্তু রুয়াবুগিরির শাসনামল শুরু হওয়ার পর তিনি নিজ এখতিয়ারে এই নেতাকে নিয়োগ দিতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় সরকার আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এই পদক্ষেপের ফলে। এরই মধ্যে আবার সরকারি কর্মচারী ও উপদেষ্টাদের (একত্রে যারা বিরু নামে পরিচিত) ভূমি অর্পণ করা হয়। ভূমি-নেতা বা পশুপালক-নেতা এসব জমিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মোয়ামির প্রতি বিরুর অবিচল আনুগত্য নিশ্চিত হয়ে যায় এই পদক্ষেপের ফলে।

রুয়ান্ডাতে যে সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, তা বেশ পদানুক্রমিক ও সামন্তবাদী ধাঁচের। আফ্রিকার অন্যান্য অংশে এই ব্যাপারটি এত বেশি দেখা যায়নি। বিভিন্ন শ্রেণী ও ব্যক্তির মাঝে পদানুক্রম গড়ে ওঠে। সামাজিক ও আইনিভাবে তাদের মধ্যে থাকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। সেনাবাহিনী, লোকপ্রশাসন, এবং গোটা সামাজিক বিন্যাসেই দেখা যায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো। বাকি সব বিষয়ের নিয়ামক ছিল পশুসম্পদের ওপর মালিকানা। এই ব্যবস্থাটির নাম উবুহাকে।

তার মানে দাঁড়াল, কিছু মানুষ থাকবে (পশুর মালিকানার দিক দিয়ে) গরিব, আর কিছু মানুষ (জন্মগতভাবে) নিচু শ্রেণীর। তারা নিজেদের চেয়ে বেশি ধনী বা উচ্চতর শ্রেণীর মানুষদের কাছে গিয়ে নিজেদের শারীরিক শ্রম প্রদান করতে পারবে। বিনিময়ে তারা পাবে গবাদি পশু ও নিরাপত্তা। তবে গবাদি পশুগুলো একচ্ছত্র অধিকার হিসেবে শ্রমিককে দিয়ে দেওয়া হতো না। মূল মালিকের প্রতি অনুগত থাকার শর্তে তারই অধীনেই সেগুলো ভোগ করতে পারত শ্রমিক। ভূমিতে কর্মরত শ্রমিকেরও একইভাবে শারীরিক শ্রম দিতে হতো। খাজনা হিসেবে প্রদান করতে হতো খাদ্যশস্যের একাংশ।

বাতুতসি অভিজাতরা তাদের "প্রতিরক্ষা" প্রদানের দায়িত্ব পালন করত দুইভাবে। একটি হলো মোয়ামির রাজদরবারে প্রতিনিধিত্ব করা, আরেকটি হলো আইনি মামলায় নির্ভরশীলদের পক্ষে ওকালতি করা। কিন্তু সর্বোপরি এই নিরাপত্তা আসত সামরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু

করে নির্দিষ্ট কিছু বাতুতসি বংশ বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাতুতসি অভিজাতদের পুত্রসন্তানেরা হয়ে ওঠে রাজশিষ্য। শিক্ষামূলক সকল প্রশিক্ষণ তারা লাভ করত একটি সামরিক কাঠামোর ভেতরে থেকে। প্রত্যেক নতুন মোয়ামি এসে বিদ্যমান বাহিনীতে নতুন আরও লোক নিয়োগ দেয়। নির্দিষ্ট কিছু বাহিনীর সাথে কতিপয় বাহুতুকে জুড়ে দেওয়া হয় রসদ সরবরাহ করার জন্য। বাতোয়াদেরও নিয়োগ দেওয়া হয় বিশেষ তিরন্দাজ হিসেবে (বিষমাখানো তির-সহ)।

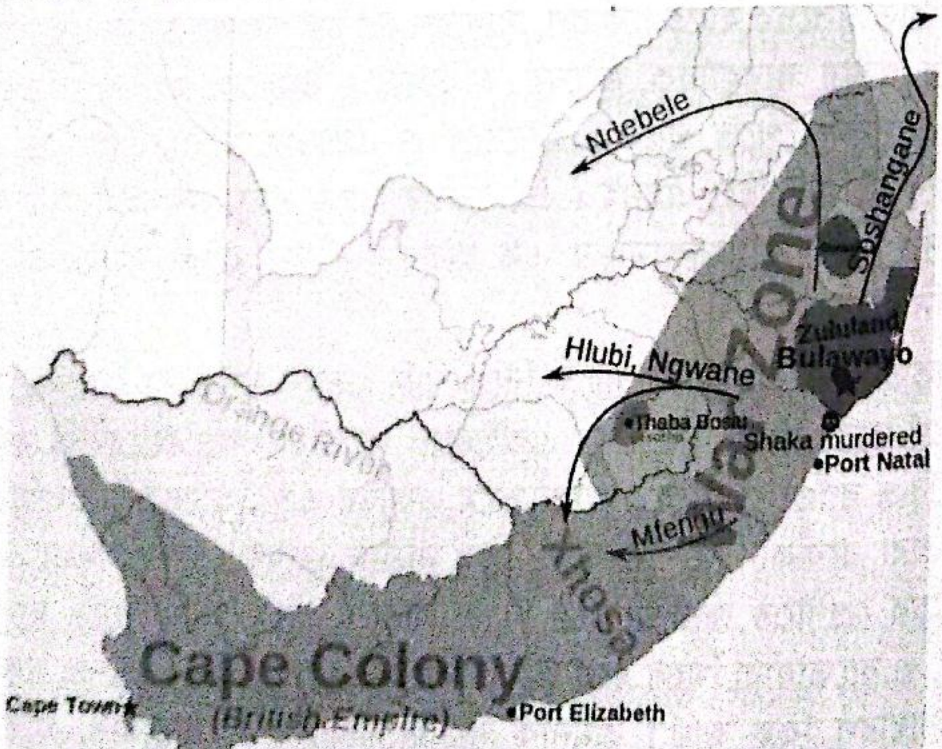
বাতুতসিরা বাহুতুদের যে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি করত, তা নিতান্তই ফাঁকা বুলি। কারণ তারা এই প্রতিরক্ষা দানের মাধ্যমে আসলে যেটা করে, তা হলো বাহুতুদের শোষণ। বহিঃস্থ শত্রু থেকে তাদের সুরক্ষা দেয়, যাতে করে জনসংখ্যা ঘন ও প্রাচুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাহুতুদের সংরক্ষণ করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হলো এদের উন্নত কৃষিজ্ঞান ব্যবহার করে আরও বেশি ফসল উৎপাদন করানো। তা ছাড়া, বাতুতসিদের মধ্যেও শুধু উচ্চতর শ্রেণীটিই ছিল গবাদি পশুর মালিক। এগুলো প্রতিপালনের দায়িত্ব তারা অর্পণ করত নিম্নতর শ্রেণীর বাতুতসিদের হাতে। কারণ, সাধারণ শ্রেণীর পশুপালকেরা এই কাজের ব্যাপারে গভীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী। উচ্চতর শ্রেণীর বাতুতসিরা সেটারও সুফল পেতে থাকে। ইউরোপ ও এশিয়ার মতো এখানেও আর্থ-সামাজিক ভিত্তিটা ছিল এমনই। এই ভিত্তির ঘাড়ে পাড়া দিয়েই বিলাসিতা ও নিজেদের মাঝে কামড়াকামড়ির এক আয়েশি জীবন যাপন করত অভিজাত বাতুতসি শ্রেণী।

বাতুতসি ও বাহুতুদের মাঝে বিয়ে-শাদি তেমন ঘটত না বললেই চলে। সে অর্থে তারা পৃথক দুটি বর্ণ। একইভাবে বাতোয়াদেরও আরেকটি বর্ণ বলা যায়। কিন্তু বর্ণগুলো যেহেতু পদানুক্রমে একটির ওপর আরেকটি অবস্থিত, সে অর্থে তারা একেকটা শ্রেণীও বটে। কিছু মাত্রায় একেক শ্রেণীর সদস্য ওপরের বা নিচের শ্রেণীতে জায়গা করে নিতে পারে। তারই সাথে সাথে বাতুতসি, বাহুতু, ও বাতোয়ারা মিলে হয়ে উঠতে থাকে রুয়ান্ডা জাতি। তাদের সকলেরই ছিল সাধারণ কিছু স্বার্থ। এমনকি বুরুন্ডি রাজ্য যেই বাতুতসি, বাহুতু, ও বাতোয়াদের নিয়ে গঠিত—তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা করাটাও ছিল সেসব স্বার্থের মাঝে একটি। রুয়ান্ডা একদিকে রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটাতে থাকে, আরেকদিকে তাদের সামাজিক শ্রেণী ও বর্ণগুলোর পার্থক্য হয়ে উঠতে থাকে আরও প্রকট। কিন্তু এগুলো রুয়ান্ডার অনন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এসব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল বহিঃস্থ কোনো শক্তির প্রভাব ছাড়াই, একেবারে স্বাধীনভাবে। দাসব্যবসার

সরাসরি কোনো প্রভাব তো ছিলই না তাদের ওপর।

আমা-জুলু

দাসব্যবসা থেকে একইভাবে মুক্ত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ পশ্চিম আফ্রিকার বন্দি রপ্তানি শুরু হয়েছিল অ্যাঙ্গোলা থেকে। মোজাম্বিক ও আরও উত্তর দিকের এলাকাগুলো থেকে রপ্তানি হয় পূর্ব আফ্রিকান বন্দিরা। লিম্পোপোর দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার যে অঞ্চলটি অবস্থিত, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাদের সামাজিক গঠনগুলো ছিল বেশ সরল। পূর্ব দিকের অঞ্চলে বহুদিন পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল খুব কম। সেখানে খোই খোই পশুপালকরা বাস করত। কালক্রমে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বান্টু-ভাষীরা। যোড়শ শতকে যখন ইউরোপীয় জাহাজ এসে নাটাল উপকূল স্পর্শ করে, তখনো সেটা বেশ স্বল্পবসতিপূর্ণ এলাকা। ছড়ানো-ছিটানো আকারে ছিল বসতভিটা। কিন্তু সামনের বছরগুলোতে জনসংখ্যা বেশ ঘন হয়ে ওঠে। শুরু হয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজনৈতিক-সামরিক পরিবর্তন।



আফ্রিকান ইতিহাসের সাথে সামান্য হলেও যাদের পরিচয় আছে, তারাই জুলু নেতা শাকা-এর নাম শুনে থাকবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বাংশে সংঘটিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সবচেয়ে মূর্ত রূপ তিনি। শাকার ব্যাপারে জনৈক (ইউরোপীয়) জীবনীকার বলেছেন :

নেপোলিয়ন, জুলিয়াস সিজার, হ্যানিবাল, শার্লামেইন ... বিশ্বের ইতিহাস-জুড়ে কালে কালে এদের মতো মানুষদের উদ্ভব ঘটেছে। তারা এমন গৌরবের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, যা সাধারণ মানুষদের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে তাদের। এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন শাকা, যিনি হয়তো এদের মাঝেও সেরাদের সেরা।

ওপরের স্তবগীতিটি শাকার এক জীবনী-গ্রন্থের পেছনের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে। যেহেতু পুঁজিবাদী প্রকাশকদের কাছে বই আর সাবানের প্যাকেটের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, সেহেতু বই-বিক্রির উদ্দেশ্যে-বানানো যেকোনো বিজ্ঞাপনকেই সন্দেহের চোখে দেখা চাই। তারপরও শাকাকে নিয়ে যতজনই আলোচনা করেছে (আফ্রিকান ও ইউরোপীয় নির্বিশেষে), সকলেই তাকে ইউরোপীয় ইতিহাসের "মহামানবগণ"-এর সাথে একই কাতারে রেখেছে। তাই উনবিংশ শতক পর্যন্ত আমা-জুলু সমাজের বিকাশ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তার প্রসঙ্গ আনাটাই সমীচীন। সার্বিকভাবে সমাজের উন্নয়নের সাথে নেতার ভূমিকার সম্পর্ক কেমন, সেটা বোঝা যাবে এই পর্যালোচনা থেকে।

শাকার জন্ম প্রায় ১৭৮৭ সালের দিকে। চল্লিশ-বছরের জীবনে তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন বলে বিদিত আছে, সেগুলো এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি ১৮১৬ সালের মাঝে আমা-নগোনির এক ছোট গোত্র আমা-জুলুর নেতায় পরিণত হন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনি গোত্রটিকে সামরিকভাবে পুনর্গঠিত করেন। সেটা অস্ত্রের দিক দিয়ে যেমন, তেমনি যুদ্ধের কৌশল ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য ছিল আমা-জুলু গোত্রকে একটি ভীতিকর যোদ্ধাবাহিনীতে পরিণত করা। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক কলাকৌশলের মাধ্যমে তিনি আমা-নগোনিকে ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

ইতিপূর্বে ডজন ডজন স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন গোত্রে বিভক্ত ছিল এই জনগোষ্ঠীটি। একটা সময় তো মনে হতে থাকে যে, শাকা বুঝি বর্তমান নাটাল, লেসোথো, ও সোয়াজিল্যান্ডের পুরো অঞ্চলটিকেই একই শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলবেন। আঠারোশ আটাশ সালে তার মৃত্যু হয়ে যাওয়ায় সেই কাজ আর সম্পন্ন হয়নি। তার কাজের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারেননি তার উত্তরসূরিরাও। কিন্তু ১৮১৬ সালে শাকা তার বাপ-দাদার সূত্রে যে পরিমাণ ভূমির মালিক হয়েছিলেন, তা ছিল মোটে একশ বর্গমাইল। উনবিংশ শতাব্দীতে আমা-জুলু জাতির দখলে থাকা ভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় সেটার একশ গুণ। ক্ষয়িষ্ণু ও খর্বশক্তির এক আমা-জুলু বাহিনী ১৮৭৬ সালে আইস্যান্ডলোয়ানার

যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজিত করে। বিদেশি অভিযানের গোটা ইতিহাসে এটি তাদের অন্যতম শোচনীয় পরাজয়।

শাকা যে সময়টায় বেড়ে উঠছিলেন, তখন ঐক্য ও কার্যকর সেনাবাহিনীর প্রশ্নটি আমা-নগোনি জাতির মাঝে প্রথমবারের মতো গুরুত্ব-সহকারে আলোচিত হতে শুরু করেছিল। এর আগ পর্যন্ত গোত্রগুলো ভেঙে ভেঙে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ হয়ে যাওয়ার একটি প্রবণতা ছিল। একটা গোত্রের জ্যেষ্ঠতম পুত্রটি যখন সাবালক হয়ে উঠত, সে আলাদা হয়ে গিয়ে স্থাপন করত তার নিজের ক্রাল। জন্ম হতো নতুন এক কনিষ্ঠ গোত্রের। কারণ তার বাবার গোত্র জ্যেষ্ঠ হিসেবেই রয়ে যেত। সেটার নেতৃত্ব চলে যেত তার "বড় বউয়ের" জ্যেষ্ঠতম পুত্রের হাতে। যতদিন জনসংখ্যার ঘনত্ব কম এবং কৃষি ও পশুচারণের ভূমির পরিমাণ বেশি ছিল, ততদিন পর্যন্ত এভাবে ভাগ হওয়াটা সম্ভব ছিল। এরকম প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থায় সম্পদ বা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য খুব একটা প্রতিযোগিতা হতো না।

লাতিন আমেরিকায় একটা ফুটবল ম্যাচ যেরকম মারাত্মক, সে-সময় যুদ্ধের ভয়াবহতাও ছিল বড়জোর ওইটুকুই। সাধারণ এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতই। তারা পরস্পরকে চিনত খুব ভালোভাবে। আর তাদের বীরেরা উৎসবমুখর পরিবেশে একে অপরের সাথে লড়াই করত। একজন-দুজন মারা যেত বটে। কিন্তু পরবর্তী লড়াইয়ের আগ পর্যন্ত শান্তভাবে বাড়ি ফিরে যেত সকলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমা-জুলুর ঢিমেতালে-চলা জীবন এবং রাজনীতি উল্লেখযোগ্য হারে পালটে যেতে শুরু করে। জনসংখ্যা বাড়তে থাকা মানে কনিষ্ঠ সদস্যদের নিজস্ব জীবন শুরু করার সুযোগ কমতে থাকা। পশুচারণের ভূমি কমে যাবার ফলে গবাদি পশু ও জমি নিয়ে শুরু হয় ঠোকাঠুকি। আমা-জুলু যেহেতু যুদ্ধে জড়াত বেশি পরিমাণে, সেহেতু আরও কার্যকরভাবে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে শুরু করে তারা। একইভাবে জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দও এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামোর চাহিদা অনুভব করেন, যে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। সেইসাথে কমিয়ে দেবে রক্তক্ষয়ী এসকল সংঘাত।

শাকা জুলুল্যান্ডের সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার সমস্যার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হন। এই দুটিকে একই মুদ্রার দুই পিঠ হিসেবে দেখতেন তিনি। তার মতে, রাজনৈতিক কেন্দ্রের উচিত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা এবং অন্যান্য পরিমণ্ডলেও এর প্রভাব প্রতিফলিত করা। এতে করে শান্তিপূর্ণভাবে

বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য গঠিত হবে, অন্যথায় বিদ্রোহীদের দমন করা হবে কঠোর হাতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জুলুল্যান্ডে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের একটি যুগ অতিবাহিত হয়। যুদ্ধের পরিমাণ বাড়ে ঠিকই, কিন্তু সামরিক সংঘাতের ধরন থাকে আগের মতোই। দূর থেকে শত্রুর দিকে ছুড়ে মারা হয় হালকা উমখোন্তো, তথা বর্শা। স্বল্প-দূরত্বে লড়াইয়ের জন্য এমন অস্ত্র বেশি সুবিধাজনক, যেটা হাতের মুঠিতে ধরে রাখা যায়। ইউরোপ ও এশিয়ার সামন্তবাদী সৈনিকেরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তরবারি ও শূলের ব্যবহার শুরু করে। শাকা যখন তরুণ সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি এর একটা সমাধান বের করেন। ভারী ও ছোট আসেগাই ব্যবহার করেন তিনি, যেটা ছুড়ে মারার বদলে কেবলই ঘাঁই মারার কাজে ব্যবহৃত হতো। পাশাপাশি, ঢিলা স্যান্ডেলের ব্যবহারও তিনি বাতিল করেন, যাতে করে শত্রুর দিকে দ্রুততর ধেয়ে যাওয়া যায়। স্বল্প-দূরত্বের যুদ্ধে অধিকতর সুবিধা লাভ করা যায় এর ফলে। অভিজ্ঞতার বলে শাকা ও তার সহযোদ্ধা যুবকরা তাদের ঢাল ও আসেগাইয়ের সবচেয়ে উপযোগী ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কার করেন।

এটা ঠিক যে, যুদ্ধ মানেই শুধু বিপক্ষের সৈন্যের মুখোমুখি হওয়া না। বরং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো গোটা শত্রুদলের বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল ও পদ্ধতি। যুদ্ধের এই ব্যাপারটাতেও মনোনিবেশ করেন শাকা। নিয়ে আসেন তার যুগান্তকারী উদ্ভাবন ইজিম্পি। এই বাহিনীর অগ্রবর্তী যে দলটি লড়াইয়ে ব্যস্ত, তাদের পেছনেই প্রস্তুত থাকত অতিরিক্ত আরেকটি বাহিনী। আর দুই দিকে সেনাদলের এমন দুটি "শিং" বিস্তৃত করা হতো, যার মাধ্যমে সহজেই পাশ থেকে ঘিরে ধরা যায় শত্রুদের। পরিশেষে (এবং সর্বোপরি), সেনাবাহিনীকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিন্যস্ত করতে হবে, যেন তারা শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন উভয় পরিস্থিতিতেই একটি সার্থক সত্তা হিসেবে কাজ করতে পারে। চল্লিশ বছর-বয়সি পর্যন্ত পুরুষদের নিয়ে শাকা তৈরি করেন নতুন নতুন বাহিনী। ইজিম্পি বাহিনীকে তিনি টানা অনুশীলন ও "ক্লান্তি"র ভেতরে রাখেন, যাতে করে সুঠাম ও দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠে প্রতিটি সেনা। আর পুরো সেনাদল কাজ করতে থাকে সেনাপতির আদেশের ছন্দে ছন্দে।

জুলু সেনাবাহিনী গতানুগতিক কোনো যোদ্ধা-দল ছিল না। এটা ছিল তরুণদের জন্য এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে গোত্রীয় আনুগত্যকে ছাড়িয়ে জাতীয়তার চেতনা সৃষ্টি করা হয়। বংশ বা জন্মস্থানের বদলে মেধার ভিত্তিতে হয় পদোন্নতি। নগোনি গোষ্ঠীর যত ভাষা রয়েছে, তার মধ্যে শুধু জুলু

ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় সবার জন্য। এর ফলেও জাতীয়তাবাদী চেতনা শক্তিশালী হয়। বারো হাজার বর্গমাইল জুড়ে সকল নাগরিক নিজেদের পরিচয় দেয় আমা-জুলু হিসেবে। নিজেদের গোত্রীয় পরিচয়কে ঠেলে দেয় দ্বিতীয় স্থানে। এর চেয়েও আরও বড় এলাকা জুড়ে গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকে জুলু প্রভাব। জাদুটোনা নিষিদ্ধ করার মতো বিভিন্ন নীতিমালা প্রণীত হয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে মুক্ত হয় জুলুল্যান্ড। এগুলোর সুফল হিসেবে জুলুল্যান্ডের সীমানার বাইরে থেকেও বহু মানুষ এখানে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। জুলু রাষ্ট্রের মানবসম্পদে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এর ফলে।

শাকার সময়কালীন জুলুল্যান্ডের ব্যাপারে লিখিত বর্ণনা রেখে গেছে বহু ইউরোপীয় পর্যটক। তারা সেখানকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেমন মুগ্ধ (যেমনটা ছিল পঞ্চদশ শতকের বেনিনের ক্ষেত্রে), তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা, চৌর্যবৃত্তির অনুপস্থিতি, এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা দেখেও চমৎকৃত। (পশ্চিম সুদান সাম্রাজ্য যখন তুঙ্গে ছিল, তখন সেখানকার আরব পর্যটকরাও একইরকম কথা লিখেছে।) আসলে পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বহু আগে থেকে জুলু জীবনের অংশ ছিল। শাকার যুগে যে জিনিসটা চোখে পড়ার মতো, তা হলো এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বহুগুণ ব্যাপ্তি। রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় যে নিরাপত্তাবলয় গড়ে ওঠে, তারই ফলে এই ব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছে। এসব দেখে মুগ্ধ হয়েছিল ইউরোপীয়রা। আর ইউরোপীয় প্রমাণই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, কারণ এগুলোকে আফ্রিকাপন্থি প্রোপাগান্ডা হিসেবে আখ্যায়িত করা অসম্ভব। জনৈক শ্বেতাঙ্গ অতিথি শাকার পনেরোটি বাহিনীর কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন,

> "এ ছিল এক দুর্দান্ত দৃশ্য। আমাদের হতবাক করে দেওয়ার মতো। 'অসভ্য' হিসেবে আখ্যায়িত একটি জাতি যে এতটা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী হতে পারে, তা তো আমরা ভাবতেই পারিনি।"

আমা-জুলুর রাজনৈতিক কাঠামো ও সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আরও অনেককিছু বলা সম্ভব। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনের আগে উনবিংশ শতকের আফ্রিকায় একজন শাকার উত্থান কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, এটা বোঝার চেষ্টা করাটাই আপাতত প্রাসঙ্গিক।

শাকা যদি মিসিসিপির কোনো তুলাক্ষেতে বা জ্যামাইকার কোনো আখক্ষেতে কর্মরত দাস হতেন, তাহলে হয়তো "অবাধ্য নিগার" হওয়ার কারণে একটা কান বা একটা হাত কাটা যেত তার। অথবা বড়জোর একটা দাসবিদ্রোহের নেতা হিসেবেই হয়তো তিনি পরিচিতি লাভ করতেন। কারণ পরাধীন আর নিপীড়িতদের মাঝে শুধু তারাই মহান, যারা নিপীড়ককে ধ্বংস

করার চেষ্টায় রত। দাস উপনিবেশে শাকা কোনো জুলু সেনাদল বা জুলু রাষ্ট্র গঠন করতে পারতেন না—এতটুকু নিশ্চিত। ঔপনিবেশিক যুগে কোনো আফ্রিকানের পক্ষেই কোনোকিছু গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, তা সে যতই প্রতিভাধর হোক না কেন। শাকা ছিলেন একজন রাখাল ও একজন যোদ্ধা। বয়স কম থাকাকালীন তিনি খোলা চারণভূমিতে গবাদিপশু চরাতেন—নিজের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ও তার পরিবেশে সেগুলো প্রয়োগ করার ব্যাপারে স্বাধীন।

শাকা তার মেধা ও সৃজনশীল শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে পেরেছেন। দাসব্যবসায়ীদের পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়নি তাকে। সুইডেন ও ফ্রান্সে বানানো পণ্য কীভাবে পুনরায় বিক্রি করা যায়, তা নিয়ে তার মাথা ঘামাতে হয়নি। জনগণের সম্পদের সীমা অনুযায়ী জুলু অঞ্চলকে কীভাবে উন্নত করা যায়, তা-ই নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

এখানে কয়েকটি বিষয় স্বীকার করে নিতে হবে। প্রথমত, সামরিক কলাকৌশলের মতো বিষয়গুলো হলো বাস্তব কোনো চাহিদার প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিমানুষের কর্মকাণ্ড উদ্ভূত হয় ও সাহায্য পায় সমাজের সার্বিক কর্মকাণ্ড থেকে। তৃতীয়ত, যেকোনো নেতার সকল অর্জন তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও উন্নয়নের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। এগুলোই নির্ধারিত করে দেয় যে, একজন ব্যক্তি তার সম্ভাবনাকে কী পরিমাণে আবিষ্কার, বৃদ্ধি, ও প্রয়োগ করতে পারবে।

ওপরের পয়েন্টগুলো এবার শাকার উদাহরণ থেকে স্পষ্ট করা যাক। শাকা একসময় উপলব্ধি করলেন, ছুড়ে মারার বর্শাগুলো ঘাঁই মারার কাজে ব্যবহার করতে নিলে ভেঙে যায়। তখন তিনি ভারী আসেগাই তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, শাকার এই আবিষ্কার গোটা আমা-জুলুর সামষ্টিক প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। আমা-নগোনি জাতি দীর্ঘকাল যাবৎ লোহা নিয়ে কাজ করছিল বলেই শাকা উন্নততর আসেগাই তৈরির আবেদন জানাতে পেরেছিলেন। কিছু গোত্রে যদি দক্ষ কামারদের উদ্ভব না ঘটত, তাহলে শাকার পক্ষে এই দাবি তোলাই সম্ভব হতো না। গোটা সমাজের সাংগঠনিক ও কৃষি সামর্থ্যের ফলেই ত্রিশ হাজার সদস্যের এক স্থায়ী সেনাদলকে ভরণপোষণ দিতে পেরেছে তারা। সেইসাথে তাদের সরবরাহ করেছে নতুন নতুন লোহার অস্ত্র। প্রতিটি সেনাকে দিতে পেরেছে গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি বড় বড় জুলু ঢাল।

জুলু সমাজে যেহেতু ওই ধরনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং পরীক্ষণের জন্য

প্রয়োজনীয় শর্তাদি অনুপস্থিত ছিল, সেহেতু শাকার পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব হয়ে উঠত না—তা তিনি যতই বুদ্ধিমান হোন না কেন। কিন্তু তিনি তার জাতিকে দিয়ে উন্নততর অস্ত্র ঠিকই তৈরি করাতে পেরেছেন, যেমনটি ওপরে ব্যাখ্যা করা হলো। রাজকার্যের জন্য তিনি বিশেষ পশুপাল গড়ে তোলেন। তখন স্বজাতির লোকেদের আরেকটি দক্ষতার সন্ধান পান তিনি। বেছে বেছে প্রজনন ঘটিয়ে উন্নততর শাবক উৎপাদন করার ক্ষেত্রে তারা বেশ আগ্রহী। কারণ গবাদি পশুর ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ ব্যবহারিক জ্ঞান ও পশুপালন পেশার প্রতি ভালোবাসা থাকায় তারা ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ।

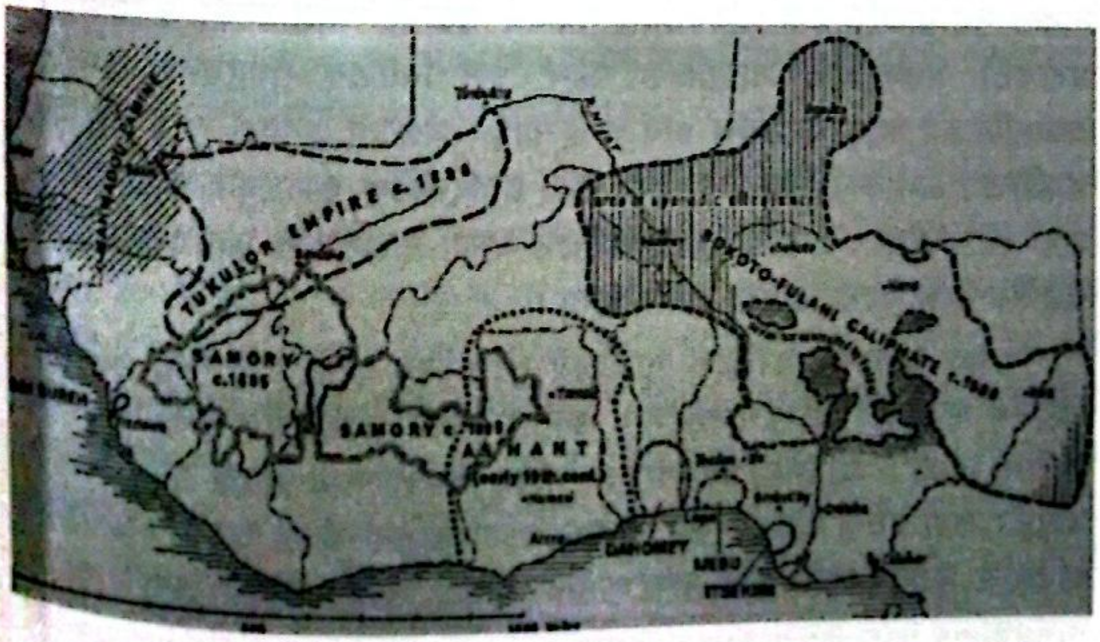
রাজনৈতিক-সামরিক পরিমণ্ডলে শাকা তার অভিভাবক দিঙ্গিসোয়ায়োর পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন। কিছু পরিমাণে অনুসরণ করছিলেন জুইকের পদাঙ্কও, যিনি দিঙ্গিসোয়ায়ো ও শাকা উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বী। দিঙ্গিসোয়ায়ো দেলাগোয়া উপসাগরে ১৭৯৭ সালে পর্তুগিজদের সাথে (প্রধানত হাতির দাঁতের) ব্যবসা শুরু করেন। চারু ও কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন তিনি। তার সবচেয়ে অনন্য উদ্ভাবন ছিল সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে। বয়স-শ্রেণীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার একটি প্রথা চালু করেন তিনি। ইতিপূর্বে একেক বাহিনীতে থাকত একেক এলাকার সেনাদের আধিপত্য। যেকোনো ঘটনায় মানুষ তার নিজের ক্লান, এলাকা, বা গোত্রের সাথে মিলে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বয়স-শ্রেণীর সকল ব্যক্তিকে একই বাহিনীতে নিয়ে আসার মাধ্যমে বৃহত্তর জাতীয় চেতনার উদ্ভব ঘটে। ক্ষুদ্রতর গোত্রনেতাদের বিপরীতে দিঙ্গিসোয়ায়োর শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

দিঙ্গিসোয়ায়ো ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ গোত্র আমা-মথেথোয়ার নেতা। পরবর্তীকালে যে অঞ্চলটি জুলুল্যান্ডের দক্ষিণাংশে পরিণত হয়, সেখানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন তিনি। উত্তরদিকে আপরা-নদোয়ান্দোয়ের নেতা জোয়াইডিও রাজনৈতিক সুসংহতি বৃদ্ধির কাজ করে যাচ্ছিলেন। শাকা ছিলেন দিঙ্গিসোয়ায়োর একটি তরুণ বয়স-শ্রেণীর বাহিনীর সদস্য। নেতার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার প্রতি অনুগত থাকেন। তারপর ১৮১৮ সালে জোয়াইডির হাতে দিঙ্গিসোয়ায়ো নিহত হন। এরপর থেকে দিঙ্গিসোয়ায়োর বহু সামরিক ও রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন ও সেগুলোর প্রভূত উন্নতি ঘটাতে থাকেন শাকা। একেই বলে উন্নয়ন। এর মানে হলো উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত জিনিসের ওপর গঠনমূলকভাবে কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হওয়া। বাইরে থেকে কেউ এসে "সভ্য" বানাতে শুরু করলেই ব্যাঘাত ঘটে সেই প্রক্রিয়ায়।

উপনিবেশায়নের আগ পর্যন্ত আফ্রিকার অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক বিকাশ সংঘটিত হচ্ছিল, সেটারই প্রধান প্রধান উদাহরণ হলো এ পর্যন্ত আলোচিত ইয়োরুবাল্যান্ড, ডাহোমি, হ্রদঘেরা রাজ্যসমূহ, ও জুলুল্যান্ড। এগুলোই একমাত্র প্রধান উদাহরণ নয়। এমনকি যেসব জায়গায় রাষ্ট্রের আকৃতি বেশ ছোট ছিল, সেখানেও রাজনৈতিক গঠনে দৃশ্যমান অগ্রগতি সংঘটিত হতে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে আফ্রিকার যেসব অঞ্চল সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি লাভ করেছিল, তাদের বেশির ভাগই নিজেদের মান বজায় রাখে (কঙ্গো-সহ অল্পকিছু ব্যতিক্রম বাদে)। যেমন, উত্তর আফ্রিকা ও ইথিওপিয়ায় সামন্তবাদী কাঠামো অক্ষুণ্ন থাকে। অবশ্য অগ্রগতির ধারাবাহিকতা যে থেমে গেছে, তা চোখে পড়তে শুরু করে। পশ্চিম সুদানের হাউসা রাষ্ট্রগুলো ছিল পূর্বেকার বড় বড় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরি।

সপ্তদশ শতকে সংঘাইয়ের পতনের পর এগুলোর উদ্ভব। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্থান ঘটে সোকোতো ইসলামি খিলাফতের, যার কেন্দ্র ছিল হাউসাল্যান্ড। আফ্রিকা মহাদেশের ইতিহাসে সোকোতো সাম্রাজ্য ছিল অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক সত্তা। এত বিশাল অঞ্চলের মাঝে সমন্বয় রক্ষার জন্য যেসব কলাকৌশল দরকার, সেগুলোর অভাব থাকায় এই সাম্রাজ্যটি প্রচুর অভ্যন্তরীণ বিভেদের শিকার হয়। ঐক্যের সমস্যা কীভাবে সমাধা করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকে পশ্চিম সুদানে। আশা করা হয় যে, ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে ইসলাম।



উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আমাদু আমাদুর হাতে নাইজার নদীর উত্তর

পাড় জুড়ে একটি ইসলামি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় (মাসিনা সাম্রাজ্য)। উচ্চতর নাইজারে এমন আরও একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন আল হাজ উমার (Tukolor Empire)। সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল মান্দিঙ্গা রাষ্ট্র। সামোরি তুরের নেতৃত্বে ১৮৮০-র দশকের মধ্যে গড়ে তোলা হয় এটি। ইতিপূর্বে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী উসমান দান ফোদিও এবং আল হাজ উমার যেরকম বিখ্যাত আলিম ছিলেন, সামোরি তুরে তেমনটা ছিলেন না। কিন্তু সামোরি তুরে এক সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক উদ্ভাবক। রাজনৈতিক প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি বাকিদের ছাড়িয়ে গেছেন। তার রাষ্ট্রে গোত্র, এলাকা, ও নৃগোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে এক ঐক্যবদ্ধ আনুগত্যের চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল।

জিম্বাবুয়েও অগ্রগতি সাধন করে চলে। ইউরোপীয়দের নগণ্য হস্তক্ষেপ ছিল বটে, তবে তা অগ্রাহ্য করার মতো। স্থানীয় ক্ষমতার কেন্দ্র মুতাপা থেকে চেঙ্গামায়ারে সরে যায়। কালক্রমে ঊনবিংশ শতকে (জুলু আগ্রাসন থেকে পালিয়ে আসা) এনগুনি জনগোষ্ঠী জিম্বাবুয়ের দখল নেয়।

এনগুনিরা যতদিন যোদ্ধা দল ছিল, ততদিন তারা ছিল বিধ্বংসী এক শক্তি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তারা মোজাম্বিক ও বর্তমান দক্ষিণ রোডেশিয়ায় নিজেদের রাষ্ট্র-নির্মাণ কৌশল ছড়িয়ে দেয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলে তারা প্রতিষ্ঠিত করে নতুন ও বৃহত্তর সব রাজ্য। জুলুল্যান্ডের মতো এসব রাজ্যও ছিল জাতীয়তাবাদের চেতনায় বলীয়ান।

এরই মাঝে মধ্য আফ্রিকার বিশাল এলাকা জুড়েও সংঘটিত হয়ে চলছিল দারুণ সব রাজনৈতিক পরিবর্তন। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কঙ্গো ও জিম্বাবুয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলটিতে সামাজিক গঠন ছিল নিম্নতর পর্যায়ের। ঠিক ওই অঞ্চলটিতেই গড়ে উঠেছিল এক গুচ্ছ রাষ্ট্র, যেগুলো একত্রে লুবা-লুন্ডি নামে পরিচিত। এলাকার বিস্তৃতির চেয়ে বরং রাজনৈতিক কাঠামোর কারণে অনন্য হয়ে ওঠে তারা। ক্রমেই ধেয়ে-আসতে-থাকা দাসব্যবসা কার্যক্রমের মুখেও স্মরণীয় হয়ে থাকে তাদের অর্জনগুলো।

বিশাল মাদাগাস্কার দ্বীপে পূর্বেকার যুগে কিছু ছোট রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে সেগুলোর জায়গা দখল করে শক্তিশালী সামন্তবাদী মেরিনা রাজ্য। আফ্রিকা মহাদেশের সার্বিক আলোচনায় প্রায়ই মাদাগাস্কারকে অগ্রাহ্য করা হয়। অথচ (ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উভয় অর্থেই) আফ্রিকার ইতিহাস হলো মালাগাসি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেরই বৃহত্তর রূপ। তারাও দাসরপ্তানির ফলে জনসংখ্যা-হ্রাসের ভুক্তভোগী। কিন্তু বেশির ভাগ দাসব্যবসায়ী রাষ্ট্রের চেয়ে মেরিনা রাজ্যের অবস্থান বেশি ভালো ছিল। কারণ তারা বিলে

প্রচুর ফলনশীল ধানের চাষ করতে জানত। আর তাদের গবাদিপশুর প্রজনন হার ছিল বেশি। তাই শ্রমশক্তির ঘাটতি এতে করে পূরণ হয়ে যায়। এখান থেকে আরও এক বার বোঝা যায় যে, দাসব্যবসার পাশাপাশি যেসকল উন্নয়ন ঘটেছে, সেগুলোকে জনশক্তি রপ্তানির ও দাস অপহরণের ফলাফল হিসেবে আখ্যায়িত করাটা নিতান্তই অযৌক্তিক।

মেরিনা রাজ্যের এবং বাকি সকলের (দাস ব্যবসায় জড়িত থাকুক বা না-থাকুক) রাজনৈতিক উন্নয়নের রহস্য তাদের নিজেদের পরিবেশ—এর মাঝে রয়েছে বস্তুগত সম্পদ, মানবসম্পদ, প্রযুক্তি, ও সামাজিক সম্পর্ক। বহু শতকের বিবর্তনের ফলে আফ্রিকান সমাজ নানারকম সুযোগ-সুবিধার উত্তরাধিকারী হয়েছে। যতদিন তারা এগুলো অন্তত ধরে রাখতে পেরেছে, ততদিন সম্প্রসারিত হতে থেকেছে তাদের মহাকাঠামো। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, শ্রেণী, ও ব্যক্তিরা পেয়ে চলেছে আরও বেশি উন্নয়নের সুযোগ।

স্বীকার করতে হবে যে, ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকায় এরকম উন্নয়ন ঘটে চলেছে। আবার এটাও মানতে হবে যে, ওই যুগেই পুঁজিবাদী ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে নানারকম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এই মহাদেশটি। এই দুটি স্বীকার্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করা জরুরি।

চলমান পরিচ্ছেদের শুরুতেই এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছিল। এখানে এসে তা পুনর্ব্যক্ত করা অপরিহার্য। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপের সাথে সম্পর্ক আফ্রিকাকে সুগঠিত বা উপকৃত করেছে—এই দাবি নিতান্তই হাস্যকর। আবার দাসব্যবসা আফ্রিকাকে ব্রাশফায়ারের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে—এমন দাবিও বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক (প্রেসিডেন্ট লেওপোল্ড সেংঘোর একবার এরকম দাবি করেছিলেন)।

আসল কথা হলো, এক উন্নয়নশীল আফ্রিকা একসময় দাসব্যবসা ও ইউরোপের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এটা ছিল অনেকটা ঝঞ্ঝাবায়ুর ভেতরে ঢুকে পড়ার মতো। এর ফলে অল্প কিছু সমাজের জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পথ হারিয়ে ফেলে বহু জাহাজ। আর সাধারণভাবে সব জাহাজের চলার গতিই ধীর হয়ে পড়ে। কিন্তু (একই রূপকের সূত্র ধরে বললে) লক্ষণীয় যে, ১৮৮৫ সালের আগেও আফ্রিকান নাবিকরা নিজেদের সিদ্ধান্ত-মতোই এগোচ্ছিল। তবে ততদিনে এমন সব অনুঘটক ক্রিয়াশীল হয়ে গেছে, যেগুলোর ফলে ইউরোপীয়রা জাহাজের দখল নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে থাকে এবং একসময়ে সফলও হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের আগমন

ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর আগের শতাব্দীগুলোয় ইউরোপের আর্থিক সামর্থ্য বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। পক্ষান্তরে আফ্রিকা দৃশ্যত প্রায় স্থবির হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আফ্রিকাকেও বলা চলে আংশিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক ও আংশিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। ওদিকে পশ্চিম ইউরোপ সামন্তবাদ থেকে সরে পুরোপুরি পুঁজিবাদে চলে গেছে। শুধু ইউরোপের উন্নয়ন ও আফ্রিকার অনুন্নতির ইতিহাস দেখাটাই যথেষ্ট নয়। বরং সেই দুটো মিলে কীভাবে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের এক সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলে—সেটাও বুঝতে হবে। এই ব্যাপারটাই আমাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।

ইউরোপীয় অর্থনীতি তাদের নিজেদের সম্পদ ও শ্রম ব্যবহার করে বহু গুণ বেশি পণ্য নির্মাণ করছিল। সেইসাথে ব্যবহার করছিল বাকি বিশ্বের সম্পদ আর শ্রমও। ইউরোপীয় অর্থনীতিতে গুণগত বহু পরিবর্তন আসে, যেগুলো পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিকে সঙ্গ দেয় ও সম্ভব করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, জমির বদলে যন্ত্র ও কারখানা হয়ে ওঠে সম্পদের প্রধান উৎস। শ্রমের সংগঠন এখন আর সীমিত পারিবারিক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল না। কৃষক সম্প্রদায়কে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। নির্মমভাবে শোষণ করা হচ্ছে পুরুষ, নারী, ও শিশুদের শ্রমকে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এসব প্রধান সামাজিক কুপ্রভাবকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তুলনামূলক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ ছিল এক বিশাল উন্নয়ন। **প্রথম পর্তুগিজ জাহাজ যখন ১৪৪৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকার দিকে রওনা হয়, তখন ইউরোপ আর আফ্রিকার অর্থনীতির ব্যবধান ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু এর মাত্র ৪৪০ বছর পর ইউরোপীয় ডাকাত রাষ্ট্রপ্রধানেরা বার্লিনে বসে আলাপ করতে শুরু করে যে, আফ্রিকার কোন অংশটা কে চুরি করবে।** এই বিশাল ব্যবধানের ফলেই ইউরোপ তার সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ খুঁজে পায়। আফ্রিকাকে উপনিবেশায়িত করে আরও অনুন্নত করতে থাকে সেটাকে।

পুঁজিবাদ সব সম্পদকে এক মেরুতে এবং দারিদ্র্যকে আরেক মেরুতে পুঞ্জীভূত করে চলে। পশ্চিম ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেটা এই পুঁজিবাদী প্রবণতারই অংশ।

স্বয়ং পশ্চিম ইউরোপের ভেতরেই কিছু রাষ্ট্র অপর কিছু রাষ্ট্রকে গরিব বানিয়ে নিজেরা বড়লোক হতে থাকে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ও জার্মানি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র। আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ও দক্ষিণ ইটালিতে ছিল

দারিদ্র্যের সয়লাব। ব্রিটিশ, ফরাসি, ও জার্মান অর্থনীতির ভেতরেও মেরুকরণ ছিল প্রকট। এক মেরুতে সম্পদের মালিক পুঁজিপতিরা, আরেকদিকে শ্রমিক-জনতা ও অল্প কিছু কৃষক। বড় পুঁজিপতিরা আরও বড় হয়ে ওঠে, আর ছোটরা হয়ে যায় বিলুপ্ত। লোহা ও ইস্পাত নির্মাণ, তৈরি পোশাক, ও বিশেষভাবে ব্যাংকিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাতে দৃশ্যত একচেটিয়া আধিপত্য করতে থাকে মোটে দু-তিনটি ফার্ম। আবার গোটা অর্থনীতিতে চালকের আসনে বসে থাকে ব্যাংক। বড় বড় শিল্পপতিদের একচেটিয়াপনা টিকিয়ে রাখতে তাদের পুঁজি সরবরাহ করতে থাকে ব্যাংকগুলো।

ইউরোপীয় ফার্মগুলো নিজেদের মাঝে অনবরত লড়াই করতে থাকে, যাতে করে কাঁচামাল, বাজার, ও যোগাযোগ-মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নিজ নিজ ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত নতুন নতুন লাভজনক উদ্যোগে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা করতে থাকে তারা। সেটা তাদের নিজ দেশের ভেতরে যেমন, তেমনি বাইরেও। নিজেদের জাতীয় অর্থনীতিতে যখন আর বড় হাঁ করার সুযোগ থাকে না, তখন তারা মনোযোগ দেয় কম উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর দিকে। কারণ ওই দেশগুলো বিদেশি পুঁজিবাদের হানা প্রতিহত করতে অক্ষম। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বজুড়ে যে বিদেশি পুঁজিবাদী আগ্রাসন শুরু হয়, সেটাকেই পরবর্তীকালে আমরা "সাম্রাজ্যবাদ" নামে চিনি।

সাম্রাজ্যবাদ মানে পুঁজিবাদী সম্প্রসারণ। ইউরোপীয় (এবং উত্তর আমেরিকান ও জাপানি) পুঁজিপতিরা তাদের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে হানা দেয়। কাঁচামালের জোগানের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ, নতুন বাজার অন্বেষণ, এবং বিনিয়োগের লাভজনক খাতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে তারা। আফ্রিকার সাথে কয়েক শতাব্দীর বাণিজ্য এই অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এর ফলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদীরা নিজেদের জাতীয় অর্থনীতির বাইরে বিশাল পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে শুরু করে।

আফ্রিকার ভেতরে এমন কিছু অঞ্চল ছিল, যেখানে ইউরোপীয় বিনিয়োগ মানেই মুহূর্তের মাঝে বিশাল মুনাফা। দক্ষিণ আফ্রিকার খনি, উত্তর আফ্রিকান বিভিন্ন সরকারের ঋণ, এবং সুয়েজ খাল খননের ফলে ভারতে ইউরোপের বিনিয়োগ ও ব্যবসার মুনাফা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগের শুরুতে ইউরোপের কাছে আফ্রিকা সবচেয়ে মূল্যবান ছিল কাঁচামালের জমজমাট উৎস হিসেবে। এসব কাঁচামালের মধ্যে রয়েছে পাম থেকে উৎপাদিত পণ্য, চীনাবাদাম, তুলা, ও রাবার। এসব কাঁচামালের চাহিদা তৈরি হওয়ার কারণ

ইউরোপের অর্থনীতির সামর্থ্য বেড়ে যাওয়া, তাদের নতুন ও বৃহত্তর যন্ত্রপাতি, এবং তাদের শহরাঞ্চলে মজুরি-ভোগী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই সবগুলো জিনিসের উদ্ভব ঘটেছে বিগত চার শতাব্দীতে। আরও এক বার বলতে হয়, এই প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল আফ্রিকার সাথে অসম ব্যবসা।

সাম্রাজ্যবাদ মৌলিকভাবে একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। এর ফলে যে সরাসরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা উপনিবেশায়নের জন্ম হবেই, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু, আফ্রিকা উপনিবেশায়নের ভুক্তভোগী হয়েছে ঠিকই। ইউরোপ যে সময়টিতে গোটা আফ্রিকাকে নিজেদের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসে, সে যুগটি "স্ক্র্যাম্বল ফর আফ্রিকা" (আফ্রিকা নিয়ে কামড়াকামড়ি) নামে কুখ্যাত। আফ্রিকার যা কিছু থেকে মুনাফা আসার সম্ভাবনা আছে, তা-ই খপ করে ধরতে শুরু করে ইউরোপ। তারা এমনকি সচেতনভাবে এমন কিছু অঞ্চলও দখল করেছে, যেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে শোষণ করার দরকার নেই। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আগেই কাজ এগিয়ে রাখছিল তারা। এরকম স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বার্থের অধিকারী প্রতিটি ইউরোপীয় দেশ তাদের পতাকা নিয়ে ধেয়ে যায় আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে ঔপনিবেশিক শাসন। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের যুগে যে ব্যবধানের উদ্ভব ঘটেছিল, সেটা ইউরোপকে আফ্রিকার ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা প্রদান করে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে দাস, গজদন্ত, স্বর্ণ, ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবসা পরিচালিত হতো আফ্রিকার উপকূলসমূহ থেকে। এসব উপকূলে ইউরোপীয় জাহাজগুলো আধিপত্য খাটাতে সক্ষম ছিল। প্রয়োজনে সেখানে দুর্গও গড়ে নিত তারা। কিন্তু ইউরোপ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত আফ্রিকার ভেতরের দিকে হানা দেওয়ার সামর্থ্য রাখত না। কারণ সে-সময় ওই কাজের জন্য যথেষ্ট শক্তি ছিল না তাদের হাতে। কিন্তু যেসকল প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে আফ্রিকার ভেতরে হানা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেই একই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় আফ্রিকাকে জয় করার সক্ষমতাও। সাম্রাজ্যবাদী যুগে আগ্নেয়াস্ত্রের বদৌলতে সামনের দিকে বিশাল এক গুণগত লাফ দিতে সক্ষম হয় ইউরোপ। আগের যুগের মাজল লোডার ও ফ্লিন্টলক বন্দুকের চেয়ে বহুগুণে উন্নত আধুনিক ব্রিচ-লোডিং রাইফেল ও মেশিন গান। ইউরোপীয়রা দম্ভ করে বলে যে, তাদের কাছে ম্যাক্সিম মেশিন গান আছে, যেটা আফ্রিকানদের নেই।

আজব ব্যাপার হলো, ইউরোপীয়রা প্রায়ই তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের নৈতিক বৈধতা আবিষ্কার করে পূর্বেকার আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে। অর্থাৎ, আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছিল, সেটা। দাসব্যবসা বন্ধ করানোর ভালো নিয়ত রেখেই নাকি তারা মূলত আফ্রিকাকে উপনিবেশায়িত করেছে। ব্রিটিশরা ছিল এই মতের প্রধান প্রবক্তা। হ্যাঁ, ইউরোপীয়রা এককালে দাসব্যবসার যতটা পক্ষে ছিল, ঊনবিংশ শতকে তারা ততটাই এর বিপক্ষে চলে যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দাসব্যবসা তাদের জন্য দরকারি ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের অভ্যন্তরে নানাবিধ পরিবর্তনের ফলে ঊনবিংশ শতকে আফ্রিকা থেকে দাসব্যবসার সব চিহ্ন সরিয়ে ফেলাটাই বরং প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এতে করে তারা স্থানীয় ভূমি ও শ্রমকে ভালোভাবে শোষণ করতে পারবে। দাসব্যবসা যেহেতু অধিকতর পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেহেতু তারা এখন একে প্রত্যাখ্যান করে। ব্যাপারটা পূর্ব আফ্রিকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত আরব দাসব্যবসা চলমান ছিল।

ব্রিটিশরা খুব মজা করে ভালো সেজে আরব দাসব্যবসা বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু ঠিক ওই বছরগুলোতেই নাইজেরিয়াতে জাজা ও নানার মতো রাজনৈতিক নেতাদের গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল ব্রিটিশরা। কারণ ওই নেতারা ততদিনে দাসরপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে পাম তেল ও রাবারের মতো পণ্যগুলোর ওপর মনোনিবেশ করতে শুরু করেছিলেন। পূর্ব আফ্রিকায় বুশিরি ছিলেন দাসব্যবসায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত একজন শাসক। সেখানে জার্মানরা খুব নৈতিকতার অবতার সেজে তার বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু যেসব আফ্রিকান শাসক দাসব্যবসার সাথে সেভাবে জড়িতই না, তাদের সাথেও জার্মানরা ছিল সমপরিমাণে শত্রুভাবাপন্ন। পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য, উত্তর, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান শাসকদের উৎখাত করার সাধারণ কারণ হলো, তারা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী চাহিদার পথে প্রতিবন্ধক। এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। দাসব্যবসার বিরোধিতা বড়জোর নামেমাত্র একটা সংযোজন, আর নয়তো বুঝেশুনে-করা ভণ্ডামি।

বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডও দাসব্যবসার বিরোধিতাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। এভাবে কঙ্গোতে তিনি প্রবর্তিত করেন বাধ্যতামূলক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব। তা ছাড়া, পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সব ইউরোপীয়ের মাঝেই তৈরি হয়েছে বর্ণগত ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। এই পুরো সময়টাতে অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষদের গণহত্যা করা ও দাস বানানোতে

লিপ্ত ছিল তারা। এমনকি যেই পর্তুগাল সাম্রাজ্যবাদী যুগে একদম দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ একটি ইউরোপীয় দেশ ছিল, তারাও আফ্রিকার নেটিভদের সভ্য বানানোকে নিজেদের কর্তব্য ভেবে বসে!

আফ্রিকাকে ভাগবাটোয়ারা করার পক্ষে আরও একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এটার মূল কথা, ইউরোপের চেয়ে বরং আফ্রিকার প্রয়োজনেই উপনিবেশায়ন সংঘটিত হয়েছে। এর প্রবক্তাদের মতে, আফ্রিকা উনবিংশ শতকে যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের ইউরোপীয় উপনিবেশায়ন দরকার ছিল। এই যুক্তি মেনে নিলে বলতে হয়, আফ্রিকাকে ইউরোপীয় ইঞ্জেকশানের আরও কয়েকটা ডোজ মারলে তার আরও উন্নতি ঘটত। অথচ এই সুঁচের আঘাতেই তো শুরু হয়েছিল তার অনুন্নতি। আফ্রিকা যদি তার ইচ্ছের স্বাধীনতার শেষ বিন্দুটুকুও ছেড়ে দিত, তাহলেই হয়তো আরও উন্নত হয়ে উঠত তারা। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের যুগে এমনিতেই বেশ খর্ব হয়ে গিয়েছিল সেই স্বাধীনতা। আফ্রিকার আরও উন্নয়ন ঘটত, যদি তারা তাদের অর্থনীতিকে ইউরোপের সাথে সমন্বিত করতে করতে ইউরোপকেই বানিয়ে দিত এর সর্বেসর্বা নিয়ন্ত্রক। এসব যুক্তির অসারতা যে কারও কাছেই স্পষ্ট। আফ্রিকায় মানবীয় উন্নয়নের যেকোনো যুগের ব্যাপারে ঠাস করে মন্তব্য করে ফেলার আগে যারা উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বোঝার সামান্য চেষ্টাও করে, তাদের কাছে এসব যুক্তি মোটেও ধোপে টিকবে না।

চতুর্দশ শতক জুড়ে আফ্রিকান শাসকেরা ইউরোপের সাথে বৃহত্তম পরিসরে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত করার দারুণ সব উদ্যোগ নিচ্ছিল। পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো দাসব্যবসার বিকল্প অন্বেষণ। যেসব রাষ্ট্র দাসব্যবসার ভেতর সবচেয়ে বাজেভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মাঝে অন্যতম ডাহোমি। সেই তারাও ইউরোপের সাথে সাংস্কৃতিক লেনদেনের একটি স্বাস্থ্যকর উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। স্বাধীনতার শেষ বছরগুলো এই কাজেই ব্যবহার করেছিল তারা।

ডাহোমিয়ান রাজা গেযো ১৮৫০ সালে একটি ফরমান জারি করেন। সকল কচি পামগাছকে পরজীবীমুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয় এতে। পামগাছ কর্তনকারীদের ওপর আরোপ করা হয় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। গেযো শাসন করেছিলেন ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক। মিশনারি ও দাসব্যবসা-বিরোধিদের মতো কিছু গোষ্ঠী তার নীতিমালার সমালোচক ছিল। তিনি সৎভাবে তাদের কথামতো সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু অচিরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইউরোপীয়রা আসলে শক্তিশালী

রাষ্ট্র হিসেবে ডাহোমির পুনরুত্থান দেখতে আগ্রহী না। তারা বরং ডাহোমির জনগণের ওপর আসন্ন উপনিবেশায়নের পক্ষে অজুহাত ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর। এহেন পরিস্থিতিতে সর্বশেষ ডাহোমিয়ান রাজা গ্লেলে তার রাজধানী আবোমিতে পিছু হটেন। যেসব নীতিকে তিনি ডাহোমির মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাথে সবচেয়ে সাযুজ্যপূর্ণ বলে মনে করেন, সেগুলোই অবলম্বন করে চলেন তিনি। গ্লেলে আবেওকুতায় আক্রমণ করেন। এতে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানরা বাস করত, যারা ইতিমধ্যে "ব্রিটিশ-নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি"। তিনি ফরাসিদের গলায় ধাক্কা মেরে তাদের পোর্তো-নোভো থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আর সার্বিকভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যান ১৮৮৯ সালে ফরাসিদের হাতে সামরিকভাবে পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত।

যেসব আফ্রিকান জনগোষ্ঠী দাসব্যবসার সাথে স্বল্পমাত্রায় জড়িত ছিল বা একেবারেই জড়িত ছিল না, তারাও ঊনবিংশ শতকে বৃহত্তর বিশ্বের সাথে মেলবন্ধন ঘটানোর প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেয়। মোজাম্বিকের গাযার এনগুনি শাসক গুনগুনহানা একজন সুইস মিশনারি ডাক্তার পাঠানোর আবেদন জানান। কয়েক বছর নিজ রাজদরবারে আতিথেয়তা করেন তাকে। অবশেষে পর্তুগিজরা ১৮৯৫ সালে তার রাজ্য দখল করে নেয়। পর্তুগিজরা ঔপনিবেশিক শাসন আরোপিত করার পর আফ্রিকানরা দীর্ঘকাল আর ডাক্তার দেখাতে পারেনি।

মুহাম্মদ আলির শাসনাধীন মিশরের দৃষ্টান্ত আলাদা আলোচনার দাবিদার। তিনি শাসন করেন ১৮০৫ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত। পুঁজিবাদী ইউরোপ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সামন্তবাদী উত্তর আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে দেয়। মুহাম্মদ আলি এ ব্যাপারে জানতেন এবং তিনি ইউরোপকে ধরে ফেলার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করেন। ধারাবাহিক কিছু সংস্কার কার্যক্রম চালান তিনি। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগটি অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের। মিশর তার নিজস্ব তুলা উৎপাদন ও তৈরি করত। তাদের ছিল কাঁচ, কাগজ, ও অন্যান্য শিল্পপণ্য। ইউরোপীয় বাতিল মালের ভাগাড় হিসেবে মিশরকে ব্যবহার করার জো ছিল না। তাই এভাবে মিশরের স্থানীয় শিল্পকে ধসিয়ে দেওয়া যায়নি। এর বদলে মিশরের "শিশুবয়সি শিল্পখাত"কে ঘিরে ট্যারিফের দেয়াল তুলে দেওয়া হয়। এর মানে এই নয় যে, মিশর বাকি বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ আলি বরং ইউরোপ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসতে থাকেন। বাড়িয়ে তোলেন মিশরের বৈদেশিক বাণিজ্য।

মুহাম্মদ আলি যে আদর্শের অনুসরণ করছেন, তা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আপ্তবাক্য। আর তা হলো একটি টেকসই ও স্ব-চালিত অর্থনীতি সৃষ্টি করা,

যা জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এহেন আদর্শ ইউরোপীয় পুঁজিবাদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ব্রিটিশ ও ফরাসিরা মিশরকে পোশাক উৎপাদক হিসেবে না, বরং কাঁচা তুলার রপ্তানিকারক এবং ইউরোপীয় পণ্যের আমদানিকারক হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক। ইউরোপীয় অর্থের কারবারিরা চায় মিশর তাদের বিনিয়োগের উৎস হয়ে উঠুক। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তারা মিশরের সুলতানকে একজন আন্তর্জাতিক ভিক্ষুকে পরিণত করে। তিনি গোটা মিশরকে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবারিদের হাতে বন্ধক দিয়ে দেন। সর্বোপরি, ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কেরা চেয়েছে মিশরের মাটি যেন ভারত ও আরবকে শোষণ করার ঘাঁটি হিসেবে কাজ করে। তাই মিশরীয়দের দিয়েই মিশরের মাটিতে সুয়েজ খাল খনন করানো হয়। কিন্তু তার মালিক হয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স, যারা এরপর নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত করে মিশর ও সুদানের ওপর।

পুঁজিবাদী যুগে ইউরোপীয় জীবনের যে অংশটি সবচেয়ে ইতিবাচকভাবে বেড়ে উঠেছে, নিঃসন্দেহে তার একটি হলো শিক্ষা। ইউরোপীয়রা বস্তুগত পৃথিবীর যেসব বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে, শিক্ষা ও লিখিত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলো তারা অন্যদের জানাতে অক্ষম। সেইসাথে মানুষ ও সমাজের ব্যাপারে বৈচিত্র্যময় দার্শনিক চিন্তাগুলোও তুলে ধরতে পারবে তারা। সাক্ষরতা-নির্ভর শিক্ষা থেকে যেসব সুবিধা আহরণ করা সম্ভব, আফ্রিকানরা দ্রুতই সেগুলোর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠে।

মাদাগাস্কারে মেরিনা রাজ্য লেখাপড়ার পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করে নিজেদের ভাষা ও একটি আরবি বর্ণমালা। স্বাগত জানায় ইউরোপীয় মিশনারিদের সহযোগিতাকে। সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে উপকার লাভের এই প্রচেষ্টা তখনই সম্ভব, যখন তাদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। উপনিবেশায়ন সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। মালাগাসি জনগণের চাহিদার জন্য মোটেও অনুকূল ছিল না তা। মেরিনো রাজারা ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকগুলোতে যে "আধুনিকায়ন" সূচিত করেছিলেন, উপনিবেশায়ন তার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভক্তির কোপ পড়ার আগ পর্যন্ত তিউনিসিয়ার ইতিহাস থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখানো সম্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্থানীয় জনগণের হাতে একটুখানি স্বাধীনতা রেখে দেওয়া উচিত। এমনটা তারা করেছে পূর্ব ইউরোপে, লাতিন আমেরিকায়, এবং আরেকটু ছোট পরিসরে চীনে। কিন্তু আফ্রিকাকে তারা সরাসরি উপনিবেশায়িত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পুরো

ব্যাপারটা যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পিত ছিল, তা না। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশক পর্যন্ত চাইছিল আফ্রিকাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে "প্রভাবাধীন এলাকা"য় ভাগাভাগি করে নেওয়া হোক। মানে ভদ্রভাবে সমঝোতায় আসা যে, "ভাই আপনারা সেনেগালটা চুষেন, আর আমরা নাইজেরিয়াটা চুষি।" এর পাশাপাশি ইংরেজ আর ফরাসিরা একে অন্যের অনানুষ্ঠানিক সাম্রাজ্যে অল্পস্বল্প ব্যবসাও চালাবে। কিন্তু, প্রথমত, আফ্রিকার কোন অংশটা কে চুষবে, তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় (বিশেষত জার্মানি যেহেতু এই খাবলাখাবলিতে যোগ দিতে আগ্রহী)।



THE RHODES COLOSSUS
STRIDING FROM CAPE TOWN TO CAIRO.

আর দ্বিতীয়ত, একটা ইউরোপীয় শক্তি যেই মুহূর্তে আফ্রিকার কোনো অঞ্চলকে নিজেদের প্রোটেক্টোরেট বা উপনিবেশ হিসেবে ঘোষণা দিত, তখন থেকেই ওই এলাকায় অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর ব্যবসায়ে শুল্ক বসিয়ে দিত তারা। এর জবাবে প্রতিদ্বন্দ্বীরাও নিজেদের উপনিবেশে জারি করত বৈষম্যমূলক শুল্ক। একটার হাত ধরে আরেকটা আসে। অচিরেই ছয়টি ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশ আফ্রিকার একেক এলাকার ওপর সরাসরি রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য নিজেদের মাঝে মারপিট লাগিয়ে দেয়। আসলেই। কার্ল পিটারস, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, হ্যারি জনস্টন, ডি ব্রাজা, জেনারেল গর্ডনের মতো ভদ্রলোকেরা, এবং ইউরোপে অবস্থানরত তাদের প্রভুরা আক্ষরিক অর্থেই আফ্রিকা নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করেন। আরেকটু হলে সশস্ত্র যুদ্ধও শুরু হয়ে যেত।

স্ক্র্যাম্বলের যে ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার কথা ওপরে বলা হলো, এর বাইরেও আরও কারণ ছিল। বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে তাড়িত হয়েও ইউরোপীয়রা আফ্রিকার

ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য লাভ করতে আগ্রহী। পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ সবচেয়ে সহিংস ও খোলাখুলি পন্থায় প্রচারিত হতে শুরু করে যে সময়টাতে, তা হলো ঊনবিংশ শতাব্দী। যুক্তরাষ্ট্র ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু। আর পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোর নেতৃত্বে ছিল ব্রিটেন।

- ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ও নিউজিল্যান্ডে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের যে পুরাতন উপনিবেশগুলো ছিল, ব্রিটেন সেগুলোকে সার্বভৌম মর্যাদা প্রদান করতে রাজি হয়। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের আইনসভা থেকে যখন কৃষ্ণাঙ্গ (ও বাদামি) লোকেরা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীদের বহিষ্কৃত করে দেয়, ব্রিটেন তখন তাদের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেয়।
- ওদিকে আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের ঘোরতর বিরোধী ইংরেজরা। যেমন, ১৮৬০-এর দশকে গোল্ড কোস্টের ফান্তে কনফেডারেশান ছিল এমন এক স্বায়ত্তশাসক সত্তা।
- সিয়েরা লিওনে তারা কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিওলদের প্রভাবও খর্বিত করার চেষ্টা চালায়।
- ফোউরা বে কলেজ ১৮৭৪ সালে ডারহাম ইউনিভার্সিটির সাথে অধিভুক্তি কামনা করে এবং পেয়ে যায়। তখন টাইমস পত্রিকা ঘোষণা করে যে, ডারহামের উচিত এরপর লন্ডন চিড়িয়াখানাকেও অধিভুক্ত করে নেওয়া!

গোটা সাম্রাজ্যবাদ জুড়ে ছিল বর্ণবাদের ভয়ানক এক প্রকরণ। যে অর্থনৈতিক যুক্তি থেকে প্রথমবারের মতো বর্ণবাদের জন্ম হয়েছিল, এই প্রকরণ সেটার থেকে একেবারেই পৃথক। ইউরোপের যে আফ্রিকায় বিনিয়োগ করা এবং সেই মহাদেশের কাঁচামাল ও শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল অর্থনীতি। আর এই নিয়ন্ত্রণ যে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন আকারে হওয়া উচিত, এই রায় দিয়েছে বর্ণবাদ।

আফ্রিকানরা সবখানে বহিরাগত রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। উন্নততর বল প্রয়োগ করে দমাতে হয়েছিল তাদের। কিন্তু সংখ্যালঘু হলেও উল্লেখযোগ্য একটি অংশের দাবি ছিল, ইউরোপের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। কারণ এই দিক দিয়ে তারা ততদিনে ইউরোপের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিছু আফ্রিকান যেভাবে ইউরোপীয় দাসব্যবসা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করেছে, সেটাই এই নির্ভরশীলতার সবচেয়ে নাটকীয় দৃষ্টান্ত।

বেশির ভাগ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে আফ্রিকান দাসদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই। কিন্তু যে আফ্রিকানরা দাস চালান দিত, এভাবে হুট করে সেই ব্যবসা বন্ধ হয়ে

গেলে তারা ফকির হয়ে যাবে। বহু অঞ্চলে বড়সড় সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, যাতে করে তারা কার্যকরভাবে ইউরোপীয় দাসব্যবসার সেবা করতে পারে। এর মাঝে অন্যতম একটি পরিবর্তন হলো "গৃহস্থালি দাসত্ব"-এর উদ্ভব এবং শ্রেণী ও বর্ণগত আধিপত্যের বিভিন্ন রূপ। এবার দাসব্যবসা উচ্ছেদ হয়ে গেলে বহু আফ্রিকান শাসক ও ব্যবসায়ীর সামাজিক অবস্থান হুমকির মুখে পড়ে যাবে। দাসব্যবসা উচ্ছেদের একদম শুরুর দিকের একটি আইন ছিল ১৮০৭ সালের ব্রিটিশ আইন। এই আফ্রিকান শাসক ও ব্যবসায়ীরা তখন থেকেই অস্থির হয়ে ওঠে। এমনকি যে ইউরোপীয়রা এখনো দাস কিনতে চায়, তাদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করে ফেলে তারা।

সাব-সাহারান আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকায় দাসরপ্তানি সবচেয়ে দ্রুত হারে কমে আসে। ইউরোপীয়রা সেখানে অন্যান্য পণ্য কেনার জন্য প্রস্তুত। কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা যখনই বুঝতে পারত ইউরোপীয়রা দাসের বদলে সেখানকার অন্য কোনো পণ্যের প্রতি আগ্রহী, তখনই সেই বিকল্প পণ্যের পেছনে প্রচণ্ড শ্রম দিতে শুরু করত অধিবাসীরা। এর মাঝে রয়েছে হাতির দাঁত, রাবার, পাম থেকে উৎপাদিত পণ্য, চীনাবাদাম। এ থেকে আরও এক বার দেখা যায়, ওই সংখ্যালঘু কিন্তু প্রভাবশালী আফ্রিকানরা ইউরোপীয় পণ্য হাসিল করতে কতটা প্রত্যয়ী। এসব পণ্যের অনেকগুলোই এখন আর কৌতূহলের বশে বা বিলাসিতার জন্য কেনা হয় না। সেগুলো বরং ততদিনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস।

প্রথম চার শতকের আফ্রো-ইউরোপীয় বাণিজ্য বাস্তবিক অর্থেই আফ্রিকার অনুন্নতির শেকড়। ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিবেশবাদ দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, কারণ আগের শতাব্দীগুলোতেই এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আফ্রিকার মাটিতে শেকড় গেড়ে ফেলেছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার এরকম অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য হলো আফ্রিকান দোসরদের অস্তিত্ব। এরা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এই এজেন্ট বা "রাজাকার"রা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেও ইউরোপীয় স্বার্থের সেবা করে এসেছে।

ইউরোপের সাথে ব্যবসার প্রভাবে বহু আফ্রিকান শাসকের অবস্থান নিতান্ত ইউরোপীয় বাণিজ্যের মধ্যস্বত্বভোগীতে নেমে গেছে। আবার বহু সাধারণ আফ্রিকানের অবস্থান উন্নীত হয়েছে ওই একই মধ্যস্বত্বভোগী পদে। আর এতে করে জন্ম নেয় মিশ্র রক্তের এক নতুন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী—ইউরোপীয় বা আরব বাপদের সন্তান এরা। এদের সকলকেই "রাজাকার" হিসেবে আখ্যায়িত করা

যায়। ইউরোপীয়রা যখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন থেকেই রাজাকাররা উপকূল থেকে ভেতর পর্যন্ত ইউরোপীয় থাবা বিস্তৃত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ সেনেগাল উপকূলে ফরাসি উপনিবেশবাদীদের হাতে ব্যবহৃত হওয়া আফ্রিকান ও মুলাটোরা[৭]। এই এজেন্টরা সেনেগাল, মালি, চাদ, উচ্চতর ভোল্টা, ও নাইজারের হাজার হাজার মাইল অঞ্চল জুড়ে ফরাসি প্রভাব বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছে। ওইসকল কৃষ্ণাঙ্গ ও মুলাটোর বসবাস ছিল গোরেই, ডাকার, সেন্ট লুই, ও রুফিস্ক বন্দরগুলোতে। আর আটলান্টিক বাণিজ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক বহু পুরাতন।

ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে বাণিজ্য পরিচালনাকারী আফ্রিকানরা শুধু বাণিজ্যিক না, সাংস্কৃতিক এজেন্টও বটে। কারণ স্বভাবতই তারা ইউরোপীয় চিন্তা ও মূল্যবোধের দ্বারা নিদারুণভাবে প্রভাবিত। আফ্রিকায় ইউরোপীয় শিক্ষার অন্বেষণ শুরু হয় ঔপনিবেশিক যুগের আগে থেকেই। যে সাদা মানুষেরা সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে আসছে, উপকূলীয় শাসক ও ব্যবসায়ীরা তাদের জীবনযাত্রাকে আরও গভীরভাবে বোঝার তাগিদ অনুভব করে। সাদা মানুষদের জীবনপদ্ধতি শেখার পেছনে সবচেয়ে বেশি কসরত করে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মুলাটো পুত্ররা এবং আফ্রিকান শাসকদের পুত্ররা। এতে করে ব্যবসায়িক কায়কারবার আরও দক্ষতা সহকারে করা যেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর সিয়েরা লিওনের জনৈক শাসক "সাদাদের মতো শঠ হওয়ার উদ্দেশ্যে বই পড়তে শেখার" বাসনা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি, সাক্ষরতার বাস্তব সুবিধাসমূহ উপলব্ধি করে আরও অনেকেই। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ মানে মূল্যবোধও গিলতে থাকা, যার ফলে আরও গভীর হয় আফ্রিকান পরাধীনতা।

- এই প্রারম্ভিক যুগে শিক্ষিত হয়ে ওঠা জনৈক পশ্চিম আফ্রিকান ব্যক্তি ল্যাটিন ভাষায় তার পিএইচ.ডি. থিসিস লিখেছেন দাসপ্রথার সাফাই গেয়ে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
- গোল্ড কোস্টে প্রথম ইউরোপীয় শিক্ষক ছিলেন রেভারেন্ড টমাস টমসন। তিনি ১৭৭৮ সালে একটি পুস্তিকা লেখেন, যার শিরোনাম দি আফ্রিকান ট্রেড ফর নিগ্রো স্লেইভস শোওন টু বি কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য প্রিন্সিপলস অব হিউম্যানিটি অ্যান্ড দ্য লজ অব রিভিলড রিলিজান (আফ্রিকায় নিগ্রো দাসের ব্যবসা কেন মানবতার নীতিমালা ও আসমানি ধর্মের বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)।

---

[৭] সাব-সাহারান আফ্রিকান এবং ইউরোপীয়দের মিশ্রিত প্রজন্মকে 'মুলাটো' (Mulatto) বলা হয়।

• ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম আফ্রিকান ইতিহাসের আরেকটি অন্যতম চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে আফ্রিকানরা ইউরোপীয় প্রভুদের অধীনে দাস হিসেবে খেটে এসেছে, তারাই দেশে ফিরে এসে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে। বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও উত্তর আমেরিকা থেকে সিয়েরা লিওনে ফিরে আসা অথবা দাসবাহী জাহাজ থেকে মুক্ত হয়ে সিয়েরা লিওনে পদার্পণ করা আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি লক্ষণীয়। একদা ব্রাজিলে থেকে-আসা আফ্রিকানদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটি কিছু মাত্রায় প্রযোজ্য।

এই ব্যক্তিরা পুঁজিবাদী মূল্যবোধ ধারণ করে নিয়েছে। আর বেশির ভাগ ইউরোপীয় মিশনারির মতো তারাও ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সমর্থক। এও দাবি করা যায় যে, জানজিবার ও পূর্ব আফ্রিকান উপকূলের আরবরাও ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের এজেন্টে পরিণত হয়েছে। প্রথমে তারা এর বিরোধী ছিল। কারণ পূর্ব আফ্রিকা ভূখণ্ডে তাদের নিজস্ব যে সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা, তা ইউরোপীয় উপনিবেশায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শীঘ্রই তারা এমন এক সমঝোতায় আসে, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় ইউরোপীয়দের হাতে। ইউরোপীয়রা ছোটখাটো আরব গোষ্ঠীগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করে।

পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের ওপর ইউরোপের আধিপত্য থেকে চূড়ান্তভাবে বোঝা যায় যে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে দাসপ্রথার ভূমিকাও স্পষ্ট হয় এখান থেকে। আরবরা আফ্রিকানদের দাস হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল কয়েক শতাব্দী যাবৎ। কিন্তু তাদের শোষণের প্রেক্ষাপট ছিল সামন্তবাদী। আরবদের হাতে আফ্রিকান দাসেরা গৃহকর্মী, সৈনিক, ও কৃষি-ভূমিদাসে পরিণত হয়। তাদের হাতে যা কিছু উদ্বৃত্ত উৎপাদিত হতো, সেগুলো পুনর্বিনিয়োগ বা পুঁজি বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হতো না (যেমনটা হতো ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বা উত্তর আমেরিকান দাসব্যবস্থায়)। বরং সামন্তবাদী অভিজাতদের ভোগের জন্য উৎপাদিত হতো সেগুলো। দাসের মালিক হওয়াটা সেখানে অর্থনৈতিক মুনাফা না, বরং সামাজিক মর্যাদার বিষয়।

এই নিয়মের বড়সড় এক ব্যতিক্রম হলো জানজিবার এবং মুহাম্মদ আলির শাসনাধীন মিশর। এই দুটি ক্ষেত্রেই আফ্রিকান শ্রমকে শোষণ করা হতো মুনাফা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। আরবের খেজুর উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু ইউরোপ ইতিপূর্বে তিন শতাব্দী যাবৎই আফ্রিকান

শ্রমকে শোষণ করে আসছে সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত লাভ করার জন্য। দাস-উপনিবেশ থেকে যে মুনাফা আসত, ইউরোপীয় পুঁজিবাদ তাতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠে। এ কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে জানজিবার ও আরবের ক্ষুদ্রতর শোষণ-ব্যবস্থাগুলোকে গ্রাস করে নিতে সক্ষম হয় পশ্চিম ইউরোপ। মুহাম্মদ আলি ১৮৪৯ সালে মারা যাওয়ার পর মিশরের অর্থনীতিকেও তারা কবজা করে ফেলে। আরেকভাবে বললে, উপনিবেশায়নের আগ থেকেই জানজিবার, মিশর, ও আরবে উৎপাদিত যথাক্রমে লবঙ্গ, তুলা, ও খেজুর ইউরোপীয় বাণিজ্য ও উৎপাদনকে শক্তিশালী করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তাই সামন্তবাদী আরব দাসব্যবসায়ীদের ওপর কালক্রমে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে একদমই বেগ পেতে হয়নি ইউরোপের পুঁজিবাদী দাসব্যবসায়ীদের। পরে এদেরকেই তারা পূর্ব আফ্রিকায় উপনিবেশায়নের এজেন্ট হিসেবে এস্তেমাল করে।

আফ্রিকান এজেন্টদের আলোচনায় ফেরা যাক। ইউরোপীয়রা কিন্তু সেনাবাহিনীতেও আফ্রিকানদের নিয়োগ দিচ্ছিল। আর এসকল সেনাবাহিনী আসলেই দীর্ঘ সময় জুড়ে রক্তক্ষয় করেছে আফ্রিকাকে বিজিত করার উদ্দেশ্যে। এই সময়টা ১৮৮০-র দশক থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালে ইউরোপীয়দের-শুরু-করা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। স্বয়ং ভুক্তভোগীদের ভেতর থেকে নিজেদের এজেন্ট বাছাই করে নেওয়াটা অত্যাচারী উপনিবেশবাদের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবুও বিগত শতকগুলোতে আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে বাণিজ্য সংঘটিত না হলে ইউরোপীয়রা এত সহজে এসকল আসকারি (সৈনিক) ও কুলি-মুটে সংগ্রহ করতে পারত না, যাদের হাত ধরে ঔপনিবেশিক বিজয় সম্ভব হয়েছে।

সেনেগালি বন্দরে বসবাসকারী যে আফ্রিকানদের কথা আগেই বলা হয়েছে, তারাই একসময় শরীরে ফরাসি উর্দি চাপায়। দেশের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল এবং ডাহোমির মতো অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় ফরাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাদেরই সাহায্যে। ব্রিটিশরা যখন ১৮৭৪ সালে আসান্তেকে পরাজিত করে, তখন তাদের বাহিনীতেও ছিল আফ্রিকান সেনা। গোল্ড কোস্ট দুর্গের চারপাশে অবস্থিত উপকূলীয় শহরগুলো থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এই আফ্রিকানরা এত দীর্ঘ সময় যাবৎ ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে ছিল যে, সপ্তদশ শতক থেকেই তারা "ডাচ", "ড্যানিশ", বা "ইংরেজ" হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসছিল। যারা যে দেশের দুর্গে চাকরি করে, তার ভিত্তিতে নিজেদের এই পরিচয় বেছে নেয় তারা। এক ইউরোপীয় দেশের হয়ে অপরটির বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছে। আর উনবিংশ শতাব্দী আসতে আসতে স্বজাতীয় আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে এদের লেলিয়ে দেওয়াটাও আর কঠিন থাকেনি। বিজেতা ব্রিটিশ

ঔপনিবেশিক শক্তির হয়ে তারা আফ্রিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে।

পর্তুগিজ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোয় যে কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছিল, তাদের উদ্ভবও "প্রাক-ঔপনিবেশিক" বাণিজ্যিক যুগে। অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডা ও বেঙ্গুয়েলা এবং মোজাম্বিকের লৌরেনকো মার্কেজ ও বেইরাতে গড়ে ওঠে আফ্রিকান, মুলাটো, এবং এমনকি ইন্ডিয়ানদের নিয়ে গঠিত বাহিনী। বার্লিন কনফারেন্সের পর থেকে তারা পর্তুগিজদের হয়ে বিশাল বিশাল অঞ্চলকে "শান্ত" করার কাজ করে আসছিল। মোজাম্বিক এবং পূর্ব, পশ্চিম, ও মধ্য আফ্রিকার যেসকল বণিক উপনিবেশ-যুগের আগে থেকেই ইউরোপীয়দের সাথে পরিচিত, তারাই ভারী ভারী মেশিন গান, কামান, ও অন্যান্য রসদ বহন করার জন্য কুলি-মুটে জোগান দিত। ভাবী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের কাছে তারাই পৌঁছে দিত নানারকম তথ্য ও সামরিক সংবাদ। দোভাষী হিসেবে তারাই ছিল আফ্রিকান মাটিতে ইউরোপীয় কণ্ঠের মুখপাত্র।

এটা ঠিক যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কহীন বহু আফ্রিকানও ইউরোপীয় নবাগতদের মিত্রে পরিণত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে রাজনৈতিক গঠনের ব্যবধানটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আফ্রিকায় রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে বৃহত্তর রাষ্ট্রের বিকাশপ্রক্রিয়া নিজ গতিতে চলমান ছিল বটে। তবুও বার্লিন সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখনো আফ্রিকা মহাদেশটি মূলত বহুসংখ্যক সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর এক সমন্বিত রূপ। সর্বজনীন কোনো উদ্দেশ্যে এসকল গোষ্ঠী নিজেদের মাঝে তখনো ঐক্য গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে বিভেদ ও বিজয়ের সেই ধ্রুপদী খেলাটি খুব সহজেই খেলে দিতে পেরেছে ইউরোপীয় হানাদাররা। এভাবে কিছু আফ্রিকান হয়ে গেছে ইউরোপীয়দের অবচেতন মিত্র।

বহু আফ্রিকান শাসক তাদের প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে টেক্কা দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় "মিত্রতা" কামনা করে। এই কাজের পরিণতি কী হতে পারে, তা অনেকেই ভাবেনি। তারা তো আর জানত না যে, ইউরোপীয়রা স্থায়ীভাবে গেড়ে বসার জন্যই আসছে। তারা তো জানত না যে, ইউরোপীয়রা কিছুর বদলে সকল আফ্রিকানকে জয় করতে আসছে। কারণ, পৃথিবীর ব্যাপারে আফ্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি তখনো খণ্ডিত ও অপর্যাপ্ত। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে গেছে পুরো বিশ্বকে শাসন করা। এ থেকেও বোঝা যায় যে, ইউরোপের তুলনায় আফ্রিকা অনুন্নত ছিল।

আফ্রিকার রাজনৈতিক বিভেদ মানেই তাদের অন্তর্নিহিত নীচতা বা পশ্চাৎপদতার প্রমাণ নয়। ইতিহাসের ঠিক ওই সময়টায় ওই মহাদেশটি ওই

বিন্দুতে অবস্থান করছিল কেবল। এটা সেই মহাসড়কেরই একটি জায়গা মাত্র, যেই পথ ধরে আফ্রিকা-সহ পুরো মানবজাতিই বিভিন্ন গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবে আফ্রিকার রাজনৈতিক একীভূতকরণ ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। উলটোদিকে আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যের ফলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্রগুলো। ইউরোপীয় পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করে আফ্রিকাকে রাজনৈতিকভাবে পদানত করতে শুরু করে, তখন প্রাক-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার স্বাভাবিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলোই হয়ে যায় তাদের দুর্বলতা। এরই সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয়রা তাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

সব মিলিয়ে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার যে, আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের আগমনকে বুঝতে হলে আগে আফ্রিকা ও ইউরোপ উভয়ের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বুঝতে হবে। বিশেষত দুই মহাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে কে কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে, সেটা। এভাবে "প্রাক-ঔপনিবেশিক" বাণিজ্যই ঔপনিবেশিক যুগের প্রস্তুতিমূলক পর্যায় হিসেবে কাজ করে।

আফ্রিকা তার নিজস্ব দুর্বলতার কারণেই উপনিবেশায়িত হয়েছে—এই ধারণা এখন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। কিন্তু দুর্বলতা বলতে এখানে সামরিক দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবকে যেমন ধরতে হবে, তেমনি ধরতে হবে কিছু রাজনৈতিক দুর্বলতাকেও। এই রাজনৈতিক দুর্বলতা হলো জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা। এর ফলে মহাদেশটি বিভক্ত অবস্থায় রয়ে যায়। পৃথিবীর ব্যাপারে তাদের সার্বিক সচেতনতার মাত্রাও ছিল কম। অথচ পুঁজিবাদী সম্পর্কের সম্প্রসারণের ফলে গোটা বিশ্ব তখন একটি একক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

বিস্তারিত দেখুন :

এই অধ্যায়ের যে পরিচ্ছেদে আফ্রিকান সমাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা অধ্যায় ২-এর ধারাবাহিকতা। ওই অধ্যায়ের জন্য উদ্ধৃত বইগুলো এখানেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এই সাম্প্রতিক প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল নিয়ে কাজ করা আফ্রিকান লেখকের সংখ্যাই বেশি। এটি জাতীয় সংগ্রামের একটি মাত্র দিক। তবে একেকটি অঞ্চল ও বিষয় নিয়ে আরও বেশিসংখ্যক ও ভালো মানের মনোগ্রাফ রয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব নিয়ে আফ্রিকান দৃষ্টিকোণ থেকে এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। আফ্রিকাতে ১৫০০ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে যে অসংখ্য

তথ্য রয়েছে, সেগুলোকে জোড়া দেওয়ার তত্ত্ব নিয়ে কোনো লেখালেখি নেই। এই অনুপস্থিতি বেশ প্রকট।

জে.বি. ওয়েবষ্টার এবং এ.এ. বোয়াহেন, *হিস্ট্রি অব ওয়েস্ট আফ্রিকা : দ্য রেভোল্যুশনারি ইয়ার্স—১৮১৫ টু ইন্ডিপেন্ডেন্স*। নিউ ইয়র্ক : প্রেজার, ১৯৬৭।

বাসিল ডেভিডসন এবং জে.ই. এমহিনা, *হিস্ট্রি অব ইষ্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল আফ্রিকা টু দ্য লেইট নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি*। নিউ ইয়র্ক : ডাবলডে অ্যাংকর বুকস, ১৯৭৭।

যেসব বই সার্বিকভাবে একেকটি অঞ্চলের দীর্ঘকালীন সমীক্ষা তুলে ধরে, সেগুলোর তালিকায় এই দুটি বইও যোগ করা উচিত। এগুলো নিতান্ত কিছু প্রবন্ধের সংকলন নয়, বরং সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যাও বটে।

ওয়াল্টার রডনি, *ওয়েস্ট আফ্রিকা অ্যান্ড দি আটলান্টিক স্লেইভ ট্রেড*। নাইরোবি : প্রকাশিত হয়েছে হিস্টরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান অব তানজানিয়ার জন্য, ইস্ট আফ্রিকান পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৯।

ই. অ্যালপার্স, *দি ইষ্ট আফ্রিকান স্লেইভ ট্রেড*।

আই.এ. আকিনজোগবিন, *ডাহোমি অ্যান্ড ইটস নেইবারস*। কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭।

প্রথম দুটি বই নির্দিষ্ট আফ্রিকান অঞ্চলের ওপর দাস-রপ্তানির প্রভাব সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তৃতীয়টি একজন নাইজেরীয় বিশেষজ্ঞের লেখা। ইউরোপীয়দের সাথে ডাহোমির সংশ্লিষ্টতা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে এখানে।

জেকব ইউ. এঘারেভবা, *আ শর্ট হিস্ট্রি অব বেনিন*। ইবাদান : ইবাদান ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

বি.এ. ওগোট, *হিস্ট্রি অব দ্য সাউদার্ন লুও*। নাইরোবি : ইষ্ট আফ্রিকা পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৭।

ইসারিয়া কিমাম্বো, *আ পলিটিকাল হিস্ট্রি অব দ্য পেয়ার অব তানজানিয়া*। নিউ ইয়র্ক : ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশানস, ১৯৭১।

জ্যান ভানসিনা, *কিংডমস অব দ্য স্যাভানা*। ম্যাডিসন : ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন প্রেস, ১৯৬৬।

ইউরোপের সংস্পর্শে আসার আগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশ নিয়ে আফ্রিকানরা যেসকল গবেষণা করেছে, প্রথম তিনটি বই তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে আফ্রিকান মৌখিক বিবরণ ব্যবহার করাটা এসকল গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য। চতুর্থটি (একজন ইউরোপীয়ের লেখা) এক যুগান্তকারী রচনা, যেখানে মধ্য আফ্রিকার ইতিহাস পুনর্নির্মাণে দারুণভাবে মৌখিক

বিবরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

জে. আদি আজায়ি, *ক্রিশ্চিয়ান মিশনস ইন নাইজেরিয়া, ১৮৪৫—১৮৯১।* নিউ ইয়র্ক: ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশানস, ১৯৭১।

ই.এ. আয়ান্দেলে, *দ্য মিশনারি ইমপ্যাক্ট অব মডার্ন নাইজেরিয়া।* নিউ ইয়র্ক: হিউম্যানিটিজ প্রেস, ১৯৬৭।

খ্রিষ্টান মিশনারিরা যে সাম্রাজ্যবাদী যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, এ ব্যাপারটি আফ্রিকান ইতিহাসবিদরা (সেইসাথে অনাফ্রিকানরাও) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। উল্লেখিত বইগুলো তারই উদাহরণ।

৫

ইউরোপের পুঁজিবাদী উন্নয়নে আফ্রিকার অবদান—ঔপনিবেশিক যুগ

কলোনি সৃষ্টি হয়েছে মেট্রোপোলের জন্য মেট্রোপোলের দ্বারা।

— ফরাসি প্রবাদ

যুক্তরাষ্ট্রে (ইউনিলিভারের) বিক্রয় কার্যক্রম আর চৌদ্দটি প্ল্যান্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় নিউ ইয়র্কের কেতাদুরস্ত পার্ক অ্যাভিনিউর লিভার হাউজ থেকে। এইসব গগনচুম্বী, চোখ-ধাঁধানো কাঁচ-আর-ইস্পাতের দিকে তাকালে মনে পড়ে, শত শত ঘণ্টার নিম্ন-মজুরি আর কৃষ্ণাঙ্গদের শ্রমে এই দালানগুলো নির্মিত হয়েছে। হাজার টনের পাম তেল, চীনাবাদাম আর কোকো সস্তায় কিনে নেওয়া হয়েছে এগুলোর খরচ মেটাতে।

— ডাব্লিও. আলফেয়াস হান্টন

উপনিবেশবাদের অধীনে আফ্রিকার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিদেশে স্থানান্তর

পুঁজি ও আফ্রিকান মজুরিভুক্ত শ্রম

উপনিবেশ যুগে আফ্রিকায় যে উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদিত হতো, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বদৌলতে সেটা খরচ হতো মেট্রোপলিটন অঞ্চলকে পুষ্ট করার জন্য। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মানবসমাজের অগ্রগতির জন্য ভূমি ও শ্রমের ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু এর ফলে উৎপাদিত পণ্য ওই অঞ্চলেই থাকতে হবে, যেখানে উক্ত ব্যবহার সংঘটিত হয়েছে। উপনিবেশবাদ শুধু এই ব্যবহার সংঘটিত করেই ক্ষান্ত হতো না। বরং উপনিবেশের সকল

উৎপাদের মুনাফা সংগ্রহ করে কথিত মাতৃ-দেশকে পরিপুষ্ট করাটাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আফ্রিকান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আফ্রিকার সম্পদ থেকে আফ্রিকান শ্রমেরই মাধ্যমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সম্পদ ক্রমাগত বাইরে চলে যেতে থাকে এর ফলে। অর্থাৎ, ইউরোপের উন্নতি আর আফ্রিকার অনুন্নতি একই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার অংশ।

যেকোনো বিচারেই আফ্রিকায় শ্রম খুব সস্তা। আর আফ্রিকান শ্রম থেকে আহরিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ বিশাল। উপনিবেশের অধীনস্থ চাকরিদাতা তার শ্রমিকদের অত্যন্ত নিম্ন মজুরি পরিশোধ করত। এতটাই কম যে, সাধারণত তা দিয়ে শ্রমিকের পক্ষে শারীরিকভাবে জীবিত থাকাই সম্ভব না। আর তাই তাকে বেঁচে থাকার জন্য আলাদা করে খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। দাস-উপনিবেশ জাতীয় খামারে কাজ করা, খনি খনন, এবং কিছু প্রকারের শহুরে চাকরির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ আরোপিত হওয়ার সময়ে আফ্রিকানরা ভূমি থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। পরবর্তী বছরগুলোতেও ভূমির সাথে কিছু-না-কিছু সম্পর্ক অব্যাহত রাখে অনেকে। তারা তাদের শাম্বা (চাষের জমি) থেকে অন্যত্র কাজ করত, যাতে কর পরিশোধ করা যায় অথবা এর জন্য তাদের বাধ্য করা হতো। ইউরোপে সামন্তবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শ্রমিকদের কাছে জীবিকা নির্বাহ করার একটিই মাধ্যম বাকি থাকে। আর তা হলো পুঁজিপতিদের কাছে নিজের শ্রম বিক্রি করা। অতএব, শ্রমিককে শারীরিকভাবে বাঁচিয়ে রাখাটা কিছু মাত্রায় চাকরিদাতারও দায়িত্ব। তাই শ্রমিককে তার "বেঁচে থাকার মতো মজুরি" প্রদান করতে হবে। আফ্রিকায় ব্যাপারটি এমন ছিল না। ইউরোপীয়রা যথাসম্ভব কম মজুরি প্রদান করত। সেটাকেই আইন বানিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটাত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

বর্তমান শতাব্দীতে আফ্রিকান শ্রমিকরা কেন ইউরোপীয় শ্রমিকদের তুলনায় কঠোরতর শোষণের শিকার হয়, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বিদেশি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। উন্নততর অস্ত্রের বলে সকল বিরোধী-শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয় তারা। দ্বিতীয়ত, আফ্রিকান শ্রমিক-শ্রেণী ছিল ছোট, খুবই ছন্নছাড়া, এবং ঘন ঘন স্থানান্তরের কারণে অত্যন্ত অস্থিতিশীল। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদ সব স্থানের সকল শ্রমিককেই শোষণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আফ্রিকায় ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের আরেকটি অজুহাত ছিল বর্ণবাদী মনোভাব। তাই আফ্রিকান শ্রমিকদের সাথে তাদের অন্যায় আচরণ আরও কঠোর। বর্ণবাদী তত্ত্বমতে, কালো মানুষেরা এমনিতেই নীচ।

তাই সে অনুসারে তাদের পাওনা মজুরিও কম। মজার ব্যাপার হলো, উত্তর আফ্রিকার ফর্সা আরব ও বার্বার জাতিকেও শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী ফরাসিরা "কালো" হিসেবেই বিবেচনা করত। ওপরে উল্লেখিত এসকল নিয়ামক যখন একাট্টা হয়, আফ্রিকান শ্রমিকদের পক্ষে সুসংগঠিত হওয়া তখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রমিক-শ্রেণীকে চূড়ান্ত মাত্রায় শোষণ করাটা পুঁজিবাদীদের সহজাত প্রবণতা। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের একমাত্র রক্ষাকবচ হলো ঐক্য ও দৃঢ়তা। এজন্যই সকল উপনিবেশ এলাকায় আফ্রিকান শ্রমিকরা যখন ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তখন উপনিবেশীয় শাসনযন্ত্র তাদের পথে অসংখ্য বাধার দেয়াল তুলে দেয়।

একইরকম কাজের জন্য আফ্রিকান শ্রমিকদের চেয়ে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় শ্রমিকরা অনেক বেশি মজুরি পেত। এনুগুতে কয়লা-খনিতে কাজ করা নাইজেরিয়ান শ্রমিক মাটির নিচে কাজ করার জন্য দৈনিক এক শিলিং, আর ওপরের জন্য নয় পেন্স করে আয় করে। একজন স্কটিশ বা জার্মান কয়লা-খনির শ্রমিকের কাছে এহেন নগণ্য মজুরি রীতিমতো অকল্পনীয়। এরা এক ঘণ্টায় যা কামায়, তা এনুগুর শ্রমিকের ছয় দিনের মজুরির সমান। বন্দরকর্মীদের ক্ষেত্রেও রয়েছে একইরকম বৈষম্য। বড় আমেরিকান শিপিং কোম্পানি ফ্যারেল লাইনসের নথিপত্র থেকে ১৯৫৫ সালের একটি হিসাব উল্লেখ করা হচ্ছে। সে বছর আফ্রিকা ও আমেরিকার মাঝে মালামাল বোঝাই ও খালাস করার পেছনে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, তার পাঁচ-ষষ্ঠাংশ পেয়েছে আমেরিকান শ্রমিকরা আর বাকি এক-ষষ্ঠাংশ আফ্রিকানরা। অথচ উভয় প্রান্তেই কিন্তু বোঝাই ও খালাসের পরিমাণ ছিল সমান। আমেরিকান বন্দরের কুলি বা ইউরোপীয় কয়লা-শ্রমিককে যে মজুরি দেওয়া হতো, তাতেও পুঁজিপতিই লাভবান হতো বটে। কিন্তু এখানে আমরা দেখাতে চাইছি, আফ্রিকান শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা কতটা বেশি।

ঔপনিবেশিক যুগে ও পরবর্তীকালে যখন এসকল বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়, তখন উপনিবেশবাদের সমর্থকেরা ফট করে জবাব দিয়ে দেয়: পুঁজিবাদী দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মান ও খরচ অনেক বেশি। অথচ এই উচ্চতর জীবনমান সম্ভব হয়েছে উপনিবেশগুলোকে শোষণ করার কারণেই। স্বয়ং আফ্রিকানদের শ্রমকে ব্যবহার করেই যেখানে উচ্চতর জীবনমান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে আফ্রিকার জীবনমানকে এভাবে দাবিয়ে রাখা সম্পূর্ণই অন্যায়। আফ্রিকান শ্রমের মাধ্যমে এই মহাদেশেই কতটা ভালোভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব, সেটা বোঝা যায় আফ্রিকার ভেতরে বসবাসরত শ্বেতাঙ্গদের বেতন ও জীবনমানের দিকে তাকালে।

ঔপনিবেশিক সরকারগুলো উচ্চতর পদসমূহে আফ্রিকানদের নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্য করেছে। সমপর্যায়ের পদে যদি সাদা ও কালো উভয়ই থেকে থাকে, তাহলে সাদা লোকটির বেতন হয়ে থাকে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। সকল পর্যায়ের ক্ষেত্রে এই কথাটি সত্য, সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে খনি-শ্রমিক পর্যন্ত। গোল্ড কোস্ট ও নাইজেরিয়ার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে যেসকল বেতনভোগী আফ্রিকান বসবাস করত, তাদের অবস্থা ছিল মহাদেশের অন্যান্য স্থানের ভাইদের থেকে অনেক ভালো। কিন্তু তারপরও সরকারি চাকরিতে তারা নিম্নতর পদেই সীমাবদ্ধ থাকত।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়টাতে গোল্ড কোস্টে বসবাসকারী ইউরোপীয় সরকারি কর্মচারীরা মাসিক বেতন পেত গড়ে চল্লিশ পাউন্ড। সেইসাথে ছিল সরকারি বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। সেখানে আফ্রিকানদের বেতন গড়ে চার পাউন্ড মাত্র। এমনও ঘটনা ছিল, যেখানে একেকজন ইউরোপীয়ের উপার্জন ছিল পঁচিশজন আফ্রিকানের সমান। সরকারি চাকরির বাইরে আফ্রিকানরা আরও যেসব পদে কাজ করত, তার মধ্যে রয়েছে নির্মাণ প্রকল্প, খনি, এবং গৃহকর্মী হিসেবে—এর সবগুলোই নিম্ন-মজুরির পেশা। দায়ভারমুক্ত ও প্রতিকারবিহীন শোষণ। গোল্ড কোস্টে ১৯৩৪ সালে একটি স্বর্ণখনিতে দুর্ঘটনায় একচল্লিশজন আফ্রিকান নিহত হয়। পুঁজিবাদী কোম্পানি এই প্রতিটি লোকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করে তিন পাউন্ড।

যেসব জায়গায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইউরোপীয় অভিবাসীর বসবাস ছিল, সেখানে সহজেই চোখে ধরা পড়ে মজুরির এই ব্যবধান। উত্তর আফ্রিকাতে মরোক্কান ও আলজেরীয়দের বেতন ছিল ইউরোপীয়দের বেতনের ১৬ থেকে ২৫ শতাংশ। পূর্ব আফ্রিকার অবস্থা আরও খারাপ। বিশেষ করে কেনিয়া ও তাঙ্গানিকায়। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের উপার্জন ও জীবনমানের সাথে তুলনা করলেই বোঝা যায়, আফ্রিকানদের সাথে ব্যবধান কতটা উৎকট। লর্ড ডেলামেরে ছিলেন কেনিয়ার ১০০,০০০ একর জমির মালিক। সেখানে কেনিয়ানদেরই নিজের দেশে মাসিক পনেরো থেকে বিশ শিলিং মজুরি ভিক্ষে করার জন্য 'কিপান্দে' ছাড়পত্র বহন করা লাগত। পাশবিক শোষণের চূড়ান্ত পর্যায়ের দেখা মেলে মহাদেশটির দক্ষিণ দিকের অংশগুলোয়। যেমন দক্ষিণ রোডেশিয়াতে কৃষিশ্রমিকদের মাসিক বেতন পনেরো শিলিং-এর চেয়ে বেশি হতো না বললেই চলে। খনিশ্রমিকরা অর্ধ-দক্ষ হলে এর চেয়ে কিছুটা বেশি পেত। কিন্তু তাদের কাজের পরিবেশ আরও বেশি অসহনীয়। উত্তর রোডেশিয়ার অদক্ষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরি সাত শিলিং পর্যন্তও নামতে পারে। বিখ্যাত কপার বেল্টে ট্রাকচালকের পেশা অর্ধ-দক্ষ হিসেবে পরিগণিত। একটা খনিতে

ইউরোপীয়রা ওই কাজ করেছিল মাসিক ত্রিশ পাউন্ড বেতনে, আরেকটায় আফ্রিকানরা একই কাজ করে পেয়েছে তিন পাউন্ড।

পুঁজিবাদী বিশ্ব ১৯৩০-এর দশকে এক মন্দার আঘাতে কেঁপে ওঠে। সকল উপনিবেশে সে-সময় মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয়। সর্বশেষ পুঁজিবাদী বিশ্বযুদ্ধটির আগ পর্যন্ত সেটা আর বাড়ানোও হয়নি, আগের অবস্থাতেও ফিরিয়ে আনা হয়নি। দক্ষিণ রোডেশিয়ার পৌর এলাকাগুলোয় ১৯৪৯ সালে যে আফ্রিকানরা কাজ করত, তাদের সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ছিল পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচাত্তর শিলিং। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এ এক উল্লেখযোগ্য উন্নতি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের (যারা আফ্রিকানদের দশ বা চৌদ্দ ঘণ্টার বিপরীতে দৈনিক মাত্র আট ঘণ্টা কাজ করে) দৈনিক মজুরি ছিল পঁচিশ শিলিং এবং তার সাথে বিনামূল্যে বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধা।

রোডেশিয়া হলো দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী ব্যবস্থারই একটি ছোট সংস্করণ। মহাদেশের শিল্পশ্রমিকদের বৃহত্তম শ্রেণীটিকে শোষণ করত তারা। ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকায় আফ্রিকান শ্রমিকরা কাজ করত মাটির নিচে অনেক গভীরে, মানবেতর পরিবেশে। ইউরোপের খনিশ্রমিকরা হলে জীবনেও এই পরিবেশ মেনে নিত না। পরবর্তীকালে কৃষ্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানরা এমন এক জায়গা থেকে স্বর্ণ উদ্ধার করে দেয়, যেটাকে অবাণিজ্যিক ভেবে ফেলে রাখা হয়েছিল। অথচ তারপরও মজুরি ও বেতন হিসেবে যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা ছিল, তার সবকিছুই হাসিল করেছে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা। কৃষ্ণাঙ্গ খনিশ্রমিকদের এত নগণ্য বেতন দিয়ে যে মহা-মুনাফা অর্জিত হতো, সেটার বদৌলতেই পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের উচ্চতর বেতন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। উত্তোলক কোম্পানির কর্মকর্তারা এটা স্বীকার করেছে।

সবচেয়ে বেশি যারা লাভবান হয়েছে, তারা হলো খনিজ-উত্তোলক কোম্পানিগুলোর শেয়ারহোল্ডাররা। তারা নিজেরা বসে থাকত ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায়। আর ওইদিকে আফ্রিকান শ্রমের দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার মাটির নিচ থেকে যে স্বর্ণ, হীরা, ম্যাঙ্গানিজ, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি উঠে আসছিল, তার মোটা অঙ্কের মুনাফা পকেটে পুরছিল বিনাক্লেশে। বহু বছর যাবৎ পুঁজিবাদী গণমাধ্যম নিজেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশংসা করে আসছিল বিনিয়োগের এক অসাধারণ স্থান হিসেবে। পুঁজি বিনিয়োগ করলেই মহামুনাফা উঠে আসে সেখান থেকে। স্ক্র্যাম্বল ফর আফ্রিকার শুরু থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ ও হীরা খনির বদৌলতে কপাল খুলে গেছে সেসিল রোডসের মতো মানুষদের। বর্তমান শতকে বিনিয়োগও বেড়েছে, সেইসাথে বেড়েছে দেশের বাইরে চলে

যাওয়া উদ্বৃত্তের পরিমাণ। প্রধানত খনি-খনন আর অর্থায়ন খাতেই বিনিয়োগ করা হতো, যেখান থেকে মুনাফার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের অনুমিত পরিমাণ ৮৬ কোটি পাউন্ড। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৫ শতাংশ মুনাফা আসতে থাকে, অর্থাৎ বার্ষিক ১২.৯ কোটি পাউন্ড। এটা তো গড় হিসাব। বেশির ভাগ উত্তোলক কোম্পানির মুনাফা ছিল এর চেয়ে অনেক বেশি। ডি বিয়ার্স কনসলিডেটেড মাইনসের মুনাফার পরিমাণ একইসাথে অভূতপূর্ব ও ধারাবাহিকভাবে বেশি—গোটা ১৯৫০-এর দশক জুড়ে ২.৬ কোটি থেকে ২.৯ কোটি মার্কিন ডলার পর্যন্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকার খনিশ্রমকে ঘিরে এই জটিলতা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার একার বৈশিষ্ট্য না। বরং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া, ও কঙ্গোতেও ছিল একই অবস্থা। কঙ্গো ইউরোপের জন্য অঢেল সম্পদের এক অব্যাহত উৎসে পরিণত হয়। কারণ ১৯০৬ সালে উপনিবেশায়ন শুরুর পর থেকে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড রাবার ও হাতির দাঁতের ব্যবসা থেকে কমপক্ষে ২ কোটি মার্কিন ডলার হাতিয়েছেন। খনিজ সম্পদ শোষণের যুগ শুরু হয় বেশ আগেভাগেই।

রাজা লিওপোল্ডের হাত থেকে যখন ১৯০৮ সালে ক্ষমতা চলে যায় বেলজিয়াম রাষ্ট্রের হাতে, তখন এই শোষণ আরও বেগবান হয়। বেলজিয়ানদের হিসাবমতে, ১৮৮৭ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে কঙ্গোতে ঢোকা মোট পুঁজির পরিমাণ ৫৭০ কোটি পাউন্ড। আর একই সময়ে সেই দেশ থেকে বের হওয়া মুনাফার পরিমাণ বলা হয়ে থাকে ৪৩০ কোটি পাউন্ড। কঙ্গোর ভেতরে থেকে-যাওয়া মুনাফা এই হিসাবের বাইরে। মহাদেশের অন্য সব স্থানের মতো কঙ্গোতেও উপনিবেশ যুগ যত অগ্রসর হয়েছে, ততই বেড়েছে দেশটি থেকে সম্পদ বেরিয়ে যাবার পরিমাণ।

স্বাধীনতার আগের পাঁচটি বছরে কঙ্গো থেকে বেলজিয়ামে প্রবাহিত পুঁজির পরিমাণ হয়ে যায় প্রকাণ্ড। উদ্বৃত্ত বহির্গমন প্রক্রিয়ার বেশির ভাগ অংশই নিয়ন্ত্রণ করেছে ইউরোপের এক প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান সোসায়েটে জেনেরেইল। এই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা ইউনিয়ন মাইনিয়ের দ্যু হাউত-কাতাঙ্গা। কঙ্গোর তামা উৎপাদন ১৮৮৯ সাল থেকে একচ্ছত্রভাবে তাদেরই দখলে (তখন এর নাম ছিল ক্যাম্পেইন ডি কাতাঙ্গা)। ইউনিয়ন মাইনিয়ের এক বছরে ২.৭ কোটি পাউন্ড মুনাফা হাতিয়েছে বলে জানা যায়।

উপনিবেশ যুগে কঙ্গোতে বছরে যত সম্পদ উৎপাদিত হতো, তার এক-

তৃতীয়াংশের বেশি চলে যেত দেশের বাইরে। এটা সেই যুগের যেকোনো বছরের ক্ষেত্রেই সত্য। এর একাংশ মুনাফা হিসেবে ভোগ করত বড় বড় ব্যবসায়িক মালিকেরা, আরেক অংশ বেতন হিসেবে পেত তাদের প্রবাসী কর্মচারীরা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন উত্তর রোডেশিয়ার ক্ষেত্রে এই অংকটা আবার এক-তৃতীয়াংশ না, বরং অর্ধেক। কাতাঙ্গাতে ইউনিয়ন মাইনিয়ের অন্তত কিছু মুনাফা দেশটির ভেতরে রেখে যেত। যেমন, আফ্রিকান শ্রমিকদের বাসস্থান ও মাতৃত্বকালীন সেবার জন্য। কিন্তু রোডেশিয়ান কপার বেল্ট কোম্পানিগুলো পুরো থালা চেটেপুটে খেয়ে নিত বিবেকের কোনো দংশন ছাড়াই।

ভুলে গেলে চলবে না যে, ঔপনিবেশিক যুগে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খনিজ উত্তোলন কার্যক্রম চলত। উত্তর আফ্রিকাতে বিদেশি পুঁজির মাধ্যমে শোষণ করা হতো ফসফেট, তেল, সীসা, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, ও লোহার আকরিকের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ। গিনি, সিয়েরা লিওন, ও লাইবেরিয়াতে স্বর্ণ, হীরা, লোহার আকরিক, ও বক্সাইট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলত। এগুলোর সাথে আরও উল্লেখযোগ্য নাইজেরিয়ার টিন, ঘানার স্বর্ণ ও ম্যাঙ্গানিজ, তাঙ্গানিকার স্বর্ণ ও হীরা, এবং উগান্ডা ও কঙ্গো ব্রাজাভিলের তামা। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে বুঝতে হলে ধরে ধরে এগোতে হবে। প্রথমে তদন্ত করতে হবে, আফ্রিকান সম্পদ ও শ্রমকে কতটুকু মাত্রায় শোষণ করা হতো। এরই সূত্র ধরে উদ্‌ঘাটন করতে হবে যে, উদ্বৃত্ত সম্পদের গন্তব্য কোথায়। এগুলো চলে যেত আফ্রিকার বাইরে পুঁজিপতিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, যারা এই বিশাল বিশাল বহুজাতিক খনিজ-উত্তোলক কোম্পানির অধিকাংশের মালিক।

আফ্রিকান শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ অতটাও চোখ-ধাঁধানো না। কৃষিকাজে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সাথে তুলনা করলে এগুলো রীতিমতো নস্যি। উত্তর, পূর্ব, ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপুল পরিমাণে কৃষি উপনিবেশ ছিল। কিছু মাত্রায় পশ্চিম আফ্রিকাতেও এগুলোর দেখা মেলে। এদের মুনাফা আসত আফ্রিকান কৃষিশ্রমিকদের ওপর চাপানো অবিশ্বাস্য নিম্ন-মজুরি ও মানবেতর পরিবেশ থেকে। তা ছাড়া, এসব জমি তারা হাত করে ফেলত অত্যন্ত স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেই। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকানদের ওপর ডাকাতি করে এগুলো পেয়েছে। তারপর নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে শ্বেতাঙ্গদের কাছে। যেমন, কেনিয়ার উঁচু ভূমিগুলো "রাজ ভূমি" হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর ব্রিটিশরা সবচেয়ে ভালো দেখে ১০০,০০০ একর ভূমি হস্তান্তরিত করে দেয় লর্ড ডেলামেয়ারের কাছে। এর জন্য তিনি মূল্য পরিশোধ করেছেন প্রতি একরে এক পেনি করে। লর্ড ফ্রান্সিস স্কট কেনেন

৩৫০,০০০ একর, ইস্ট আফ্রিকান এস্টেটস লিমিটেড পায় আরও ৩৫০,০০০ একর, ইস্ট আফ্রিকান সিন্ডিকেট নেয় ১০০,০০০ একর—সবই পানির দামে। বলাবাহুল্য, এসকল উপনিবেশ থেকে পেল্লায় মুনাফা আসত। অথচ এখানকার মজুরি দক্ষিণ আফ্রিকান স্বর্ণখনি বা অ্যাঙ্গোলার হীরক খনির চেয়ে অনেক অনেক কম।

ঔপনিবেশিক যুগে লাইবেরিয়া কাগজে-কলমে স্বাধীন ছিল বটে। কিন্তু কার্যত তা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ফায়ারস্টোন রাবার কোম্পানি ১৯২৬ সালে লাইবেরিয়ার দশ লাখ একর বনাঞ্চল কিনে নেয়। এর জন্য তারা পরিশোধ করে প্রতি একরের জন্য ছয় সেন্ট এবং রপ্তানিকৃত রাবারের মূল্যমানের ১ শতাংশ। রাবারের চাহিদা এবং কৌশলগত গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই লাইবেরিয়ার ভূমি ও শ্রম থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ফায়ারস্টোন কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রের পঁচিশতম বৃহত্তম ধনকুবের কোম্পানিতে পরিণত করে।

ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানি বনাম আফ্রিকান কৃষক

খনি ও কৃষিজমিতে আফ্রিকান মজুরিভুক্ত শ্রমিকরা যে উদ্বৃত্ত উৎপাদিত করত, চলমান পরিচ্ছেদে এখন পর্যন্ত সেটাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকান এই শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় ছিল খুবই কম। বরং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে জড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি ছিল স্বাধীন কৃষকেরা। তাহলে আফ্রিকান উদ্বৃত্ত সম্পদকে দেশের বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে এই স্ব-নিযুক্ত কৃষকদের ভূমিকা কী? উপনিবেশপন্থিরা এখানে যুক্তি দেয় যে, এই কৃষকদের জন্য উপনিবেশায়ন বেশ উপকার বয়ে এনেছে। কোকোয়া, কফি, পাম তেলের মতো ফসল উৎপাদন বা সংগ্রহ করার মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যা যে ভুল, তা স্পষ্ট করা জরুরি।

অর্থকরী ফসল উৎপাদনকারী বা সংগ্রহকারী কৃষকের শ্রমকে ধারাবাহিকভাবে শোষণ করে বেশ কিছু ব্যক্তি। এই ধারার শুরুটা হয় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দিয়ে। কিছু ক্ষেত্রে, ওই স্থানীয় বণিকরা ছিল ইউরোপীয়। বিরল কিছু ক্ষেত্রে আফ্রিকান। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে আনীত এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। এরা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদী ও শোষিত আফ্রিকান কৃষকের মাঝে মধ্যবর্তী দালাল হিসেবে কাজ করত। পশ্চিম আফ্রিকাতে এই ভূমিকা পালন করে লেবানিজ ও সিরীয়রা। পূর্ব আফ্রিকাতে ভারতীয়রা এই পদে আসীন হয়। জানজিবার ও পূর্ব আফ্রিকার আরও কিছু জায়গায় আরবরাও ছিল

মধ্যবর্তী দালাল শ্রেণীতে।

অর্থকরী ফসল-চাষীদের কখনোই নিজেদের কোনো পুঁজি থাকত না। যখন যে ফসল ফলায়, তখন সেটির ওপর টিকে থাকে। ভালো ফলন আর ভালো দামের ওপর নির্ভরশীল তারা। ফলন খারাপ হলে বা দাম কমে গেলেই ধার কর্জ করতে হতো। অন্যথায় খাজনা পরিশোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করা সম্ভব হতো না তাদের পক্ষে। নিরাপত্তা হিসেবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ ফসল বন্ধক রাখত মধ্যপক্ষীয় ঋণদাতাদের কাছে। ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়া মানেই তাদের ক্ষেত-খামার ঋণদাতাদের দখলে চলে যাওয়া। ঋণের ওপর সুদের পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য রকমের বেশি, যাকে বলে "চক্রবৃদ্ধি হার"। পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। "নেটিভ ক্রেডিট অর্ডিন্যান্স" আইন করে এশীয় বণিকদের হাত থেকে আফ্রিকানদের রক্ষা করে তারা।

কিন্তু কিছু ছোটখাটো দ্বন্দ্বের কথা বাদ দিলে, উপনিবেশক আর মধ্যবর্তী দালাল উভয়ই ছিল একই শোষণ-প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাধারণত লেবানিজ ও ভারতীয়রা করত ছোটখাটো চাকরিগুলো, যেগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ইউরোপীয়দের নেই। এরা ছিল সুতা ইঞ্জিনের মালিক, যা দিয়ে শণ থেকে বীজ আলাদা করা হয়। আর ইউরোপীয়দের মনোযোগ ছিল যথারীতি ইউরোপে অবস্থিত সুতা কারখানার ওপর। দালালেরাও গ্রামে যেত, আর ইউরোপীয়রা পছন্দ করত শহরে থাকতে। গ্রামে প্রায় পুরো বেচা-কেনার ক্ষমতা ভারতীয় ও লেবানিজদের দখলে। বেশির ভাগ মুনাফা তারা শহরে ও বিদেশে অবস্থানকারী ইউরোপীয়দের হাতে এনে পৌঁছে দিত।

যতটুকু লভ্যাংশ দালালদের হাতে যেত, তা একদম নগণ্য। আসল মুনাফাভোগী ছিল বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসায়িক কোম্পানি এবং স্বয়ং ইউরোপীয় সরকারগুলো। পুঁজিবাদী যে প্রতিষ্ঠানটি আফ্রিকান কৃষকদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে, সেটা হলো ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক কোম্পানি। অর্থাৎ, উপনিবেশের ভেতরে ও বাইরে পণ্য পরিবহনে দক্ষ কোম্পানিগুলো। এদের মাঝে সবচেয়ে কুখ্যাত ফ্রান্সের ক্যাম্পেইন ফ্রসেঁ ডি'আফ্রিক অক্সিডেন্টালে (সিএফএও) ও সোসায়েটে কমার্শিয়াল কোয়েস্ট আফ্রিকেইন (এসসিওএ), এবং ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানি (ইউএসি)। কৃষকের শ্রমে-ঘামে উৎপাদিত সম্পদের বিশাল একটি অংশ বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পেছনে এরাই দায়ী।

দাসব্যবসায় অংশগ্রহণের কল্যাণে কিছু ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক কোম্পানির

হাতে আগে থেকেই আফ্রিকান রক্ত লেগে ছিল। এভাবে ইউরোপীয় দাসব্যবসা থেকে আগেই মুনাফা হাতিয়েছে বর্ডোর ফরাসি বণিকরা। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তারা সেই পুঁজি কাজে লাগিয়ে সেনেগাল থেকে গাম্বিয়ায় চীনাবাদামের ব্যবসা করে। ফার্মগুলো ঔপনিবেশিক যুগেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, যদিও কিছু হাতবদল সংঘটিত হয় মাঝখান দিয়ে। বিভিন্ন ফার্ম একে অপরের সাথে মিশেও যায়। সেনেগাল, মৌরিতানিয়া, ও মালিতে মরেল অ্যান্ড প্রম, মরেল ব্রাদার্স, বুহান অ্যান্ড টাইসের, ডালমান অ্যান্ড ক্ল্যান্ট্রে এই সবগুলো নাম বেশ সুপরিচিত। এগুলোর বেশ কয়েকটিই পরবর্তীকালে এসসিওএ'র সাথে একীভূত হয়ে যায়। এই কোম্পানির অধিপতি ছিল ফরাসি ও সুইস অর্থদাতাদের একটি দল। ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে চলতে থাকে সমান্তরাল আরেকটি প্রক্রিয়া। দাসব্যবসা থেকে প্রাপ্ত পুঁজি এবার আফ্রিকা ও ফ্রান্সের মাঝে সরাসরি ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মার্সেইয়ের বেশির ভাগ ছোট ফার্মকে একীভূত করে শুষে নেয় দৈত্যাকার সিএফএও। এরা বিক্রয়যোগ্য সব পণ্য এনে ঠাসাত ফ্রান্স-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকায়। বিনিময়ে স্বদেশে নিয়ে যেত কৃষিজ উৎপাদ, যেগুলো মোটাদাগে কৃষকদের শ্রমের ফল। সিএফএও-তে ব্রিটিশ ও ডাচ পুঁজিও ছিল। লাইবেরিয়া এবং ব্রিটিশ ও বেলজিয়ান উপনিবেশগুলোতেও বিস্তৃত ছিল এর কর্মকাণ্ড। বলা হয়, এসসিওএ এবং সিএফএও অনুকূল বছরগুলোতে ৯০ শতাংশ এবং প্রতিকূল বছরগুলোতে ২৫ শতাংশ মুনাফা হাসিল করত।

ব্রিটেনে দাসব্যবসার এক কুখ্যাত বন্দর ছিল লিভারপুল। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে যখন দাসব্যবসা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তারাই সবার আগে শুরু করে দেয় পাম তেলের ব্যবসা। তার মানে দাঁড়াল, লিভারপুলের ফার্মগুলো এখন আর আফ্রিকার শ্রমকে বিদেশে পাচারের মাধ্যমে শোষণ করছে না। এর বদলে আফ্রিকার ভেতরেই আফ্রিকার শ্রম ও কাঁচামালকে শোষণ করতে থাকে তারা। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এবং ঔপনিবেশিক যুগের ঠিক শুরুতে লিভারপুল মূলত আফ্রিকান কৃষকদের উৎপাদের ওপর মনোনিবেশ করে। দাসব্যবসার যুগে আফ্রিকার সাথে ব্রিটেন ও ইউরোপের বাণিজ্যের বড় একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ এই বন্দরটি। শিল্পনগরী ম্যানচেস্টার ও চেশায়ারের সহযোগিতায় ঔপনিবেশিক যুগের ব্যবসাও একইভাবে লিভারপুলেরই নিয়ন্ত্রণে রয়ে যায়। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে গ্লাসগোরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, যেমনটি আগ্রহ ছিল লন্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ী ও কোম্পানিরও। আফ্রিকান আমদানি ও রপ্তানির প্রধান বন্দর হিসেবে ১৯২৯ সালের মধ্যে লিভারপুলের জায়গা দখল করে নেয় লন্ডন।

ব্রিটিশ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর মাঝে সর্বাধিক পরিচিত ছিল ইউএসি। এটি বৃহৎ অ্যাংলো-ডাচ কোম্পানি ইউনিলিভারের অঙ্গসংস্থা। পশ্চিম আফ্রিকার সকল এবং পূর্ব আফ্রিকার কিছু ব্রিটিশ উপনিবেশে এদের প্রতিনিধি বিদ্যমান ছিল। ইউনিলিভারের নিয়ন্ত্রণে আরও ছিল ক্যাম্পেইন দ্যু নাইজার ফ্রঁসে, ক্যাম্পেইন ফ্রঁসে ডি লা কোট ডি'আইভোইর, চাদের এসসিকেএম, সেনেগালের নোসোকো, পর্তুগিজ গিনির এনএসসিএ, এবং ডাহোমির জন ওয়াকেন অ্যান্ড কোং। আরও কিছু ব্রিটিশ ও ফরাসি ফার্মকে প্রত্যেক কলোনিতে দেখা যেত না বটে। কিন্তু নিজ নিজ কার্যক্রমের এলাকায় ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছিল তারা। যেমন, নাইজেরিয়ায় ছিল জন হোল্ট।

পূর্ব আফ্রিকার আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় জড়িত ফার্মগুলো সাধারণত পশ্চিম আফ্রিকারগুলোর চেয়ে ছোট। কিন্তু তারপরও পাঁচ-ছয়টা ফার্ম ছিল বাকিগুলোর চেয়ে যথেষ্ট বড় এবং তারাই সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করত। এদের মাঝে অন্যতম পুরাতন স্মিথ ম্যাকেঞ্জি। এটি স্কটিশ কোম্পানি ম্যাককিনন অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি থেকে উদ্ভূত। পূর্ব আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের অগ্রনায়ক ছিল এই কোম্পানিটিই। ভারতের ওপরেও চোখ ছিল তাদের। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফার্মের মধ্যে রয়েছে এ. বম্যান, উইগেলস-ওয়ার্থ অ্যান্ড কোম্পানি, ড্যালগেটি, লেজলি অ্যান্ড অ্যান্ডারসন, র‍্যালি ব্রাদার্স, মাইকেল কনস, জস. হ্যানসেন, দি আফ্রিকান মার্কেন্টাইল অ্যান্ড টুয়েন্টশে ওভারসিজ ট্রেডিং কোং। কোনো কোনোটি ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হওয়ার আগে একীভূত হয়ে যায়। সবগুলোরই ছিল আরও বেশ কয়েকটি অঙ্গসংস্থা। আবার তারা নিজেরাও ছিল মেট্রোপোলের বড় বড় কোম্পানির সাথে সংযুক্ত। পূর্ব আফ্রিকার আমদানি-বাণিজ্যের একটি টুকরোর মালিকও ছিল ইউএসি। শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা ১৯০৪ সালে যে গেইলি অ্যান্ড রাবার্ট কোম্পানির সূচনা করেছিল, ইউএসি সেটারই ধারা অব্যাহত রাখে।

পূর্ব আফ্রিকায় উদ্বৃত্ত ভোগদখলের ধাঁচটি চিহ্নিত করা বেশ সহজ। কারণ নাইরোবি এবং মোম্বাসা বন্দরে এই পুরো কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা হতো। সব বড় বড় ফার্ম কার্যক্রম চালাত নাইরোবি থেকে। গুদামজাতকরণ, পরিবহন, আর বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম সামলানোর জন্য মোম্বাসাতে ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়। এরপর দৃশ্যপটে আসে উগান্ডা ও তাঙ্গানিকা। তাদের রাজধানী যথাক্রমে কাম্পালা ও দার এস সালামে বড় ফার্মগুলোর শাখা অবস্থিত ছিল। সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকায় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বেশ ছোট। কিন্তু যুদ্ধের পর তা লাফিয়ে বেড়ে যায়। যেমন, কেনিয়া থেকে আমদানির মূল্যমান ১৯৩৮ সালে ছিল ৪০ লক্ষ পাউন্ড, যা

১৯৫০-এ ৩.৪ কোটি এবং ১৯৬০ সালে ৭ কোটিতে গিয়ে ঠেকে। রপ্তানির মূল্যমানও স্বভাবতই বাড়তে থাকে একই সময়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে এগুলোর প্রধান সুবিধাভোগী বাণিজ্যিক ফার্মগুলো।

আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে কৃষকেরা অর্থকরী ফসল ফলাত, সেসব জায়গায় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তুলনামূলক কম বিনিয়োগেই পেয়ে যেত অধিক মুনাফা। কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদন করতে তাদের একটা পয়সাও খরচ করতে হতো না। আফ্রিকান কৃষকরা অর্থকরী ফসলের চাষ করত বিভিন্ন কারণেই। খুব ছোট একটা অংশের উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে ইউরোপীয় পণ্যের জোগান লাভ অব্যাহত রাখা। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে এসব পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তারা। মহাদেশের অন্যান্য স্থানে বেশির ভাগ চাষী নগদ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এগুলোর চাষ করে। কারণ বিভিন্ন ধরনের খাজনা তাদের পরিশোধ করতে হতো নগদ অর্থ আকারেই। কেউ-বা এসবের চাষ করত, তাদের বাধ্য করা হতো বলে। কিছু স্থানে তাদের বাধ্য করা হতো আক্ষরিক অর্থেই বন্দুক ও চাবুকের মুখে। যেমন, জার্মান-শাসনাধীন তাঙ্গানিকা, পর্তুগিজ উপনিবেশসমূহ, এবং ১৯৩০-এর দশকে ফরাসি বিষুবীয় আফ্রিকা ও ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত সুদান। কিন্তু খাওয়া-পরার জন্য নগদ অর্থের ওপর নির্ভর করতে হবে, এরকম চাষীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো এই ব্যাপারটার পূর্ণ ফায়দা লুটে নেয়। তারা জানে যে, আফ্রিকান কৃষক ও তার পরিবার নিজেদের শাম্বা ক্ষেত থেকেই খাদ্যের জোগান পেতে সক্ষম। তাই কৃষক ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যতটুকু পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত, কোম্পানিগুলো তা দিতেই চাইত না। মোটকথা, কোম্পানিগুলো যেন বিজিত কোনো জাতির কাছ থেকে কর আদায় করছে। করের পণ্যগুলো কীভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, তা নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোরই প্রয়োজন নেই।

আফ্রিকার ভেতর নিজস্ব পরিবহন-মাধ্যমও ছিল বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর। যেমন, মোটর-চালিত জলযান ও ট্রাক। কিন্তু পরিবহনের খরচটা তারা সাধারণত লেবানিজ বা ভারতীয় দালালদের মাধ্যমে কৃষকদের ঘাড়ে দিয়ে দিত। ওই পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলো দুইদিক দিয়ে চিপে ধরেছিল আফ্রিকান কৃষকদের। একদিকে তারা ফসলের দাম নিয়ন্ত্রণ করত। আরেকদিকে কৃষকদের কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন আমদানি-পণ্যের দামও ঠিক করে দিত তারাই। যেমন : হাতিয়ার, পোশাক, বাইসাইকেল। উদাহরণস্বরূপ, ইউএসি ও অন্যান্য কোম্পানি ১৯২৯ সালে নাইজেরিয়াতে পাম থেকে উৎপাদিত পণ্যের দাম একদমই কমিয়ে দেয়। অথচ আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়তে থাকার কারণে

বেড়ে চলেছে জীবনযাত্রার ব্যয়। প্রতি গ্যালন পাম তেলের দাম ১৯২৪ সালে ছিল চৌদ্দ শিলিং। পরে ১৯২৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় সাত শিলিং এবং পরের বছর এক শিলিং-এর চেয়ে একটু বেশি। মন্দার বছরগুলোতে যদিও বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর প্রাপ্তির পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু তাদের লাভের সূচক বেড়ে যায় ঠিকই। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কৃষকদের বুকে পাড়া দিয়ে কী নির্লজ্জভাবে উদ্বৃত্ত হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। মন্দার মাঝখানেও বেশ কেতাদুরস্ত মুনাফা লাভ করে ইউএসি। তাদের ১৯৩৪ সালের মুনাফার পরিমাণ ৬,৩০২,৮৭৫ পাউন্ড। শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া হয় ১৫ শতাংশ করে লভ্যাংশ।

উপনিবেশায়িত আফ্রিকার প্রতিটি অংশে মন্দার বছরগুলো এভাবেই কেটেছে। সুকুমা ল্যান্ডে (তাঙ্গানিকা) ১৯৩০ সালে পাউন্ডপ্রতি তুলার দাম পঞ্চাশ সেন্ট থেকে দশ সেন্টে নেমে আসে। ফরাসি উপনিবেশগুলোয় ধাক্কা লেগেছে একটু পরে। কারণ ১৯৩১-এর আগ পর্যন্ত ফরাসি আর্থিক অঞ্চলে মন্দার প্রভাব পড়েনি। এরপর সেনেগালি চীনাবাদামের দাম অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়। কফি আর কোকোর দাম কমে আরও ভয়ানকভাবে। কারণ ইউরোপীয় ক্রেতাদের কাছে এগুলো তুলনামূলক বিলাসী পণ্য। আরও লক্ষণীয় যে, সিএফএও এবং এসসিওএ'র মতো ফরাসি ফার্মগুলো ইউরোপে তাদের কাঁচামাল কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হলেও কোনো লোকসানের শিকার হয়নি। বরং এর পুরো চাপটা সহ্য করেছে আফ্রিকান কৃষক ও মজুররা। এমনকি সেটা জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে হলেও। ফরাসি-নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলোতে আফ্রিকান কৃষকদের বাধ্য করা হয় তথাকথিত সমবায় সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য। সেখানে তাদের তুলা-সহ নির্দিষ্ট কিছু ফসলের চাষ করতে বাধ্য করা হয়। বিনিময়ে যে মূল্যই তাদের প্রদান করা হয়, তা-ই মেনে নিতে বাধ্য তারা।

মন্দা শেষ হতে না হতেই ইউরোপ এবার যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। পশ্চিমা শক্তিরা আফ্রিকান জনগণকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসে স্বাধীনতার তরে যুদ্ধ করার জন্য! ঈশ্বর আর দেশের নামে লুটপাটের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় বাণিজ্যিক ফার্মগুলো। গোল্ড কোস্টে তারা প্রতি টন কোকোর জন্য ১০ পাউন্ড করে পরিশোধ করে। অথচ যুদ্ধের আগে সেটা ছিল ৫০ পাউন্ড। একইসাথে আমদানিকৃত পণ্যের দাম হয়ে যায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। গোল্ড কোস্টে এক টুকরা ছাপার কাপড় যুদ্ধের আগে বিক্রি হতো সাড়ে ১২ শিলিং করে। আর ১৯৪৫ সালে তার মূল্য দাঁড়ায় ৯০ শিলিং। নাইজেরিয়াতে এক গজ খাকির দাম ৩

শিলিং থেকে বেড়ে ১৬ শিলিং হয়। এক থোকা লোহার পাতের দাম ৩০ থেকে বেড়ে হয়ে যায় ১০০।

মূল্যবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী শহুরে শ্রমিকরা। কারণ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হতো নগদ অর্থের বিনিময়ে। আর তাদের খাবারের একাংশও আমদানিকৃত। যুদ্ধ-পরবর্তী এই শোষণমূলক পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রমিক-অসন্তোষের মাঝে। বেশ কয়েকটি ধর্মঘট সংঘটিত হয়। গোল্ড কোস্টে ১৯৪৮ সালে আমদানি-পণ্যের ওপর যে বয়কট আন্দোলন শুরু হয়, তারই হাত ধরে সূচিত হয় নক্রুমার অধীনে স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু সস্তা উৎপাদ আর দুর্মূল্যের রপ্তানির ফলে কৃষকরাও অস্থির হয়ে ওঠে। উগান্ডাতে তুলাচাষীরা ১৯৪৭ সালে সহ্যের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। ব্রিটিশদের বড় বড় আমদানি-রপ্তানি ফার্মের গায়ে তারা হাত দিতে অক্ষম বটে। কিন্তু অন্তত ভারতীয় ও আফ্রিকান দালালরা তো তাদের নাগালেই আছে। তাই তারা ইন্ডিয়ান-মালিকানাধীন তুলা ইঞ্জিনের দিকে অগ্রসর হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কাবাকার প্রাসাদের বাইরে। এই কাবাকা ব্যক্তিটি পুরুষানুক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক, যিনি প্রায়ই উগান্ডায় ব্রিটিশদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

মুনাফার সূচক যেন সর্বদাই যথাসম্ভব সর্বোচ্চ থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য বাণিজ্যিক ফার্মগুলো "পুল" তৈরি করে। এসব পুলের মাধ্যমে ঠিক করে দেওয়া হয় যে, আফ্রিকান চাষীদের কী পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। দামের পরিমাণ একদম সর্বনিম্ন করে রাখে তারা। এর পাশাপাশি উপনিবেশের অর্থনৈতিক জীবনের আরও কিছু পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো। ফলে তারা কয়েক জায়গায় একসাথে হুল ফুটিয়ে উদ্বৃত্ত শুষে নিতে শুরু করে। এর একটা উদাহরণ মরক্কোর ক্যাম্পেইন জেনেরেইল দ্যু মারোক। এই কোম্পানির মালিকানায় ছিল বড় বড় ভূসম্পত্তি, প্রাণীসম্পদের খামার, কাঠের কর্মশালা, খনি, মৎস্য খামার, রেললাইন, বন্দর, ও শক্তিকেন্দ্র। সিএফএও এবং ইউএসি'র মতো দৈত্যদের আঙুলও ছিল সবকিছুর ওপরে। সিএফএও চীনাবাদামের ক্ষেত থেকে শুরু করে ফেবার অ্যান্ড ফ্রেইজিনেট শিপিং লাইনের শেয়ার পর্যন্ত নানা জিনিসের মালিক। নাইজেরিয়া ও ঘানার জনগণ যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই ইউএসি। তারা পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার নিয়ন্ত্রক, এবং মাখন কারখানা, স মিল, সাবান কারখানা, গেঞ্জি কারখানা, হিমাগার, প্রকৌশল ও মোটর মেরামতের দোকান, দড়ি, আর উপকূলীয় নৌকার মালিক। এসকল ব্যবসার কোনো কোনোটা সরাসরি আফ্রিকান মজুরি-শ্রমিকদের শোষণ করে চলে। আর অর্থকরী ফসলের খাতে কৃষকেরা যা কিছু সারনির্যাস উৎপাদিত করে চলেছে, এই প্রতিটি কোম্পানিই

কোনো-না-কোনোভাবে ভোগ করে চলেছে সেগুলো।

যেসব ফার্ম আফ্রিকা থেকে কৃষিজ পণ্য কিনে নিত, কিছু ক্ষেত্রে তারাই ছিল ওইসব কৃষিজ কাঁচামাল-ভিত্তিক পণ্য-তৈরিকারী। যেমন, কোকোয়া ও চকোলেট উৎপাদনকারী প্রধান দুটি ইংলিশ কোম্পানি ছিল ক্যাডবারি ও ফ্রাই। তারা পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের ক্রেতা। আর পূর্ব আফ্রিকায় ব্রুক বন্ড কোম্পানি চা উৎপাদনের পাশাপাশি রপ্তানিও করে থাকে। মার্সেই, বর্ডো, ও লিভারপুলের বহু বাণিজ্যিক কোম্পানিও তাদের স্বদেশে সাবান ও কৃত্রিম মাখন-সহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল। এই ব্যাপারটা ইউএসি'র ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য। ওদিকে ফ্রান্সে তেল ও চর্বি প্রক্রিয়াজাতকারী লাসিওউর গ্রুপের বাণিজ্যিক ক্রেতা ছিল আফ্রিকায়। অবশ্য বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও শিল্প-কারখানার কর্মকাণ্ডের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব। আফ্রিকান কৃষকদের শোষণ করার যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া, শিল্প-কারখানার কর্মকাণ্ড সেটার সর্বশেষ ধাপ। একদিক দিয়ে এটা সবচেয়ে বিধ্বংসী ধাপও বটে।

নির্দিষ্ট কোনো অর্থকরী ফসল উৎপাদনের জন্য প্রচুর কর্মঘণ্টা ব্যয় করতে হতো কৃষকদের। উৎপাদের মূল্য মানে ওই দীর্ঘ কর্মঘণ্টার মূল্য। আফ্রিকার প্রাথমিক উৎপাদ চিরকালই সস্তায় বিক্রি হয়ে এসেছে। তাই স্বভাবতই কাঁচামালের ক্রেতা ও ব্যবহারকারীরা ছিল কৃষকদের পাশবিকভাবে শোষণের দায়ে অপরাধী।

ওপরের এই সাধারণ মন্তব্যের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে তুলার প্রসঙ্গ আনা যায়। এটি আফ্রিকার অন্যতম বৃহৎ অর্থকরী ফসল। উগান্ডার চাষীর হাতে উৎপাদিত তুলা শেষমেশ গিয়ে পৌঁছাত ল্যাংকাশায়ারের ইংরেজ কারখানায় আর নয়তো ভারতে ব্রিটিশ-মালিকানাধীন কোনো কারখানায়। ল্যাংকাশায়ার কারখানার মালিক তার স্বদেশি কর্মীদের যথাসম্ভব কম মজুরি প্রদান করে বটে। কিন্তু বেশ কিছু কারণে সে তাদের শ্রমকে সীমিত মাত্রায় শোষণ করতে সক্ষম। ওদিকে উগান্ডান শ্রমকে সে শোষণ করতে পারে অবারিতভাবে। কারণ সেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার সহযোগী। এই রাষ্ট্র নগণ্য মজুরির বিনিময়ে উগান্ডানদের দীর্ঘ সময় শ্রম দিতে বাধ্য করে। তা ছাড়া, কাঁচামাল তুলার চেয়ে তৈরিকৃত সুতি শার্টের দাম অনেক অনেক বেশি। সেই শার্ট যখন উগান্ডাতে পুনরায় আমদানি করা হয়, তখন ওই তুলার উৎপাদক কৃষকই আর সেটা কেনার সামর্থ্য রাখে না।

আফ্রিকা থেকে কাঁচামাল রপ্তানি এবং তৈরি-পণ্য আমদানি এক অসম বিনিময়। পুরো ঔপনিবেশিক যুগ জুড়ে এই অসমতা ক্রমেই আরও প্রকট হতে

থাকে। ঔপনিবেশিক যুগের আগে ১৮৭০-৮০ দশকে আফ্রিকান অঞ্চলগুলো কাঁচামালের বিনিময়ে যে পরিমাণ তৈরি-পণ্য আমদানি করতে পারত, ১৯৩৯ সালে একই মানের কাঁচামালের বিনিময়ে তারা সেটার মাত্র ৬০ শতাংশ তৈরি-পণ্য ক্রয় করার সামর্থ্য রাখে। ঊনিশশ ষাট সালের মধ্যে আরও কমে যায় সেই পরিমাণ। অর্থনীতির কোন সূত্রের বলে কাঁচামালের মূল্য এত কম, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। উন্নত দেশগুলো কিন্তু কাঠ ও গমের মতো নিজেদের কিছু কাঁচামাল ঠিকই চড়া দামে বিক্রি করে চলত। কোনো উপনিবেশের পক্ষে এত বেশি দাম হাঁকানো সম্ভব ছিল না। কীভাবে তা সম্ভব হলো? এর ব্যাখ্যা একটাই। উপনিবেশকরা তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির বলে আফ্রিকানদের ওপর এই অসম লেনদেন চাপিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নির্ভরশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর এভাবেই চাপিয়ে দেওয়া হয় অসম শর্তের চুক্তি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর ওপর এমনটিই করা হয়েছে।

মেট্রোপোল ও উপনিবেশগুলোর মাঝে এই অসম প্রকৃতির বাণিজ্য থেকে "সংরক্ষিত বাজার"-এর ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মেট্রোপোলের একজন অদক্ষ উৎপাদকও উপনিবেশে গিয়ে নিশ্চিত বাজার খুঁজে পাবে। কারণ তার স্বগোত্রীয়রা সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তা ছাড়া, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের মতো এখানেও ইউরোপীয় উৎপাদকেরা নিম্নমানের পণ্যের আরেকটি ধারা সৃষ্টি করে নেয়। যেই জিনিস তাদের নিজেদের বাজারে বিকোয় না (বিশেষ করে পোশাক), সেগুলো তারা পাঠিয়ে দেয় উপনিবেশের বাজারে। ইউরোপীয় চাষীরাও এখান থেকে ফায়দা লাভ করতে থাকে সস্তা মাখন বিক্রির মাধ্যমে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার জেলেরা লবণ-দেওয়া কডমাছ বিক্রি করে পায় একইরকম মুনাফা। অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় আফ্রিকা কিন্তু ইউরোপীয় পণ্যের বড়সড় কোনো বাজার না। কিন্তু এখানে ক্রয়মূল্য আর বিক্রয়মূল্য দুটোই ঠিক করে দেয় ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা। এতে করে তাদের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা সহজেই আফ্রিকানদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সম্পদ হাতিয়ে নিতে পারে। আফ্রিকানরা যদি নিজেদের রপ্তানিকৃত পণ্যের দাম বাড়ানোর মতো অবস্থানে থাকত, তাহলে সেটা কিছুতেই সম্ভব হতো না পুঁজিপতিদের পক্ষে।

জাহাজ-পরিবহন ও ব্যাংকিং খাত

শুধু বাণিজ্যিক কোম্পানি আর শিল্পমালিকদের পক্ষে উদ্বৃত্ত সম্পদ শোষণের পুরো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। জাহাজ-পরিবহন কোম্পানিগুলো এই

ধারায় যে অবদান রেখেছে, তা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। সবচেয়ে বড় শিপিং কোম্পানিগুলো ছিল উপনিবেশক দেশগুলোর ঝান্ডাবাহী, বিশেষত ব্রিটিশদের। পরিবহনকারীরা নিজেরাই নিজেদের আইন। স্বদেশের সরকার বড়ই আদর-আপ্যায়ন করে তাদের। তারা দেশের হয়ে মহা-মুনাফা উপার্জনকারী, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তাকারী, বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যম, এবং যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর দায়িত্ব পালনকারী। পরিবহন-ভাড়ার ওপর আফ্রিকান কৃষকদের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। অন্যান্য ভূমির বাসিন্দাদের চেয়েও তারা বেশি মূল্য পরিশোধ করত। লিভারপুল থেকে পশ্চিম আফ্রিকায় ময়দা পরিবহনের ভাড়া ছিল পঁয়ত্রিশ শিলিং প্রতিটন। অথচ লিভারপুল থেকে নিউ ইয়র্কে (প্রায় একই দূরত্ব) তা মাত্র সাড়ে সাত শিলিং। মালামালের পরিমাণ অনুযায়ী সাধারণত পরিবহন খরচের তারতম্য হয়। শতাব্দীর শুরুর দিকে কোকোয়ার রপ্তানির পরিমাণ যখন কম ছিল, তখন টনপ্রতি পরিবহন ভাড়া ঠিক করা হয় পঞ্চাশ শিলিং। কিন্তু পরবর্তীকালে রপ্তানি বাড়লেও এই উচ্চ ভাড়াই বহাল থাকে। কেনিয়া থেকে ১৯৫০-এর দশকে নিউ ইয়র্কে যে কফি পরিবহন করা হতো, সেখান থেকে জাহাজিরা আয় করত টনপ্রতি ২৮০ শিলিং (তৎকালীন লেনদেনের হার ৪০ মার্কিন ডলার)। তাত্ত্বিকভাবে, জাহাজিদের কাছে এই ভাড়া পরিশোধ করার কথা বণিকের। কিন্তু বাস্তবে এই পুরো খরচ বহন করে কৃষকদের শ্রম। কারণ কৃষকদের কাছ থেকে সস্তায় কিনে নেওয়ার মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয়, বণিক সেখান থেকেই জাহাজের ভাড়া দেয়। আবার, কেনিয়াতে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী উপনিবেশকরা ব্যয়ভার বহন করত বটে। কিন্তু গ্রামের মজুরি-শ্রমিকদের শোষণ করার মাধ্যমে সেই খরচ উসুল করে নিত তারা।

বাণিজ্যিক ফার্মের মতো পরিবহন কোম্পানিগুলোও অনুরূপ "পুল"-এর ব্যবস্থা করে উচ্চ মুনাফা অব্যাহত রাখে। "কনফারেন্স লাইন্স" নামে পরিচিত বিষয়টির প্রবর্তন ঘটায় তারা। এই নিয়ম অনুযায়ী, দুই বা ততোধিক পরিবাহক কোম্পানি নিজেদের মাঝে ভাড়ার ব্যয়ভার ভাগাভাগি করার সুযোগ পায় যথাসম্ভব সুবিধাজনক শর্তে। বিনিয়োগের মুনাফা এত বেশি এবং তাদের লোভ এতই লাগামছাড়া ছিল যে, এমনকি উপনিবেশক পক্ষের বণিকরাও প্রতিবাদ করতে শুরু করে। ইউএসি (ইউনিলিভারের সহযোগিতায়) ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ওয়েস্ট আফ্রিকান লাইন্স কনফারেন্সের সাথে এক অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। শেষোক্ত কোম্পানিটি ব্রিটিশ পরিবহন ফার্ম এল্ডার ডেম্পস্টার, হল্যান্ড ওয়েস্ট আফ্রিকা লাইন, ও জার্মান ওয়েস্ট আফ্রিকা লাইন নিয়ে গঠিত। এই অর্থনৈতিক যুদ্ধে পরিবহন পক্ষের ওপর জয়লাভ করে ব্যবসায়িক পক্ষ। কিন্তু

এটা ছিল দুই হাতির লড়াই। তাদের পাড়া খেয়ে ঘাসের অবস্থাই সবচেয়ে নাজেহাল হয়ে যায়। দিনশেষে সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয় ঘটে আফ্রিকান কৃষকদের। কারণ ব্যবসায়ী ও পরিবহনকারীরা প্রাথমিক উৎপাদের দাম কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের মতভেদ নিরসন করে নেয়।

ঔপনিবেশিক দৃশ্যপটের নেপথ্যে ছোঁকছোঁক করে গেছে ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, দলিল-লেখক, ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। "নেপথ্যে" বলা হলো, কারণ কৃষকরা কখনো এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লেনদেন করেনি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোও যে তাদের শোষণ করে চলেছে, এ ব্যাপারটা সাধারণভাবে অজানা ছিল তাদের কাছে। ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের কোনো সুযোগ কৃষক বা শ্রমিকের ছিল না। কারণ তাদের কোনো "নিরাপত্তা" বা "জামানত" নেই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কায়কারবার হতো শুধুমাত্র অন্য পুঁজিপতিদের সাথে। কারণ তারা ব্যাংককে এই নিশ্চয়তা দিতে পারত যে, যা কিছুই হোক, ব্যাংক তার অর্থ ফেরত পাবেই এবং লাভের মুখ দেখবেই। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী বিশ্বের অভিজাত শ্রেণী হয়ে ওঠে ব্যাংকাররা। এ অর্থে তারা নেপথ্যে না, বরং শ্রেষ্ঠাংশেই ছিল। আফ্রিকান শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সম্পদ মেট্রোপলিটন ব্যাংকারদের হাতে আসত, তার পরিমাণ শুনলে চোয়াল ঝুলে যাবে। এমনকি খনিজ-উত্তোলক কোম্পানিগুলোর চেয়েও বেশি মুনাফা হাসিল করত তারা। যতবার তারা নতুন করে সরাসরি বিনিয়োগ করে, ততবারই আফ্রিকানরা তাদের শ্রমের ফল থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তা ছাড়া, উপনিবেশে যেকোনো বিনিয়োগ মানেই বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা। কারণ ছোট বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো ঘুরেফিরে কোনো না কোনো বড় ব্যাংকারের সাথে সম্পর্কিত। মেট্রোপোলে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা মিলত, ঔপনিবেশিক বিনিয়োগের মুনাফা সেটার চেয়ে ধারাবাহিকভাবে বেশি। তাই ঔপনিবেশিক উদ্যোগগুলোর অর্থায়নের জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকত অর্থদাতারা।

উপনিবেশায়নের একদম শুরুর বছরগুলোতে আফ্রিকার ব্যাংকগুলো ছিল ছোট এবং তুলনামূলক নির্ভরশীল। ব্যাংক ডি সেনেগাল এবং ব্যাংক অব ব্রিটিশ ওয়েস্ট আফ্রিকার ক্ষেত্রে এ কথাটি খাটে। প্রথমটি ১৮৫৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। আর দ্বিতীয়টির সূচনা ঘটেছিল পরিবহন ফার্ম এল্ডার ডেম্পস্টারের অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু ইউরোপের যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো সেই ১৮৮০-র দশক থেকেই রিমোট কন্ট্রোলারের মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল, তারা অচিরেই সরাসরি নাক গলাতে শুরু করে। উপনিবেশের পুঁজিবাদী লেনদেন যখন যথেষ্ট লাভজনক হতে শুরু করে, তখনই ঔপনিবেশিক ব্যাংকিংয়ের

সাথে সরাসরি জড়িয়ে যায় তারা। ব্যাংক ডি সেনেগাল ১৯০১ সালে ব্যাংক ডি লাফ্রিক অক্সিডেন্টালির (বিএও) সাথে একীভূত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তারা শক্তিশালী ব্যাংক অব ইন্দোচায়নার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করে। এটি কতিপয় প্রভাবশালী মেট্রোপলিটন ফরাসি ব্যাংকারের বিশেষ এক সৃষ্টি। ব্যাংক কমার্শিয়ালি ডি লাফ্রিক (বিসিএ) ১৯২৪ সালে ফ্রান্স-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে আবির্ভূত হয়। ফ্রান্সের কেটির লিওনাইস ও বিএনসিআইয়ের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত। ততদিনে ব্যাংক অব ব্রিটিশ ওয়েস্ট আফ্রিকার অর্থায়নকে সহযোগিতা করতে শুরু করেছে লয়েডস ব্যাংক, ওয়েস্টমিন্সটার ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, এবং ন্যাশনাল প্রোভিনশিয়াল ব্যাংক—সবগুলোই ইংল্যান্ডের। আরেক বিশাল ইংরেজ ব্যাংকিং ফার্ম Barclays সরাসরি আফ্রিকায় ঢুকে পড়ে। তারা কলোনিয়াল ব্যাংককে কিনে নেয় এবং প্রতিষ্ঠিত করে Barclays ডিসিও (ডমিনিয়োন অ্যান্ড কলোনিয়াল)।

এই সেই বারক্লেইজ

ব্রিটেন-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকায় যে ব্যাংকিং ব্যবসা চলত, তার সিংহভাগের মালিক ছিল ব্যাংক অব ব্রিটিশ ওয়েস্ট আফ্রিকা (যেটি ১৯৫৭ সালে ব্যাংক অব ওয়েস্ট আফ্রিকা নাম ধারণ করে) এবং Barclays। একইভাবে, ফ্রান্স-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম ও বিষুবীয় আফ্রিকাতে সেই ভূমিকা ধারণ করে বিএও এবং বিসিএ। পশ্চিম আফ্রিকাতে ফরাসি ও ব্রিটিশ ব্যাংকিং পুঁজিকে একীভূতও করা হয় একটা সময়ে গিয়ে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে জন্ম নেয় ব্রিটিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকা ব্যাংক। ফ্রান্স আর বেলজিয়ামও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে মিলেমিশে শোষণকর্ম চালায়। কারণ সোসায়েটে জেনেরালিতে বেলজিয়ান ও ফরাসি উভয় দেশের পুঁজিই ছিল। ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকা ও কঙ্গোর ব্যাংকগুলোকে সহযোগিতা করত এটি। অন্যান্য দুর্বলতর ঔপনিবেশিক শক্তিকেও সহায়তা জোগায় Barclays-এর মতো আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো। পাশাপাশি নিজেদের জাতীয় ব্যাংকসমূহের চারণভূমি হিসেবেও ব্যবহার করে সেসকল ঔপনিবেশিক

এলাকাকে। লিবিয়াতে কার্যক্রম চালাত ব্যাংকো ডি রোমা এবং ব্যাংকো ডি নাপোলি। আর পর্তুগিজ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সবচেয়ে পরিচিত নাম ছিল ব্যাংকো আল্ট্রামারিনো।

দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ব্যাংকিং ফার্ম ছিল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব সাউথ আফ্রিকা লিমিটেড। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৬২ সালে কেইপ কলোনি থেকে। যেসকল বিজনেস হাউজের হর্তাকর্তারা এটি পরিচালনা করত, লন্ডনের সাথে তাদের ছিল গভীর সখ্যতা। এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয় লন্ডনে। সোনা ও হীরার অলংকারাদি তৈরি এবং সেসিল রোডস ও ডি বিয়ারসের লুটের মাল ব্যবস্থাপনা করার মাধ্যমে তাদের কপাল খুলে যায়। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ১৮৯৫ সালের মধ্যে বেচুয়ানাল্যান্ড, রোডেশিয়া, ও মোজাম্বিকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব আফ্রিকায় এটি দ্বিতীয় ব্রিটিশ ব্যাংক। তাদের আসল মুনাফার পরিমাণ ছিল দুর্দান্ত রকমের। আনুষ্ঠানিকভাবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এক বইয়ে লেখক বিনীতভাবে উপসংহার টেনেছেন:

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের আর্থিক ফলাফল নিয়ে এই বইয়ে তেমন কিছু বলাই হয়নি। কিন্তু ব্যাংকটির অর্জিত মুনাফা আসলে তাদের কর্মকাণ্ডেরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। তাই শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এটাই তাদের মূল লক্ষ্য হতে বাধ্য।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ১৯৬০ সালে মোট ১,১৮১,০০০ পাউন্ড মুনাফা অর্জন করে। শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান করে ১৪ শতাংশ লভ্যাংশ। এই শেয়ারহোল্ডারদের বেশির ভাগই ইউরোপের বাসিন্দা অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ। অথচ এই মুনাফার উৎপাদক মূলত দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা। তা ছাড়া, এসকল ইউরোপীয় ব্যাংক তাদের সব আফ্রিকান শাখার সঞ্চয় লন্ডনের প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য হলো সেই সম্পদ লন্ডনের অর্থবাজারে বিনিয়োগ করা। আফ্রিকান উদ্বৃত্তকে মেট্রোপোলে স্থানান্তরিত করার দ্রুততম রাস্তা ছিল এটি।

পূর্ব আফ্রিকায় ১৮৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংকটি ভারতে বিদ্যমান এক ব্রিটিশ ব্যাংকের অঙ্গ। পরে এর নাম হয় ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রাইন্ডলেজ। পার্শ্ববর্তী তাঙ্গানিকায় জার্মানরা ১৯০৫ সালে জার্মান ইস্ট আফ্রিকান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব আফ্রিকায় ব্যাংকিংয়ের প্রায় একচেটিয়া দখল লাভ করে ব্রিটিশরা। সব মিলিয়ে ঔপনিবেশিক যুগে পূর্ব আফ্রিকায় নয়টি বিদেশি ব্যাংক ছিল। এর মধ্যে তিন রাঘব বোয়াল ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রাইন্ডলেজ, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, এবং Barclays।

বিদেশি ব্যাংক কাউকে কীভাবে ফকির বানাতে পারে, আফ্রিকা তার এক দারুণ উদাহরণ। বেশির ভাগ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা দেওয়া হয় শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের হাতে। তারা চিরকালই "স্বদেশ" বলতে ব্রিটেনকে বুঝে এসেছে। তাই ঔপনিবেশিক যুগের শেষ দিকে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা যখন অনিরাপদ বোধ করতে শুরু করে, তখন তড়িঘড়ি নিজেদের টাকা-পয়সা ব্রিটেনে পাঠিয়ে দিতে শুরু করে তারা। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০ সালে ব্রিটেন কেনিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে রাজি হয়। তখন তাঙ্গানিকার শ্বেতাঙ্গরা সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও বড় এক অঙ্ক তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করে দেয় লন্ডনের "নিরাপদ আশ্রয়ে"। ঔপনিবেশিক ব্যাংকগুলোর অন্য সব রেমিট্যান্সের মতোই এই অঙ্ক থেকেও বোঝা যায়, আফ্রিকান ভূমি ও শ্রমকে কী পরিমাণ শোষণ করা হয়েছে।

❁ অর্থনৈতিক শোষক হিসেবে ঔপনিবেশিক সরকার

ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানির পাশাপাশি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষও আফ্রিকার অর্থনৈতিক শোষণ ও দারিদ্র্যের পেছনে সরাসরি দায়ী। উপনিবেশের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যালয় থাকত উপনিবেশক দেশগুলোতে। ওইসব দেশের সরকার আফ্রিকায় তাদের প্রশাসকদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করত। পালন করত বেশ কিছু দায়িত্ব। এর মাঝে প্রধান প্রধান হলো :

(১) অন্যান্য পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

(২) নিজস্ব পুঁজিবাদীদের মাঝে মতবিরোধের মীমাংসা করা।

(৩) ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো যেন ঠিকমতো আফ্রিকাকে শোষণ করতে পারে, সে জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি সবচেয়ে তাৎপর্যময়। এটার কারণেই ঔপনিবেশিক সরকারগুলো বারবার "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা"র মন্ত্র আওড়াত। এটা দিয়ে তারা বোঝায়, আফ্রিকাকে লুট করার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এরই সূত্র ধরে নানারকম কর আরোপ করে ঔপনিবেশিক সরকারগুলো।

আসলে শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে উপনিবেশগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য টাকা দরকার। ঔপনিবেশিক কর ব্যবস্থার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এই তহবিল জোগাড় করা। যে প্রশাসক ও পুলিশরা আফ্রিকানদের নিপীড়ন করত এবং পুঁজিবাদীদের কুকুর হিসেবে কাজ করত, স্বয়ং আফ্রিকানরাই তাদের ভরণপোষণের অর্থ জোগান দিতে থাকে। এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে

নিশ্চিত করে ইউরোপীয় উপনিবেশকরা। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকাকে জয় করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে যে টাকা খরচ করেছে, সেটা উসুল করার উদ্দেশ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কর ও শুল্ক মাসুল আরোপ করা হয়।

তার মানে, ঔপনিবেশিক সরকারগুলো কার্যত একটা পয়সাও নিজেদের পকেট থেকে খরচ করেনি। সব খরচ মেটানো হয়েছে মহাদেশটির শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করার মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভরণপোষণ জোগানোর মাধ্যমে আফ্রিকানরা তাদের শ্রমের ফল থেকে আরও বেশি করে বঞ্চিত হতে থাকে। এ ব্যাপারে চরমতম ভুক্তভোগী ছিল ফরাসি উপনিবেশগুলো। বিশেষ করে ১৯২১ সালে রাষ্ট্রীয় সকল ব্যয়ভার বহন করা ও একটি সঞ্চয় গড়ে তোলা হয় শুধুমাত্র রাজস্ব ও কর থেকে।

আফ্রিকার মাটিতে পুলিশ, সেনাবাহিনী, সরকারি কর্মীবাহিনী, ও বিচারবিভাগ স্থাপন করার মাধ্যমে আফ্রিকান জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা আরও সহজ হয়ে যায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর পক্ষে। পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আফ্রিকার একটি বড় সমস্যা হলো, অর্থকরী ফসলের চাষী হওয়ার জন্য আফ্রিকানদের রাজি করানো। পশ্চিম আফ্রিকার মতো কিছু জায়গায় আফ্রিকানরা ইউরোপীয় তৈরি-পণ্যের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে, স্বেচ্ছায়ই তারা ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থায় অংশ নিতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু সব জায়গায় এমনটি ঘটেনি। বহু স্থানেই আফ্রিকানরা স্রেফ টাকার আশায় নিজেদের চিরাচরিত জীবনব্যবস্থাকে পালটে ফেলতে সম্মত হয়নি। চায়নি শ্রমিক বা অর্থকরী ফসলের চাষী হতে। এসব ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের আইন, করব্যবস্থা, ও নিরেট শক্তির প্রয়োগ ঘটায়। পুঁজিবাদী মুনাফার অনুকূল কাজকর্ম করতে বাধ্য করে আফ্রিকানদের।

ঔপনিবেশিক সরকারগুলো আফ্রিকান ভূমির দখল লাভ করার মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি মারে। একদিকে তাদের নিজেদের নাগরিকরা খুশি হয় (যারা খনিজ উত্তোলন বা কৃষিজমি লাভ করতে আগ্রহী)। আরেকদিকে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেখানে ভূমিহীন আফ্রিকানরা শুধু কর পরিশোধের জন্য না, বেঁচে থাকার জন্যই শ্রম দিতে বাধ্য। কেনিয়া ও রোডেশিয়ার মতো অভিবাসী এলাকায় ঔপনিবেশিক সরকারগুলো আফ্রিকানদের নিজ উদ্যোগে অর্থকরী ফসল চাষ করতে বাধাও প্রদান করে। তাহলে সরাসরি শ্বেতাঙ্গদের অধীনেই কাজ করানো যাবে তাদের দিয়ে। কিকুয়ুর ব্যাপারে কেনিয়ার জনৈক শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী কর্নেল গ্রোগ্যান একদম সোজাসাপটা বলেছেন : "আমরা ওর ভূমি ছিনিয়ে নিয়েছি। এবার তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ছিনিয়ে নিতে হবে।

বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা এই দেশে আমাদের চাকরির অবিচ্ছেদ্য অংশ।”

মহাদেশের কিছু অংশে আফ্রিকানদের হাতে কিছু জমি রয়ে যায়। সেখানে ঔপনিবেশিক সরকারগুলো আফ্রিকানদের অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য করে, দাম যত কমই হোক না কেন। এক্ষেত্রে তাদের এক পছন্দসই কৌশল ছিল করারোপ। নগদ আর্থিক কর আরোপ করা হয় অসংখ্য জিনিসের ওপর—গবাদি পশু, জমি, বাড়ি, এবং স্বয়ং মানুষের ওপরও। কর পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ পাওয়া যেত অর্থকরী ফসল চাষের মাধ্যমে অথবা ইউরোপীয় খামারে বা খনিতে কাজ করার মাধ্যমে। উপনিবেশবাদ আসলে কী চায়, তার এক মজার উদাহরণ দেখা যায় ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত বিষুবীয় আফ্রিকায়। সেখানে মান্দজা জাতির (বর্তমানে কঙ্গো ব্রাজাভিলে বসবাসকারী) ওপর শিকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ফরাসি কর্মকর্তারা। এর উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে শুধুমাত্র তুলা চাষে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করা। এলাকাটিতে প্রাণীসম্পদ ছিল না বললেই চলে। খাদ্যতালিকায় মাংস সংযুক্ত করার একমাত্র উৎস ছিল শিকার। এতদসত্ত্বেও ফরাসিরা জোরেসোরে বাস্তবায়িত করে এই নিষেধাজ্ঞা।

কোনোকিছুতেই যখন কোনো কাজ হয় না, তখন ঔপনিবেশিক শক্তি ব্যাপক হারে শারীরিক বলপ্রয়োগ করে শ্রম আদায় করার চেষ্টা করে। অতি অবশ্যই তার সহযোগী হিসেবে থাকে আইনি আদেশ-নিষেধ। কারণ ঔপনিবেশিক সরকার যেটা চায়, সেটাই “আইন”। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব আফ্রিকায় কিছু আইন ও উপ-আইনের বলে কৃষকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকরী ফসলের (যেমন: তুলা বা চীনাবাদাম) চাষ করতে বাধ্য। এগুলো বাস্তবে আইন না, বরং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগেরই একটি ধরন। কিন্তু কাগজে-কলমে যেহেতু “আইন”, সেহেতু এসব শ্রম কখনোই “জোরপূর্বক শ্রম” বলে গণ্য হয় না।

জোরপূর্বক শ্রমের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ কথিত জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড। এসকল “জনকল্যাণমূলক কাজ”-এর জন্য বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বাধ্যতামূলক শ্রম দিতেই হবে। যেমন: প্রশাসকদের জন্য দুর্গ, আফ্রিকানদের জন্য কারাগার, সেনাদলের জন্য সেনানিবাস, এবং ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের জন্য বাংলো নির্মাণ। এই জোরপূর্বক শ্রমের বিরাট অংশ ব্যবহৃত হতো সড়ক, রেলপথ, ও বন্দর নির্মাণের পেছনে। এগুলোর মাধ্যমে পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং অর্থকরী ফসল রপ্তানি সুবিধাজনক হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন থেকে একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করা যাক।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে সেখানে একটি রেলপথ চালু হয়। এর জন্য গ্রাম থেকে তাড়িয়ে আনা হাজার হাজার শ্রমিকের জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে। কাজের কঠিনতা এবং পরিবেশের দুরবস্থার কারণে এই কাজে নিয়োজিত বহু শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোয় এ ধরনের জোরপূর্বক শ্রম (শিশুশ্রম-সহ) এতই বিস্তৃত ছিল যে, ১৯২৩ সালে "নেটিভ অথোরিটি অর্ডিন্যান্স"-এর শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই আইনের মাধ্যমে কুলিগিরি এবং রেল ও সড়ক নির্মাণকাজে বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবহার সীমিত করে দেওয়া হয়। এই আইনের ফাঁক গলে বেরোনোর উপায় বের করে নেওয়া হয় প্রায় ক্ষেত্রেই। সকল ঔপনিবেশিক শক্তি মিলে ১৯৩০ সালে একটি আন্তর্জাতিক "জোরপূর্বক শ্রমনিরোধ চুক্তি"তে স্বাক্ষর করে বটে, কিন্তু বাস্তবে এটারও কোনো চর্চা ছিল না।

বিনামূল্যে শ্রম লাভের এক চতুর উপায় বের করে নেয় ফরাসি সরকার। প্রথমে তারা নিয়ম করে যে, আফ্রিকান পুরুষদের ফরাসি সৈনিক হিসেবে নাম লেখাতে হবে। তারপর তাদের ব্যবহার করতে থাকে মজুরিহীন শ্রমিক হিসেবে। এটি-সহ জোরপূর্বক শ্রম আদায়ের আরও কিছু আইন "প্রেস্টেশান" নামে পরিচিত। ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত সুদান ও বিষুবীয় আফ্রিকায় ব্যাপক হারে এগুলো প্রযুক্ত হয়। ওইসব অঞ্চলে যেহেতু অর্থকরী ফসল ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত না, সেহেতু উদ্বৃত্ত হস্তগত করার জন্য বের করে নেওয়া হয় আরেকটি উপায়। সেখান থেকে শ্রমিকদের ধরে এনে উপকূলের নিকটে অন্য কোনো এলাকায় অর্থকরী ফসলের ক্ষেতে কাজ করানো হতো তাদের দিয়ে। ঔপনিবেশিক যুগে জোরপূর্বক শ্রমের বিশাল জোগানদাতা ছিল বর্তমানের উচ্চতর ভোল্টা, চাদ, ও কঙ্গো ব্রাজাভিল। ফরাসিরা আফ্রিকানদের দিয়ে ব্রাজাভিল থেকে পয়েন্টে-নর্টে পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করে ১৯২১ সালে। এটি শেষ হতে হতে ১৯৩৩ চলে আসে। নির্মাণকাজ চলাকালীন প্রতি বছর হাঁকিয়ে আনা হয় দশ হাজার করে শ্রমিককে। কখনো এদের পাড়ি দিতে হতো এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ। বছরে অন্তত ২৫ শতাংশ শ্রমিক মারা পড়েছে অনাহারে ও রোগে ভুগে। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সময়টা ছিল ১৯২৫ থেকে ১৯২৯।

"জনকল্যাণমূলক কাজ" তো পুঁজিপতিদের পকেট ভারী করেছেই। ঔপনিবেশিক সরকারও জোরপূর্বক শ্রমিক সংগ্রহ করে দিয়ে এই পুঁজিপতিদের সহযোগিতা করত। উপনিবেশের শুরুর বছরগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় তা চলমান থাকে। কিছু জায়গায় তো ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল

এটি। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোয় ১৯২৯-৩৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে এই প্রথাকে পুনর্জীবিত করা হয়। কেনিয়া ও তাঙ্গানিকায় জোরপূর্বক শ্রম পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, যাতে যুদ্ধের সময়েও অভিবাসীদের ক্ষেতখামার টিকে থাকে। নাইজেরিয়াতে এই জোরপূর্বক-শ্রম আইনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় টিন কোম্পানিগুলো। শ্রমিকদের দৈনিক পাঁচ পেন্স মজুরি এবং রেশন দিয়েই পার পেয়ে যেতে থাকে তারা। ঔপনিবেশিক যুগের পুরোটা জুড়ে কাঠ কোম্পানিগুলোর হয়েও একই ধরনের সেবা দিয়ে গেছে ফরাসি সরকার। গ্যাবন ও আইভোরি কোস্টের বিশাল অঞ্চল এসব কোম্পানিকে অর্পণ করা হয়েছিল।

পর্তুগিজ ও বেলজিয়ান উপনিবেশক সরকার ছিল এ ব্যাপারে সবচেয়ে নির্লজ্জ। তারা আফ্রিকানদের একাট্টা করে সরাসরি পুঁজিপতি ব্যক্তিদের অধীনে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিত। এসব কাজের পরিবেশ দাসপ্রথার চেয়ে কোনো দিক দিয়ে ভালো ছিল না। কঙ্গোতে বিগত শতকে রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের শাসনাধীনে পাশবিক ও ব্যাপক হারে জোরপূর্বক শ্রমের প্রথা চালু হয়। লিওপোল্ডের কর্মকর্তা ও পুলিশ বাহিনীর হাতে এত বেশি কঙ্গোলিজ নিহত ও পঙ্গু হয়ে যায় যে, স্বয়ং ইউরোপীয়রাও এতে আপত্তি জানাতে শুরু করে। লিওপোল্ড যখন ১৯০৮ সালে "কঙ্গো ফ্রি স্টেট"কে বেলজিয়ান সরকারের হাতে তুলে দেন, ততদিনে তিনি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। বেলজিয়ান সরকার কঙ্গোর ওপর শোষণের এই মাত্রা কিছুমাত্র কমায়নি।[৮]

দাসত্ব-সদৃশ শ্রম আদায় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাজে রেকর্ডের অধিকারী পর্তুগিজরা। তারাও বারেবারে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সমালোচনার শিকার হয়েছে। পর্তুগিজ উপনিবেশবাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। তারা শুধু নিজের নাগরিকদের জন্যই না, বরং পর্তুগিজ উপনিবেশের বাইরের পুঁজিপতিদের জন্যও জোরপূর্বক শ্রম সংগ্রহ করে দিত। অ্যাঙ্গোলান ও মোজাম্বিকানদের দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি করে দেওয়া হয়, যাতে তারা নগণ্য জীবিকার বিনিময়ে সেখানকার খনিতে কাজ করে। এই শ্রমিকদের বুঝে পাওয়ার বিনিময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পুঁজিপতিরা পর্তুগিজ সরকারকে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করে। (দক্ষিণ আফ্রিকাতে আফ্রিকানদের রপ্তানি করা

---

[৮] ১৮৮৫-১৯০৮ পর্যন্ত কঙ্গো ছিল বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৯০৮ সালে একে পার্লামেন্টের অধীনে এনে 'বেলজিয়ান উপনিবেশ' এর মর্যাদা (?) দেওয়া হয়। এই সময়কালে মহামারি-গণহত্যা-অপুষ্টিতে প্রায় ১ কোটি কঙ্গোলিজ নিহত হয়।

এখনো অব্যাহত আছে।)

ওপরের উদাহরণে পর্তুগিজ উপনিবেশকরা অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিদের সাথে সহযোগিতা করছিল, যাতে আফ্রিকান শ্রমের সর্বাধিক শোষণ নিশ্চিত করা যায়। পুরো ঔপনিবেশিক যুগ জুড়ে বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শক্তির মাঝে এহেন সহযোগিতার নজির যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় প্রতিযোগিতাও। সাধারণভাবে প্রত্যাশা এমন থাকত যে, ইউরোপীয় কোনো দেশের বুর্জোয়াদের স্বার্থ অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন হলে সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে। যত যা-ই হোক, আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল স্বজাতির একচেটিয়া অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা। তাই বেলজিয়ান সরকার আইন করে দেয় যে, কঙ্গোতে ও কঙ্গো থেকে সব পণ্য আসা-যাওয়া করবে মূলত বেলজিয়ান পরিবহন পথ ধরে। আর ফরাসি সরকার বিদেশি জাহাজে করে ফ্রান্সে আনীত চীনাবাদামের ওপর মোটা অঙ্কের কর আরোপ করে। এর মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবে নিশ্চিত করল, যাতে ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকার চীনাবাদাম ফরাসি জাহাজে করেই রপ্তানি করা হয়। এক দিক দিয়ে এর অর্থ হলো, আফ্রিকান রক্ত এক হুলের বদলে আরেক হুল দিয়ে চুষে নেওয়া। কিন্তু এর সাথে সাথে শোষণের সর্বমোট পরিমাণও বেড়ে গেছে। কারণ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ যদি এখানে প্রতিযোগিতা করতে পারত, তাহলে তারা নিজেদের সেবার মূল্য কমিয়ে দিত এবং কৃষিজ উৎপাদের জন্য অধিকতর মূল্য পরিশোধ করত।

ইউরোপীয়দের সাথে একচ্ছত্র ব্যবসায় আফ্রিকানরা সবচেয়ে বড় মার খেত, যদি ইউরোপীয় দেশটি পশ্চাৎপদ হয়ে থাকে। পর্তুগিজ উপনিবেশের আফ্রিকান কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের জন্য দাম পেত আরও কম। আর আমদানিকৃত পণ্যের জন্য টাকা দিত বেশি। আবার যেই ব্রিটেন আফ্রিকার অন্যতম বৃহৎ উপনিবেশক, সেই তারাও জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ও জাপানের মতো বাঘা বাঘা পুঁজিবাদীদের সাথে প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিরা তাদের সরকারের সাথে দেনদরবার করতে থাকে, যেন প্রতিযোগিতার পথ আটকে দেওয়া হয়। যেমন, ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব আফ্রিকায় ২.৫ কোটি গজ জাপানি কাপড় রপ্তানি করা হয়। সেই পরিমাণটি ১৯৩৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৩ কোটি গজ। ফলে ব্রিটিশ বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টান রুনসিম্যান সংসদে আবেদন জানান, যেন আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রবেশকারী সব জাপানি পণ্যের ওপর মোটা অঙ্কের ট্যারিফ আরোপ করা হয়। তার মানে দরকারি একটি পণ্যের আমদানির জন্য এবার আফ্রিকানদের আরও বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হবে, কারণ

ব্রিটিশ কাপড় আরও ব্যয়বহুল। আফ্রিকান কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তারা এর মাধ্যমে নিজেদের শ্রমের ফল থেকে আরও বেশি বঞ্চিত হয়ে পড়ল।

ঔপনিবেশিক সরকার এবং তাদের বুর্জোয়া নাগরিকদের মাঝে স্বার্থের মিল কত বেশি, তার একটি উদাহরণ হলো আফ্রিকার প্রোডিউস মার্কেটিং বোর্ডসের আচরণ। এই বোর্ডসের উদ্ভব ১৯৩৭ সালে গোল্ড কোস্টের "কোকোয়া ধর্মঘট"-এর হাত ধরে। ওই সময়ে কোকোয়া-চাষীরা দাম বাড়ানোর দাবিতে কয়েক মাস যাবৎ ফসল বিক্রি করা বন্ধ রাখে। এই "ধর্মঘট"-এর আপাত ইতিবাচক একটি ফল এই যে, ব্রিটিশ সরকার একটি মার্কেটিং বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইউএসি বা ক্যাডবারির মতো বড় বড় ব্যবসায়িক কোম্পানির বদলে এই বোর্ডই এখন থেকে কৃষকদের থেকে কোকোয়া কিনবে। তার আগ পর্যন্ত ওই কোম্পানিগুলোই ছিল ক্রেতা। একটি ওয়েস্ট আফ্রিকান কোকোয়া কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হয় ১৯৩৮ সালে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই বোর্ডের আড়ালে মূলত তাদের বেসরকারি পুঁজিপতিদের হাতেই মূল দায়িত্ব তুলে দেয়। তাই তাদের অঢেল মুনাফা হাসিলের ধারায় কোনো ছেদ পড়েনি এর ফলে।

কাগজে-কলমে এই মার্কেটিং বোর্ডের দায়িত্ব হলো কৃষককে তার ফসলের বিনিময়ে ন্যায্য মূল্য প্রদান করা। বোর্ড এই ফসল বিদেশে বিক্রি করে এবং উদ্বৃত্ত একটি অংশ রেখে দেয়। এই উদ্বৃত্ত কৃষির উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। আবার বিশ্ববাজারে দাম কমে গেলে এখান থেকেই কৃষকদের প্রদান করা হবে একটি স্থিতিশীল মূল্য। কিন্তু বাস্তবে এই বোর্ড খুবই কম একটি নির্ধারিত দাম পরিশোধ করতে থাকে কৃষকদের। অথচ বহু বছর যাবৎ বিশ্ববাজারে ফসলের দাম বেড়েই চলছিল। আফ্রিকানরা এর কোনো উপকারই পায়নি। বরং লাভবান হয়েছে স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার এবং তার বেসরকারি কোম্পানিগুলো। ফসল কেনা-বেচায় মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে এসকল কোম্পানিকেই ব্যবহার করা হতো। ইউএসি ও জন হোল্টের মতো বড় কোম্পানিগুলোকে বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোটা প্রদান করা হয়। যেহেতু তারা সরকারেরই প্রতিনিধি, সেহেতু সরাসরি আক্রমণেরও ভয় নেই এবং মুনাফাও নিশ্চিত।

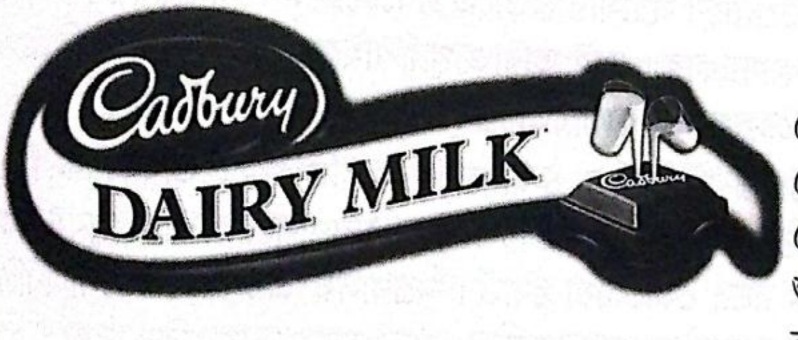
মার্কেটিং বোর্ডের ধারণাটি উচ্চ পর্যায়ের ব্রিটিশ নীতিনির্ধারক মহলে সমর্থন লাভ করে। কারণ ঠিক ওই সময়েই শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। ব্রিটিশ সরকার তাই উপনিবেশের কিছু উৎপাদ সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংরক্ষণ করে রাখতে মরিয়া। কারণ যুদ্ধের সময়ে বাণিজ্যিক কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জাহাজ পাওয়া যাবে না। বেসরকারি পুঁজিপতিদের নিরাপত্তা দিতেও

সরকার উদগ্রীব, কারণ যুদ্ধের ডামাডোলে তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হবে। যেমন, পূর্ব আফ্রিকার সিসাল গাছ হঠাৎ করেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্রিটেন ও তার মিত্রদের কাছে। কারণ ফিলিপাইনস ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ থেকে অনুরূপ শক্ত তন্তু জাতীয় পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে জাপান। সত্যি বলতে, যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই ব্রিটিশ সরকার থরে বিথরে সিসাল গাছের জোগান নিয়ে আসতে থাকে। এতে করে পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থানরত অনাফ্রিকান ক্ষেত-মালিকদের সাহায্য করা যাবে। এই মালিকেরা জার্মানি-সহ ইউরোপের অন্যান্য অংশে বাজার হারিয়ে বসেছে। একইভাবে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বোর্ডের মাধ্যমে তেলের বীজ (যেমন পাম ও চীনাবাদাম) আনানো হতে থাকে, যাতে করে মাখন ও সামুদ্রিক তেলের আসন্ন সংকট মোকাবিলা করা যায়।

কৃষকদের উৎপাদিত সকল অর্থকরী ফসল বিশ্ববাজারের চেয়ে কম মূল্যে কিনে নিত প্রোডিউস মার্কেটিং বোর্ড। যেমন, ১৯৪৬ সালে ওয়েস্ট আফ্রিকান প্রোডিউস বোর্ড প্রতি পাউন্ড পাম তেলের বিনিময়ে নাইজেরিয়ানদের দিত সতেরো পাউন্ডের কিছু কম। কিন্তু খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ওই একই জিনিস তারা বিক্রি করত পঁচানব্বই পাউন্ডে। এই অঙ্ক বিশ্ববাজারের মূল্যের বেশি কাছাকাছি। বোর্ডস যখন চীনাবাদাম কেনে, তখন তার দাম থাকে টনপ্রতি পনেরো পাউন্ড, পরে বিক্রির সময় তা হয়ে যায় ১১০ পাউন্ড। তা ছাড়া, ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা বোর্ডের গচ্ছিত সম্পদের ওপর রপ্তানিশুল্ক আরোপ করত। এটা কৃষকদের ওপর এক পরোক্ষ কর। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, বহু কৃষক বোর্ডসের অধীনতা থেকে পালানোর চেষ্টা করে। সিয়েরা লিওনে ১৯৫২ সালে কফির দাম এতই কমে যায়, উৎপাদকরা তাদের ফসল চোরাচালানের মাধ্যমে নিয়ে যেত নিকটস্থ কোনো ফরাসি এলাকায়। প্রায় একই সময়ে নাইজেরিয়ার কৃষকরা পাম তেল থেকে পালিয়ে রাবার সংগ্রহ বা কাঠ কাটা শুরু করতে থাকে। এগুলো প্রোডিউস বোর্ডের এখতিয়ারের অধীন নয়।

সরকার সর্বদাই নির্দিষ্ট শ্রেণীর সেবক। এই ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলে সহজেই বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক সরকারগুলো কেন পুঁজিপতিদের সাথে হাত মিলিয়ে আফ্রিকার উদ্বৃত্ত সম্পদ ইউরোপে পাচার করে চলছিল। ধরে নিলাম, এই (মার্কসবাদী) অবস্থানটি সঠিক নয়। সরকার কোনো শ্রেণীর সেবক না। কিন্তু তারপরও ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা কীভাবে বড় বড় পুঁজিপতির অধীনস্থ কমিটি হিসেবে কাজ করে এসেছে, তার সুস্পষ্ট সব প্রমাণ অগ্রাহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। উপনিবেশের প্রশাসকরা কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি ও তাদের মালিকদের কথা মানতে বাধ্য। কিছু কোম্পানি-প্রতিনিধি তো এমনও

ছিল, যারা একই সাথে কয়েকটি উপনিবেশের ওপর প্রভাবশালী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত গোটা পশ্চিম আফ্রিকায় এরকম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি ছিলেন স্যার অ্যালফ্রেড জোনস। তিনি এল্ডার ডেম্পস্টার লাইনসের চেয়ারম্যান, ব্যাংক অব ওয়েস্ট আফ্রিকার চেয়ারম্যান, এবং ব্রিটিশ কটোন-গ্রোয়িং অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট। ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকায় ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে জনৈক মার্ক রুকার্টকে সন্তুষ্ট করার জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন ফরাসি প্রশাসক। রুকার্ট বেশ কয়েকটি ফরাসি বাণিজ্যিক কোম্পানির সাথে ভালোভাবে জড়িত। পুরো ইতিহাস-জুড়ে প্রতিটি উপনিবেশের ক্ষেত্রে এরকম উদাহরণ তুলে ধরা সম্ভব। অবশ্য কিছু কিছু উপনিবেশে নির্দিষ্ট মেট্রোপলিটন ব্যবসায়ীর চেয়ে বরং শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের প্রভাব ছিল বেশি।



ইউরোপে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা যে পার্লামেন্টে শুধু দেনদরবারই করত, তা না। বরং প্রশাসনটাই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত কোকোয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান আর কেউ নন, স্বয়ং জন ক্যাডবারি। এই ভদ্রলোক ক্যাডবারি ব্রাদার্সের একজন পরিচালক, পশ্চিম আফ্রিকার কোকোয়া চাষীদের শোষণের জন্য নির্মিত "পুল"-এর একজন অংশীদার। ইউনিলিভারের সাবেক চাকরিজীবীরা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তেল ও চর্বি বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে রাখে, সেইসাথে ইউনিলিভার থেকে চেক পাওয়াও অব্যাহত থাকে তাদের! তেল ও চর্বি বিভাগ প্রোডিউস বোর্ডের কোটাগুলো হস্তান্তর করে দেয় অ্যাসোসিয়েশান অব ওয়েস্ট আফ্রিকান মার্চেন্টসের কাছে, যেটি ছিল ইউনিলিভারের অঙ্গসংস্থা ইউএসি'র কবজায়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিশিষ্ট লেবানিজ ব্যবসায়ীর কাছে একটি নির্দেশনা পাঠানো হয় যে, তাকে ইউএসি'র তৈরি করা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। এতে আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোম্পানিগুলো আফ্রিকায় দাম কমিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনমতো জোরপূর্বক শ্রম লাভের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা পেত। এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইউনিলিভার তখন সাবান, মার্জারিন, আর এরকম বিভিন্ন লাভজনক পণ্য বিক্রি করত

ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত এক বাজারে। এতেও একদমই অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

উপনিবেশের উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা অংশ যাতে সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসে, সেটাও নিশ্চিত করত মেট্রোপলিটন সরকারগুলো। পুঁজিবাদী উদ্যোগে তাদের সকলেরই কোনো না কোনোভাবে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা ছিল। বেলজিয়ান সরকার খনিজ উত্তোলনের বিনিয়োগকর্তা। অ্যাঙ্গোলান ডায়মন্ড কোম্পানির সাথে আংশিক মালিকানার বদৌলতে একইরকম আরেক বিনিয়োগকারী ছিল পর্তুগিজ সরকার। ফরাসি সরকার তো আর্থিক খাতের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য সারাক্ষণই উদগ্রীব। ঔপনিবেশিক ব্যাংকগুলো যখন বিপদে পড়ত, তখন ফরাসি সরকারের ওপর ভরসা রাখতে পারত তারা। তাদের শেয়ারের একটি অংশ আবার ফরাসি সরকারের হাতেও যায়। গতানুগতিক কোনো বাণিজ্যিক উদ্যোগে সরাসরি জড়াতে সবচেয়ে কম আগ্রহী ছিল সম্ভবত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার। সেই তারাও পূর্ব নাইজেরিয়ার কয়লা খনিগুলো পরিচালনা করত—রেলপথের কথা তো বাদই দিলাম।

মার্কেটিং বোর্ডসের বদৌলতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাৎক্ষণিক কিছু নগদ অর্থ হাতে পেত। দেখা যায়, ব্রিটিশ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে খুবই কম দামে জিনিস বিক্রি করে কোকোয়া বোর্ড। মন্ত্রণালয় এরপর সেগুলো বিক্রি করে ব্রিটিশ পণ্য-প্রস্তুতকারকদের কাছে। এতে করে তারা কিছু বছরে ১১ মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত মুনাফা হাসিল করেছে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও বোর্ড জিনিস বিক্রি করে। এই দেশটি তখনকার বৃহত্তম বাজার এবং সেখানকার দাম ছিল বেশ চড়া। এসব মুনাফার কোনোকিছুই আফ্রিকান চাষীর হাতে যেত না, বরং এগুলো আমেরিকান ডলারে ব্রিটিশদেরই বৈদেশিক লেনদেন।

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৩ সাল থেকে “বিপরীত ঋণ-ইজারা” সম্পর্ক শুরু করে। অর্থাৎ, যুদ্ধকালে ব্রিটেনকে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ঋণ দিয়েছিল, তার আংশিক শোধ করা হয় ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কাঁচামাল প্রেরণ করার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে মালয়ের টিন ও রাবার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আফ্রিকা ছিল খনিজ ও কৃষিজ নির্বিশেষে নানান রকম উৎপাদের বিশাল জোগানদাতা। টিন ও রাবারের পর ডলার-উপার্জনের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে কোকোয়া। ঊনিশশ সাতচল্লিশ সালে ব্রিটিশদের ডলার-ভাণ্ডারে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ নিয়ে আসে পশ্চিম আফ্রিকার কোকোয়া। তা ছাড়া, হীরার প্রায় একচেটিয়া উৎপাদক হওয়ার কারণে (দক্ষিণ) আফ্রিকা

সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে ডলার কামাই করে ব্রিটেন। ডি বিয়ার্স কনসলিডেটেড মাইনসের একজন পরিচালক ছিলেন হ্যারি এফ. অপেনহাইমার। তিনি ১৯৪৬ সালে তার সহ-পরিচালকদের বলেন, "যুদ্ধের সময়ে হীরক রত্ন বিক্রি করার ফলে গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।"

এই মুদ্রাগত ব্যাপারটির কারণেই ঔপনিবেশিক সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যায়, যাতে করে আফ্রিকার সম্পদ নিয়ে জমা করা যায় মেট্রোপলিটন রাষ্ট্রের কোষাগারে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলে প্রথম প্রথম কয়েন ও নোট প্রণীত করা হতো বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে। এরপর এই দায়িত্বটি নিয়ে নেয় ওয়েস্ট আফ্রিকান কারেন্সি বোর্ড এবং ইস্ট আফ্রিকান কারেন্সি বোর্ড। এগুলো যথাক্রমে ১৯১২ ও ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। উপনিবেশ অঞ্চলে এই বোর্ডগুলোর প্রণীত মুদ্রাকে সহযোগিতা করত "স্টার্লিং রিজার্ভ", যা হলো আফ্রিকার উপার্জিত অর্থ। বিষয়টা কীভাবে কাজ করত, তা ব্যাখ্যা করছি। একটা উপনিবেশ যখন (প্রধানত) রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, ওই আয়গুলো ব্রিটেনে ধরে রাখা হতো পাউন্ড স্টার্লিং আকারে। সমমানের স্থানীয় পূর্ব বা পশ্চিম আফ্রিকান মুদ্রা প্রণয়ন করে ছড়িয়ে দেওয়া হতো সংশ্লিষ্ট উপনিবেশে। গচ্ছিত ওই স্টার্লিং বিনিয়োগ করা হয় ব্রিটিশ সরকারি পুঁজিবাজারে। এর মাধ্যমে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করে ব্রিটেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মেট্রোপলিটন সরকারের সাথে ও কারেন্সি বোর্ডদ্বয়ের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে, যাতে প্রক্রিয়াটি ঠিকঠাকমতো চলে। সকলে মিলে তারা গড়ে তোলে এক জটিল অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক। আফ্রিকাকে জবাই দিয়ে ইউরোপকে পুষ্ট করার উদ্দেশ্য দারুণভাবে বাস্তবায়িত হতে থাকে এর ফলে।

স্টার্লিং রিজার্ভে কোনো উপনিবেশ যে অবদানই রাখে, সেটাই ব্রিটিশ কোষাগারের প্রতি এক নজরানার মতো। উপনিবেশের নিজের কোনো উপকার নেই এতে। সিয়েরা লিওনের মতো ছোট একটি উপনিবেশের স্টার্লিং রিজার্ভ ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে ৬ কোটি পাউন্ডে গিয়ে ঠেকে। আর ১৯৫৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ছিল ২১ কোটি পাউন্ড, যা গোল্ড কোস্ট থেকে প্রাপ্ত কোকোয়া ও খনিজ বিক্রি করার ফল। মিশর আর সুদানও ছিল ব্রিটেন কোষাগারের বড় জোগানদাতা। ব্রিটেনের স্টার্লিং সঞ্চয়ে আফ্রিকার মোট অবদান ১৯৪৫ সালে ছিল ৪৪.৬ কোটি পাউন্ড, যা ১৯৫৫ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪৪.৬ কোটি পাউন্ড—মানে ব্রিটেন আর কমনওয়েলথের সর্বমোট সোনা ও ডলার সঞ্চয়ের অর্ধেকেরও বেশি। ওই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২১২ কোটি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতিনির্ধারকদের মাঝে প্রথম সারিতে

ছিলেন আর্থার ক্রিচ-জোন্স এবং অলিভার লিটলটনের মতো ব্যক্তিরা। তারা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে ব্রিটেন টিকেই ছিল উপনিবেশের উপার্জিত ডলারের ওপর।

উপনিবেশ থেকে নজরানা আদায়ের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকে ছাড়িয়ে যায় বেলজিয়ান সরকার। বিশেষত সর্বশেষ যুদ্ধটি চলাকালীন ও তার পরে। জার্মানরা বেলজিয়াম দখল করে নেওয়ার পর লন্ডনে এক প্রবাসী সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই প্রবাসী সরকারের ঔপনিবেশিক সচিব রাবার্ট গডিং স্বীকার করেন :

যুদ্ধের সময় কঙ্গো লন্ডনে-অবস্থানরত বেলজিয়ান সরকারের সকল ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ছিল। কূটনৈতিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে ইউরোপ ও আফ্রিকায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর খরচ, সব মিলিয়ে যা ৪ কোটি পাউন্ড মতো হবে। সত্যি বলতে কী, কঙ্গোর সম্পদের কারণেই লন্ডনের বেলজিয়ান সরকারকে একটা শিলিং বা ডলারও ধার করা লাগেনি। বেলজিয়ান স্বর্ণের রিজার্ভ তাই অক্ষত রয়ে যায়।

কঙ্গোর কিছু আয় ছিল বেলজিয়ান ফ্র্যাঙ্কে, এবং কিছু আয় অন্যান্য মুদ্রায়। যুদ্ধের সময় থেকে এই দ্বিতীয় প্রকারের পুরো আয় জমা হয় ন্যাশনাল ব্যাংক অব বেলজিয়ামে। তাই বেসরকারি পুঁজিপতিরা কঙ্গো থেকে যা লুটেছে, তার কথা তো বাদই। স্বয়ং বেলজিয়ান সরকারই ফি বছর লক্ষ লক্ষ ফ্র্যাঙ্কের টুংটাং শুনে কান জুড়াতে পেরেছে।

ব্রিটিশ ও বেলজিয়ান উপনিবেশায়ন সম্পর্কে যা কিছু বলা হলো, ফরাসিদের আলোচনা করলে ওই একই কথারই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। গিনি ছিল কথিত "গরিব" এক উপনিবেশ। কিন্তু ১৯৫২ সালে এটি ফ্রান্সকে একশ কোটি (পুরাতন) ফ্যাঙ্ক আয় করে দেয়, যা ৫৬ লক্ষ ডলারের সমান। এই আয়ের ভিত্তি ছিল বক্সাইট, কফি, ও কলা বিক্রি। অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তির চেয়ে ফরাসি অর্থনৈতিক কৌশলগুলো একটু আলাদা ছিল। ফ্রান্স পৃথক কারেন্সি বোর্ড প্রতিষ্ঠা না করে বরং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ব্যবহার করত আরও বেশি। সামরিক উদ্দেশ্যে শুল্ক আরোপ করে আফ্রিকানদেরকেও আরও বেশি মাত্রায় চিপেছে ফ্রান্স। ফরাসি সরকার আফ্রিকানদের গায়ে ফরাসি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম চাপিয়ে দিত। তারপর হরেক রকমের যুদ্ধে ব্যবহার করত তাদের। যেমন: অন্য আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনাম-সহ অন্যান্য উপনিবেশের বিরুদ্ধে, এবং ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে। এসকল আফ্রিকান "ফরাসি" সৈনিকদের মরতে পাঠানোর ব্যয়ভার বহন করতে হতো ঔপনিবেশিক বাজেট থেকে। কিন্তু তারা

কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে আফ্রিকান তহবিল থেকেই তাদের পেনশন দেওয়া হতো।

সারকথা, উপনিবেশায়নের ফলে আফ্রিকার ভেতরে শোষণের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যায়। পূর্বেকার গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক-জাতীয় আফ্রিকান সমাজের তুলনায় তা অনেক অনেক বেশি। একইসাথে, উদ্বৃত্ত সম্পদও ব্যাপক হারে রপ্তানি হয়ে যেতে থাকে বিদেশে। কারণ এটাই উপনিবেশায়নের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য।

পুঁজিবাদের প্রযুক্তিগত ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি

উপনিবেশবাদের ফলে ইউরোপের অন্যান্য উপকার : প্রাথমিক পর্যালোচনা

এখনো কিছু বুর্জোয়া মুখপাত্র দাবি করে যে, ইউরোপ অর্থনৈতিক কোনো উপকারের জন্য উপনিবেশবাদের সূচনা ঘটায়নি। ঠিক যেভাবে দাবি করা হয়, দাসব্যবসা নাকি ইউরোপের জন্য লাভজনক ছিল না। এহেন দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি খণ্ডন করতে যাওয়া মানে স্রেফ সময় নষ্ট। উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো আফ্রিকা থেকে কী পরিমাণ আর্থিক ফায়দা হাসিল করেছে, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ইউরোপের পুঁজিবাদে আফ্রিকার যে অবদান, তা শুধু অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ না। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। সাম্রাজ্যবাদের মেট্রোপলিটন অংশগুলোতে তড়িৎ গতিতে প্রযুক্তি ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটতে থাকে এই উপনিবেশবাদের কল্যাণেই। সার্বিকভাবে পুঁজিবাদী বিভিন্ন সংস্থার এবং সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক সাংগঠনিক কৌশলও উন্নত হয়ে ওঠে একই কারণে। উপনিবেশবাদ আসলেই পুঁজিবাদের হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেই পশ্চিম ইউরোপ পুঁজিবাদের আঁতুড়ঘর, সেখানে তার জীবন আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগের শুরুতেই ইউরোপের ভেতরে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে খুব দৃঢ়ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়ে আসছিল। স্বয়ং এই অবস্থাটিও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলাফল, যা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন এক যুগে প্রবেশ করছিল ইউরোপ। বিদ্যুৎ, লোহা ও অন্যান্য ধাতুর কারিগরি, এবং কৃত্রিম রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার বেড়েই চলেছিল সে সময়ে। ঔপনিবেশিক যুগে সেগুলোর গতি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বৈদ্যুতিক

যন্ত্রপাতির গুণগত উন্নতি সাধিত হয়। যন্ত্রপাতির আকার ছোট হয়ে আসে, দূর-যোগাযোগে অভাবনীয় গতি আসে, এবং কম্পিউটার জন্মলাভ করে। রাসায়নিক কারখানায় তৈরি হচ্ছিল প্রাকৃতিক কাঁচামালের প্রচুর বিকল্প। জ্বালানি জাতীয় রাসায়নিকের পুরো নতুন একটি শাখার আবির্ভাব ঘটে। ধাতবশিল্পে নানারকম ধাতুর সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন যৌগের উদ্ভাবন ঘটানো হয়। তার মানে উৎপাদিত পণ্যগুলো এখন হবে আরও বেশি তাপনিরোধী, হালকা, ও আঘাত-সহ্যকারী। ঔপনিবেশিক যুগের শেষে (ধরুন ১৯৬০ সালে) ইউরোপ আরও একটি নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে—পারমাণবিক শক্তির যুগ।

ঔপনিবেশিক যুগে মেট্রোপোল এবং উপনিবেশগুলোর মাঝে শক্তির ব্যবধান পনেরো থেকে বিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যাপারটা মোটামুটি সর্বজনবিদিত। অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে এখানে বেশি অবদান রেখেছে মেট্রোপোলগুলোর বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের অগ্রগতি। এর কারণেই আফ্রিকা ও পশ্চিম ইউরোপের উৎপাদনশীলতার মাঝে তৈরি হয়েছে এত বিশাল পার্থক্য। তাই মেট্রোপোলসমূহে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পেছনে উপনিবেশবাদের ভূমিকা কতটুকু, তা বোঝা জরুরি। এই অগ্রগতিকেই পরে শিল্পখাতে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের উপনিবেশায়নের কারণেই ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতি করেছে—এরকম দাবি অত্যন্ত শিশুসুলভ। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সংস্কারের প্রবণতা স্বয়ং পুঁজিবাদেরই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। মুনাফার প্রতি তাড়নার কারণেই পুঁজিবাদ এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু আফ্রিকার উপনিবেশায়নের ফলে একটার পর একটা ঘটনা এমনভাবে সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের মাঝে আমূল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আসে। ঘটনাগুলোর মাঝে একটা শৃঙ্খলা তৈরি করে দিয়েছে উপনিবেশবাদ। ওই শৃঙ্খলাটা না থাকলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ এত বেশি পণ্য ও সেবা উৎপাদিত করতে পারত না, যেটা তারা ১৯৬০ সালে করে দেখিয়েছে। আরেকভাবে বললে, উন্নত ও অনুন্নত দেশকে বিচার করার মাপকাঠিই আলাদা হয়ে যেত তখন।

আফ্রিকান উপনিবেশবাদ থেকে আগত মুনাফা অন্যান্য খাত থেকে আগত মুনাফার সাথে মিলিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অর্থায়নের উৎস হিসেবে কাজ করে এগুলো। বর্তমান শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সমাজের ধনসম্পদ বেড়ে যাওয়ার ফলেই তারা এরকম টাকা ও অবসরের অধিকারী হয়েছে, যেটাকে গবেষণার পেছনে কাজে লাগানো যায়। আবার, সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদের

বিকাশের ফলেই পুঁজিবাদী মেট্রোপোলগুলোর অভ্যন্তরে শ্রমের বিভাজন আরও বাড়তে থাকে। এরই হাত ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা একসময় আলাদা একটি শ্রমবিভাগে পরিণত হয়। এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগও বটে। এর আগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা জিনিসটা ছিল স্রেফ একটা অতিরিক্ত সংযোজন। নির্দিষ্ট একটা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিগত বা এমনকি খামখেয়ালি কোনো উদ্যোগ।

ইউরোপীয় সমাজ ওই জায়গাটা থেকে সরে আসে। সরকার, সেনাবাহিনী, ও বেসরকারি পুঁজিপতিরা গবেষণাকে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত করে। অর্থায়ন ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয় একে। অর্থায়নের উৎস কী হবে এবং গবেষণা কোন পথে এগুবে, তার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব খাটিয়েছে উপনিবেশবাদ। প্রথমত, একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আফ্রিকা থেকে ইউরোপের আদায়-করা মুনাফাগুলো হলো পুনরায় বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সম্পদ। মুনাফাই এখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য না, বরং পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যম মাত্র। তাই পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকান কারেন্সি বোর্ডগুলো ব্রিটেনের সরকারি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে থাকে। সরকারি বন্ড, মর্টগেজ, ও শিল্পখাতের শেয়ারে বিনিয়োগ করতে থাকে ব্যাংক ও বীমা সংস্থাগুলো। বিনিয়োগের জন্য এত সম্পদ আদায় করা হয়েছে উপনিবেশগুলো থেকে। তারপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মেট্রোপোলের নানা খাতে। এর ফলে এমনসব শিল্পখাতও উপকৃত হয়েছে, যেগুলো উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত পণ্যের সাথে কোনোভাবেই জড়িত না।

তবে কিছু শিল্পখাত তো অবশ্যই উপনিবেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রভাব ভালোভাবে বোঝা যাবে এদেরকে দিয়ে। এসব শিল্পখাতকে এমনসব কলাকৌশল আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক কাঁচামালসমূহ সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন ধরুন তালের শাঁস পেষার যন্ত্র, কম গন্ধবিশিষ্ট কফির দানাকে দ্রবণীয় পাউডারে পরিণত করার কৌশল ("ইন্সট্যান্ট কফি") ইত্যাদি। বণিক ও শিল্পপতিরা ঔপনিবেশিক কাঁচামালকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি নিয়েও ভাবনাচিন্তা করে। তাহলে ইউরোপীয় কল-কারখানায় ঠিক যেসব গুণগত ও পরিমাণগত চাহিদা রয়েছে, সেগুলো মেটানো যাবে। যেমন, জাভাতে ওলন্দাজরা এবং লাইবেরিয়াতে আমেরিকানরা খুব যত্ন নিয়ে নতুন জাতের রাবার গাছ উৎপাদন করে। এগুলোর ফলন এবং রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা বেশি। উন্নততর কাঁচামাল খোঁজ করতে করতেই একসময় আরেকটি জিনিসের চাহিদা শুরু হয়। আর সেটা হলো এমনসব

কাঁচামালের উৎস, যেগুলো পেয়ে গেলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ আর সেভাবে উপনিবেশের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। এর ফলে জন্ম নেয় সিন্থেটিক্স।

জাহাজ-পরিবহন প্রসঙ্গে আসা যাক। মেট্রোপোলের সাথে উপনিবেশের সংযোগ ঘটানোর জন্য প্রচুর মাত্রায় ব্যবহার করা হতো জাহাজ। কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবন যে এই ব্যাপারটার সাথে সম্পর্কিত, তা সহজেই ধরতে পারা যায়। পচনশীল পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজকে হিমায়িত করে রাখা লাগত। পাম তেলের মতো ভারী বা তরল পণ্য পরিবহনের জন্য নির্মাণ করা লাগত বিশেষ ধরনের ধারক। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, ও বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য উদ্ভাবিত হয় তেলের ট্যাংকার—একদমই নতুন শ্রেণীর এক জাহাজ। জাহাজের আকৃতি ও তাদের পরিবাহিত পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযোজিত হতে থাকে মেট্রোপোলের বন্দরগুলোতে।

ইউরোপীয় প্রযুক্তির কিছু খাতের সাথে উপনিবেশবাদের সম্পর্ক বেশ দূরবর্তী বা একদম নেই বললেই চলে। কিন্তু সেগুলোর ওপরও উপনিবেশবাদের প্রভাব রয়েছে। বিজ্ঞান যখন তার ডালপালা মেলতে শুরু করে, তখন এর বিভিন্ন শাখার মাঝে গড়ে ওঠে অসংখ্য জটিল আন্তঃসম্পর্ক। প্রত্যেকটা ধারণা ও উদ্ভাবনের রহস্য আলাদা আলাদা করে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদগণ একটা ব্যাপার স্বীকার করে যে, গোটা বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের বিকাশ ও জীবনে তার প্রয়োগ অনেকগুলো সামাজিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের ওই নির্দিষ্ট শাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না সেগুলো। সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সাথে সাথে মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে যেসব শক্তি সৃষ্টি হয়, সেগুলোর উৎস ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহ।

সাম্রাজ্যবাদের সামরিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করলে উল্লিখিত বিষয়গুলো একদম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদেই অস্ত্রবিজ্ঞান গতিশীল হয়ে ওঠে। এই সমাজটি কিন্তু সেই সামন্তবাদী যুগ থেকেই সমরাস্ত্রের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপ যে সামরিক ক্ষেত্রে কতটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার এক লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ও জাপানের মাঝে হাড্ডাহাড্ডি নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উপনিবেশ এবং বিনিয়োগক্ষেত্র নিয়ে প্রতিযোগিতার ফলে জন্ম নেয় ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিনের মতো নৌযান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা হয়ে ওঠে সমরবিদ্যা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক

শোষণের মাধ্যমে যে মুনাফা হাসিল করেছে, তা দিয়ে বিজ্ঞানের এই শাখাকে তারা পরিপুষ্ট করে তুলতে থাকে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপের সাংগঠনিক কলাকৌশল উন্নয়নে আফ্রিকা অনেক ভূমিকা রাখে। সেগুলোর মাঝে অন্যতম হলো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শক্তিশালী করে তোলা। সর্ব-আফ্রিকানবাদী দুসে মুহাম্মদ আলি এবং ডাব্লিও.ই.বি. দু বোই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই উপলব্ধি করেন যে, সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের মূল হোতা একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। এই বিষয়টির সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিখ্যাত বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন বিপ্লবী রাশিয়ান নেতা লেনিন। লেনিনের এই কথাগুলো প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মতো ফলে যায়। ঔপনিবেশিক যুগ যতই সামনে এগোয়, ততই দেখা যায় একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরাই এ থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে। বিশেষ করে অর্থায়নের সাথে জড়িত পুঁজিপতিরা।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রথমে ছোট ছোট অনেকগুলো কোম্পানির মাঝে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা হতো। একসময় পুরো ক্ষেত্রটার ওপর ছড়ি ঘোরাতে থাকে মুষ্টিমেয় কিছু বড় কোম্পানি। এই পরিবর্তনটা যেভাবে হলো, তাতে অবদান রেখেছে আফ্রিকা (এবং সেইসাথে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা)। জাহাজ-পরিবহন কোম্পানিগুলো ১৮৭৫ সালে তাদের "কনফারেন্স লাইন্স" প্রথমবারের মতো শুরু করে ভারতীয় বাণিজ্যপথে। এই একচেটিয়া চর্চা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায়। বর্তমান শতকের শুরুর দিকে পশ্চিম আফ্রিকায় ব্যাপারটা একদম তুঙ্গে উঠে যায়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুলিং ও বাজার-ভাগাভাগির সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা এই পশ্চিম আফ্রিকা থেকেই হাসিল করেছিল ফরাসি ও ব্রিটিশরা। এভাবেই ঔপনিবেশিক যুগের শুরু থেকে ছোট ছোট কোম্পানিগুলোকে গিলতে থাকে বড় বড় রুই-কাতলারা।

পারস্পরিক সংযুক্ত ডিরেক্টোরেট, হোল্ডিং কোম্পানি, এবং দৈত্যাকার সব কর্পোরেশান গড়ে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকায়। একদম নিখুঁত পরিকল্পনা সহকারেই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। এসব কোম্পানি দুই দিক দিয়ে বহুজাতিক। প্রথমত, এগুলোর পুঁজির মালিকেরা বিভিন্ন দেশের। দ্বিতীয়ত, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত। এটা ঠিক যে, অপেনহাইমারের মতো ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্যোক্তাদের কপাল খুলেছে এই দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেই। চলমান শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবসাগুলো ছিল ব্যক্তি ও পরিবার-কেন্দ্রিক। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা আসলে ওই যুগটার মূল নাট্যমঞ্চ ছিল না। সেখানকার খনিজ উত্তোলনকারী বড় বড় কোম্পানিগুলো ব্যক্তিগত

মালিকানার নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, উৎপাদন, প্রচারণা, ও বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সংগঠিত হতো এগুলো। আর এরা দীর্ঘমেয়াদে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম। সম্প্রসারণ ও আধিপত্যের প্রতি পুঁজিবাদের যে তাড়না, সর্বকালেই তার উৎস ছিল পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদনশীল শক্তি। সম্প্রসারিত হতো সামগ্রিক ব্যবস্থাটা; কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি না। তবে এটাও ঠিক যে, পুঁজিবাদী কাঠামোতে চালকের আসনে ছিল ব্যক্তি মানুষেরাই। আফ্রিকা এবং বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ব্যাপারটি সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্তী শতকেও কীভাবে সম্পদকে শোষণ করা যায়, এ ব্যাপারে তারা সচেতনভাবে পরিকল্পনা করতে সক্ষম। আর কিয়ামত পর্যন্ত কীভাবে আফ্রিকার কালো মানুষদের ওপর প্রভুত্ব খাটানো যায়, সেই পরিকল্পনাও তারা জারি রাখে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নিয়ে বিশ্ববাণিজ্যের কৌশলগত নেতৃত্ব ইউরোপের হাতে। বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে পণ্যপরিবহনের আইনি ও সাংগঠনিক বিষয়গুলোও তারাই ঠিক করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের সাথে সাথে ইউরোপের ক্ষমতা বাড়ে। কারণ সাম্রাজ্যবাদ মানেই বিনিয়োগ। আর বিনিয়োগের মাধ্যমে (ঔপনিবেশিক শাসন থাকুক বা না-থাকুক) ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা প্রতিটি মহাদেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও উপকৃত হতে থাকে একই অনুপাতে। কারণ সার্বিকভাবে পুঁজিবাদের এবং বিশেষভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য যেসব কাঁচামাল একাট্টা করা প্রয়োজন, ইউরোপই সেগুলোর পরিমাণ ও মান নির্ধারিত করে দিতে সক্ষম। যেমন, চকোলেট তৈরির জন্য দরকার চিনি ও কোকোয়া।

তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিনি উৎপাদনের সাথে আফ্রিকার কোকোয়া উৎপাদনকে জুড়ে দেওয়া হয়। দুটি ধারা এক হয়ে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার চকোলেট শিল্পকে শক্তি জোগায়। একই ঘটনা ঘটে ধাতবশিল্পের ময়দানে। সুইডেন, ব্রাজিল, বা সিয়েরা লিওন থেকে আসে লোহার আকরিক। গোল্ড কোস্ট থেকে আসে ম্যাঙ্গানিজ কিংবা দক্ষিণ রোডেশিয়া থেকে ক্রোমিয়াম। লোহার সাথে এই ম্যাঙ্গানিজ বা ক্রোমিয়াম যুক্ত করে তৈরি করা হয় নানা জাতের ইস্পাত। ঔপনিবেশিক যুগের যত পুঁজিবাদী উৎপাদন-কর্মকাণ্ড রয়েছে, সবগুলো থেকে এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ তুলে আনা সম্ভব।

জন স্টুয়ার্ট মিল যেমনটি বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার বাণিজ্য ছিল শহর ও গ্রামের মধ্যকার বাণিজ্যের মতো। বর্তমান শতাব্দীতে এই সংযোগ আরও বেশি ঘনিষ্ঠ। শহর (ইউরোপ) যে গ্রামাঞ্চলের (আফ্রিকা, এশিয়া, ও লাতিন আমেরিকা) খেয়ে-পরে বেঁচে আছে,

তাও আরও বেশি স্পষ্ট। বলা হয়, উপনিবেশগুলোর জীবনের উদ্দেশ্য হলো মেট্রোপোলের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করা এবং তাদের থেকে তৈরি-পণ্য ক্রয় করা। এই কথা বলার মাধ্যমে আসলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেখানে পৃথিবীর সকল শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত। তার মানে, ওই সময়ের আগ পর্যন্ত প্রতিটি সমাজই উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার সদস্যদের আলাদা আলাদা কাজ ভাগ করে দিত—কেউ শিকার করত, কেউ পোশাক বানাত, কেউ ঘর নির্মাণ করত। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে পুঁজিবাদীরাই মোটাদাগে ঠিক করে দেয় যে, পৃথিবীতে শ্রমিকরা কী ধরনের কাজ করবে। আফ্রিকানরা মাটির নিচ থেকে খনিজ তুলে আনবে, কৃষিজ ফসল ফলাবে, প্রাকৃতিক উৎপাদ সংগ্রহ করবে, এবং সাইকেল মেরামতের মতো আরও কিছু ছোটখাটো কাজ করবে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ও জাপানের ভেতরে শ্রমিকরা খনিজ ও কাঁচামাল পরিশোধন করবে এবং সাইকেল তৈরি করবে।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর দক্ষতা যেন সর্বাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তা নিশ্চিত করেছে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন। আফ্রিকান মাটি চাষ করা ও এর নিচ থেকে খনিজ তুলে আনার জন্য দরকার শারীরিক সক্ষমতা। কিন্তু আকরিক থেকে ধাতু আহরণ এবং তা থেকে পণ্য তৈরি করার জন্য দরকার প্রযুক্তিগত দক্ষতা। সময় যত গড়ায়, প্রযুক্তি ও দক্ষতা ততই বাড়ে। যেমন, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কথাই ধরুন। আধুনিক ইস্পাত শিল্পের উৎস সিমেন্সের উন্মুক্ত-চুল্লী ব্যবস্থা এবং বেসিমার প্রক্রিয়া। এ দুটি পদ্ধতিই বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিদ্যমান। দুটি প্রক্রিয়াই বড়সড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ইস্পাত উৎপাদনের জন্য একসময় প্রয়োজন ছিল অবিরাম কর্মযজ্ঞ। আর এখন প্রয়োজন বড়সড় বৈদ্যুতিক চুল্লী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষ শ্রমিকদের সরিয়ে তাদের জায়গা দখল করেছে স্বয়ংক্রিয় ও কম্পিউটার-ভিত্তিক যন্ত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদের আগের বছরগুলোতে প্রযুক্তি ও দক্ষতায় যত উন্নতি হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেটা বহুগুণে বেড়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগে লোহার আকরিক আফ্রিকার প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল না। তাই উদাহরণটি অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, ও উত্তর আফ্রিকার অর্থনীতিতে লোহা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন যে প্রক্রিয়ায় মেট্রোপোলের প্রযুক্তি ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়েছে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য লোহাকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করাই যায়। তা ছাড়া, সংকর ইস্পাত বানাতে যেসব খনিজ প্রয়োজন, আফ্রিকা কিন্তু সেগুলোরও উৎস। বিশেষ করে ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমিয়ামের। বেসিমার

প্রক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ অত্যাবশ্যক। আফ্রিকার বেশ কিছু জায়গায় এটি খনন করা হয়। বিশ্বে ম্যাঙ্গানিজের বৃহত্তম উৎস গোল্ড কোস্টের নোমা খনি। আমেরিকান কোম্পানিগুলো গোল্ড কোস্টের ও উত্তর আফ্রিকার খনিসমূহের মালিক। যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত শিল্পে তারা এগুলো ব্যবহার করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার ক্রোমিয়ামও একইরকম ভূমিকা পালন করে ধাতু শিল্পে। এটি মরিচারোধী ইস্পাত উৎপাদনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

সংকর ইস্পাত তৈরির আরেকটি মূল্যবান আফ্রিকান খনিজ হলো কলাম্বাইট। অত্যন্ত তাপ-প্রতিরোধী হওয়ায় জেট ইঞ্জিনের ইস্পাত তৈরিতে এটি প্রধান উপাদান। প্রথম কথা হলো, ইউরোপীয় শিল্প ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ফলেই কলাম্বাইট এত মূল্যবান হয়ে ওঠে। অথচ ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত এটি ছিল নাইজেরিয়া থেকে উত্তোলিত টিনের একটি ফেলনা উপজাত। পরে যখন এর ব্যবহার শুরু হয়, ইউরোপীয় প্রযুক্তি তখন বিমানের ইঞ্জিনের মতো জটিল এক পরিমণ্ডলে আরও সামনে এগিয়ে যায়।

অবশ্য কলাম্বাইট নিয়ে কাজ করার জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন, তা হাতের নাগালে পেয়েছিল শুধু আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান, ব্রিটিশ ও ফরাসি শ্রমিকেরা। যে নাইজেরিয়ান শ্রমিকেরা মাটি খুঁড়ে এটা বের করে আনল, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন তাদের কোনো সুফল দিলো না। কয়েক বছর পর কলাম্বাইটের চাহিদা ধপ করে কমে যায়। কিন্তু যতদিন এর চাহিদা ছিল, এর মধ্যেই তা ইউরোপীয় ধাতুবিদ্যাকে আরও বেশি অভিজ্ঞ করে তুলেছে। কলাম্বাইট এভাবে স্বনির্ভর সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মাঝে যে ব্যবধান আগে থেকেই ছিল, সেটাকে প্রকট করে তোলে।

তামাও এই আলোচনার বেশ ভালো উদাহরণ। আকরিক রপ্তানি করার জন্য আফ্রিকানদের অদক্ষ শ্রমই যথেষ্ট। পরে সেটাকে পরিশোধিত করে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী কারখানা। আফ্রিকার রপ্তানিকৃত প্রধান খনিজ ছিল তামা। এটি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। তাই তা পুঁজিবাদী বিদ্যুৎ শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। জেনারেটর, মোটর, বৈদ্যুতিক যানবাহন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বাতি ও পাওয়ার লাইন, গাড়ি, দালান, গোলাবারুদ, বেতার, রেফ্রিজারেটর-সহ হরেক রকম জিনিসে তামা ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তির ইতিহাসে একেকটা যুগ তার শক্তির মূল উৎসের নামে পরিচিতি লাভ করে। আজকের যুগটাকে আমরা বলি পারমাণবিক যুগ। কারণ পারমাণবিক শক্তির অমিত সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমরা। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্পবিপ্লব হয়, সেই সময়টা তাপের যুগ নামে পরিচিত। একইভাবে, ঔপনিবেশিক যুগ ছিল

বিদ্যুতের যুগ। অতএব কঙ্গো, উত্তর রোডেশিয়া, এবং আফ্রিকার অন্যান্য অংশ থেকে রপ্তানিকৃত তামা ছিল ইউরোপের প্রাণশক্তি। এর প্রভাব গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিবাদী উন্নয়নে এর ভূমিকা হয়ে ওঠে অপরিমেয়।

কাঁচামালের আলোচনায় সামরিক খাতকে আরও এক বার বিশেষভাবে উল্লেখ করা চাই। গতানুগতিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে তো আফ্রিকান খনিজের চূড়ান্ত ভূমিকা ছিলই। আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনেও সেই ভূমিকা বহাল থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ইউরেনিয়াম পেতে শুরু করে বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে। প্রথম আণবিক বোমা নির্মাণের প্রধান উপাদান ছিল এটি। ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হতে হতে উপনিবেশক দেশগুলোতে শিল্পখাত আর যুদ্ধখাত এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, একটাতে অবদান রাখা মানে অন্যটাতেও অবদান রাখা। তাই প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল আফ্রিকার বিশাল অবদানগুলো বুঝি শুধু শান্তিপূর্ণ ক্ষেত্রেই কাজে লাগে। যেমন তামার তার বা ইস্পাতের সংকর তৈরি করা। কিন্তু শেষমেশ ওই অবদানই বিস্ফোরক দ্রব্য, বিমানবাহী রণতরী ইত্যাদিতে রূপ নেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র যখন নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এর পরই তাদের পক্ষে গোটা পৃথিবীকে উপনিবেশায়িত ও শাসন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। মেট্রোপোলগুলো যখন নানান রকমের বিধ্বংসী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত করে নেয়, তখন তার প্রভাব পড়ে দুইভাবে। একটা মনস্তাত্ত্বিক, আরেকটা ব্যবহারিক। ক্ষমতা ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে-চাওয়া উপনিবেশায়িত জনগণ এই দুই দিক দিয়েই দমে যায়। মনে রাখা ভালো, আফ্রিকাতে উপনিবেশায়নের প্রধান সহায়ক ছিল "গানবোট নীতি"। স্থানীয় পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী যখনই উপনিবেশে মেট্রোপলিটন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, ততবারই এই নীতি প্রয়োগ করা হতো।

ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের সামরিক শক্তি বেড়ে গেল। উপনিবেশায়িত মানুষদের জন্য তা দ্বিগুণ ক্ষতির কারণ। একদিকে মেট্রোপোল ও উপনিবেশের মাঝে সার্বিক প্রযুক্তিগত ব্যবধান বেড়ে গেল। আরেকদিকে ক্ষমতা ও স্বাধীনতার মতো সবচেয়ে সংবেদনশীল ক্ষেত্রটিতে সৃষ্টি হলো অমোচনীয় ব্যবধান। ঔপনিবেশিক যুগে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনের ফলে ইউরোপে কর্মসংস্থানও বেড়ে চলল। এর বাইরে আফ্রিকাতে লাখ লাখ শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী ও প্রবাসীর জীবিকার ব্যবস্থা তো হয়েছেই। কাঁচামালকে এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হতো, যার ফলে এগুলো থেকে বিভিন্ন উপজাতও সৃষ্টি হয়। ওইসব উপজাতকে ঘিরে গড়ে উঠত আলাদা শিল্পখাত। আফ্রিকা,

এশিয়া, ও লাতিন আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত খনিজ আকরিকের বদৌলতে অসংখ্য চাকরি সৃষ্টি হয় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে। ইস্পাত কারখানা, গাড়ির কারখানা, অ্যালুমিনা ও অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, এবং তামার তার কারখানায় যে পরিমাণ লোক নিয়োগ দেওয়া হতো, তা থেকেই এ ব্যাপারটা অনুমেয়। এগুলোর ফলে আবার উন্নত হয়ে ওঠে নির্মাণশিল্প, পরিবহন শিল্প, অস্ত্র শিল্প ইত্যাদি। আফ্রিকা থেকে খনিজ উত্তোলনের ফলে সেখানকার মাটি নরম হয়ে যায়, কৃষিকাজের ফলে জমি হয়ে যায় ঊষর। কিন্তু ইউরোপে কৃষিজ ও খনিজ আমদানির ফলে বিশাল বিশাল শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে।

মানবীয় সংগঠনের আদিতম পর্যায়ে উৎপাদন ছিল ছড়ানো-ছিটানো ও স্বল্পমাত্রার। অর্থাৎ, একেকটা পরিবার নিজ নিজ জীবিকার জন্য কাজ করার মাধ্যমে স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখত। কালক্রমে উৎপাদন আরও বেশি সামাজিক ও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। একটা পরিপক্ব সামন্তবাদী বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে এক জোড়া জুতো তৈরি করার সাথে অনেক মানুষ জড়িত। যথা : গবাদি পশুপালক, চামড়া-কারখানার শ্রমিক, এবং জুতা-সেলাইকারী। স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রে একজন শ্রমিক নিজেই পশু শিকার করে নিজের জুতো নিজেই বানাত। পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে একটা সমাজে এরকম সামাজিক নির্ভরশীলতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে, তা ওই সমাজের উন্নয়নের একটি সূচক। বিশেষ দক্ষতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে এরকম সামাজিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়।

নিঃসন্দেহে, ইউরোপীয় পুঁজিবাদের উৎপাদন-কর্মকাণ্ড ক্রমেই এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠেছে। এটি পুরো পৃথিবীকে সমন্বিত করে ফেলে। আর নিজের অর্থনীতিতে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে ব্যাংকিং পর্যন্ত প্রতিটি দিককে খুব নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে নেয়। এই কাজের এক প্রধান প্রণোদনা ছিল ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু বণ্টন আবার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। মানবশ্রমের ফল ভোগ করে নির্দিষ্ট এক সংখ্যালঘু শ্রেণী। আর তারা হলো শ্বেতাঙ্গ জাতি এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা। উন্নয়ন ও অনুন্নতির দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সারনির্যাস এটাই। ঔপনিবেশিক যুগে এভাবেই এর বিবর্তন ঘটতে থাকে।

আফ্রিকাকে শোষণের অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে ইউনিলিভার

ব্যাংক ও কারখানা কোম্পানিগুলো শোষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

এর ফলে কীভাবে আফ্রিকান উদ্বৃত্ত সম্পদ ইউরোপে চলে যায়, তা আমরা দেখেছি। একইভাবে, অর্থনীতির বাইরেও অন্যান্য উপায়ে ইউরোপের উপকার করেছে আফ্রিকা। এইসব একই কোম্পানির কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করলে এই ব্যাপারটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে একটিমাত্র কোম্পানির পর্যালোচনা তুলে ধরছি—ইউনিলিভার। আফ্রিকান সম্পদ ও জনগণকে শোষণ করার সাথে এদের বিকাশের সম্পর্ক কেমন, তা এখানে দেখানো হবে।

Unilever

আফ্রিকাকে ১৮৮৫ সালে যখন কনফারেন্স টেবিলে রেখে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হচ্ছিল, তখন জনৈক উইলিয়াম এইচ. লিভার ইংল্যান্ডের লিভারপুলের নিকটে মারসিসাইডে সাবান প্রস্তুত করছেন। তিনি এই সাবানের নাম দেন “সানলাইট”। যেই জলাভূমিতে তার কারখানা অবস্থিত ছিল, সেখানে গড়ে ওঠে পোর্ট সানলাইট শহর। দশ বছরের মাঝে লিভারের কোম্পানিটি শুধু ইংল্যান্ডেই বছরে ৪০,০০০ টন সাবান বিক্রি করতে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য স্থান, আমেরিকা, ও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে গড়ে তুলতে শুরু করে রপ্তানি-বাণিজ্য এবং কল-কারখানা। এরপর আসে লাইফবয়, লাক্স, ভিম। আরও দশ বছর পর ব্রিটেনে লিভারের বার্ষিক সাবান-বিক্রির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০,০০০ টন। এর পাশাপাশি ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ও বেলজিয়ামেও তাদের কারখানাগুলোয় চলছে উৎপাদন ও বিপণন। কিন্তু এই দেশগুলোর কোনোটাতেই সাবান গজাত না। এই জিনিস উৎপাদনের প্রধান উপাদান ছিল স্টিয়ারিন, যা তেল ও চর্বি থেকে আহরণ করতে হয়। পশুর চর্বি আর তিমির তেলের কথা বাদ দিলে কাঙ্ক্ষিত এই কাঁচামাল পুরোটাই আসে গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে। যথা তালের তেল, তালের শাঁসের তেল, চীনাবাদামের তেল, এবং নারিকেলের শুকনো শাঁস। কপালের ফেরে পৃথিবীর বৃহৎ পাম-উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিমা আফ্রিকা। চীনাবাদামেরও বিশাল উৎপাদক তারা।

অস্ট্রিয়ান কোম্পানি শিখৎ (যেটি পরে ইউনিলিভারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়) ১৮৮৭ সালে অস্ট্রিয়াতে প্রথম তালের শাঁস চূর্ণ করার কারখানা স্থাপিত করে।

তাদের তখন কাঁচামাল সরবরাহ করত লিভারপুলের তেল-ব্যবসায়ীদের একটি কোম্পানি। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। বরং আফ্রিকাকে ইউরোপের কাঁচামালের ভাণ্ডার হিসেবে খুলে দেওয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এটি। লিভার তার নিজস্ব "অভিযাত্রীদের" আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন ১৯০২ সালের মধ্যেই। তারা সিদ্ধান্তে আসে যে, পাম-জাতীয় উৎপাদ সংগ্রহের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হবে কঙ্গো। কারণ বেলজিয়ান সরকার অসংখ্য তালগাছ-বিশিষ্ট বিশাল জায়গা অর্পণ করে দিতে অত্যন্ত আগ্রহী। লিভার কঙ্গোতে প্রয়োজনীয় জমি অধিকার করেন এবং তালের শাঁস থেকে তেল আহরণ করার যন্ত্রপাতি সেখানে নিয়ে আসেন।

কিন্তু পাম-তেল রপ্তানি করা হয় কঙ্গোর উত্তর দিকে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো থেকে। তাই ১৯১০ সালে ডাব্লিও.বি. ম্যাকআইভারকে কিনে নেয় লিভার। এটি নাইজেরিয়ার একটি ছোট লিভারপুল কোম্পানি। এরপর সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়াতেও দুটি ছোট কোম্পানিকে কিনে নেওয়া হয়। এভাবে লিভার (তৎকালে লিভার ব্রাদার্স নামে পরিচিত) পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিটি উপনিবেশে আসন পেতে বসে। প্রথম বড় সংবাদটা আসে, যখন লিভার ১৯২০ সালে নাইজার কোম্পানিকে ৮০ লাখ পাউন্ডে কিনে নেয়। এরপর ১৯২৯ সালে লিভারের সর্বশেষ বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আফ্রিকান অ্যান্ড ইস্টার্নও হয়ে যায় তাদের অংশীদার। এর ফলে যে একীভূত কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে, তারই নাম ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানি (ইউএসি)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে লিভার মার্জারিন বানাতে শুরু করে। সাবানে যে কাঁচামাল দরকার, এটাতেও তা-ই; অর্থাৎ, তেল ও চর্বি। পরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপের এই কোম্পানিগুলো অন্যদের কিনে-নেওয়া ও একীভূত করার মাধ্যমে ক্রমেই বড় হতে থাকে। ইউরোপ মহাদেশে সাবান ও মার্জারিন প্রস্তুতকরণের সবচেয়ে বড় নামগুলো হল্যান্ডের দুটি কোম্পানি—জারগেন্স ও ফন ডার বার্গ, এবং অস্ট্রিয়ার দুটি কোম্পানি—শিখ্ৎ ও সেন্ট্রা। ওলন্দাজ কোম্পানিগুলো প্রথমে আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর ১৯২৯ সালে এই দুটি কোম্পানি ও লিভারের মাঝে মহাজোট গঠিত হয়। লিভার ততদিনে তার প্রায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিনে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। ১৯৩০ সালের এই একীভূতকরণের ফলে ইউনিলিভার হয়ে ওঠে একচেটিয়া কোম্পানি। কার্যক্রমের সুবিধার্থে একে ইউনিলিভার লিমিটেড (ব্রিটেনে নিবন্ধিত) এবং ইউনিলিভার এন.ভি. (হল্যান্ডে নিবন্ধিত)-তে ভাগ করা হয়।

তেল ও চর্বির বিশাল জোগানের জন্য ইউনিলিভার অনেকাংশে নির্ভর করত

তার অঙ্গসংগঠন ইউএসি'র ওপর, যা আগের বছর গঠিত হয়েছে। ইউএসি নিজেও অবিরাম বড় হতে থাকে। এটি ১৯৩৩ সালে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কোম্পানি জি.বি. অলিভ্যান্টকে গ্রাস করে নেয়। আর ১৯৩৬ সালে কিনে নেয় গোল্ড কোস্টের সুইস ট্রেডিং কোম্পানিকে। ততদিনে ইউএসি কেবল কঙ্গোর বন্য পামের ওপর নির্ভরশীল নেই, বরং গড়ে তুলেছে সুগঠিত ক্ষেত। যুক্তরাষ্ট্রে লিভারের কারখানাগুলো তাদের তেলের জোগান লাভ করত প্রধানত কঙ্গো থেকে। এমনকি ১৯২৫ সালে (ইউনিলিভার ও ইউএসি এই রূপে আবির্ভূত হওয়ারও আগে) বোস্টোনে লিভারের কর্মকাণ্ড থেকে মুনাফা আসে ২৫০,০০০ পাউন্ড।

যুদ্ধ ও শান্তি উভয়কালেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে ইউনিলিভার। শুধু পূর্ব ইউরোপেই সমাজতন্ত্রের উত্থানের কারণে জাতীয়করণের ফলে তারা কারখানাগুলো হারায়। কিন্তু এটা বাদ দিলে ঔপনিবেশিক যুগের শেষে ইউনিলিভার হয়ে ওঠে এক বিশ্বশক্তি। তাদের বিক্রিত পণ্যের মাঝে রয়েছে সাবান, ডিটার্জেন্ট, মার্জারিন, শূকরের চর্বি, ঘি, রান্নার তেল, ক্যানবদ্ধ খাবার, মোমবাতি, গ্লিসারিন, তেল কেক, এবং টুথপেস্টের মতো পরিচ্ছন্নতা উপাদান। এই দৈত্যাকার অক্টোপাস তার জীবিকা শুষত কোথা থেকে? লন্ডনের ইউনিলিভার হাউজের তথ্যবিভাগই সেই উত্তরটা দিক।

ইউনিলিভারের যুদ্ধ-পরবর্তী বিকাশের সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশটি হলো ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানির অগ্রগতি। মন্দা যখন চরম অবস্থায়, তখনো ইউনিলিভারের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ টাকা ঢালা থামায়নি। ইউএসি'র সম্ভাব্য অবস্থাকে তারা বিবেচনাতেই নেয়নি। বরং অন্ধের মতো আস্থা রেখেছে আফ্রিকার ভবিষ্যতের ওপর। যুদ্ধের পর এই প্রাথমিক উৎপাদক যেভাবে সমৃদ্ধ হয়, তাতেই নিজেদের পুরস্কার পেয়ে যায় ইউনিলিভার। আফ্রিকা তখন হিমায়িত মটরশুঁটি থেকে শুরু করে মোটরচালিত গাড়ি পর্যন্ত সব ধরনের পণ্যের বাজার। ইউনিলিভারের ভরকেন্দ্র ইউরোপে। কিন্তু এর বৃহত্তম সদস্য (ইউএসি) তার জীবিকার জন্য (তাদের এককালীন গৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০ কোটি পাউন্ড) প্রায় পুরোপুরিই নির্ভর করে পশ্চিম আফ্রিকার সুস্থতার ওপর।

কাঠখোট্টা হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় বললে, লিভারের আফ্রিকান উদ্যোগগুলো কিছু ক্ষেত্রে লোকসানের শিকার হয়েছে। কঙ্গোর ক্ষেতগুলো নিজের খরচ জুগিয়ে লাভজনক হয়ে উঠতে উঠতে সময় লেগেছে বেশ কয়েক বছর। নাইজার কোম্পানিকে যে ১৯২০ সালে কিনে নেওয়া হলো, আর্থিকভাবে সেটার ধকল সামাল দিতেও কিছুটা সময় লেগেছে। চাদের এসসিকেএন কখনোই

বলার মতো কোনো আর্থিক লাভ দেখাতে পারেনি। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ আর্থিক বছরগুলোতেও ইউএসি'র অঙ্গসংগঠনগুলো ছিল অমূল্য সব সম্পদ। ইউনিলিভারের উৎপাদন শাখা যাতে তাদের অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের উৎসের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে, সেটা নিশ্চিত করেছে এই অঙ্গসংস্থাগুলো। এটা ঠিক যে, ইউএসি নিজেও মোটা অঙ্কের আর্থিক শেয়ার জোগান দিত। কিন্তু ইউএসি ও ইউনিলিভারের আর্থিক সাফল্য এখানে আলোচ্য না। বরং আফ্রিকাকে শোষণ করার ফলে ইউরোপের প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক উন্নয়ন কীভাবে সংঘটিত হয়েছে, সেটা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

সাবান ও মার্জারিন উভয় শিল্পেরই ছিল নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা। এগুলো সমাধান না করে তারা সামনে এগোতে পারবে না। একদম সহজভাবে বললে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হলো বাস্তব কোনো চাহিদার প্রতি সাড়া। মার্জারিনে ও রান্নায় ব্যবহারের জন্য তেলের গন্ধ দূর করতে হয়। শূকরের প্রাকৃতিক চর্বির বিকল্প অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। আর মার্জারিন যখন সস্তা মাখনের কাছ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হয়, তখন ভিটামিনযুক্ত উন্নত-মানের নতুন মার্জারিন উৎপাদনের উপায় খোঁজা হতে থাকে। লিভারের দুই বিশেষজ্ঞ ১৯১৬ সালে এক ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জার্নালে তাদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত করেন। এতে দেখানো হয় যে, মার্জারিনে-থাকা ভিটামিন খাওয়ানোর ফলে প্রাণীর শারীরিক বৃদ্ধি হয়েছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাটি নিয়ে কাজ করছিল, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন উক্ত বিশেষজ্ঞরা। এরপর ১৯২৭ সালের মাঝে মানুষের খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় ভিটামিন-সমৃদ্ধ মার্জারিন।

সাবানের ক্ষেত্রে (এবং কিছুটা কম মাত্রায় মার্জারিনের ক্ষেত্রেও) তেলকে শক্ত করে চর্বিতে পরিণত করার একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা আবশ্যক। বিশেষ করে তিমির তেল, তবে সবজির তেলের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। "হাইড্রোজেনেশান" নামক এই প্রক্রিয়া বর্তমান শতাব্দীর শুরুর দিকে বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। প্রতিদ্বন্দ্বী সাবান কোম্পানিগুলো তাদের টাকা ও তাড়া প্রদান করে এই বিষয়ে গবেষণার জন্য। এখানে লিভারের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল যেসব ইউরোপীয় কোম্পানি, তারাও পরে ইউনিলিভারের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির শাখাপ্রশাখা কীভাবে বিস্তৃত হয়েছে, তার এক চমকপ্রদ উদাহরণ হলো ডিটার্জেন্ট। সাবান নিজেই একটা ডিটার্জেন্ট বা পরিষ্কারক। কিন্তু সাধারণ

সাবানের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, খনিজযুক্ত পানিতে বা অম্লের সংস্পর্শে পচতে শুরু করা। এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে "সাবানবিহীন পরিষ্কারক"। সাধারণ সাবানের মতো ক্ষারীয় চর্বি থাকবে না এতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশের তেল ও চর্বির সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয় জার্মানিতে। ফলে জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো কয়লার আলকাতরা থেকে ডিটার্জেন্ট তৈরি করে। পরে ১৯৩০-এর দশকে কেমিক্যাল কোম্পানিগুলো একই ধরনের ডিটার্জেন্ট তৈরি করতে শুরু করে ব্যাপক মাত্রায়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। যে দুটি কোম্পানি ডিটার্জেন্ট গবেষণায় তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে, তারা হলো ইউনিলিভার এবং প্রোক্টার অ্যান্ড গ্যাম্বল। শেষোক্ত কোম্পানিটির প্রধান কার্যালয় সিনসিনাটিতে অবস্থিত।

একটা বিষয় অদ্ভুত লাগতে পারে। ডিটার্জেন্ট হলো সাবানের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সাবানের কোম্পানিগুলোই এর প্রচার-প্রসার করেছে। আসলে একচেটিয়া ব্যবসাগুলোর একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা। তাই পুরাতন ব্যবসাকে ঢেলে সাজাতে বা একেবারে পালটে নতুন ময়দানে চলে যেতে তারা একটুও ইতস্তত করে না। অন্যথায় পুরাতন পণ্যের সাথে আটকে গিয়ে তাদের পুঁজি মাঠে মারা যেত। সাবান কোম্পানিগুলো যদি ডিটার্জেন্টের ব্যবসা শুধু কেমিক্যাল কোম্পানিগুলোর হাতে ছেড়ে দিত, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো তাদের সাবান, সোপ ফ্লেক, ও গুঁড়া সাবানের ব্যবসা। বাজারে নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে আসত অন্য কেউ। ইউনিলিভার তাই ডিটার্জেন্টের রসায়ন নিয়ে উঠেপড়ে লাগে। সবজির তেল অনেকাংশেই বহাল রাখলেও রাসায়নিকভাবে পালটে নেয় সেগুলোকে। এ ধরনের গবেষণাকে স্রেফ ভাগ্যের হাতে বা ব্যক্তিপর্যায়ে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। ১৯৬০ এর মধ্যে ইউনিলিভার চারটি প্রধান গবেষণাগারের অধিকারী হয়ে যায়—দুটি ইংল্যান্ডে, একটি হল্যান্ডে, এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রে। সেইসাথে ছোট ছোট আরও গবেষণাগার তো আছেই। এরা সবাই মিলে তিন হাজার লোককে কাজে নামিয়ে দেয়, যাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই যোগ্যতাধারী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ।

ইউনিলিভার ও তার ঔপনিবেশিক শোষণের গুণোত্তর প্রভাবকে মোটামুটি ভালোভাবেই সনাক্ত করা যায়। তালের শাঁস চূর্ণ করলে যে অবশিষ্টাংশ তৈরি করা হয়, তা প্রাণীসম্পদের জন্য অসাধারণ খাবার। সাবান-শিল্পের একটি উপজাত গ্লিসারিন। বিস্ফোরক তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয়রা এসব বিস্ফোরকের একাংশ দিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিয়েছে বটে। কিন্তু কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। যেমন: খনি খনন, আকরিক সংগ্রহ, ও নির্মাণকাজ। তেল ও চর্বির ভিত্তিতে আরও কিছু পণ্য সাবানের সাথে

সম্পর্কিত—বিশেষ করে প্রসাধনী, শ্যাম্পু, সুগন্ধি, শেইভিং ক্রিম, টুথপেস্ট, এবং ভাই। জনৈক লেখকের ভাষ্যে, ওইসকল উপজাত "ইউনিলিভারের বাণিজ্যিক ভিত্তিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। তেল ও চর্বি-প্রযুক্তিবিদদের কাছে এ ব্যাপারে যে জ্ঞানভাণ্ডার আগে থেকেই ছিল, সেগুলোকে আরও বেশি ব্যবহার করতে শুরু করে তারা।"

সাবান ও মার্জারিন তৈরিতে তেল ও চর্বি ছাড়াও অন্য আরও কাঁচামাল দরকার। সাবান বানাতে বিপুল পরিমাণ কস্টিক সোডা খরচ হয়ে যায়। তাই ১৯১১ সালে লিভার চেশায়ারে এমন কিছু জমি কিনে নেন, যেগুলো ক্ষার উৎপাদনের উপযোগী। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠা পুঁজিপতি দৈত্যরা খুব বড় মাত্রায় এসব কাজ করার সামর্থ্য রাখে। লিভারের যখন অ্যাব্রেসিভের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন কোম্পানিটি বোহেমিয়াতে চুনাপাথরের একটি খনি কিনে নেয়। আর ইউনিলিভার যখন র‍্যাপিং পেপারের জোগান অব্যাহত রাখতে চেয়েছে, তখন কিনে নিয়েছে পুরো একটা কাগজ-কারখানা।

ইউরোপের প্রবৃদ্ধির আরও একটি প্রভাবক ছিল পরিবহনের সমস্যা। নাইজার কোম্পানি কিনে নেওয়ার এক মাসের মাথায় লিভার আরেকটি প্রকল্প হাতে নেয়। মহাসাগরগামী যেসব জাহাজ পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পণ্য বয়ে আনে, মার্সেইতে সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্য বন্দোবস্ত করে তারা। বিপুল পরিমাণে পাম তেল-বহনকারী জাহাজ নির্মাণের পথিকৃৎ ইউএসি। আর ফন ডার বার্গ তার কোম্পানির জন্য জাহাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি শিপইয়ার্ড কেনার কথা ভাবেন। এটি একীভূত হওয়ার কয়েক বছর আগের ঘটনা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি বটে। কিন্তু ইউনিলিভার ঠিকই নিজস্ব জাহাজের মালিক হতে পেরেছে। এর মাঝে ছিল শিপইয়ার্ড থেকে বানিয়ে আনা আনকোরা নতুন জাহাজও, যেগুলো ঠিক তাদের চাহিদানুযায়ী বৈশিষ্ট্য সহকারে নির্মিত।

ইউনিলিভার ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো খুচরা বিক্রয়। তাদের পণ্য একদম গৃহিণীর হাত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছানো চাই। ইউনিলিভারে প্রবেশ করা ওলন্দাজ কোম্পানিগুলো সিদ্ধান্ত নেয়, বিক্রি নিশ্চিত করার জন্য তাদের মুদি দোকানের মালিক হওয়া উচিত। জার্গেন্স ১৯২২ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে মুদি দোকানের একটি ধারার মালিক বনে যায়। তারা যথার্থই সেটার নাম দেয় "হোম অ্যান্ড কলোনিয়াল"। ফন ডার বার্গও (যিনি তখনো ইউনিলিভারের প্রতিদ্বন্দ্বী) পিছিয়ে থাকেননি। লিপ্টন'স টি-এর জন্য খ্যাত লিপ্টনের মালিকানাধীন দোকানগুলোর বেশির ভাগ অংশীদারত্ব কিনে নেন তিনি। পরে

এই সব দোকান ইউনিলিভারের কাছে হস্তান্তরিত হয়। মুদি দোকানের ব্যবসা তখন আর নিতান্ত সাবান ও মার্জারিনের পরিবেশক হয়ে থাকেনি। বরং নিজেই হয়ে ওঠে পণ্যের মালিক।

এসব চক্রবৃদ্ধি প্রভাবকে কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন বলে মনে হয়। মাছ বিক্রির জন্য লিভার কেন আলাদা করে ম্যাক ফিশারিজ নামক খুচরা দোকান দেবে, আপাতদৃষ্টে তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! সাবান, সসেজ, আর আইস-ক্রিমের মাঝে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু লিভার প্রথমে সসেজ কোম্পানি ওয়ালস-কে কিনে নেন। পরে ওয়ালস একটি আইস-ক্রিম উৎপাদন কারখানা খোলে। আসলে এসবের পেছনে কারণ আছে। পুঁজির উদ্দেশ্যই আধিপত্য বিস্তার করা। এটি বাড়তে থাকে ও ছড়িয়ে পড়ে। চোখের সামনে যা-ই দেখে, তারই নিয়ন্ত্রণ পেতে চায়। ইউরোপের আফ্রিকা-শোষণের কারণে এই একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। তাদের সম্প্রসারণ ও আধিপত্যের দুয়ার অবারিত হয়ে যায় এর ফলে।

ইউনিলিভারের আলোচনা শেষ করার আগে একটা বিষয় লক্ষ করা উচিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি দিক নির্দেশ করে দেয় এরকম কোম্পানিগুলো। ইউনিলিভার লিমিটেড এবং ইউনিলিভার এন.ভি.-এর এই দ্বৈত কাঠামো একেবারেই নতুন এক উদ্ভাবন। মধ্য ইউরোপের শিখ্‌ৎ ও সেন্ট্রা এবং ওলন্দাজ মার্জারিন কোম্পানি জার্গেন্স ও ফন ডার বার্গ একীভূত হওয়ার পরেই এই কাঠামোর সৃষ্টি। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য ছিল করের পরিমাণ কমিয়ে আনা। ইউনিলিভার দুটি হোল্ডিং কোম্পানি নিয়ে গঠিত, যাদের নীতিনির্ধারক পর্ষদ একই। মুনাফা স্থানান্তর করে সমান-সমান রাখার বন্দোবস্ত করে তারা। জন্মলগ্ন থেকেই এ ছিল এক পেশাদার কোম্পানি। যতগুলো কোম্পানি এর সাথে একীভূত হয়েছে, প্রতিটিরই ছিল বহু বছরের অভিজ্ঞতা। কর্মী সংগঠন, উৎপাদন, ও প্রচারণার ব্যাপারে তারা একেবারে ঝানু। খরচের হিসাব ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনকারী হিসেবে প্রথম সারিতে আছে শিখ্‌ৎ। লিভার নিজেও ইউরোপে ব্যাপক বিজ্ঞাপনী প্রচারণার পথিকৃৎ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও তার দক্ষতা রয়েছে। ইউনিলিভার কোম্পানি বিপুল উৎপাদন ও বিজ্ঞাপনী প্রচারণার কৌশলগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং সেগুলোর উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বিপুল মাত্রায় ভোক্তা বাড়িয়ে মুনাফা হাসিল করেছে তারা।

এসকল সাংগঠনিক পরিবর্তনের তাৎপর্য ভালোভাবে বোঝা যায় দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে। ইউনিলিভারের জটিল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে

তুলনা করুন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের চার্টার্ড কোম্পানিগুলোকে। তারা হিসাবের ব্যবস্থাপনা করতে প্রায়ই হিমশিম খেয়ে যেত। কার্যকর হিসাব ও ব্যবসায়িক পদ্ধতি হলো পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলোর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য আকাশ থেকে পড়েনি। এগুলো ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। আর এই বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে আফ্রিকার শোষণ। চার্টার্ড কোম্পানির যুগ থেকে শুরু করে একদম ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত এই শোষণ অব্যাহত থেকেছে।

উপনিবেশবাদ থেকে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তির উপকার লাভ

উপনিবেশবাদের মাধ্যমে উপনিবেশকরা অর্থনৈতিক উপকারের বাইরেও আরও বহু উপকার পেয়েছে। প্রতিটি উপনিবেশের সাথে "মাতৃদেশ"টির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়। আরেকটি উপায় হলো একেকটি কোম্পানির সাথে উপনিবেশগুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, যেটা আগের পরিচ্ছেদেই আলোচিত হলো। এমনিতে গতানুগতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হলো ইউরোপীয় মেট্রোপোলের সাথে তার নিজস্ব উপনিবেশগুলোর সম্পর্ককে বোঝা। সেক্ষেত্রে মেট্রোপোলের জন্য বহু ইতিবাচক প্রভাবের খোঁজ পাওয়া যাবে। অবশ্য উপনিবেশভেদে সেই উপকারের ধরন বিভিন্ন রকম। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর মাঝে সবচেয়ে নীচ ছিল পর্তুগাল। এসব উপনিবেশের কথা বাদ দিলে ইউরোপে পর্তুগালের নিজের বলতে কিচ্ছু ছিল না। তাই অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, আর গিনিকে তারা পর্তুগালেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে দাবি করে বসত। পর্তুগাল নামক ইউরোপীয় দেশটির যেকোনো প্রদেশের মতোই আফ্রিকার এসব দেশকে নিজেদের প্রদেশ ভাবত তারা। ফ্রান্সও মাঝেমাঝে একই পথের অনুসরণ করেছে। আলজেরিয়া, মার্টিনিক, আর ভিয়েতনামকে দাবি করেছে "বিদেশি ফ্রান্স" হিসেবে।

গ্রেট ব্রিটেন বা বেলজিয়াম কখনোই গ্রেটার ব্রিটেন বা বিদেশি বেলজিয়ামের তত্ত্ব প্রচার করেনি। কিন্তু বাস্তবে উপনিবেশের সব রসদ যেন বিনা বাধায় মেট্রোপোলে পৌঁছাতে পারে, এ ব্যাপারে তারা একদম সতর্ক থাকত। পশ্চিম ইউরোপ দশকের পর দশক পরিজীবীর মতো করে তাদের উপনিবেশগুলোকে শোষণ করেছে। তাদের জাতীয় জীবনের একটা দিকও এর উপকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। জনৈক নাইজেরীয় ১৯৬০ সালে ব্রাসেলস ভ্রমণ করে আসার পর লিখেছেন: "আমি নিজ চোখে দেখেছি প্রকাণ্ড সব প্রাসাদ, জাদুঘর আর অন্যান্য সরকারি দালান। এই সবকিছুর খরচ জোগাচ্ছে কঙ্গোর হাতির দাঁত

আর রাবার।"

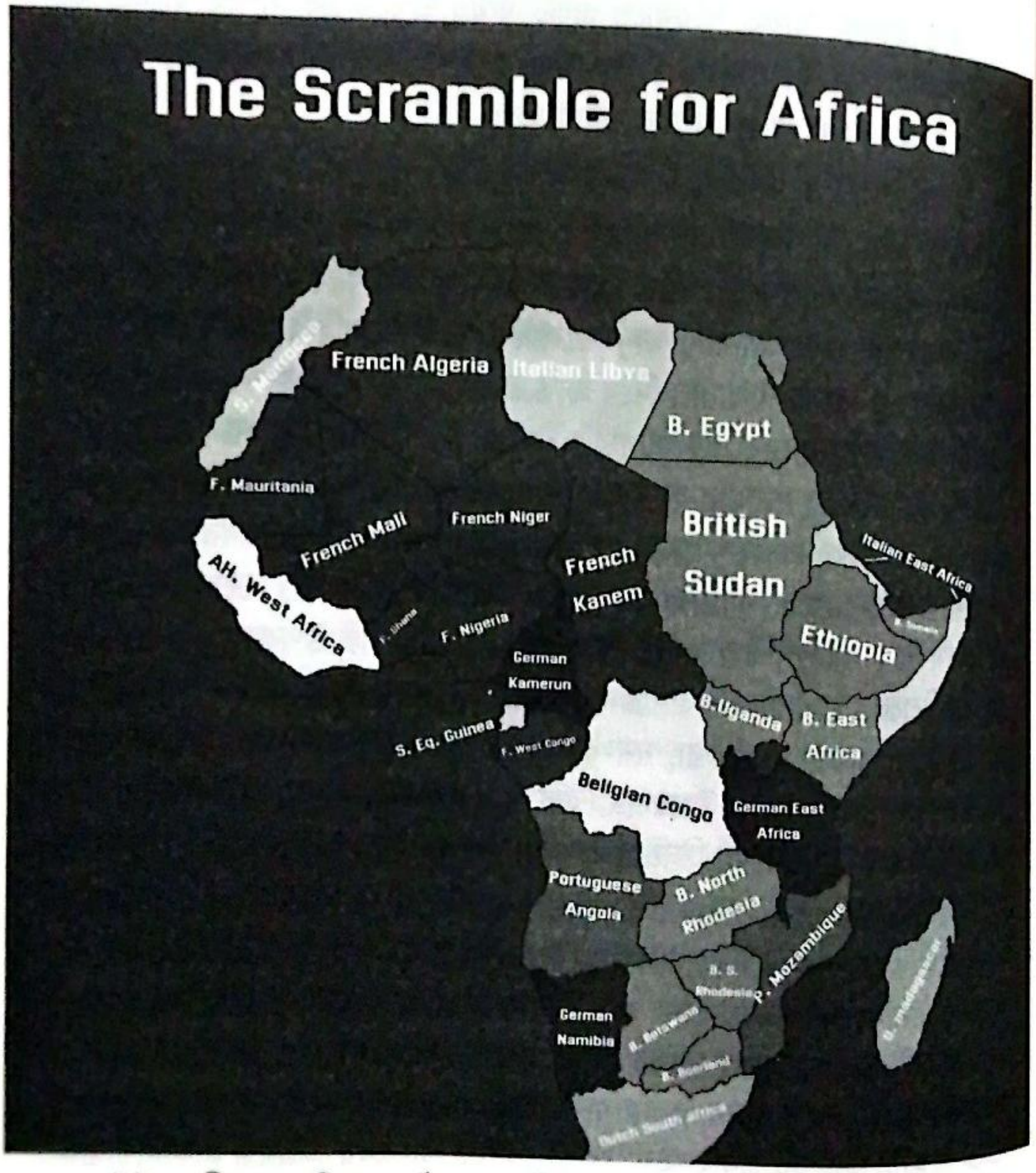
সাম্প্রতিক কালে আফ্রিকান লেখক ও গবেষকরা আরও একটি বিষয় জেনে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর তা হলো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঠাসা আফ্রিকার লুটের মালামাল। আফ্রিকান শিল্পের একইরকম সংগ্রহ রয়েছে প্যারিস, বার্লিন, আর নিউ ইয়র্কে; যদিও পরিমাণে একটু কম। অর্থনৈতিক সম্পদ বাদেও যা কিছুর কারণে মেট্রোপোলগুলোকে উন্নত ও "সভ্য" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, জাদুঘরে-রাখা এসব সম্পদ তারই অংশ।

উপনিবেশায়িত জনগণ উপনিবেশকদের পক্ষে সৈনিক হিসেবেও কাজ করেছে। এটা উপনিবেশকদের প্রতি তাদের অন্যতম স্পষ্ট ও প্রভাবশালী অবদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশীয় ময়দানে যে "ব্রিটিশ বাহিনী" লড়াই করছিল, তারা আসলে এই পরাধীন মানুষগুলোই। ব্রিটিশ বাহিনী তখন ভারতীয়, আফ্রিকান, ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দিয়ে ভর্তি। উপনিবেশের জনসম্পদকে ব্যবহার করাটা উপনিবেশবাদের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। রোমানরা তাদের বিজিত এক জাতির সৈনিকদের ব্যবহার করে আরেক জাতিকে জয় করত। আবার শত্রুদের বিরুদ্ধে রোমের প্রতিরক্ষায়ও ব্যবহার করত তাদের। ব্রিটিশরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আফ্রিকার সাথেও একই কাজ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রেজিমেন্টকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে প্রেরণ করা হয় ব্রিটিশদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রেজিমেন্টের সৈনিকদের ভেতর ছিল কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা, নন-কমিশনড কর্মকর্তাদের মাঝে ছিল আইরিশ (উপনিবেশায়িত), আর ইংরেজরা এর কর্মকর্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে এই রেজিমেন্টে বহু সিয়েরা লিওনীয়ও যুক্ত হয়।

ব্রিটিশদের হাতে পশ্চিম আফ্রিকার উপনিবেশগুলো বিজিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ওয়েস্ট আফ্রিকান ফ্রন্টিয়ার ফোর্স—এদের সৈনিকেরা আফ্রিকান এবং কর্মকর্তারা ইংরেজ। ওয়েস্ট আফ্রিকান রেজিমেন্ট ১৮৯৪ সালে এদের সাথে যোগ দেয়। সিয়েরা লিওনের কথিত হাট ট্যাক্স ওয়ারকে দমন করার জন্য গড়ে তোলা হয় এই সমন্বিত বাহিনী। উক্ত যুদ্ধটি ছিল চাপিয়ে-দেওয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক প্রতিরোধ। পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকাতে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করে যে আফ্রিকান বাহিনী, তা হলো কিং'স আফ্রিকান রাইফেলস। এসকল আফ্রিকান বাহিনী মেট্রোপলিটন সমরযন্ত্রকে কয়েকভাবে উপকৃত করেছে।

- ☑ প্রথমত, বিভিন্ন উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দমন করার জন্য জরুরি বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হতো এদের।

- ☑ দ্বিতীয়ত, আফ্রিকার ভেতর অন্য ইউরোপীয়দের সাথে লড়াইয়েও এদের ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।
- ☑ তৃতীয়ত, ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্র বা আফ্রিকার বাইরে বিভিন্ন যুদ্ধমঞ্চেও তাদের নিয়ে যাওয়া হতো।



ইউরোপীয় সামরিক কার্যক্রমে আফ্রিকার ভূমিকা কেমন ছিল, তা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব আফ্রিকার যুদ্ধে। ব্রিটেন ও জার্মানি তখন পূর্ব আফ্রিকার দখল নেওয়ার জন্য পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত। যুদ্ধের শুরুতে তাঙ্গানিকায় জার্মানদের যে নিয়মিত বাহিনী ছিল, তাতে ছিল ২১৬ জন ইউরোপীয় এবং ২,৫৪০ জন আফ্রিকান আসকারি। যুদ্ধ চলাকালীন নিবন্ধিত করা হয় ৩,০০০ ইউরোপীয় ও ১১,০০০ আসকারিকে। ব্রিটিশ পক্ষে

প্রধান বাহিনীটির নাম কেএআর। এর সদস্যরা ছিল মূলত পূর্ব আফ্রিকান এবং নিয়াসাল্যান্ড থেকে আনীত সৈন্য। কেএআর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ১৯১৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে ৩৫,০০০ ছাড়িয়ে যায়, যেখানে প্রতি দশজনে নয়জনই ছিল আফ্রিকান।

পূর্ব আফ্রিকা যুদ্ধের বেশ শুরুতেই ব্রিটিশরা পাঞ্জাবি ও শিখদের নিয়ে গড়া একটি বিদেশি বাহিনীকে নিয়ে আসে। আরও ছিল পশ্চিম আফ্রিকান বিভিন্ন বাহিনীও। কিছু সুদানি ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানও ছিল সেখানে। প্রথম প্রথম অল্প কিছু শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী যুদ্ধে যোগ দেয়। কারণ তারা এটাকে ভেবেছিল অনেকটা চড়ুইভাতির মতো। কিন্তু বছর না গড়াতেই স্থানীয় যোদ্ধাদলে যোগ দিতে চরম অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব আফ্রিকার সাদা অধিবাসীরা। তাই কার্যত আফ্রিকানরাই আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে এটা ঠিক করার জন্য যে, কোন ইউরোপীয়রা তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে। জার্মান ও ব্রিটিশরা শুধু অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। ইতিহাস বইয়ের মতে, পূর্ব আফ্রিকার এই যুদ্ধে জয়ী হয় "ব্রিটিশরা"।

আফ্রিকা থেকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সেনা-সংগ্রহকারী ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্স। ফরাসি সেনাদলে আফ্রিকান সেনাদের নাম লেখানোর পরিমাণ খুবই বাড়িয়ে দেওয়া হয় ১৯১২ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ২০০,০০০ সেনা সংগ্রহ করা হয়। এতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা অনেকটা দাস শিকারেরই অনুরূপ। এই "ফরাসি" সৈনিকরা টোগো ও ক্যামেরুনে জার্মানদের বিরুদ্ধে, এবং স্বয়ং ইউরোপের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে আনুমানিক ২৫,০০০ "ফরাসি" আফ্রিকান তাদের প্রাণ হারায়। আরও অনেকে ফিরে আসে পঙ্গু হয়ে। কারণ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী যুদ্ধে গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এদের।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে কী পরিমাণ সামরিক সুবিধা পাওয়া সম্ভব, তা বুঝতে পেরে ফ্রান্স খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। তাই লীগ অব নেশনস যখন ক্যামেরুনের একটি অংশ ফ্রান্সকে দিয়ে দেয়, ফ্রান্স তখন ক্যামেরুনিয়ান আফ্রিকান সেনাদের এমন সব কাজে ব্যবহার করার আবদার জানায়, যার সাথে ক্যামেরুনের প্রতিরক্ষার কোনো সম্পর্কই নেই। বিগত বিশ্বযুদ্ধেও স্বভাবতই আফ্রিকান সেনাদের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছে ফ্রান্স। যুদ্ধের প্রথমদিকে ফ্রান্স এবং ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকার বেশির ভাগ অঞ্চল চলে যায় জার্মানদের ও ফ্যাসিবাদী (ভিশি) ফ্রান্সের দখলে। এরপর ফ্রান্সকে উদ্ধার করেছে এই আফ্রিকানরাই। ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত বিষুবীয় আফ্রিকায় অবিস্মরণীয়

ভূমিকা পালন করেছেন ফেলিক্স এবুওয়ে নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ। তিনি জেনারেল ডি গলের নেতৃত্বাধীন এক বাহিনীর প্রতি অনুগত থাকেন এবং ফরাসি ও জার্মান ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যেই পালটা-আক্রমণের মাধ্যমে জেনারেল ডি গল ও ফ্রি ফ্রেঞ্চরা ফ্রান্সের ক্ষমতা ফিরে পায়, সেটার ভিত্তি ও বেশির ভাগ জনশক্তি সরবরাহ করেছে আফ্রিকা।

ফরাসিদের হাতে আফ্রিকান সৈনিকদের ব্যবহার বিগত যুদ্ধের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়নি। পশ্চিম আফ্রিকানদের ১৯৪৮ সালে মাদাগাস্কারে প্রেরণ করা হয়। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে তারা জাতীয়তাবাদী বাহিনীকে পরাজিত করে। ইন্দোচীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান সেনাদের ব্যবহার করা হয়েছে। এরও পরে আলজেরীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান সেনাদের ও বিশেষ করে সেনেগালিদের।

ঔপনিবেশিক শক্তির সেনাদলে আফ্রিকানদের নানারকম ভূমিকা নিয়ে এখনো কোনো বিশদ গবেষণা হয়নি। কিন্তু এতটুকু বোঝা যায় যে, সেরকম গবেষণা পরিচালিত হলে নির্দিষ্ট একটা বিন্যাস চোখে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ-নিয়ন্ত্রিত সেনাদলে কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের অবস্থা যেমন ছিল, এখানেও দেখা যাবে একই চিত্র। উক্ত সেনাদলে কালো যোদ্ধাদের প্রতি মারাত্মক বৈষম্য করা হতো। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিজয়গুলোতে বিশাল ও স্বীকৃতিহীন অবদান রেখেছে এই কালোরাই। সেইসব সেনাদলের অফিসাররা শুধু ছিল সাদা লোক। কিছু আইন-কানুন থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, ওয়েস্ট আফ্রিকান রেজিমেন্টের আফ্রিকান সৈনিকদের জুতো পরতে না দেওয়া। আবার, ইউরোপীয় যুদ্ধগুলোর মাঝে প্রায়ই দেখা দিত বর্ণগত দাঙ্গা। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লড়াইরত কৃষাঙ্গ সেনারাও ঠিক এভাবেই বিদ্রোহ করে গেছে একদম ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় পর্যন্ত।

বেশ কিছু আফ্রিকান অত্যন্ত গর্বসহকারে ঔপনিবেশিক সৈনিক হিসেবে কাজ করত। কারণ তাদের মনে আশা ছিল, এর মাধ্যমে তারা আফ্রিকানদের সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদা দেখিয়ে দিতে পারবে। হয়তো বা এরই হাত ধরে মহাদেশটি একসময় অর্জন করে নেবে তার স্বাধীনতাও। কারণ ইউরোপীয়রা তাদের এই বীরত্ব দেখে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। এই আশা শুরু থেকেই ছিল ভিত্তিহীন। কারণ উপনিবেশকরা আফ্রিকান সেনাদের নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে আসছিল স্রেফ গুটি হিসেবে। এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য উপনিবেশবাদ ও সার্বিকভাবে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখা। এর এক অবাক-করা উদাহরণ হলো

১৯১৫ সালে নিয়াসাল্যান্ডে (বর্তমান মালাওয়ি) জন চিলেম্বুয়ের নেতৃত্বাধীন এক আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ। নিয়াসাল্যান্ড ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশরা তখন পূর্ব আফ্রিকাতে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াইরত। এর মধ্যেও তারা চিলেম্বুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ কেএআরের একটি অংশকে পাঠিয়ে দেয়। তা ছাড়া, কেএআর এসে পৌঁছানোর আগেও চিলেম্বুয়ের স্বাধীনতাকামিতার বিরুদ্ধে নিয়াসাতে একটি প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছিল। নিয়াসার শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের সেই প্রতিরোধ-যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন একজন জার্মান লেফটেন্যান্ট। এহেন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এক লেখক মন্তব্য করেছেন:

> ইউরোপে তাদের স্বদেশিরা নিজেদের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী মারামারিতে লিপ্ত। অথচ আফ্রিকাতে সব ইউরোপীয়ের সহজাত সিদ্ধান্ত ছিল "আগে আমরা শ্বেতাঙ্গ, পরে জার্মান বা ব্রিটিশ।" [কারণ] জন চিলেম্বুয়ের কার্যক্রম দিনশেষে তাদের সকলের ঔপনিবেশিক স্বপ্নকেই ধূলিসাৎ করে দেবে।

নিজেদের সামরিক শক্তি ও কৌশলকে শক্তিশালী করার জন্য উপনিবেশকরা আফ্রিকা মহাদেশ ও আফ্রিকান জনগণকে অদ্ভুত কিছু উপায়ে ব্যবহার করেছে। কপালের জোরে এই কাজের গবেষণাগার হিসেবে তারা সহজেই পেয়ে যায় উত্তর আফ্রিকা ও সাহারাকে। রোমেল ও মন্টগোমারি তখন শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন। এমনই এক সময়ে সশস্ত্র যুদ্ধকৌশলের বিবর্তন পরখ করতে উক্ত গবেষণাগার বেশ কাজে দেয়। ইচ্ছেকৃতভাবেই ইথিওপীয়দের ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ হিসেবে। ইটালীয় ফ্যাসিবাদীরা তাদের ওপর বিষাক্ত গ্যাসের পরীক্ষা চালায়। এরপর ১৯৩৫ সালে নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করে আফ্রিকার এই ছোট্ট অংশটিতে, যা তখনো পর্যন্ত কিছুটা হলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী ছিল। সে-সময় ইটালীয়রা যুক্তি দেয়, "সূর্যে জায়গা পেতে হলে" ইটালিরও উচিত উপনিবেশবাদের সুফল ভোগ করা। ব্রিটেন আর ফ্রান্স ততদিনে এই সূর্য আর আফ্রিকান উৎপাদের এত বেশি সুফল পেয়ে গেছে যে, ইটালির এই দাবির কোনো বিরোধিতা তারা করতে পারেনি।

উপনিবেশায়িত আফ্রিকার বৃহত্তর অংশটি শাসন করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যগুলো তাদেরই দখলে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ১৮৮৫ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত পুঁজিবাদের গোটা অস্তিত্ব আর বিকাশ ছিল উপনিবেশবাদের সাথে সাত-পাকে বাঁধা। আফ্রিকা এতে পুরোহিতের ভূমিকা পালন করে। আফ্রিকান উপনিবেশসমূহ মানেই বিপুল পরিমাণের উদ্বৃত্ত সম্পদ। উদ্ভাবন, লাফিয়ে লাফিয়ে প্রযুক্তির অগ্রগতি, আর পুঁজিবাদী

উদ্যোগের সংগঠন নিশ্চিত করে তারা। যোদ্ধা সরবরাহের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পিঠ বাঁচায়। মাঝেমাঝে মনে হয়, এই দুই প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশায়নের এত বেশি উপকার পেয়েছে যে, "বেশি ভালো ভালো না" পর্যায়ে পৌঁছে যায় তারা।

ব্রিটেনের ক্ষেত্রে বলা চলে, উপনিবেশবাদের ফলে ব্রিটিশ শিল্পখাত হেলেদুলে জীবন কাটাতে থাকে। উৎপাদন ও প্রচারণার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিমণ্ডলে অলস হয়ে যায় ব্রিটেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানার আর নবায়ন বা প্রতিস্থাপন করা হয়নি। নতুন ধরনের পণ্য বিক্রির জন্য করা হয়নি তেমন কোনো গতিশীল প্রচেষ্টা। পক্ষান্তরে ১৯১৮-র পর যখন জার্মানি উপনিবেশ-বঞ্চিত হয়ে যায়, তখন তারা নিজেদের সম্পদ ও মেধা ব্যবহার করে বাঁচতে শেখে। এগুলো নিঃসন্দেহে উপনিবেশায়নের পুরো চিত্রটার কিছু মজাদার খুঁটিনাটি। তবে মাথায় রাখতে হবে যে, উপনিবেশবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদের একটি দিক মাত্র। উপনিবেশবাদের ভিত্তি ছিল বিদেশি রাজনৈতিক শাসন এবং তা পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সকল উপনিবেশের মাঝে অন্তর্নিহিত, সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত (শুধু যেসব জায়গায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেছে, সেগুলো ছাড়া), এবং এটি সকল পুঁজিবাদী জাতিকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। তাই কোনো একটা পুঁজিবাদী দেশের যদি নিজস্ব কোনো উপনিবেশ না-ও থাকে, তবুও শোষণের ফল থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। বিশ্বের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলো তো ঘুরেফিরে মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী অট্টালিকারই উঠান।

❁ মেট্রোপলিটন অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ামক হিসেবে উপনিবেশবাদ

ইউনিলিভারের ইতিহাস একটি সতর্কবার্তা যে, উপনিবেশবাদ মানে স্রেফ একটা উপনিবেশ ও তার মাতৃদেশের মাঝে সম্পর্ক নয়। বরং এর একদিকে রয়েছে উপনিবেশ এবং অন্যদিকে মেট্রোপোল। ইউনিলিভারে থাকা জার্মান পুঁজি ব্রিটিশদের সাথে মিলে আফ্রিকাকে শোষণ করেছে। আর ইস্ট ইন্ডিজের শোষণে ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলিয়েছে ওলন্দাজ পুঁজি। পুরো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জুড়ে এগুলোর উপকার এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে, প্রতিটা পুঁজিবাদী দেশই পেয়েছে গনিমতের অংশ। এমনকি যারা ঔপনিবেশিক শক্তি নয়, তারাও। সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ক্যানাডা, ও যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপিত ইউনিলিভার কারখানাগুলো আফ্রিকার উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগদখলে অংশ নিয়েছে। এগুলোকে

ব্যবহার করেছে নিজেদের উন্নয়নে।

- ঔপনিবেশিক আফ্রিকাতে সর্বদাই জার্মানির দাবি ছিল, এমনকি ১৯১৮ সালের পরও। অথচ সে-সময় অন্য পুঁজিবাদী শক্তিরা জার্মানির কাছ থেকে তার সব উপনিবেশ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। উনিশশো বিশের দশকে যখন জার্মানদের জাহাজ-পরিবহন পুনরায় চালু করা হয়, তখন তা পূর্ব, পশ্চিম, ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জার্মান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও সম্পর্ক ছিল আফ্রিকার সাথে। এর মাঝে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অধিকারী উত্তর আফ্রিকার টুয়েন্টশ ব্যাংক।
- ওলন্দাজ জাহাজ কোম্পানিগুলোও ওয়েস্ট আফ্রিকান কনফারেন্স লাইনে জার্মান ও ব্রিটিশদের সাথে জড়িত ছিল।
- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জাহাজিরা "ট্র্যাম্প" জাহাজ ভাড়া করার জন্য বিখ্যাত। নির্ধারিত পথের বাইরে এসব জাহাজ আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে পণ্য পরিবহন করত। পুরাতন ইস্ট আফ্রিকান ট্রেডিং কোম্পানিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিত ড্যানিশ পুঁজি।
- আফ্রিকায় সুইসদের কোনো উপনিবেশ ছিল না। কিন্তু এসসিওএ-তে তাদের ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুঁজি। সাম্রাজ্যবাদী ব্যাংকিংয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্য পুঁজিবাদীরা যেসব যুদ্ধে জড়িত, নিজেদের তারা সন্তর্পণে সেগুলো থেকে বিরত রাখে। এতে করে তারা যুদ্ধের উভয় পক্ষের সাথেই ব্যবসা চালু রাখতে সক্ষম হয় এবং উপনিবেশ থেকে আগত সম্পদ ভোগ করে।
- এরপর আছে জাপান। এই পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি এশিয়াতে উপনিবেশের অধিকারী এবং আফ্রিকাতে ব্যবসায়ে আগ্রহী। জাপানি পুঁজিপতিরা ইউরোপীয়দের তুলনায় কম দামে জিনিস বেচার চেষ্টা করত বটে। কিন্তু আফ্রিকার সাথে তাদের পরিচালিত ব্যবসা তবুও ছিল আফ্রিকানদের জন্য অসম ও অসুবিধাজনক।

ঔপনিবেশিক যুগকে পুরোপুরি বুঝতে হলে আফ্রিকার অর্থনৈতিক বিভাজনকে বিবেচনায় রাখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিভাজনের কোনো নির্দিষ্ট বা দৃশ্যমান সীমান্ত নেই। উপনিবেশায়িত আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাকে পুঁজিপতি শক্তিরা নিজেদের মাঝে কীভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে, সেটাই এই বিভাজনের সীমান্ত। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্তুগালের দুটি বড়সড় রাজনৈতিক উপনিবেশ ছিল। মোজাম্বিক ও

অ্যাঙ্গোলা। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে এই দেশ দুটি বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী শক্তির হাতে বণ্টিত। পর্তুগিজ সরকার তাদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছে। কারণ অত বড় এলাকা সামাল দেওয়ার মতো সামর্থ্য দুর্বল পর্তুগিজ পুঁজিপতিদের নেই।

অর্থনৈতিক বিভাজনে কঙ্গো ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য ছিল বিশেষ বন্দোবস্ত। এ দুটিই অত্যন্ত মূল্যবান অঞ্চল। প্রথমে কঙ্গোকে "কঙ্গো ফ্রি স্টেট" নামে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের অধীনে অর্পিত করা হয়। তার মানে এই জায়গাটা একটা মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল হওয়ার কথা। সকল পুঁজিবাদী দেশ এখানে বিনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে লিওপোল্ড তার প্রশাসনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে কঙ্গোর সম্পদ একচ্ছত্রভাবে নিজের দখলে নিয়ে নেন। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী গোষ্ঠী যেসব কারণে ১৯০৮ সালে লিওপোল্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, তার মাঝে একটি প্রধান কারণ এটি। কঙ্গোর দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর বেলজিয়াম এটাও নিশ্চিত করে, যাতে এর বেশির ভাগ উদ্বৃত্ত সম্পদ ও অন্যান্য সুবিধা বেলজিয়ামের হস্তগত হয়। কিন্তু অ-বেলজিয়ান পুঁজিবাদী কর্তৃপক্ষগুলো খনিজ উত্তোলনের বিনিয়োগে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়। তারপর ঔপনিবেশিক যুগ যত এগোতে থাকে, কঙ্গো কেক থেকে ততই বড় বড় টুকরো কেটে নিতে থাকে ব্রিটিশ, ফরাসি, ও আমেরিকানরা।

বেশ দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল গোটা সাম্রাজ্যবাদের জন্য কাঁচামালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার। ঊনবিংশ শতকে কামড়াকামড়ির শুরুতেই যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বর্ণ ও হীরক আবিষ্কৃত হয়, তখন থেকেই বহু বছর যাবৎ সেখানে আসন গেড়ে ছিল ব্রিটেন। বোয়ার অভিবাসীদের সাথে ব্রিটেনকে সমঝোতায় আসা লাগে। তাদের জীবিকা আসত প্রধানত জমি থেকে। আফ্রিকান ও অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ অভিবাসীকে শোষিত ও শাসিত হতে দেখাটাই তাদের আসল আগ্রহের জায়গা। ফলে আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে খনিজ সম্পদের সিংহভাগ লাভ করে ব্রিটেন। আর রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল ধরে রাখে বোয়াররা, যাতে তাদের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটানো যায়। এরপর অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদীরা বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করে। তারাও তখন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী/ফ্যাসিবাদী সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সম্মত হয় এবং তা করেও ছাড়ে।

আফ্রিকার অর্থনৈতিক বিভাজন ও পুনর্বিভাজন সারাক্ষণই চলমান ছিল। কারণ একেকটি পুঁজিবাদী দেশের পকেটে-যাওয়া মালের পরিমাণ সারাক্ষণ বাড়ত-কমত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্র। কারণ আফ্রিকা

থেকে তারা যে উপকার লাভ করত, পুরো ঔপনিবেশিক যুগ জুড়ে তার পরিমাণ বেড়েই চলে।

সময় যতই গড়ায়, ততই বড় হতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের কেকের টুকরা। মেট্রোপোল এবং উপনিবেশায়িত আফ্রিকার মাঝে অসম ব্যবসা থেকে এভাবেই তারা লাভবান হতে থাকে। **আফ্রিকার বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার ১৯১৩ সালে ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারেরও বেশি। এরপর ১৯৩২ সালে তা ১৫ কোটি ডলার এবং ১৯৪৮ সালে ১২০ কোটি ডলারে গিয়ে ঠেকে। এটা আফ্রিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ১৫ শতাংশ। পশ্চিম আফ্রিকার বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার ১৯৩৮ সালে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে ১৯৪৬ সালে হয় ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ১৯৫৪ সালে ৫১ কোটি ৭০ লক্ষ।**

কিন্তু আফ্রিকায় আমেরিকার সেরা ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সে আমেরিকাকে স্বর্ণ, হীরক, ম্যাঙ্গানিজ, ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ সরবরাহ করার বিনিময়ে তাদের থেকে ক্রয় করে ভারী যন্ত্রপাতি। সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ আফ্রিকা বাণিজ্য তো ছিলই। এর পাশাপাশি লন্ডনে আমেরিকান ক্রেতাদের কাছে পুনর্বিক্রিও হতো দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ। ঠিক এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বিক্রিত হতো গোল্ড কোস্ট ও নাইজেরিয়ার বেশির ভাগ কোকো।

আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যের ফলে জাহাজ-পরিবহন সেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমেরিকা সেটা অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়নি। ইউনাইটেড স্টেইটস স্টিল এক্সপোর্ট কোম্পানির প্রেসিডেন্ট জেইমস ফ্যারেল আফ্রিকাগামী একটি জাহাজ-কোম্পানি ক্রয় করেন। কারণ তিনি "অন্ধকার মহাদেশটির ভবিষ্যতে"র প্রতি আস্থাশীল। ইউএসি'র কর্মকর্তারাও ঠিক এই কথাটিই বলেছিল। আর অতি অবশ্যই তাদের মতো ফ্যারেলের কথার অর্থও হলো মেট্রোপোলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আফ্রিকার শোষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে পুঁজিপতিদের ভাগ্য আরও খুলে যাবে, সেটার প্রতি আস্থা। এই লোকগুলো মাঝেমাঝে নিজেরাই এসব কথা বলে ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ভাইস-অ্যাডমিরাল কোক্রেইন ছিলেন ফ্যারেলের জাহাজ-কোম্পানির এক বড় গুণগ্রাহী। আফ্রিকায় ফ্যারেলের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি ১৯৫৯ সালে এক গবেষণার ভূমিকায় লেখেন :

আমাদের বর্তমান শিল্প-সামরিক অর্থনীতির জন্য কৌশলগত উপকরণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কঠিন প্রতিযোগিতা হয়। ফ্যারেল লাইন্স আমেরিকার নৌ-ইতিহাসের নির্মাতা। তারা স্পষ্টভাবে ও জোরেসোরে

প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে, কোনো দেশের পতাকাবাহী জাহাজ আসলেই সেই দেশের বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম... যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও সম্পদে আমেরিকান-পতাকাবাহী মহাসাগরীয় বাণিজ্যের মূল্যকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা স্রেফ আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। উপনিবেশের ভেতরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ একাট্টা করে তারা। জানা কথা যে, নাম ছাড়া বাকি সবকিছুতেই লাইবেরিয়া ছিল আমেরিকান উপনিবেশ। যুক্তরাষ্ট্র লাইবেরীয় সরকারকে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছিল বলে বিদিত আছে। কিন্তু এই সুযোগে তারা লাইবেরীয় খাজনার দখল নিয়ে নেয়। হাজার হাজার বর্গ মাইল লাইবেরীয় ভূমিকে লুট করে। লাইবেরিয়ার দুর্বল সরকারের ওপর ছড়ি ঘোরায়। লাইবেরিয়ায় বিনিয়োগের প্রধান দায়িত্ব পালন করে ফায়ারস্টোন রাবার কোম্পানি। লাইবেরীয় রাবার থেকে ফায়ারস্টোন এত বিশাল মুনাফা অর্জন করে যে, এ নিয়ে বইও লেখা হয়ে যায়। আমেরিকান পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাপানো এই বইয়ের উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, বিদেশে আমেরিকার ব্যবসা কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ফায়ারস্টোন ১৯৪০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে লাইবেরিয়া থেকে ১৬ কোটি ডলার মূল্যমানের রাবার বের করে নিয়ে যায়। বিনিময়ে লাইবেরীয় সরকার পায় ৮০ লাখ ডলার। শুরুর দিকের বছরগুলোতে লাইবেরীয় সরকারের প্রাপ্ত অংশ ছিল আরও ছোট। কিন্তু সবচেয়ে অনুকূল বছরগুলোতেও ফায়ারস্টোনের মোট মুনাফা ছিল লাইবেরিয়ার রাজস্ব আয়ের তিন গুণ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী অর্থনীতি টাকার অঙ্কে যত না উপকার পেত, অন্যান্য উপকারের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। ওপরের উদ্ধৃতিতে ভাইস-অ্যাডমিরাল ক্রোকেইন একদম হাঁড়ির খবর তুলে এনেছেন। তিনি বলেছেন, কৌশলগত এই কাঁচামালগুলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের শিল্প ও সামরিক খাতকে সচল রেখেছে। ফায়ারস্টোন যে লাইবেরিয়ার ক্ষেত থেকে রাবার নেয়, এর কারণ ব্রিটেন ও হল্যান্ড তাদের রাবারের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তারা ওই রাবার সংগ্রহ করত যথাক্রমে এশীয় উপনিবেশ মালয় এবং ওলন্দাজ-নিয়ন্ত্রিত ইস্ট ইন্ডিজ থেকে। লাইবেরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র এমন এক উৎস পেয়ে গেছে, যা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই নির্ভরযোগ্য। রাবার ব্যবহারের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র গাড়িনির্মাণ শিল্প। তাই হার্ভি ফায়ারস্টোন যে হেনরি ফোর্ডের জিগরি দোস্ত এবং ব্যবসায়িক সহকর্মী, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। লাইবেরিয়ার বদৌলতে ওহায়োর অ্যাক্রোন শহর হয়ে ওঠে রাবারের টায়ার

তৈরির এক জবরদস্ত কেন্দ্র। এসব টায়ার চলে যেত ডেট্রয়েটে ফোর্ডের বড় বড় কারখানায়।

উপনিবেশের শেষ পনেরো বছরে আফ্রিকাতে আমেরিকার যে বিনিয়োগ, সেটা হয়েছে কিছু মাত্রায় অন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ক্ষতি করার মাধ্যমে। কিন্তু শেষমেশ আসলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী স্বার্থই সংরক্ষিত হয়েছে। এই প্যারাডক্সের ব্যাখ্যা হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়। তারা পুয়ের্তো রিকো ও ফিলিপাইনস উপনিবেশদ্বয়ের মালিক। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগসমূহ। এই বিনিয়োগের মুখ্য ক্ষেত্র লাতিন আমেরিকা এবং গৌণ ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। আমেরিকার বিদেশি বিনিয়োগ ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটেনের চেয়ে একটু এগিয়ে ছিল। ব্রিটেন তখন ফ্রান্স, জার্মানি, ও জাপানের মতো অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়ে বহু এগিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দারুণভাবে মোড় ঘুরিয়ে দেয় আমেরিকার দিকে।

ইউরোপ বহু ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে স্থবির হয়ে গেলেও আমেরিকার মাটিতে কোনো যুদ্ধই হয়নি। এর উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়তেই থাকে। তাই ১৯৪৫ সালের পর আমেরিকার পুঁজি যেতে থাকে আফ্রিকায়, এশিয়ায়, এবং স্বয়ং ইউরোপেও। নতুন এক আগ্রাসী শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সহকারে এগিয়ে যেতে থাকে আমেরিকা। কারণ তার পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা তখনো মাটিতে শোয়া। ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ ও ফরাসি ব্যাংকাররা এতটাই নিরুপায় হয়ে পড়ে যে, তারা আমেরিকান অর্থদাতাদের আফ্রিকা মহাদেশে ডেকে নিয়ে আসে। কারণ ব্রিটিশ ও ফরাসিদের নিজেদের পুঁজি তখন অপর্যাপ্ত। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সট্রাকশান অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট হলো যুক্তরাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক। এটি আফ্রিকার ওপর আমেরিকান প্রভাবের এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন হয়ে ওঠে। মহাদেশটির অর্থনৈতিক পুনর্বিভাজনেরও এক বড় হাতিয়ার ছিল এটি।

ড. কোয়ামি এনক্রুমার গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে আফ্রিকায় আমেরিকার প্রত্যক্ষ বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ১১ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৭৮ কোটি ৯০ লক্ষতে উন্নীত হয়। এর বেশির ভাগই এসেছে মুনাফা থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত আফ্রিকায় যে মুনাফা অর্জন করেছে, তার আনুষ্ঠানিক পরিমাণ ১২৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। অর্থনৈতিক বিভাজনের আলোচনায় যেটা বেরিয়ে আসে, তা হলো ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ও মুনাফা বৃদ্ধির হার। যেমন, ১৯৫১ সালে আমেরিকান বিনিয়োগ ছিল ৩১.৩

কোটি ডলার। পাঁচ বছর আগের অঙ্কের চেয়ে সেটা প্রায় তিন গুণ। পরবর্তী পাঁচ বছরে তাও বেড়ে আড়াই গুণ হয়ে যায়। একই সময়ে ব্রিটিশ ও ফরাসি বিনিয়োগ বেড়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে।

যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল বটে। কিন্তু উত্তর আমেরিকান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়, এর ফলে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংগঠনিক, ও সামরিকভাবে লাভবান হয় সকল ঔপনিবেশিক শক্তি। এরকম উদাহরণ আগেও দেখানো হয়েছে। আফ্রিকান কোনো উপনিবেশ যখন ইউরোপের ধাতুশিল্পে বা বিদ্যুৎশিল্পে অবদান রাখে, সেই প্রভাব সমাজের অন্যান্য খাতেও ছড়িয়ে যায়। কারণ এসকল খাত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। একইভাবে, যুক্তরাষ্ট্রও এমন এক ভৌগোলিক স্থান, যা রয়েছে পুঁজিবাদী উন্নয়নের একদম পুরোভাগে। যেমন, প্যাটেন্টের মতো কিছু আইনি প্রক্রিয়ার হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত জ্ঞান স্থানান্তরিত হয় পশ্চিম ইউরোপে।

তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ততদিনে বিশ্বের শীর্ষ পুঁজিপতি রাষ্ট্র। তাই তার সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামরিক পরিসরে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য সক্রিয় দায়িত্বও পালন করতে হয় তাকে। যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানেও ঢুকে পড়ে। এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সেসব জায়গায় নিজের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করা এবং সেখানকার পুঁজিবাদকে রক্তদান করা। এই রক্তের বিরাট অংশই অবশ্য আফ্রিকান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকা আফ্রিকা থেকে (তুলনামূলক) কম মুনাফা হাতাতে পেরেছে, এটা ভাবলেই চলবে না। বরং সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে, উত্তর আমেরিকা হলো ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি অংশ। রেড ইন্ডিয়ানদের গণহত্যা এবং আফ্রিকানদের দাস বানানো থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে সামগ্রিক এই ব্যবস্থাটিই। নিজেদের সীমান্তের ভেতরে এবং ক্যারিবিয়ান ও লাতিন আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে আফ্রিকানদের যেভাবে ক্রমাগত শোষণ করা হয়েছে, সেটাও আমেরিকার দৈত্যাকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ঊনিশশ পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী/উপনিবেশবাদী বিশ্বের নেতা ও পুলিশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র হলো ব্রিটেনের যোগ্য উত্তরসূরি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদকে মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ঘোষণা করা হয় যে, আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা আফ্রিকার এমাথা থেকে ওমাথা চষে বেড়াচ্ছে কৃষিজ

ও খনিজ সম্পদের জন্য—বিশেষত দ্বিতীয়টার জন্য। মার্শাল প্ল্যানের টাকা (একোনমিক কমিশন ফর আফ্রিকার মাধ্যমে) যায় মাইন্স ডি যেলিজার মতো কোম্পানিগুলোর কাছে। এটি উত্তর আফ্রিকায় সীসা ও দস্তা উত্তোলন করত। আবার, এই টাকার ফলেই আমেরিকানরা কোম্পানির শেয়ার ক্রয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। তাই ১৯৫৪ সালে মাইন্স ডি যেলিজার মোট ১২৫ কোটি পুরাতন ফ্র্যাঙ্ক (৮১ লাখ ৬০ হাজার ডলার) মুনাফার অধিকাংশেরই মালিক হন যুক্তরাষ্ট্রের মরগ্যান এবং ইউরোপের রথসচাইল্ডস। একইভাবে, ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কঙ্গোতে দশ-বছর-মেয়াদি অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা পায় বেলজিয়ান সরকার। এই সহযোগিতা প্রদানের বিনিময় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কঙ্গোর কিছু কোম্পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। কঙ্গোর বৈদেশিক বাণিজ্যে বেলজিয়ামের পর দ্বিতীয় স্থানটি অধিকার করে যুক্তরাষ্ট্র। আর যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের প্রদান করতে হয় বেশ কিছু সুবিধা।

তাই এই প্যারাডক্স চলতেই থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা উপনিবেশায়িত আফ্রিকায় ঢুকে পড়ে। গুঁতো মেরে সরিয়ে দিতে থাকে ফরাসি, ব্রিটিশ, ও বেলজিয়ান পুঁজিপতিদের। কিন্তু পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকে এমনভাবে টাকা দিতে থাকে, যেটা না পেলে তারা আর উঠে দাঁড়াতেই পারত না। পারত না ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার ওপর শোষণ চালিয়ে যেতে।

উপনিবেশবাদের বিগত কয়েক দশকে উপনিবেশ থেকে যে সম্পদ হাসিল হয়েছে, তা পুঁজিবাদের জন্য একটি আপদকালীন সঞ্চয় হিসেবে কাজ করে। প্রথমবারের মতো এই সঞ্চয় ভালোভাবে কাজে লাগে ১৯২৯-৩৪ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে। সেই সময়ে আফ্রিকায় জোরপূর্বক শ্রম বৃদ্ধি করা হয়। ফসলের বিনিময়ে আফ্রিকানদের দেওয়া হতে থাকে নিম্নতর মূল্য। শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হতো কম, আমদানিকৃত পণ্যের বিনিময়ে তাদের থেকে টাকা নেওয়া হতো অনেক বেশি। ওই সময়টিতে মেট্রোপলিটন দেশগুলোর শ্রমিকরাও অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু মন্দার ভার যেন ইউরোপ থেকে যথাসম্ভব উপনিবেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছে উপনিবেশকরা।

এই বিশাল অর্থনৈতিক মন্দার কোনো প্রভাব সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়েনি। সমাজতন্ত্রের কারণে সেখানে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে মন্দা। এটা

অযৌক্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার ফলাফল। মুনাফার অন্বেষণে উৎপাদন এত বেশি বেড়ে যায় যে, মানুষের ক্রয়ের সামর্থ্যকে তা ছাড়িয়ে যায়। ফলে শেষমেশ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দুইই কমিয়ে দিতে হয়েছে ব্যাপক মাত্রায়। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ত্রুটির সাথে আফ্রিকানদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ইউরোপীয়রা যখন সবকিছু লেজেগোবরে করে ফেলে, তখন নির্দ্বিধায় আফ্রিকানদের শোষণ বাড়িয়ে দেয় তারা। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাতে সুইডেনের ঘাড়ে চড়ে ব্রিটেনের কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে চড়ে বেলজিয়ামের উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তারা সবাই মিলে ডুবতে বসেছিল। এজন্যই উপনিবেশ থেকে হাতানো উপকারগুলো শুধু ঔপনিবেশিক শক্তিদেরই না, বরং সকল পুঁজিবাদী দেশকে টেনে ডাঙায় তুলে আনে।

উপনিবেশগুলো মেট্রোপোলসমূহকে দ্বিতীয়বারের মতো উদ্ধার করে সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধের সময়। আগেই যেমনটি বলা হলো, এখানেও আফ্রিকানদের বিরাট আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। মেট্রোপোলকে তারা অতীব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করত অত্যন্ত কম দামে। আফ্রিকার সামরিক গুরুত্বও ছিল চূড়ান্ত মাত্রার। যুদ্ধের বিভিন্ন ময়দানে আফ্রিকানরা তো লড়াই ও মৃত্যুবরণ করেছেই। সেইসাথে মহাদেশটির ভৌগোলিক অবস্থানও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নভেম্বর ১৯৪২-এ তৃতীয় এক যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় আফ্রিকা (ইউরোপীয় ও এশীয় ময়দানগুলো প্রথম ও দ্বিতীয়)। আর এই ময়দানটিই ছিল চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যম।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণ আটলান্টিকের যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আফ্রিকার হাতে। পশ্চিম দিক থেকে যে দুটি পথে ভারত মহাসাগরে ঢুকতে হয়, তাও আফ্রিকারই অধীন। জনৈক সামরিক বিশ্লেষক যেমনটি বলেছেন, "আফ্রিকা যার, বিজয় তার।" ইটালিয়ানদের আক্রমণের মুখে বড় বড় ঔপনিবেশিক শক্তি এই মহাদেশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে আফ্রিকান যোদ্ধা ও সম্পদের সহযোগিতায়। ইটালীয়দের অধীনে ছিল শুধুমাত্র লাইবেরিয়া, সোমালিল্যান্ড, ও (সাময়িকভাবে) ইথিওপিয়া। জার্মানদের অবশ্য ততদিনে আফ্রিকাতে কোনো উপনিবেশ নেই। ইটালীয় ও ফ্যাসিবাদী ভিশি ফরাসিদের সাহায্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছিল তাদের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল পুঁজিবাদী শক্তিদের নিজেদের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমন ছিল না। এখানে আগ্রাসী রাষ্ট্র ইটালি, জার্মানি, ও জাপান ছিল ফ্যাসিবাদী। পর্তুগাল, স্পেন, ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই মতাদর্শের সমর্থক বটে। কিন্তু সুযোগসন্ধানী পর্তুগিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়াররা ব্রিটেন, ফ্রান্স, ও

যুক্তরাষ্ট্র-সহ গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলোর পক্ষে থাকাকেই সুবিধাজনক বলে মনে করে।

ফ্যাসিবাদ হলো পুঁজিবাদেরই একটি বিকৃত রূপ। পুঁজিবাদের ভেতরে আধিপত্যের যে প্রবণতা নিহিত, ফ্যাসিবাদ সেটাকে তুঙ্গে তুলে দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে সুরক্ষা দেয় সে। আবার পুঁজিবাদ ইতিমধ্যে যে প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের জন্ম দিয়েছে, ফ্যাসিবাদ সেটাকে অপরিমেয় মাত্রায় শক্তিশালী করে তোলে। সেটা ইহুদিদের বিরুদ্ধে হোক (হিটলারের ক্ষেত্রে যা হয়েছে) অথবা আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে (পর্তুগালের সালাযার ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য নেতৃবর্গের মতাদর্শ যেরকম)। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্জনগুলো ঘুরিয়ে দেয় ফ্যাসিবাদ। যেমন: অবাধ নির্বাচন, আইনের চোখে সমতা, ও সংসদ। এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের মাঝে কর্তৃত্ববাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সমন্বয়কেও সে সমর্থন করে। পর্তুগাল ও স্পেনে তা ছিল ক্যাথোলিক চার্চ, আর দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাচ রিফর্মড চার্চ।

জন্মদাতা পুঁজিবাদের মতো ফ্যাসিবাদও সমাজতন্ত্রের পুরোপুরি বিপরীত। ফ্যাসিবাদী জার্মানি ও ইটালি অন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে যেমন আক্রমণ করেছে, তেমনি করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নকেও। উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ফ্যাসিবাদের পরাজয় তাই সমাজতন্ত্রের বিজয়। একই সাথে এর ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোও বেঁচে যায়। ফ্যাসিবাদের মতো ঐতিহাসিকভাবে বিপরীতমুখী পথচলা শুরু করতে হয়নি তাদের।

সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধটি যখন শেষ হয়, তখন আফ্রিকার ঘাড়ে আরেকটি দায়িত্ব এসে পড়ে—ইউরোপের পুনর্গঠন। ওই সংকটকালে যুক্তরাষ্ট্র এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে, যেটার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশক দেশগুলোর সরাসরি আশ্রয়স্থল হিসেবে উপনিবেশগুলোও ছিল, যদিও তখন পুঁজির সংকটে ছিল উপনিবেশকরা। লক্ষণীয় যে, ১৯৪০-এর দশকের শেষদিক থেকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ একটি জিনিস স্বীকার করে নিতে শুরু করে। তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির ত্রাতা হিসেবে আফ্রিকার সম্ভাব্য ভূমিকা মেনে নিয়ে এ ব্যাপারে খোলাখুলি বক্তব্য দিতে শুরু করে তারা।

ফরাসি কেবিনেটের মিনিস্ট্রি অব কলোনিজের নাম পালটে মিনিস্ট্রি অব ওভারসিজ ফ্রান্স রাখা হয় ১৯৪৬ সালে। উপনিবেশায়িত আফ্রিকানদের গালভরা নাম দেওয়া হয় "বিদেশি ফরাসি"। প্রায় একই সময়ে ফ্রান্সের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিবৃতিতে সোজাসাপটা স্বীকার করা হয়:

সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বিদেশি ফরাসি যদি না থাকত, তাহলে ফ্রান্স কেবল ইউরোপের একটি ছোট্ট রাষ্ট্র হয়েই রয়ে যেত। তাদের তরুণ বাহিনীটি বিশ্বের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছে এক অভাবনীয় উপায়ে [যুদ্ধে আফ্রিকার ভূমিকার কথা বলা হচ্ছে]।

এর কিছুকাল পরেই ফ্রান্স ১৯৪৯-৫২ সালের জন্য চার বছরমেয়াদি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। তখন এরকম বক্তব্য দেখা যেতে থাকে :

> ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট ও সীসার আকরিক, ক্যানবদ্ধ পণ্য এবং কৃষিজ উৎপাদ সরবরাহ করার মাধ্যমে ফ্রান্সের বিপদ কাটিয়ে ওঠার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে মরক্কো।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ই নিজ নিজ উপনিবেশগুলোর "উন্নয়ন"-এর জন্য এইজেন্সি স্থাপন করে। ব্রিটিশ পরিমণ্ডলে এর নাম ছিল কলোনিয়াল ডেভেলাপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার (CD&W), আর ফরাসি উদ্যোগটির নাম FIDES; তাদের প্রধান কাজ ছিল ঋণ প্রদান করা। মেট্রোপোলকে সাহায্য করার কাজে উপনিবেশগুলোকে সাহায্য করা হবে এর মাধ্যমে। আরেকভাবে বললে, যুদ্ধপরবর্তী পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য উপনিবেশের সম্পদ সর্বোচ্চ হারে শোষণ করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি বেড়ে যায়।

পশ্চিম ইউরোপ ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে যেরকম যুদ্ধপরবর্তী সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তা যেনতেন কোনো পরিস্থিতি নয়। বুর্জোয়াদের এমন এক সময়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজ করতে হচ্ছিল, যখন সমাজতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে প্রমাণ করে ফেলেছে। তার ওপর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করছে সোভিয়েতদের রেড আর্মি। এটা বুর্জোয়াদের সামনে আসা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ উৎপাদনের মাধ্যমকে ব্যক্তিমালিকানাধীন রাখার ব্যাপারে পুঁজিবাদের যে মৌলিক তত্ত্ব, সমাজতন্ত্র সেটাকেই হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছিল (যেটা ফ্যাসিবাদ করেনি)। তা ছাড়া, দূরদূরান্তের উপনিবেশেও নিজের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছিল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। পুঁজিবাদীরা এসকল উপনিবেশকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জরুরি তাগিদ অনুভব করতে থাকে। তাদের ভাষ্যমতে "কম্যুনিজমের হুমকি" যেন উপনিবেশের সম্পদ ব্যবহার করতে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করতে হচ্ছিল।

উৎপাদনের এক বিকল্প ধরন হিসেবে সমাজতন্ত্র হয়ে যায় পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের সংগ্রামে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আফ্রিকা। একটি হলো পুঁজিবাদী সমরবিদদের জন্য ঘাঁটি

হিসেবে কাজ করা। আরেকটি হলো আধুনিক অস্ত্রশিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক হরেক রকমের কাঁচামাল জোগান দিয়ে যাওয়া। এসব কাঁচামালের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আণবিক ও পরবর্তীকালের পারমাণবিক অস্ত্রের (হাইড্রোজেন বোমা-সহ) জন্য এসব উপাদান দরকারি। গুরুত্বের দিক দিয়ে ইউরেনিয়ামের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আরও কিছু দুর্লভ খনিজ পদার্থ। যেমন : রোডেশিয়ার লিথিয়াম। নতুন ধরনের এয়ারক্রাফট রকেট, ট্যাংক, বন্দুক, ও বোমা বানাতে প্রয়োজনীয় ইস্পাতে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

প্রতিটি উপনিবেশে আগে থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ছোট ছোট সামরিক ঘাঁটি ছিল। ঔপনিবেশিক যুগের একদম শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে শক্তিশালী করে চলাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হতো। যেমন, ফ্রান্সের ১৯৫৫ সালের বাজেটে উপনিবেশের সামরিক স্থাপনাগুলোর উন্নয়নের জন্য ছয়শ কোটি ফ্র্যাঙ্ক (১ কোটি ৬৮ লাখ ডলার) বরাদ্দ রাখার ব্যাপারে বিশেষ ভোটাভুটি হয়। সেইসাথে ডাকার ও জিবুতির কৌশলগত ঘাঁটিগুলোও শক্তিশালী করা হবে এর মাধ্যমে। এরও কিছুকাল আগে কঙ্গোর কামিনার কাছে একটি বিশাল এয়ার বেইস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছিল বেলজিয়ানরা।

পুরোনো এসকল উপনিবেশে নিয়মিত ঘাঁটি তো আছেই। পাশাপাশি যুদ্ধের সময় আফ্রিকার যেসব অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হাতে আসে, সেখানেও সামরিক স্থাপনা তৈরি করতে সমর্থ হয় তারা। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গ্যানাইজেশান (ন্যাটো)-এর সদস্য হিসেবে তারা ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান এক উপাদান। তাই ফ্যাসিবাদীদের হাত থেকে উত্তর আফ্রিকা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মরক্কো ও লিবিয়ায় বড় বড় বিমানঘাঁটি নির্মাণে সক্ষম হয়। ইটালীয় এরিত্রিয়াতে আমেরিকানরা পদার্পণ করে আধুনিক রাডার স্টেশন-সহ। আর ইথিওপিয়া মেনে নেয় সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব।

নামেমাত্র স্বাধীন হলেও লাইবেরিয়া আমেরিকার এই বিশাল সামরিক উপস্থিতিতে অসম্মতি জানানোর মতো অবস্থায় ছিল না। আমেরিকা যে এতদিন লাইবেরিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে শাসন ও শোষণ করে এসেছে, এটা তারই ফলাফল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৩ সালে মনরোভিয়াতে একটি বন্দর নির্মাণ করতে রাজি হয়। সেইসাথে তারা "বন্দরের স্থানে, ও সার্বিকভাবে এর আশপাশে দক্ষিণ আটলান্টিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বার্থের জন্য এরকম নৌ, বিমান ও সামরিক সুবিধাদি ও স্থাপনা নির্মাণ, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা

ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারে"র ব্যাপারে সম্মতিও আদায় করে নেয়। যুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে লাইবেরিয়ার রাবার্টসফিল্ড বিমানঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালেও এটি সামরিক স্থাপনা হিসেবে বহাল থাকে। পুরো বিষয়টাকে আরও গোছালো করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫১ সালে লাইবেরিয়ার সাথে একটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তিও সম্পন্ন করে।

বলাবাহুল্য, ১৯৫০-এর দশকে বেশির ভাগ আফ্রিকান তখনো ঔপনিবেশিক প্রজা। তাই নিজেদের মাটিকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেওয়া বা না-দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো এখতিয়ারই ছিল না। প্রায় পুরো উত্তর আফ্রিকাকেই ন্যাটোর কার্যক্রমের একটি ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। স্থাপিত ঘাঁটিগুলোর নিশানা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আফ্রিকান জনগণের অজান্তেই সেখানে বেঁধে যেতে পারত একটা পারমাণবিক যুদ্ধও। ডাকার ও নাইরোবির মতো আফ্রিকান শহরগুলোতে ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে খোলামেলা সামরিক সম্মেলনও করত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো। এতে নিমন্ত্রণ করত দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে। বারেবারে প্রমাণ মেলে, কীভাবে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সুবিধার জন্য আফ্রিকাকে ব্যবহার করা হয়েছে। মানে আফ্রিকাকেই বাধ্য করা হয়েছে তার নিজের শোষণে অংশগ্রহণ করার জন্য। এ যেন রীতিমতো উপহাস!

সংকটকালে পুঁজিবাদকে উদ্ধার করার পাশাপাশি এই নির্ভরশীল দেশগুলো পুঁজিবাদের আয়ুও দীর্ঘায়িত করে আসছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই এর অন্তর্নিহিত কিছু দ্বন্দ্ব ও সংঘাত রয়েছে। নির্ভরশীল দেশগুলো এগুলোর ধকল সহ্য করে। একদম শুরু থেকেই পুঁজিবাদের একটি দ্বন্দ্ব ছিল পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মাঝে। ব্যবস্থাটিকে সচল রাখতে হলে শ্রমিকদের ওপর শোষণ ক্রমাগত বাড়াতে থাকতে হবে পুঁজিপতিদের। একই সময়ে আবার ইউরোপীয় শ্রমিকরাও কারখানা ও খনির মতো উৎপাদনের মাধ্যমগুলোর ওপর ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব লাভ করে চলেছে। বড় বড় কোম্পানিতে এবং নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর ভেতরে একসাথে কাজ করতে শিখছে তারা। বুর্জোয়ারা যদি শ্রমিকদের শ্রমের ফসল থেকে তাদের বঞ্চিত করতে থাকে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তাদের অত্যাচার করতে থাকে, তাহলে দুই শ্রেণীর মাঝে বেঁধে যাবে সংঘর্ষ। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই কার্ল মার্কস অনুমান করে আসছিলেন যে, শ্রেণীসংঘাত ঘটবে বিপ্লবের আকারে। তাতে জয়ী হবে শ্রমিকরা। পুঁজিপতিরা এই সম্ভাবনার ব্যাপারে অত্যন্ত আতঙ্কিত। তারা ভালো করেই জানে, সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে এরকম বিপ্লবের মাধ্যমেই

তারা উৎপাদনের মাধ্যমের মালিকানা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এই পরিস্থিতিতে নতুন এক জিনিসের সংযোজন ঘটিয়েছে। মেট্রোপোলে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মাঝে সংঘাত স্থগিত হয়ে রয়েছে এর ফলে।

শুধুমাত্র রাশিয়াতেই শ্রমিক-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আর রাশিয়া ইউরোপের কোনো মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী কেন্দ্র না, বরং একদম কিনারায় অবস্থিত। এ থেকেই বোঝা যায়, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ও জার্মানিতে পুঁজিবাদ কীভাবে থিতু হয়েছে। তারা লাতিন আমেরিকার মতো উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশকে শোষণ করে গেছে, যেখানকার রাষ্ট্রগুলো ছিল নামেমাত্র স্বাধীন।

আফ্রিকা থেকে আগত উদ্বৃত্তের একাংশ দিয়ে ইউরোপীয় শ্রমিকদের সামান্য কয়েকটা সুবিধা বেশি দেওয়া হয়। এটা তাদের বিপ্লবী চেতনা দমন করার জন্য একটা ঘুসের মতো। এই ঘুসের কিছু রূপ হলো বর্ধিত মজুরি, উন্নত কাজের পরিবেশ, এবং সামাজিক সেবা। ইউরোপীয় সমাজ-জুড়ে নানাভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় উপনিবেশায়নের সুফল। বেশির ভাগ পুঁজিবাদী কোম্পানি অল্প দামে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে। এতে করে ইউরোপীয় গৃহিণী একটু দম ফেলার ফুরসত পায়। **যেমন, ইন্সট্যান্ট কফি সাধারণ শ্রমিকের হাতের নাগালে নিয়ে আসে। কিন্তু আইভোরি কোস্ট বা কলম্বিয়ার কফিচাষী যাতে আবার বেশি দাম না পায়, সেটা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানও ঠিক রাখে পুঁজিপতিরা।** এভাবে পুঁজিবাদ পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য মেট্রোপোলের সকল শ্রেণী ও খাতকে সেবা দিয়ে আসছিল।

ঔপনিবেশিক টেবিল থেকে ছিটকে পড়া খাবারের কণাগুলো কুড়িয়ে খাওয়ার জন্য ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। যেই শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা, তারাই তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিপতিরা মেট্রোপোলের শ্রমিকদের ভুল তথ্য ও শিক্ষা প্রদান করেছে। ফলে ঔপনিবেশিক শোষণের ব্যাপারে বেখবর রয়ে গেছে তারা। ভেড়ার মতো গলার রশির টানে টানে হেঁটেছে। পুঁজিপতিদের হাতে নিজেদের দাসত্বকে টিকিয়ে রেখেছে অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ। তারা এখন আর রাজনৈতিক ক্ষমতা চায় না। বরং সামান্য বেশি মজুরির জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা করে। ওদিকে জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেটার সাথে মজুরি কাটাকাটি হয়ে যায়। তারা সৃজনশীলতা ছেড়ে দিয়েছে। বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কে মেনে নিয়েছে তারা। যুদ্ধ ও শান্তির মতো বড় বড় বিষয়ে স্বাধীন মতামত চর্চা করতে অক্ষম। এর ফলে তারা শুধু উপনিবেশের অধিবাসীদের না, নিজেদেরও জবাই করে চলেছে।

ফ্যাসিবাদ ছিল পুঁজিপতি বাপ-মায়ের কোলে জন্ম নেওয়া রাক্ষস। শতাব্দীর

পর শতাব্দী ধরে—মূলত ইউরোপের বাইরে চর্চিত—পুঁজিবাদী পাশবিকতা, শোষণ, আধিপত্য ও বর্ণবাদের চূড়ান্ত ফল এই ফ্যাসিবাদ। বহু অভিবাসী ও ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা যে ফ্যাসিবাদী ঝোঁকের অধিকারী, এ ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিদ্বেষ ফ্যাসিবাদ ছাড়া কিছুই না। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদের শুরু থেকেই শেকড় গাড়তে শুরু করেছিল এটি। বিশেষ করে খনিজ উত্তোলন শিল্প যখন দক্ষিণ আফ্রিকাকে পুঁজিবাদী কক্ষপথে নিয়ে আসে, তখন সেখানে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। উপনিবেশবাদের ফ্যাসিবাদী প্রবণতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যখন ১৯৪০ সালে নাৎসিদের হাতে ফ্রান্স দখল হয়ে যায়। ফরাসি ফ্যাসিবাদীরা হিটলারের সাথে হাত মিলিয়ে ভিশি শাসন প্রতিষ্ঠিত করে ফ্রান্সে। আর আফ্রিকার ফরাসি অভিবাসীরা এই ভিশি শাসনকে সমর্থন জানায়। ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের আরও চমকে-দেওয়া আরেক উদাহরণ দেখা যায় আলজেরিয়ার শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের মাঝে। তারা আলজেরিয়ার স্বাধীনতার বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং মেট্রোপলিটন ফ্রান্সের অধিকতর প্রগতিশীল বা উদারপন্থি সরকারগুলোকে উৎখাত করার জন্যও জোরেসোরে চেষ্টা চালিয়েছে।

স্বয়ং ইউরোপের ভেতরও সুনির্দিষ্ট ও চোখ-খুলে-দেওয়ার মতো কিছু উদাহরণ দেখা যায়। পুঁজিবাদ মানুষের উন্নয়নে যে অল্প কিছু অবদান রেখেছে, ঔপনিবেশিক আচরণের ফলে সেগুলো কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায়—তা বোঝা যায় এসকল উদাহরণ থেকে। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব আফ্রিকায় জার্মান বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যখন কর্নেল ফন লেটো ফিরে আসেন, তখন তাকে পদোন্নতি দিয়ে জার্মান সেনাবাহিনীর জেনারেল বানানো হয়। হামবুর্গে ১৯১৮ সালে জার্মান কম্যুনিস্টদের ওপর গণহত্যায় নেতৃত্ব দেন এই ফন লেটো। এটা ছিল জার্মান ইতিহাসের মোড়-ঘুরিয়ে-দেওয়া এক ঘটনা। কারণ এক বার যেহেতু সবচেয়ে প্রগতিশীল শ্রমিকদের গুঁড়িয়ে দেওয়া গেছে, সেহেতু ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদী শাসনের পথে আর কোনো বাধাই রইল না। তাঙ্গানিকায় নিষ্ঠুরভাবে মাজি মাজি যুদ্ধ দমন এবং নামিবিয়ার (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা) হেরেরো জনগণের ওপর গণহত্যা চালানোর চেষ্টা করে জার্মান শাসকশ্রেণী। এখান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরে তারা ইহুদিদের বিরুদ্ধে এবং জার্মান শ্রমিক ও প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

পর্তুগালে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের সূচনা ঘটে ১৯২৬ সালে। এটি অনুপ্রেরণা পেয়েছে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক অতীত থেকে। সালাযার ১৯৩২ সালে একনায়ক হওয়ার পর বলেন যে, পর্তুগালে তার এই "নতুন রাষ্ট্র" গড়ে উঠেছে "নীচ লোকদের" শ্রমের ওপর ভিত্তি করে। মানে আফ্রিকানরা আরকি।

শুধু তা-ই না। পর্তুগিজ কৃষক ও শ্রমিকদেরও সহ্য করতে হয়েছে পুলিশি আতঙ্ক, দারিদ্র্য, ও অমানবিকীকরণ। তাই স্বদেশে ও বিদেশের উপনিবেশে ফ্যাসিবাদের জন্য চরম মূল্য পরিশোধ করেছে তারা (এবং এখনো করে যাচ্ছে)।

উপনিবেশবাদ পশ্চিম ইউরোপের শাসকশ্রেণী ও সার্বিকভাবে পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করেছে। বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে এসে এটি উৎপাদনের মৃতপ্রায় একটি ধরনকে স্পষ্টতই নতুন জীবন দান করে যাচ্ছিল। ওই সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের বাদে অন্য যে-কারও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বলা চলে যে, উপনিবেশবাদ ছিল এক রাক্ষুসে প্রতিষ্ঠান। মানবের মুক্তিকে জাপটে ধরে আটকে রেখেছিল সে।

বিস্তারিত দেখুন :

এখানেও পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকারী লেখকের সংখ্যা কম। উপনিবেশ থেকে মেট্রোপোলে উদ্বৃত্ত সম্পদ ও অন্যান্য সুবিধা পাচারের পেছনে এই দুই ব্যবস্থার আঁতাত নিয়ে তেমন কেউই কাজ করেননি। যা-ও বা কিছু আলোচনা হয়েছে, সেখানেও কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণ নেই। সত্যি বলতে, সেখানে বরং মেট্রোপোলিটান দৃষ্টিভঙ্গিই উঠে আসে। ইউরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান মার্ক্সবাদীরা অনেকেই নিজ নিজ দেশে আধুনিক পুঁজিবাদের হিংস্র চেহারা উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কিন্তু আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার শোষণের বৃহত্তর চিত্রের সাথে তার সংযোগ দেখাননি। নব্য-উপনিবেশবাদী যুগের হাতে-গোনা কিছু উদাহরণ শুধু ব্যতিক্রম।

জর্জ প্যাডমোর, *আফ্রিকা : হাউ ব্রিটেন রুলস আফ্রিকা*। লন্ডন : উইশার্ট বুকস লিঃ, ১৯৩৬।

কোয়ামে এনক্রুমা, *আফ্রিকা মাস্ট ইউনাইট*। নিউ ইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৭০।

_______, নিও-কলোনিয়ালিজম, *দ্য হাইয়েস্ট স্টেইজ অব ইম্পেরিয়ালিজম*।

ডাব্লিও.এ. হান্টন, *ডিসিশান ইন আফ্রিকা*। নিউ ইয়র্ক : ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৫৭।

এই তিনজন লেখকই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় সর্ব-আফ্রিকানবাদী বুদ্ধিজীবী। ইউরোপের প্রতি আফ্রিকার অবদানের ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

গ্রোভার ক্লার্ক, *দ্য ব্যালেন্স শীটস অব কলোনিয়ালিজম।* নিউ ইয়র্ক : রাসেল অ্যান্ড রাসেল, ১৯৬৭।

ডি.কে. ফিল্ডহাউজ, *দ্য কলোনিয়াল এম্পায়ার্স।* নিউ ইয়র্ক : ডেলাকোর্টে প্রেস, ১৯৬৬।

এই দুটি বইয়ে বলা হয়েছে যে, উপনিবেশবাদ মৌলিকভাবে অর্থনৈতিক কোনো বিষয় নয়, এবং উপনিবেশকদের কোনো উপকারও হয়নি। দ্বিতীয় বইটি সাম্প্রতিক, আর এই মত এখনো বহাল তবিয়তে জীবিত।

ইউ.এস.এস.আর. *ইন্সটিটিউট অব হিস্ট্রি, আ হিস্ট্রি অব আফ্রিকা ১৯১৮-১৯৬৭।*

পিয়েরে জালেই, *দ্য পাইলেইজ অব দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড।* নিউ ইয়র্ক : মান্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭০।

এই (মার্ক্সবাদী) বইগুলো বিশেষভাবে আফ্রিকা এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের শোষিত অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। বলেছে যে, মেট্রোপোলগুলো বেশ মোটা অঙ্কের ঔপনিবেশিক উদ্বৃত্ত গলাধঃকরণ করে গেছে।

৬

আফ্রিকাকে অনুন্নত করার ব্যবস্থা হিসেবে উপনিবেশবাদ

"শ্বেতাঙ্গের বোঝা বইতে বইতে কৃষ্ণাঙ্গকেই চরম মূল্য দিতে হয়।"
—জর্জ প্যাডমোর (ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান) সর্ব-আফ্রিকানবাদী, ১৯৩৬

"ঔপনিবেশিক সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাও ঔপনিবেশিক শক্তির খাদেম... দাসত্বের আমলে শিক্ষা ছিল দাস তৈরিরই একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র।"
—মোজাম্বিক লিবারেশান ফ্রন্ট, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের ভাষ্য, ১৯৬৮

আফ্রিকায় পুঁজিবাদের কথিত সুবিধাসমূহ

❁ আর্থসামাজিক বিভিন্ন সেবা

আফ্রিকায় ইউরোপীয় শোষণের বিভিন্ন প্রমাণ দেখে অনেক বুর্জোয়া লেখক আংশিকভাবে হলেও মেনে নেয় যে, উপনিবেশবাদ আসলে মেট্রোপোলের স্বার্থই রক্ষা করে আসছিল। এসবের পরেও তারা বলতে চায়, ইউরোপীয়রা আফ্রিকানদের জন্যে কী কী করেছে। এভাবে উপনিবেশবাদের একটা ব্যালেন্স শীট তৈরি করতে চায় তারা। এই হিসাব খাতায় সব ডেবিট ক্রেডিট বসানোর পর তারা প্রায়ই উপসংহার টানে যে, খারাপের চেয়ে ভালোর পরিমাণই বেশি। এই উপসংহারকে সহজেই প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। কিন্তু তার আগে আরেকটা বিষয় দেখানো প্রয়োজন। যেই যুক্তি-প্রক্রিয়ায় তারা এই উপসংহারে এল, ওই প্রক্রিয়াটাই ভ্রান্ত। কারণ তাদের যুক্তির মধ্যে রয়েছে কিছু আবেগী আবেদন। তারা গণমানুষকে বুঝ দিতে চায় যে, "এত কিছুর পরও এখানে মুদ্রার দুটি

পিঠ রয়েছে।" তাদের মতে, একদিকে নিপীড়ন আর শোষণ ছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে আফ্রিকার উন্নয়নে ও স্বার্থরক্ষায় ঔপনিবেশিক সরকারের বিরাট অবদানও ছিল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এটা ডাহা মিথ্যা। উপনিবেশবাদের শুধু একটাই দিক—ওরা একচোখা জলদস্যু।

আফ্রিকানদের কল্যাণে ঔপনিবেশিক সরকার কী করেছে আসলে? বলা চলে রেলপথ, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালের মতো অবকাঠামো নির্মাণ। কিন্তু এসবের সম্মিলিত সেবার পরিমাণ ভয়ানক তুচ্ছ।

উপনিবেশবাদের প্রথম তিন দশকে আফ্রিকায় যা হয়েছে, তাতে আফ্রিকানদের মঙ্গল কিছু হয়েছে তা বলা দুঃসাধ্য। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক সেবার যে তোড়জোড়, তা নীতিনির্ধারণী একটা চাল মাত্র। এগুলোর সেবার পরিমাণ যে কত কম ছিল, তা আসলে বলার অপেক্ষাই রাখে না। সর্বোপরি আফ্রিকাকে অনুন্নত প্রমাণ করতে যে পরিসংখ্যান দেখানো হয়, তা আসলে উপনিবেশ-পরবর্তী পরিসংখ্যান। স্বাধীনতার প্রথম এক দশকে শিক্ষা, চিকিৎসা আর বাসস্থানের মতো সেবাগুলোতে আফ্রিকা যেরকম উন্নতি করেছে, তা উপনিবেশকদের রেখে যাওয়া পরিমাণের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সুতরাং, উপনিবেশকালের তুচ্ছ কিছু সামাজিক সুবিধাকে লাগামহীন শোষণের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে যদি বলা হয় 'খারাপের চেয়ে ভালোই বেশি', তাহলে তা হবে নির্লজ্জতম ধোঁকাবাজি।

পুঁজিবাদ অবশ্য ইউরোপীয় শ্রমিকদের জন্যে সামাজিক সেবা নিশ্চিত করেছে ঠিকই। কিন্তু প্রথম প্রথম সেই সেবা ছিল বুর্জোয়া আর মধ্যবিত্তদের প্রদানকৃত সেবার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র। আর পরবর্তীকালে নীতিমালার অংশ হিসেবেই তা প্রদান করা হতে থাকে। কিন্তু আফ্রিকায় এসবের কাছাকাছিও কিছু ঘটেনি। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটেনের আবির্ভাবের বহু আগে ১৯৩৪ সালে এই দ্বীপ রাষ্ট্র নিজভূমে সামাজিক সেবার জন্যে জনপ্রতি বরাদ্দ রাখত ৬ পাউন্ড ১৫ শিলিং (১৬২০ পেন্স)। আর ঘানায় তখন সামাজিক সেবার জন্যে বরাদ্দ ছিল জনপ্রতি ৭ শিলিং ৪ পেন্স মাত্র (৮৮ পেন্স)।[৯] সেটাও আবার উপনিবেশিক মানদণ্ডে সর্বোচ্চ। নাইজেরিয়া আর নিয়াসাল্যান্ডে এই বরাদ্দ ছিল ১ শিলিং ৯ পেন্সের চেয়েও কম (২১ পেন্স)। অন্য কোনো ঔপনিবেশিক শক্তিও এর চেয়ে ভালো কিছু করছিল না, বরং এর চেয়ে বাজে অবস্থাই ছিল অন্য সবখানে।

[৯] ১৯৭১ সালে ডেসিমালাইজেশানের আগে, ১ পাউন্ড = ২০ শিলিং, ১ শিলিং = ১২ পেন্স, তাহলে ১ পাউন্ড = ২৪০ পেন্স।

পর্তুগিজরা এখানে একদম অনন্য। কারণ তাদের দাম্ভিকতা আকাশচুম্বী কিন্তু কাজের বেলায় ঠনঠন। পর্তুগিজরা গর্ব করে বলে, অ্যাঙ্গোলা, গিনি আর মোজাম্বিক প্রায় পাঁচশত বছর তাদের করায়ত্ত ছিল। আর এই পুরো সময়টা ধরেই নাকি চলেছে এক "সভ্যকরণ অভিযান"। তারপর দেখা গেল, এই পাঁচশত বছরে শ্বেতাঙ্গদের চাপানো সেই সভ্যতার বোঝা টানতে গিয়ে মোজাম্বিকে একজনও ডাক্তার তৈরি হয়নি, পূর্ব অ্যাঙ্গোলার মাথাপিছু গড় আয়ু ত্রিশের নিচে গিয়ে ঠেকেছে। আর এদিকে গিনি বিসাউয়ের ব্যাপারে পর্তুগিজরাই স্বীকার করেছে যে, সেখানকার অবস্থা মোজাম্বিক আর অ্যাঙ্গোলার তুলনায়ও খারাপ!

তার ওপর ঔপনিবেশিক যুগের সীমিত সামাজিক সেবাগুলোর বণ্টন এমন ছিল, যেটা শাসন আর শোষণেরই প্রতিচ্ছবি। প্রথমত, শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী আর প্রবাসীদের আবদার ছিল মেট্রোপোলের মতো বুর্জোয়া-মানদণ্ডে জীবনযাপন করা। এরা আফ্রিকায় বিলাসী জীবনযাপনে বদ্ধপরিকর। কারণ এদের অধিকাংশই এসেছিল ইউরোপের দরিদ্র পরিবার থেকে। স্বদেশে এসব সেবা লাভের কথা কল্পনাই করতে পারত না তারা। আলজেরিয়া, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উপনিবেশগুলোতে শ্বেতাঙ্গরা এমন এক অবকাঠামো বিনির্মাণ করে, যেখানে তারা নিজেরা বিলাসী জীবন কাটাতে পারে। আর এ থেকেই বোঝা যায়, এইসব সেবা থেকে আফ্রিকা আসলে কোনো উপকারই পায়নি।

আলজেরিয়াতে শ্বেতাঙ্গ দখলদারদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৩৯ জন; কিন্তু শহুরে আলজেরিয়ানদের মধ্যে এই হার ছিল হাজারে ১৭০ জন। অর্থাৎ স্বাস্থ্য, মাতৃত্ব বা পয়ঃনিষ্কাশন সেবাগুলো আবর্তিত হতো পশ্চিমা দখলদারদের কেন্দ্র করেই। ঠিক একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক অবস্থার আসল রূপ বুঝতে হলেও পরিসংখ্যানকে অন্তত দুইভাগে ভাগ করতে হবে—সাদা আর কালো। ব্রিটিশ-শাসিত পশ্চিম আফ্রিকায় এমন ভাগ ছিল তিনটি। এক, 'সব পেয়েছি'র দলে থাকা ইউরোপীয়রা; দুই, ইউরোপীয়দের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাওয়া ভারতীয়রা; আর তিন, নিজের দেশেই নিগৃহীত হতভাগা আফ্রিকানরা।

যেসব দেশ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত, সেখানেও সামাজিক সেবার সিংহভাগই গেছে শ্বেতাঙ্গদের ভোগে। নাইজেরিয়ার দক্ষিণাংশ এমনই এক উপনিবেশ। এরাই নাকি দয়াময়ী মাতৃরাষ্ট্র থেকে সুবিধা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইবাদান আফ্রিকার সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এক শহর। সেখানে সব মিলিয়ে জনা

পঞ্চাশেক ইউরোপী বসবাস করত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। এই গুটিকয়েক মানুষের জন্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ১১ শয্যা এবং সুন্দর পরিবেশবিশিষ্ট আলাদা হাসপাতালই বানিয়ে ফেলে। আর পাঁচ লক্ষাধিক কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে ছিল মাত্র ৩৪টি শয্যা। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। সুতরাং সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০০ ইউরোপীয়দের জন্যে ১৯৩০-এর দশকে আধুনিক সুবিধা-সম্বলিত হাসপাতালের সংখ্যা ছিল বারোটি, অন্যদিকে প্রায় ৪ কোটি আফ্রিকানের জন্যে বরাদ্দ ছিল ৫২টি হাসপাতাল।

সামাজিক সেবার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে। এসব কর্মকাণ্ড অভাবনীয় রকমের লাভজনক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে খনিজ উত্তোলন খাতে। খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রচুর ধকল যায়। মেট্রোপোলের শ্রমিকেরা জীবন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষার মতো ডাক্তারি ও বীমা সেবাগুলো পেতে শুরু করেছে এই সেদিন। আর ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় খনি শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা ছিল একেবারেই যাচ্ছেতাই। তাঙ্গানিকার লুপা স্বর্ণখনিতে ১৯৩০ সালে স্কার্ভির মতো আরও কিছু মহামারি দেখা দেয়। শতাধিক শ্রমিক প্রাণ হারায় এতে। বলাবাহুল্য, এদের কাছে জীবন বাঁচাবার মতো ন্যূনতম সুবিধাদিও ছিল না। খাবারের পয়সাই তো দেওয়া হতো না এদের।

দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহৎ আফ্রিকান শ্রমিক জনগোষ্ঠী বরাবরই ছিল দুঃখের সায়রে। যক্ষা কমিশনের ১৯১২ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ঘিঞ্জি শহরগুলোতে এমন একটা পরিবার ভাগ্যগুণে মিলানোও দুঃসাধ্য, যেখানে কেউ না কেউ যক্ষ্মায় ভুগছে না বা মারা যাচ্ছে না। হাসপাতাল-সেবা এতটাই অপ্রতুল যে, দুরারোগ্য ব্যাধি যক্ষ্মা-আক্রান্তকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ধুঁকে ধুঁকে মরার জন্য। সেখানে আরও ছড়িয়ে পড়ে এই ছোঁয়াচে রোগ। কিছু এলাকায় ৪০,০০০ জনের বিপরীতে ডাক্তার ১ জন মাত্র। আর স্থানীয়দের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা পেতে অর্থনৈতিক কোনো ছাড় নেই। হতদরিদ্র রোগীদের জন্যে নেই কোনো বিশেষ বরাদ্দ। পঁয়ষট্টি শতাংশেরও বেশি শিশু মাত্র দুবছর হবার আগেই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে।

এসব ছিল ১৯১২ সালের দিকের ঘটনা, যখন দক্ষিণ আফ্রিকার সোনা আর হীরের সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। এরপর ঘিঞ্জি শহরের সংখ্যা বেড়ে যায়, বস্তির পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, আর এদিকে সরকার জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টির মতো ঘৃণ্য পদক্ষেপ হাতে নেয়। এর মানে বর্ণের ভিত্তিতে জনগণকে পৃথক করে ফেলা, যাতে আরও ভালো করে আফ্রিকানদের শোষণ করা যায়।

অনেক আফ্রিকান গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পাড়ি জমায়। কারণ, যত খারাপই হোক, শহর ছিল মন্দের ভালো। আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, কলের জল, বাঁধানো পাকা রাস্তা, স্বাস্থ্যসেবা আর বিদ্যালয় সেবাগুলো ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকে শেষ অবধি গ্রামীণ আফ্রিকানদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই ছিল। তবে এই পল্লী অঞ্চলই ছিল অর্থকরী ফসলের উৎপাদক আর শ্রমিকের জোগানদাতা, যেগুলো কিনা ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার চালিকাশক্তি। ঔপনিবেশিক হিসেবখাতার "ক্রেডিট"গুলো সম্পর্কে এসব চাষাভুষার কোনো ধারণাই ছিল না।

যেহেতু এই অল্পবিস্তর সামাজিক সেবার উদ্দেশ্যও ছিল শোষণ, সেহেতু আফ্রিকানরা ওসব সেবার কিছুই পায়নি। অথচ তাদের শ্রমের সরাসরি উদ্বৃত্ত সম্পদই রপ্তানি হতো মেট্রোপোলে। অর্থাৎ, শোষিত আফ্রিকানদের থেকে যে সম্পদ আহরিত হয়েছে, সেগুলোর কিছুই তাদের স্বগোত্রীয়দের কল্যাণে বিনিয়োগ হয়নি।

এই কথার পক্ষে একাধিক উদাহরণ দেওয়া যাবে। যে উপনিবেশ যত "ধনী", উপনিবেশবাদের অধীনে সেটি সামাজিক সেবা পেতও তত বেশি। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় র‍্যান্ড আর কঙ্গোতে কাতাঙ্গা তুলনামূলকভাবে বিশাল এক শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য হয়। অনেক বছর যাবৎ এই কাজটা তারা করে গেছে বিশেষ কোনো ভাবাবেগ ছাড়াই। কিন্তু শেষে গিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি দারুণ একটা উপলব্ধি অর্জন করে যে, স্বাস্থ্যবান আর সাক্ষর শ্রমিক থাকলে তো দিনশেষে তাদেরই লাভ। ইউরোপীয় পুঁজিপতিরাও ঠিক এই কারণেই সেখানকার শ্রমিকদের প্রতি আরেকটু দিলখোলা হয়। শ্রমিকদের শ্রমের কিছু ফল অন্তত তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়, যাতে তাদের জীবিত ও সুস্থ রাখা যায়।

আফ্রিকার অর্থকরী ফসল-উৎপাদক দেশগুলোর পরিস্থিতিও একই। যেসব স্থানে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন কম, সেখানে আর্থসামাজিক সেবার পরিমাণও কম। ডাহোমি, তাঙ্গানিকা আর চাদের তুলনায় উগান্ডা, গোল্ড কোস্ট বা নাইজেরিয়ার আফ্রিকানরা কেন বেশি "অবস্থাপন্ন"—তার কারণ এখান থেকে বোঝা যায়।

একেকটা দেশের ভেতরেও দেখা যায় উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক বৈষম্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কোন অঞ্চল কী পরিমাণ সম্পৃক্ত, তার ভিত্তিতে হতো এই তারতম্য। কেনিয়ার উত্তরাঞ্চল বা সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের মতো এলাকাগুলো উপনিবেশককে তেমন কিছু দিতে পারেনি। তাই ঔপনিবেশিক শক্তিও তাদের

রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা হাসপাতাল সেবা দেয়নি। এমনকি কোনো উপনিবেশের জেলা পর্যায়েও দেখা যেত সামাজিক সুবিধার চরম বৈষম্য। যেমন, প্ল্যান্টেশান কোম্পানি তাদের শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করত। কারণ শ্রমিকদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাটাও এক প্রকারের বিনিয়োগ। সাধারণত সেইসব হাসপাতালে ওই বিশেষ কোম্পানির শ্রমিকরাই সেবা পেত। এছাড়া আশপাশের সুবিধাবঞ্চিত এবং অর্থনীতির বাইরে-থাকা সর্বসাধারণ আফ্রিকানরা ছিল যারপরনাই অবজ্ঞার শিকার।

আরুশা ঘোষণাপত্র আফ্রিকার ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার সবচেয়ে নিগূঢ় সত্যিটা উন্মোচন করে দিয়ে বলে, "আমরা নিপীড়িতও হয়েছি মারাত্মকভাবে, শোষিতও হয়েছি মারাত্মকভাবে, এবং উপেক্ষিতও হয়েছি মারাত্মকভাবে।"

নিপীড়িত, শোষিত আর উপেক্ষিত হবার সম্মিলিত চিত্র সবচেয়ে ভালোভাবে ভেসে ওঠে আফ্রিকান উপনিবেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে : বিশেষ করে সড়ক ও রেল খাতে। এখানে আমদানি-রপ্তানির জন্য কোন এলাকাটি বেশি দরকারি, তার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ভৌগোলিক বৈষম্য চোখে পড়ে। যেখানে রপ্তানির সম্ভাবনা অপ্রতুল, সেখানে স্বভাবতই যোগাযোগ ব্যবস্থা অবহেলিত। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ছিল অবশ্য। যেসব জায়গায় সড়ক ও রেলপথ বানালে সশস্ত্র বাহিনী ও রসদ পরিবহন সহজ হবে, সেসব জায়গায় এ কাজ ঠিকই করা হয়। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচার আর আগ্রাসনের পথ আরও সুগম করা।

ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকান যোগাযোগ-ব্যবস্থা এজন্যে গড়ে ওঠেনি, যাতে করে স্থানীয়রা বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে। এমনকি আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ পণ্যের বাণিজ্য সচল রাখতেও তৈরি হয়নি এসকল রাস্তাঘাট। আন্তঃঔপনিবেশিক যোগাযোগ বা একই উপনিবেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তাতে আফ্রিকার চাহিদা বা উন্নয়নের কথা মোটেও মাথায় রাখা হয়নি। সকল রাস্তাঘাট আর রেলপথ সাগরমুখী করে তৈরি। আর এসব তৈরি হয়েছিল কেবল সোনা বা ম্যাঙ্গানিজ বা কফি অথবা তুলা আহরণের জন্যেই। এসবের উদ্দেশ্যই ছিল কাঠ ব্যবসায়ী, ভূসামন্ত আর শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের তেলা মাথায় তেল মাখা। আর যদি আফ্রিকানরা কেউ এর সুবিধা পেয়েও থাকে, তা নিতান্তই কাকতালীয়। অথচ আফ্রিকায় এসব ধকলের সিংহভাগ সহ্য করতে হয়েছে শ্রমিকদের; পুঁজিপতিদের না। ন্যূনতম পুঁজি বিনিয়োগ করে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো হাজার হাজার শ্রমিককে খাটাতে পারত। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আর পুলিশ ছিল বেতনভুক্ত। আর শ্রমিকদের শ্রম আদায় করা হতো কেবল ঔপনিবেশিক

আইন, বলপ্রয়োগ আর হুমকির মাধ্যমে। রেলপথের কথাই ধরুন। ইউরোপ-আমেরিকায় রেলপথ নির্মাণে কী ব্যাপক পরিমাণ মূলধন দরকার। শ্রমিকের উচ্চহারে মজুরির সাথে রয়েছে কাজকে ত্বরান্বিত করতে প্রণোদনা বা বোনাস। অন্যদিকে আফ্রিকায় এই কাজ করিয়ে নিতে মজুরি লাগত কেবল চাবুকের আঘাত। আর কাজ দ্রুত আদায় করতে আরও বেশি চাবুকের আঘাত।

ব্রেজাভিল থেকে নয়খ পয়েন্ট পর্যন্ত (ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত) কঙ্গো রেলপথ নির্মাণে কী পরিমাণ আফ্রিকান প্রাণহানি হয়েছিল, তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট পুঁজি ছিল না বলেই এত বিপত্তি। আর এজন্যেই ক্রেন কিংবা বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতির জায়গা নিতে হয়েছে এক বিশাল মানবশক্তিকে। এর অবস্থার তুলনা চলে নাইরোবির এম্বাকাসি বিমানবন্দর নির্মাণের সাথে। যেহেতু এর নির্মাণ হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে (কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৩ সালে), তাও আবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঋণ নিয়ে, সেহেতু উপনিবেশকরাই এর কৃতিত্ব পায়। কিন্তু আসল কথা হলো, কেনিয়ার লোকেরা ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে এই বিমানবন্দর নির্মাণ করেছিল একেবারে নিজেদের হাতে।

এম্বাকাসি প্রাথমিক পর্যায়ে ৪টি রানওয়ে-সম্বলিত এবং ৭ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ছিল। এই বিমানবন্দরকে বলা হয়ে থাকে "পৃথিবীর সর্বপ্রথম হস্তনির্মিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।" সম্ভবত কয়েক হাজার মাও মাও শ্রমিক[১০] সেখানে "লক্ষাধিক টনের মতো খনন কাজ, গর্ত ভরাটের কাজ বা পাঁচ লক্ষাধিক টনের মতো পাথর বসানোর কাজ করেছে অস্ত্রের মুখে। আর এসব করতে তাদের খালি হাতে ছিল কেবল শাবল আর পাথরের হাতুড়ি।"

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় ইউরোপমুখী যোগাযোগ-ব্যবস্থা যেভাবে আফ্রিকানদের স্বার্থকে অবহেলা করেছে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তা করেছে এর চেয়েও নিকৃষ্টভাবে। ব্যাংকগুলো স্থানীয়দের কদাচিৎ ঋণ দিত। ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকায় ১৯৩১ সালের "স্থানীয়দের ঋণপ্রদান (সীমিতকরণ) অধ্যাদেশ" জারি করা হয়। আফ্রিকানদের ঋণ দেওয়াকে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় এর মাধ্যমে। বীমা কোম্পানিগুলি প্রায় একচ্ছত্রভাবে শুধু শ্বেতাঙ্গ আর পুঁজিবাদীদেরই সেবা দিত। মেট্রোপলিটন মুদ্রায় উপনিবেশের জন্য যে রিজার্ভ রাখা হতো, তাও আফ্রিকানদের জন্যে বৈরী এক "সেবা"। কারেন্সি বোর্ড আর কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সেবা দিত। তারাই আফ্রিকানদের নিজেদের রপ্তানি-আয়ের ওপর হাত দিতে দেয়নি। বরং ব্রিটেন, ফ্রান্স আর বেলজিয়ামে

[১০] ১৯৫০-এর দশকে কেনিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহী আন্দোলনে জড়িত শ্রমিক শ্রেণি।

রাখা ঔপনিবেশিক রিজার্ভ ছিল আসলে ইউরোপের কাছে আফ্রিকার ঋণ এবং ইউরোপে বিনিয়োগকৃত মূলধন।

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় এবং এশিয়ায় ইউরোপীয় বিনিয়োগের যে ধারণা জনমনে প্রচলিত এবং প্রশংসিত, তা পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিনিয়োগের জন্যে যে অর্থের জোগান ছিল, তা এসেছে মূলত ইউরোপে ও সমগ্র পৃথিবীতে শ্রমিক আর কৃষককে লুট করার মাধ্যমে। আর আফ্রিকার ক্ষেত্রে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাণিজ্যে করা সকল বিনিয়োগের অর্থ এসেছে মূলত দাসব্যবসা থেকে। পর্তুগিজ সরকারই সর্বপ্রথম আফ্রিকা থেকে বন্দিদের ইউরোপে এনে দাস হিসেবে বিক্রি করত, আবার তারাই সবার শেষে এই ব্যবসা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। এই ব্যবসায় লভ্যাংশের অধিকাংশই তাদের হাতছাড়া হয় ব্রিটিশ আর জার্মানদের কাছে। তবুও এই পর্তুগিজ দাসব্যবসা তাদের ঔপনিবেশিক ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোতে অর্থায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। যেমন : অ্যাঙ্গোলা আর মোজাম্বিকে কৃষি ও খনিজ উত্তোলন কোম্পানির যৌথবাণিজ্যে।

ইউরোপের বড় বড় বন্দরনগরের যে উদ্যোক্তারা আফ্রিকা থেকে ইউরোপে কৃষিপণ্য আমদানি শুরু করে, তারাই এককালে জড়িত ছিল দাসব্যবসায়ে। এই একই কথা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডের ভু কোম্পানির ক্ষেত্রেও খাটে। ঔপনিবেশিক যুগের বহু স্বনামধন্য পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানের পুরো পুঁজিই এসেছে দাসব্যবসা বা দাসপ্রথা থেকে। বিখ্যাত বীমা আর ব্যাংক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লয়েড এই কাতারেই পড়ে। তাদের পুঁজির পুরোটাই এসেছে ১৭ আর ১৮ শতকের ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাসব্যবসার লভ্যাংশ থেকে। বিশ্বখ্যাত Barclays ব্যাংকের পূর্বসূরিরা এই দাস ব্যবসাতেই জড়িত ছিল। ফরাসি ওর্মস এ কম্পাইন-ও একই ঝাঁকের কই। অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দাসবাণিজ্যের সাথে ওর্মসের শক্তিশালী যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এশিয়া আর আফ্রিকায় ফরাসি রাজত্বের সাথে বাণিজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এরাই। এদের ব্যবসা মূলত ছিল মাদাগাস্কার আর ভারত মহাসাগর-কেন্দ্রিক।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইউনিলিভার বা ইউএসি এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল। সেটা থেকেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, আফ্রিকার শ্রমিকদের শ্রম থেকে উৎপাদিত পুঁজি দিয়েই উলটো শোষণ করা হচ্ছিল তাদের। লিভার ব্রাদার্স যখন ১৯২৯ সালে নাইজার কোম্পানিকে কিনে নেয়, তখন তারা হয়ে ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর আফ্রিকার সবচেয়ে জঘন্য শোষকদের উত্তরাধিকারী।

নাইজার কোম্পানি ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৭ সালের সময়টায় ছিল পূর্ণাঙ্গ সরকারি সমর্থনপুষ্ট পুলিশি ক্ষমতাধর এক প্রতিষ্ঠান। এই সময়টায় এটি নাইজেরীয়দের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। এছাড়া একচেটিয়া নাইজার কোম্পানি এমন সব ছোট কোম্পানিকে কিনে নিয়েছিল, যাদের মূলধনের উৎস কেবলই দাসব্যবসা। ঠিক একইভাবে যখন ইস্টার্ন আর আফ্রিকান ট্রেডিং কোম্পানি দুটি এক হয়ে ইউএসি এর জন্ম হয়, তখন এর বহু বিনিয়োগকারীর পারিবারিক শেকড় ছিল ইউরোপীয় দাসবাণিজ্য। আর এমন করে ঘাঁটলে জানা যাবে যে, ফরাসি কোম্পানি সিএফএও আর এসসিওএ'র বিনিয়োগও একই উৎস থেকে আগত।

মূলধন পুঞ্জীভূত করা ও পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম আফ্রিকায় যে ধারাবাহিকতা ছিল, পূর্ব আফ্রিকায় তা দেখা যায় না। প্রথমত, আরব ও ইউরোপীয়রা পূর্ব আফ্রিকার দাসবাণিজ্যের অংশীদার ছিল। দ্বিতীয়ত, জার্মানরা এই ব্যবসায় বাগড়া দেয় ১৮৮৫ সালের দিকে, যদিও তারা প্রথম দিকে এটা করেনি। ওদিকে ফরাসিরা (যারা আঠারো এবং উনিশ শতকে পূর্ব আফ্রিকায় ইউরোপীয় দাসবাণিজ্যের নেতা) পূর্ব আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের চেয়ে বরং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে উপনিবেশ স্থাপনে বেশি ব্যস্ত ছিল। তৃতীয়ত, জার্মান উপনিবেশের স্থায়িত্ব মূলত ১৯১৪-১৮ এর যুদ্ধের পর আর টিকে থাকতে পারেনি। তবুও স্মিথ ম্যাকেঞ্জি ফার্মের কল্যাণে পূর্ব আফ্রিকায় ব্রিটিশদের এই ব্যবসায় আবার লাভের দেখা মেলে।

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় পরবর্তীকালে যে বিনিয়োগ হয়েছে, তার সবই মূলত উনিশ শতকের ধারাবাহিকতার ফলাফল। সাথে ছিল মেট্রোপোল থেকে আগত পুঁজি। সম্পদের এসব কথিত নতুন উৎসকে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এগুলো কোনো-না-কোনোভাবে ইউরোপের বাইরের মানুষকে শোষণ থেকে করা আয়। কিন্তু আফ্রিকায় ব্যবসা-পরিচালনাকারী সব প্রতিষ্ঠানই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাসবাণিজ্যের সাথে বা মহাদেশটির অতীত-শোষণের সাথে জড়িত ছিল—তা প্রমাণ করা জরুরি নয়। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইউরোপের প্রাথমিক পুঁজির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে বাইরের দেশগুলো। আর আফ্রিকায় ব্যবসা থেকে যে লভ্যাংশ আসত, তা অন্য সব উপনিবেশের আয়কে সবসময় ছাড়িয়ে যেত।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ ও হীরের ব্যবসার ব্যাপারে একজন রক্ষণশীল বুর্জোয়া লেখকের ভাষ্যে :

> প্রাথমিকভাবে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল [হীরা শিল্পে], এর বাইরের

সব মূলধন ব্যয়ও আসত মুনাফা থেকেই। আন্তর্জাতিক হীরাব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোও এই শিল্প থেকে প্রচুর লাভ অর্জন করে। এর এক অদ্ভুত গুরুত্ব ছিল। কারণ হীরাব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পরবর্তীকালে র‍্যাড [স্বর্ণব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান]-এর উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়েছে।

একইভাবে অ্যাঙ্গোলায় ডায়ম্যাং হীরা কোম্পানি যা বিনিয়োগ করেছিল, তার পুরোটাই উঠে আসে খুব দ্রুত। তারপর তারা নেমে পড়ে নতুন মূলধন তৈরিতে। এই কোম্পানি শুধুমাত্র ১৯৫৪ আর ১৯৫৫ সালে যে পরিমাণ লাভ করে, তা তাদের সমস্ত বিনিয়োগের ১৪০ শতাংশ। বিনিয়োগের বা পরিচালন ব্যয়ের অতিরিক্ত অংশ স্বভাবতই পাচার হতো পর্তুগাল, বেলজিয়াম আর যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে ডায়ম্যাং কোম্পানির অংশীদারেরাই ছিল অধিবাসী। সেই অর্থে অ্যাঙ্গোলা আসলে সেসব দেশেই বিনিয়োগ করছিল।

সেই অর্থে বলা চলে, উপনিবেশগুলোই ছিল মূলধনের উৎপাদক। অথচ এই দেশগুলোতে ইউরোপীয় বিনিয়োগ হবার কথা ছিল।

মূলধন প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হচ্ছিল মেট্রোপোল থেকে নির্ভরশীল দেশগুলোতে, এক উপনিবেশ থেকে আরেক উপনিবেশে (মেট্রোপোল হয়ে), মেট্রোপোল থেকে মেট্রোপোলে, এবং উপনিবেশ থেকে মেট্রোপোলে। কিন্তু দাসপ্রথার আমল থেকেই যেহেতু মহামুনাফা সৃষ্টি হচ্ছিল অ-ইউরোপীয়দের হাতে, সেহেতু মূলধন মূলত উপনিবেশ থেকে মেট্রোপোলেই যাচ্ছিল বেশি। যা ছিল আগের বছরের লভ্যাংশ, তা-ই পরের বছর হয়ে যেত বিনিয়োগ-উপযোগী মূলধন। এমনকি অনেক প্রগতিশীল লেখকেরও ভুল ধারণা ছিল এ ব্যাপারে। তারা ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় পুঁজি "রপ্তানি" এবং "বিদেশি" বিনিয়োগ নিয়ে কথা বলেছেন। অথচ ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় এই বিনিয়োগের উৎস বিদেশি ছিল না, বরং এই বিনিয়োগের মালিকানাই শুধু ছিল বিদেশি।

উপনিবেশের পক্ষে সাফাই-গাওয়া ব্যক্তিরা চট করে বলে দেয় যে, আফ্রিকায় স্কুল কিংবা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মতো সেবাগুলোর টাকার জোগান এসেছে ব্রিটিশ, ফরাসি আর বেলজিয়ান করদাতাদের থেকে। আর এর মাধ্যমে আশ্চর্যজনকভাবে একটা ব্যাপার এড়িয়ে যায় তারা। উপনিবেশ থেকে আয় হতো লক্ষ কোটি ডলার। সেখানে কয়েক হাজার ডলার সামাজিক সেবার জন্যে নাকি ইউরোপীয় করদাতাদের নমঃনমঃ করতে হবে! আসল ব্যাপারটা এরকম : আফ্রিকান শ্রমিক আর কৃষকেরা ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের জন্যে নির্দিষ্ট মূল্যের সেবা আর পণ্য উৎপাদন করেছে। এরই কিয়দংশ তারা পেয়েছে

মজুরি হিসেবে বা যৎসামান্য সামাজিক সেবা আকারে। আসলে উপনিবেশের পরিচালন-ব্যয় হিসেবে এগুলো অপরিহার্যই ছিল। বাকি অংশ গেছে উপনিবেশ-ব্যবস্থার নানা অংশীদারদের কাছে।

প্রায়-অবিতর্কিত তথ্য ও উপাত্তগুলো একদম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, উপনিবেশবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মেট্রোপোলের উন্নয়ন। শোষিত উপনিবেশগুলিতে খুচরা কিছু উন্নয়ন দেখা গেলেও তা ছিল কাকতালীয় বা উপজাত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নথিগুলো এটা-সেটা নিয়ে রয়াল কমিশনের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে ভরা। আর এই প্রতিবেদনগুলোই (যেগুলির ব্যাপারে আসলে কদাচিৎ-ই ব্যবস্থা গৃহীত হতো) প্রমাণ করে যে, আফ্রিকানদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক শক্তিরা কতটা উদাসীন ছিল। ঊনিশশ ত্রিশের দশকে পুরো ওয়েস্ট ইন্ডিজ জুড়ে দাঙ্গা দেখা দেয়। দাসপ্রথার বিলুপ্তির পরে সেখানে এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে ফেলে রেখে আসা হয়েছিল আফ্রিকান উত্তরসূরিদের। তারাই এই দাঙ্গার সূচনা ঘটায়। রয়াল কমিশন অনুসন্ধান চালিয়ে এমন ভয়াবহ তথ্য উদ্ধার করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এই প্রতিবেদনের প্রকাশনাই আটকে দেওয়া হয়। নাহলে তো গোমর ফাঁস হয়ে যেত যে, ফ্যাসিবাদের চেয়ে উপনিবেশবাদ কোনো অংশেই কম না। অথচ ব্রিটিশরা এই ফ্যাসিবাদের মূলোৎপাটনের জন্যেই যুদ্ধে নেমেছিল। এই অনুসন্ধানের ফলেই কলোনিয়াল ডেভেলাপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার (CD&W) প্রতিষ্ঠিত করার কথা ওঠে। এ ব্যাপারে ১৯৪০ সালে একটি আইন করা হয় বটে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আগে ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে ঋণ দেবার মতো তহবিল গঠিত হয়ে উঠেনি।

ফরাসিরা এই CD&W এর আদলে ১৯৪৬ সালে গড়ে তোলে FIDES।[১১]উপনিবেশবাদের শুরু থেকেই উপনিবেশ বিস্তারের পক্ষে দুই ধরনের ব্যাখ্যা দিত মেট্রোপোল। একটা ব্যাখ্যা একদম সোজাসাপটা। ইউরোপীয় শহরগুলোর বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের পছন্দসই ছিল এই ব্যাখ্যা। তা হলো, উপনিবেশের এই নিত্য লীলা তাদের জন্যে মারাত্মক লাভজনক। আরেকটি ব্যাখ্যা, "অসভ্য স্থানীয়"দের কল্যাণ। ইতিপূর্বে দাসপ্রথার পক্ষে যেরকম সাফাই গাওয়া হতো, সেরকম। তখন বলা হতো, দাসপ্রথা হচ্ছে বর্বর আফ্রিকানদের সুসংবদ্ধ খ্রিষ্টীয় জমিনে আনবার এক ন্যায্য প্রচেষ্টা মাত্র। গত কয়েক দশকে যখন

---

[১১] The Investment Fund for Economic and Social Development (French: Fonds d'Investissements pour le Developpement *Économique et Social*, or FIDES) was a development finance institution active in the French colonial empire, notably in Africa. It was established in ১৯৪৬

উপনিবেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়, তখন একদম স্পষ্টভাবেই একে ধামাচাপা দেওয়ার এক পাঁয়তারা শুরু হয়। CD&W আর FIDES ছিল উপনিবেশের ভয়াবহতাকে লুকাবার এই প্রোপাগান্ডারই অংশ।

সর্বোপরি, FIDES আর CD&W গঠিত হয়েছিল যুদ্ধোত্তর এক পরিস্থিতিতে। পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা তখন সমাজতন্ত্র আর এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও প্রতিযোগিতায় উপনিবেশগুলোতে একদমই পেরে উঠছিল না। জনাব বেভিন একজন নামকরা শ্রমিক-নেতা। তিনি স্বজাতির সাথে বেইমানি করে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের মুখপাত্রে পরিণত হন। তার মতে, "বাকি দুই বিশ্বশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া আর যুক্তরাষ্ট্র অমিত সম্পদের অধিকারী। যদি পশ্চিম ইউরোপ তাদের সাথে টক্কর দিতে চায় বা পৃথিবীতে সাম্য নিশ্চিত করতে চায়, তবে আফ্রিকান সম্পদ আহরণ এবং এর সমৃদ্ধকরণের বিকল্প নেই।" FIDES আর CD&W এর কর্মযজ্ঞের ওপর একটু সূক্ষ্ম গবেষণা চালালেই দেখা যাবে, এরা আফ্রিকার জনগণের উন্নয়নে কিছু তো করেইনি, বরং ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

তথাকথিত সেই সব উন্নয়ন তহবিলের প্রায় পুরোটাই গেছে কিছু সামাজিক সেবা আর অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের পেছনে। CD&W ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে যে বরাদ্দ রেখেছে, তার ১ শতাংশেরও কম ছিল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে। FIDES এর ক্ষেত্রে এই বরাদ্দের পরিমাণ ০.৫ শতাংশেরও কম, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যকার সময়ে। কৃষি আফ্রিকানদের প্রধান কর্মকাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছিল অতি নগণ্য। নাইজেরিয়ার ঔপনিবেশিক প্রশাসন CD&W থেকে বিশাল এক তহবিলের আশা নিয়ে ১০ বছরের এক পরিকল্পনা হাতে নেয়। মোট তহবিল যেখানে ৫৩ মিলিয়ন পাউন্ড, এই পরিকল্পনার জন্য সেখানে ব্যয় ধরা হয় ১৮২৪ মিলিয়ন। অধিকাংশ বরাদ্দই ছিল মূলত একটি কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্যে আর ব্রিটিশ "বিশেষজ্ঞ"দের বেতন দেওয়ার জন্যে।

অন্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোও দশ বছর-মেয়াদি পরিকল্পনা করে। এর সবগুলোতেই নাইজেরীয় পরিকল্পনার মতো খুঁত বিদ্যমান। আদতে কোনোটাই সত্যিকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না, বরং বলা চলে ভিন্ন ভিন্ন সরকারি বিভাগের বিচ্ছিন্নভাবে চলমান কর্মকাণ্ডেরই সম্প্রসারণ মাত্র। তাই এর কোনোটাই যে আহামরি পরিবর্তন আনবে না, তা অনুমিতই ছিল। আর এগুলো অভ্যন্তরীণ বা অন্তঃআফ্রিকীয় বাণিজ্যের কল্যাণকে একদম পাশ কাটিয়ে গেছে।

"উন্নয়ন" তহবিলের অধিকাংশই উপনিবেশে গেছে ঋণ আকারে। উদ্দেশ্য হলো বন্দর, রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পানির লাইন বা গুদাম নির্মাণ। আসলে দীর্ঘমেয়াদি শোষণের জন্যে অপরিহার্য ছিল এগুলো। আর স্বল্প মেয়াদে এসব প্রকল্প ইউরোপীয় ইস্পাত, কংক্রিট, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ির ইঞ্জিন-সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের এক বাজার তৈরি করে। FIDES এর তহবিলের এক-পঞ্চমাংশ গেছে ডাকারের ব্যয়বহুল গণপূর্ত কর্মকাণ্ডে, যা আদতে ছিল ফরাসি শিল্পোন্নয়নের পাঁয়তারা। আর এতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল এক বিশাল প্রবাসী জনগোষ্ঠীর। এমনকি এই তহবিলের অধীনে যেসব স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হয়েছে, তাতেও ইচ্ছেমতো খরচা করা হয়েছে যেন সেগুলো শ্বেতাঙ্গ প্রবাসীদের চাহিদা মেটাতে পারে। ঋণ এমনভাবে নেওয়া হতো যেন, প্রকল্পের সকল সরঞ্জাম মেট্রোপোল থেকেই কেনা লাগে।

"উন্নয়ন" তহবিলের জন্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থের জোগান আসত ইউরোপীয় অর্থবাজার থেকে। তার মানে, মেট্রোপলিটন সরকারগুলো তাদের ব্যাংকার ও অর্থদাতাদের সুনিশ্চিত মুনাফার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বিনিয়োগযোগ্য লাভজনক খাত তৈরি করে দিচ্ছে তাদের জন্য। ফরাসি সরকার ১৯৫৬ সালে নিজেদের পুঁজিপতিদের প্রণোদনা দিতে একটি স্কিম চালু করে, যেটা আফ্রিকার উন্নয়ন ও কল্যাণের ফাঁকাবুলি ছোঁড়ায় ওস্তাদ। এই স্কিমের অধীনে গড়ে ওঠে "ফিনানশিয়াল সোসাইটিজ ফর দ্য ডেভেলাপমেন্ট অব ওভারসীজ টেরিটোরিজ" (SDOM)। SDOM মূলত ছিল বেসরকারি কয়েকজন পুঁজিপতির সংগঠন, যাদের মূল আগ্রহ উত্তর আফ্রিকার তেল নিয়ে। আর এদের পেছনে সরকারি মদদ ছিল বিশাল।

CD&W যে একটা ভাঁওতাবাজি, সচেতন পর্যবেক্ষকের কাছে তা স্পষ্ট। তহবিল বণ্টনে সাহায্য করার জন্যে ঔপনিবেশিক সরকারের সচিব একটি পর্ষদ গঠন করে। এর সদস্যরা ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অত্যন্ত ক্ষমতাধর সব সদস্য, যাদের মাঝে রয়েছে Barclays ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দও। CD&W এর তহবিল তো ওই মড়ার দশবছর-মেয়াদি পরিকল্পনার জন্যও অপ্রতুল। তাই ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে বাকি তহবিলের জন্যে খোলা অর্থবাজার থেকে ঋণ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আফ্রিকার শ্রম ও সম্পদের উদ্বৃত্তও যেন ইউরোপীয় লোভী পোদ্দারদের দখলেই যায়, সেটা নিশ্চিত করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

CD&W তহবিলের ঘাটতি পূরণে ঔপনিবেশিক সরকারের সাহায্যে প্রথম যে ব্যাংক এগিয়ে আসে, তা হলো Barclays ব্যাংক। এই ব্যাংক একটি বিশেষ

ওভারসীজ ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন গড়ে তোলে আফ্রিকাকে "সহায়তা" করার জন্য। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ঘোষণা দেন, "ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উন্নয়ন এবং এর বাসিন্দাদের সামগ্রিক কল্যাণ [ব্রিটেনের] প্রতিটা নাগরিকের স্বার্থেই অপরিহার্য।" এই ভাষা ছিল মূলত গণসংযোগের ভাষা। শ্বেতাঙ্গরা যেদিন থেকে খ্রিষ্টান ধর্ম আর সভ্যতার নামে মানুষকে হত্যা করা ও দাস বানানোয় লিপ্ত, তখন থেকেই এরকম ভাষাই ব্যবহার করে আসছে তারা।

ইউরোপীয়রা কীভাবে আফ্রিকানদের বিংশ শতাব্দীর আলোয় নিয়ে আসে, সেটার ঢোল পেটানো এক অধুনা চর্চা। এটা উপনিবেশবাদের ধোঁকাবাজিরই অংশ। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বক্তব্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আর এটা যে মিথ্যা—তা শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে নয়, বরং সকল ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা সম্ভব।

প্রায়ই বলা হয়, পুঁজিবাদী গতিশীলতার মাধ্যমে উপনিবেশবাদ আফ্রিকার আধুনিকায়ন করেছে। যেমন জমিজমার ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের অন্যান্য মাধ্যমের মালিকানা, আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এখানে পুঁজিবাদী উপাদান আর সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বোঝা আবশ্যক। উপনিবেশবাদ আফ্রিকায় কিছু পুঁজিবাদী উপাদানের আমদানি করেছে মাত্র। মোটাদাগে গোষ্ঠীতন্ত্র যেখানে যেখানে মুদ্রাভিত্তিক ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসেছে, ওই ব্যবস্থা সেখানেই নিজেকে গোষ্ঠীতন্ত্রের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। বর্ধিত পরিবার আর উৎপাদন ও বণ্টনের ভিত্তি হয়ে থাকেনি। তার জায়গা নিয়েছে অর্থকরী ফসলের চাষ আর মজুরিভিত্তিক শ্রম।

দক্ষিণ আফ্রিকান একটি প্রবাদে এটা দারুণভাবে উঠে আসে, "শ্বেতাঙ্গের কোনো আত্মীয় নেই, তার আত্মীয় কেবল টাকা।" এটাকে বলা যায় একদম নিগূঢ় সত্যের উন্মোচন। পুঁজিবাদের আগের ও পরের সমাজের অবস্থা এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ যখন গোষ্ঠীতান্ত্রিক আফ্রিকান সমাজের সংস্পর্শে আসে, তখন আত্মীয়তার সম্পর্কের জায়গা নিয়ে নেয় কাঠখোট্টা অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এত কিছুর পরও পুঁজিবাদ আসলে আফ্রিকাকে পালটে মেট্রোপোলের মতো বানিয়ে দেয়নি। যদি তা করতই, তাহলেই না পুঁজিবাদের নির্মমতা আর অসমতা নিয়ে অভিযোগ করার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতাও জানানো যেত। বলা যেত যে, উপনিবেশবাদ মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক উন্নয়নের পথ ধরেই এগিয়ে নিয়ে গেছে আফ্রিকাকে।

মেট্রোপোলে বা তার উপকেন্দ্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। একটা হলো সেইসব পুঁজিবাদী আর বুর্জোয়া, যাদের দখলে কারখানা আর

ব্যাংকসমূহের মালিকানা (সম্পদ উৎপাদন আর বণ্টনের প্রধান মাধ্যম)। দ্বিতীয়টি হলো সেইসব প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক সম্প্রদায়, যারা ওইসব কারখানায় উপর্যুক্ত বুর্জোয়াদের জন্যে কাজ করত। উপনিবেশবাদ আফ্রিকানদের মধ্য থেকে বা আফ্রিকার ভেতরে কোনো পুঁজিপতি বা কারখানার মালিক শ্রেণী তৈরি করেনি; এমনকি সেরকম শহুরে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীও না (বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে)। আরেকভাবে বললে, ইউরোপের সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তন এবং উৎপাদনে গতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ এক ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু উপনিবেশবাদের আদলে পুঁজিবাদ আফ্রিকায় সেই ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ।

স্বাভাবিক যে, এক পুঁজিপতি আরেক পুঁজিপতি তৈরিতে ভূমিকা রাখবে না, যে কিনা পরবর্তীকালে তার প্রতিযোগী হয়ে উঠবে। বরং প্রথম থেকেই ইউরোপে পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিযোগিতা, উৎখাত, আর একচেটিয়াপনা। এজন্যেই যখন সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা হয়, মেট্রোপলিটন পুঁজিপতিরা নির্ভরশীল দেশে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে চায়নি। এরপরও ওইসব পুঁজিপতির বাসনাকে পাশ কাটিয়ে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় কিছু পুঁজিপতি তৈরি হয়েছিল ঠিকই। এক্ষেত্রে অন্যান্য উপনিবেশায়িত জাতির তুলনায় আফ্রিকা একদমই ব্যতিক্রম। বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের মালিক হয়ে বুর্জোয়া সোপানের অন্তত মাঝপর্যায় পর্যন্ত যাবার সুযোগটাও পেয়েছে খুবই নগণ্য-সংখ্যক আফ্রিকান।

আফ্রিকান পুঁজিপতির সংখ্যা এত কম হবার একটা কারণ হিসেবে বলা হয়, যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আগন্তুক হয়ে এখানে এসেছিল, স্থানীয়দের সাথে তাদের কোনো পারিবারিক বন্ধন নেই। তাই পুঁজিবাদের চাহিদামতো নিষ্ঠুরভাবে পুঁজি একাট্টা করার পথে কোনোকিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। লেবানিজ, গ্রিক, সিরীয় বা ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পাতি-ব্যাপারী থেকে মাঝারি মানের ব্যবসায়ী বা ক্ষেত্রবিশেষে লঘু পুঁজিপতির পর্যায়ে উন্নীত হয়। পশ্চিম আফ্রিকায় রাইয়াহ বা লেভেন্তিস নামগুলো সুপরিচিত, ঠিক যেভাবে পূর্ব আফ্রিকায় পুঁজিপতি হিসেবে মাধবনি বা বিশ্রামের নাম ব্যাপক পরিচিত।

মধ্যস্বত্বভোগী আর ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে নিত্য ঝামেলা লেগে থাকতই। কিন্তু ইউরোপীয়রা সবখানেই সংখ্যালঘুদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যেন এই জায়গাটা অন্তত আফ্রিকানরা নিতে না পারে। যেমন, পশ্চিম আফ্রিকাতে সিয়েরা লিওনের ব্যবসায়ীদের তাদের নিজস্ব উপনিবেশে বা তার বাইরেও কোথাও থিতু হতে নিরুৎসাহিত করা হতো। পূর্ব আফ্রিকায় উগান্ডার

জনগণের ক্ষীণ আশা ছিল যে, কখনো হয়তো তারা তুলার চাষ বা এর সাথে সম্পর্কিত পুঁজিবাদী কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়াতে পারবে। অথচ ১৯২০ সালে যখন শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নের দায়িত্ব একটা কমিশনকে দেওয়া হয়, তখন এর প্রস্তাবনায় কেবল ইউরোপীয় আর ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ ছিল। আফ্রিকানদের এখানে অনুপ্রবেশ একদম আইনগতভাবে রহিত করা হয়।

পুরো আফ্রিকাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, অল্পবিস্তর আফ্রিকান ব্যবসায়ী যারা ছিল, তারা সকলেই ছিল সোপানের একদম নিচের দিকে। এদের আসলে পুঁজিপতির ছিটেফোঁটাও বলা চলে না। বড় পরিসরে কৃষি, কারবারি, খনি আহরণ বা শিল্পোন্নয়নের জন্যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত মূলধনই থাকত না কখনো। তারা মূলত ইউরোপীয় বা ওইসব সংখ্যালঘুদের বিনিয়োগের ওপরই সর্বদা নির্ভরশীল থাকত।

আফ্রিকান পুঁজিবাদ সৃষ্টিতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ব্যর্থ বটে। কিন্তু এর চেয়েও অবাক করা ব্যাপার, আফ্রিকায় একটা শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি করে আফ্রিকা-জুড়ে শিল্পদক্ষতা ছড়িয়ে দিতেও ব্যর্থ হয়েছে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ। উপনিবেশবাদ স্বভাবতই আফ্রিকার জমিনে শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী। তাদের আগ্রহ শুধু কৃষি, খনিজ উত্তোলন, আর গাছ কাটা নিয়ে। যখনই আফ্রিকায় শিল্পায়নের ন্যূনতম ঝোঁক দেখা গেছে, তখনই ঔপনিবেশিক সরকার কোনো-না-কোনোভাবে মেট্রোপলিটন শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে সে পথ রুখে দিয়েছে। সেনেগালে ১৯২৭ সালে চীনাবাদাম-তেলের বিভিন্ন কারখানা হয়, যেগুলো ফ্রান্সে রপ্তানিও শুরু করে। কিন্তু অল্পসময়ের ভেতরেই ওই কারখানার কর্মকাণ্ড সীমিত করা হয় ফরাসি তেল-ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে। একইভাবে নাইজেরিয়াতে লেবানিজদের প্রতিষ্ঠিত তেলের কল চালানোকে নিরুৎসাহিত করা হয়। যদিও সেই তেল ইউরোপে তখনো কাঁচামাল হিসেবে পাঠানো হতো, কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পপতিরা কখনোই চায়নি এর কিছুমাত্র প্রক্রিয়াকরণ আফ্রিকার জমিনে হোক।

আফ্রিকায় এই শিল্পায়ন-বিরোধী নীতির ফলে অনেক অযৌক্তিক বৈপরীত্য দেখা দেয় : এই যেমন, সুদান আর উগান্ডা নিজেরা তুলা উৎপাদন করে, অথচ তুলাজাত পণ্য আমদানি করে। আবার আইভোরি কোস্ট কোকো উৎপাদন করলেও তাদের টিনজাত কোকো আর চকোলেট আমদানি করতে হতো।

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় কৃষিকাজ আর গৃহপরিচর্যার সকল কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাত একটা ক্ষুদ্র শ্রমিকশ্রেণী। পুঁজিবাদী এলাকাগুলোর তুলনায় এদের অধিকাংশই অদক্ষ। যখনই কোনো প্রকল্পে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তা

দেখা দিত, সেগুলোর তত্ত্বাবধান করত ইউরোপীয় সাহেববাবুরা—ঘেরা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত সাদা হাফ প্যান্ট আর হেলমেট পরিহিত অবস্থায়। ইউরোপীয়রা অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানগর্ভ হয়ে উঠেছিল, তার কিছুই ১৮৮৫ সালের দিকে আফ্রিকা অর্জন করতে পারেনি। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। আর এই পার্থক্যের আংশিক কারণ হচ্ছে উপনিবেশ-পূর্ববর্তীকালে আফ্রিকার সাথে ইউরোপের সম্পর্ক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এতকিছুর পরেও একদম স্বল্পসংখ্যক লোক এই ঔপনিবেশিক আমলে "আধুনিক" দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেশিয়ার মতো কিছু অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চরম বর্ণবাদের স্বাক্ষর রাখা হতো, যেন শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সবচেয়ে ভালো চাকরির পদটা খালি রাখা যায়। আর তাই আজ অবধি শ্বেতাঙ্গদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এই মহাদেশে আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এটা পুঁজিবাদেরই প্রভাব।

আগেই দেখানো হয়েছে যে, ইউরোপে শিল্প কারখানার উপস্থিতি তাদের সার্বিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পেছনে প্রধান প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। আর আফ্রিকা দেখেছে মুদ্রার অপর পিঠ। শিল্পকারখানা নেই মানে দক্ষতা সৃষ্টির দ্বারও সেখানে রুদ্ধ। এমনকি খনি শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা করা হয়, যেন মূল্যবান শ্রমটুকু করা হয় আফ্রিকার বাইরে। ভুলে গেলে চলবে না, শ্রমিকেরাই প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তরের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মণিমুক্তা বা হীরার ব্যবহারিক মূল্যের চেয়ে এর দাম অনেক বেশি। এর কারণ শুধুমাত্র এটা নয় যে, তা প্রকৃতিতে বিরল। হীরা-প্রাপ্তির স্থান চিহ্নিত করতেও ব্যাপক পরিশ্রম প্রয়োজন। এটা মূলত একজন দক্ষ ভূতত্ত্ববিদের কাজ। আর স্বভাবতই তারা হতো ইউরোপীয়। আর খনি থেকে হীরে উত্তোলন মূলত কঠোর কায়িক পরিশ্রমের কাজ। এ পর্যায়েই দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তাঙ্গানিকা আর সিয়েরা লিওনের আফ্রিকান জনগোষ্ঠী দৃশ্যপটে আসে। এরপর হীরে কাটা বা তার পালিশ করার জন্যেও ব্যাপক পরিশ্রমের প্রয়োজন। এর কিছু কাজ করানো হতো আফ্রিকায় থাকা শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে। বাকি কাজ পুরোটাই হতো লন্ডন বা ব্রাসেলসে। আর ওইখানের দক্ষ শ্রমিকের টেবিলেই এই রুক্ষ হীরার দাম বেড়ে ফুলে ফেঁপে উঠত। ঔপনিবেশিক আমলে কোনো আফ্রিকানই এই কাজের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারত না।

বাড়তি উৎপাদন আরও বাড়তি উৎপাদনের যে সুযোগ তৈরি করে, তার মধ্যেই পুঁজিবাদের গতিশীলতা নিহিত। প্রতিটা বড় শিল্প কারখানারই কিছু না কিছু উপজাত তৈরি হতো। আর এগুলো স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার বাড়ানোর

পাশাপাশি নির্মাণ ও পরিবহন শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে—যেমনটা দেখা গেছে ইউনিলিভারের ক্ষেত্রে। পেশাদার অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এটা "ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ" এর জন্যে লাভজনক। কিন্তু আফ্রিকার কাঁচামাল-ব্যবহারকারীরা যেহেতু আফ্রিকার বাইরের, সেহেতু আফ্রিকার ভেতরে এই ফরোয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের কোনো ফায়দাই হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গিনি বক্সাইট রপ্তানি শুরু করে। মার্কিন আর ফরাসি পুঁজিপতিদের হাতে গিয়ে এই বক্সাইট অ্যালুমিনিয়ামে রূপান্তরিত হতো। মেট্রোপোলে গিয়ে এ থেকে তৈরি হতো প্রতিসারক সরঞ্জামাদি, বিদ্যুৎ পরিবাহী, সিগারেটের মোড়ক, রান্নাবান্নার তৈজসপত্র, গ্লাস, গহনা, অ্যাব্রেসিভ, পাতলা কাঠামো, আর উড়োজাহাজ। গিনির এই বক্সাইট ইউরোপীয় জাহাজশিল্প আর উত্তর আমেরিকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর জন্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক গিনি নিজে একদম ফুটো হয়ে গেছে।

ইউরোপের অর্থনীতিতে স্বর্ণের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। মেট্রোপোলের অর্থব্যবস্থা, শিল্প ও কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আফ্রিকা-থেকে-প্রাপ্ত সোনা। বক্সাইট এবং অন্যান্য খনির মতো সোনাও একটি ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ। একবার তা দেশের জমিন থেকে উত্তোলন করে পাচার হয়ে গেলে সে ক্ষয়পূরণ আর সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো স্থানগুলোয় যতদিন উৎপাদন চলমান ছিল, এই সাধারণ কথাটা ততদিন চাপা পড়ে থাকে। কিন্তু নাটকীয়ভাবে ব্যাপারটা সামনে চলে আসে, যখন ঔপনিবেশিক যুগে সত্যি সত্যিই খনি থেকে সোনা উধাও হয়ে যায়। যেমন, তাঙ্গানিকার দক্ষিণাঞ্চলে চুনিয়ায় ১৯৩৩ সাল থেকেই ব্রিটিশরা খুব তাড়াহুড়া করে সোনা উত্তোলন করে চলে। এই সোনা ১৯৫৩ সালের মধ্যেই ব্রিটিশরা তুলে বিদেশে রপ্তানিও করে ফেলেছে। ঔপনিবেশিক আমলের শেষে দেখা গেল, চুনিয়া তাঙ্গানিকার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনপদ। স্বয়ং তাঙ্গানিকাকেই বলা হতো পূর্ব আফ্রিকার দরিদ্র সিন্ডারেলা। এই যদি হয় আধুনিকায়নের নমুনা, আর এর জন্যে যদি মূল্য দিতে হয় শোষিত আর অত্যাচারিত হয়ে, তবে তো জঙ্গলে থাকাটাই আফ্রিকার জন্য মঙ্গল ছিল।

শিল্পায়ন শুধুমাত্র কলকারখানা প্রতিষ্ঠাকেই বোঝায় না। সেচকার্য, সার, কৃষি যন্ত্রাংশ, উন্নত প্রজাতি নির্ণয় কিংবা নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রেই ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে পুঁজিবাদী আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো, কৃষি উৎপাদনের প্রযুক্তি পালটাতে না-পারা। উপনিবেশবাদের আফ্রিকা-উন্নয়নের বুলি যে কতটা ফাঁপা, তার প্রমাণ হলো—আফ্রিকার

অধিকাংশ মানুষ যে নিড়ানি নিয়ে উপনিবেশের আমলে প্রবেশ করেছে, ওই আমল থেকে বেরও হয়েছে সেই নিড়ানি নিয়েই। কিছু পুঁজিপতির কৃষি-বনায়ন প্রকল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল বটে। যেখানে কতিপয় কৃষকের হাতে হয়তো ট্রাক্টরের স্টিয়ারিং হুইল গিয়েছিল। কিন্তু দিনশেষে ওই আদি নিড়ানিই মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। পুঁজিবাদ যেখানে ইউরোপে কৃষিবিপ্লব ঘটিয়ে দিলো, সেখানে আফ্রিকায় সে কিছুই করে উঠতে পারেনি।

কিছু জেলায় পুঁজিবাদ বরং কৃষিক্ষেত্রের প্রযুক্তিকে আরও পিছিয়ে দেয়। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত জনগণের জন্যে বরাদ্দ ছিল অপর্যাপ্ত জমি। তাতেই তাদের বাধ্য করা হতো অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্যে। তার ওপর যে পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষবাস করা হতো, তাতে তারা বারবার জমি পালটাতে বাধ্য হতো। বাস্তবে এটা ছিল এক প্রকার প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্গমন। কেননা দিনের পর দিন জমির উৎপাদনক্ষমতা কমতে থাকে আর এভাবে আস্তে আস্তে জমিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। যেখানেই আফ্রিকানদের বারবার স্থানান্তরিত করিয়ে পৈত্রিক জমি চাষ থেকে বঞ্চিত করা হয়, সবগুলোতেই এই নেতিবাচক ফলাফল ছিল অবশ্যম্ভাবী। ওদিকে বাদাম আর তুলার মতো অর্থকরী ফসলগুলো মাটির পুষ্টি অনেক বেশি শুষে নেয়। এজন্যে সেনেগাল, নাইজার আর চাদের মতো যে দেশগুলো এমনিতেই মরুভূমির ধারে, সেখানে এই টানা চাষবাস মাটির অবস্থা আরও খারাপ করে ফেলে এবং মরুকরণ ত্বরান্বিত করে।

বর্ণবাদের শেকড় পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে এত গভীরে প্রোথিত যে, কৃষির অগ্রগতি না হবার পেছনে এরা আফ্রিকানদের সহজাত নীচতাকেই দায়ী করে। সত্যি বলতে এ সবই হয়েছে শ্বেতাঙ্গ অনুপ্রবেশকারীদের কারণে, যদিও এর পেছনের কারণ কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বর্ণবাদী আচরণ নয়, বরং সামগ্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুসংহত করাল গ্রাস।

আফ্রিকান কৃষির পদ্ধতি ও যন্ত্রাংশের আধুনিকায়ন করতে না-পারাটা কেবল ঔপনিবেশিক নীতিনির্ধারকের ভুল সিদ্ধান্তের ফসল নয়। এটা সামগ্রিকভাবে উপনিবেশবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কারণ আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের উদ্দেশ্য ছিল মেট্রোপোলে দক্ষতা আর নির্ভরশীল দেশগুলোয় নিম্নমানের মানবশক্তি তৈরি করা। সেইসঙ্গে এটা আফ্রিকান শ্রমসম্পর্কের ওপর বলপ্রয়োগেরও (আরোপকৃত করের পরিমাণ-সহ) ফলাফল। বলপ্রয়োগ করে মানুষকে দিয়ে অতিসাধারণ কায়িক পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু অন্য কিছু নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকায় আফ্রিকানদের দাস হিসেবে

ব্যবহার করার সময় তা প্রমাণিত হয়েছে। দাসেরা হাতিয়ার নষ্ট করে ফেলে এবং এগুলো দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বাড়তি নজরদারি এবং অনুন্নত হাতিয়ারে সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমেই কেবল এগুলো প্রতিহত করা সম্ভব। তাই দাসলব্ধ শ্রম দিয়ে শিল্পখাত চলে না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল ১৮৬১ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, যাতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে পুরো ভূখণ্ডে পুঁজিবাদ কায়েম করা যায়। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেন আফ্রিকায় জোরপূর্বক কৃষিশ্রম এতটা সাদাসিধে রাখা হতো, যা থেকে আয়ও হতো কম।

ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিরা আফ্রিকান মানুষকে তার নিজের ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে কখনোই পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দিত না। আফ্রিকান অর্থকরী ফসলের কৃষকের মজুরির দিকে তাকালে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আফ্রিকান কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য কদাচিৎ বার্ষিক ১০ পাউন্ডে পৌঁছাত। বেশির ভাগ সময় এর পরিমাণ হতো এর অর্ধেক। এই অল্প আয়কে নিজের বলার আগে এ থেকেই তাদের যন্ত্রপাতি, বীজ, পরিবহন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করতে হতো। যেসব কৃষক কফি, কোকো কিংবা পাম উৎপাদন করার সাথে জড়িত ছিল, তাদের আয় তুলা ও বাদাম-চাষীদের চেয়ে বেশি। তারপরও দেখা গেছে ওকোয়াপিম কোকো বা চাগা কফির চাষীরা যে আয় করত, তাতে সংসার নিয়ে দিনাতিপাত একপ্রকার অসম্ভব। অন্যদিকে মিষ্টি আলু আর কলা চাষ বিকল্প হিসেবে ভালোই জোগান দিত এগুলির সাথে। আর এভাবেই কৃষকের মুখে অন্ন জুটত। যা কিছু বাড়তি শিলিং আয় করত, তা চলে যেত ভূমির কর দিয়ে আর মধ্যস্বত্বভোগীদের দোকান থেকে লবণ, কাপড় আর মোমবাতি কেনার পয়সা দিতে। যদি তাদের মধ্যে কেউ খুব বেশি ভাগ্যবান হতো, তবে তারা কিনতে পারত দস্তার পাত, বাইসাইকেল, বেতারযন্ত্র, সেলাই মেশিন আর পারত বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দিতে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, এদের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

এসব আফ্রিকান কৃষকের কম আয় করার পেছনে একটা বড় কারণ, তারা অদক্ষ শ্রমিক। এটাই একমাত্র কারণ নয়। তবুও এটা সত্যি যে, ইউরোপের জটিল প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে যাবার পর তুলার মতো পণ্যের দাম এক লাফে অনেক বেড়ে যায়। পুঁজিপতিরা কীভাবে প্রতিটা শ্রমিকের প্রাপ্যের উদ্বৃত্ত নিজেরা হাতিয়ে নেয়, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কার্ল মার্কস এই তুলার উদাহরণ দিয়েছেন। প্রক্রিয়াজাতকৃত তুলার মূল্যে ভাগ রয়েছে কাঁচা তুলা উৎপাদকের, ভাগ রয়েছে সুতাকাটার শ্রমিকের, আর রয়েছে তুলাজাত পণ্য উৎপাদকের। একে তো আফ্রিকার জমিনে আফ্রিকান কৃষকের উৎপাদিত ফসল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়। তার ওপর, আফ্রিকান

অদক্ষ শ্রমিকেরা ইউরোপের দক্ষ শ্রমিকের তুলনায় অতি নগণ্য অর্থ পেত। এভাবে দুই বারে বঞ্চিত হয় আফ্রিকান শ্রমিক।

চাদের তুলাচাষীর এক ঘণ্টার পরিশ্রমের মূল্য এক সেন্টিমিটারের চেয়েও কম সুতি কাপড়ের মূল্যের সমান। অর্থাৎ, নিজের উৎপাদিত তুলাজাত তিন মিটার কাপড় ফ্রান্স থেকে কিনতে তাকে কমসেকম পঞ্চাশ দিন কাজ করতে হবে। অন্যদিকে আধুনিক সুতা কাটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা একজন ফরাসি গার্মেন্টসকর্মীকে তিন মিটারের ওই একই কাপড় কিনতে কাজ করতে হবে কয়েক মিনিট! ধরে নিলাম এই ফরাসি শ্রমিকেরা ঈশ্বরের (যিনি কিনা ৬ দিনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন) বিশেষ প্রিয়পাত্র না। তাহলে এই বৈষম্যের কারণ নিশ্চয়ই স্বয়ং পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থারই কোনো একটা উপাদান। প্রথমত, চাদের কৃষক ব্যবসায় প্রতারণার শিকার। সে বিক্রি করেছে অল্প দামে, কিন্তু কিনেছে বেশি দামে। ফলে নিজের শ্রমে উৎপাদিত মূল্যেই তার নিজের পাওনা নগণ্য। এটা কোনো রহস্যময় "বাজার শক্তি"র বলে হয়নি, যা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা আমাদের বুঝ দিতে চায়। বরং এটা হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকার কারণে। এটা অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের ফলাফল। দ্বিতীয়ত, চাদের কৃষক কাজ করতে অনেক সময় নেয়। কারণ, উপনিবেশবাদ তাকে উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তুলা উৎপাদনের সময় কমিয়ে আনার সুযোগ দেয়নি।

কিছু ক্ষেত্রে এটা ঔপনিবেশিক সরকারের জন্যেই কল্যাণকর হতো, যদি তারা আফ্রিকায় কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করত। কেননা এতে করে তারা পেত অধিকতর ও উন্নততর উৎপাদন। প্রতিটা ঔপনিবেশিক সরকার কিছু না কিছু অর্থ ক্রান্তীয় অঞ্চলের কৃষি গবেষণার জন্যে ব্যয় করেছে। কিন্তু এই গবেষণা কেবল অর্থকরী ফসলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর এগুলোর প্রয়োগ আয়ত্ত করা আফ্রিকান কৃষকদের জন্যে অসম্ভব, কারণ তাদের সে পুঁজিই নেই। যেখানে ইউরোপে এই গবেষণায় ব্যাপক ব্যয় করা হতো (ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় খাতেই প্রচুর সুবিধা পেত মেট্রোপোল), সেখানে সমসাময়িক আফ্রিকান কৃষি উন্নয়নের বরাদ্দ রীতিমতো করুণার দান বলে মনে হবে।

এই তো গেল আর্থসামাজিক আধুনিকায়নের দাবি। পাশাপাশি উপনিবেশের সাফাই-গায়করা আরও দাবি করে, ইউরোপীয় শাসন আফ্রিকায় রাজনৈতিক উন্নয়ন ও মুক্তি এনেছে। এ প্রসঙ্গে তাদের পুরাতন যুক্তি হলো, উনিশ শতকে আফ্রিকায় চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এনগুনি, ইয়াও এবং সামোরির

সোফা "গোত্র"গুলো চালাচ্ছিল অন্ধ হত্যাযজ্ঞ। পরবর্তীকালে লিভিংস্টোন এবং স্ট্যানলি এসে আফ্রিকাকে একরকম উদ্ধার করেন। প্রথম কথা হলো, সমকালীন ইউরোপীয় আফ্রিকা-গবেষকরা আর এহেন কথা বলে না। কারণ তারাও জানে, এই দাবি নির্জলা মিথ্যে। তবুও এখনো কিছু লেখকের মতে, "নিরর্থক যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা থেকে বান্টু জাতিকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল স্থিতিশীল [ইউরোপীয়] সরকার-ব্যবস্থা কায়েম করা।"

উপনিবেশকদের আরেকটি কথিত কৃতিত্ব হলো, তারাই নাকি আফ্রিকায় প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। উপনিবেশবাদের আগে আফ্রিকায় যে একাধিক রাষ্ট্র ছিল, এই সত্যকে কী সুন্দরভাবে অগ্রাহ্য করা হলো! সেইসাথে এড়িয়ে যাওয়া হলো আফ্রিকার বিবর্তনের সার্বিক গতিবিধিকেও। জাতীয়তাবাদ হলো এক বিশেষ ধরনের একাত্মতা, যা গড়ে উঠে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে। একটা সামাজিক গোষ্ঠী যখন তাদের পারিপার্শ্বিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাদের সামষ্টিক অর্জনকে প্রতিযোগীদের থেকে রক্ষা করতে চায়, তখন তারা এভাবে একাত্ম হয়। এ ছাড়াও, জাতিরাষ্ট্র তার নিজের সীমানার অভ্যন্তরে আইনকানুন-সহ স্থিতিশীলতা বজায় রাখবার চেষ্টা চালায়, সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর পক্ষ থেকে। আর এইসব বৈশিষ্ট্যই উনিশ শতকের আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান ছিল। এগুলোর কোনো কোনোটা হয়তো ইউরোপীয়দের আন্দাজে-আঁকা সীমান্তবিশিষ্ট উপনিবেশগুলোর চেয়েও বড়।

এটা সত্যি যে, বর্তমানের আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের এঁকে দেওয়া সীমান্তের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এমনটা না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে ফেলেছে, আফ্রিকার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা লাগত ওটার ভেতরে থেকেই। কিন্তু উপনিবেশবাদ আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদ আমদানি করে এর আধুনিকায়ন করেছে—এই দাবি আফ্রিকার অতীতের ব্যাপারে মূর্খতার পরিচায়ক। বিশেষত যখন বলা হয় যে, এ ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও স্থিতিশীলতা অর্জন করা আফ্রিকানদের একার পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হতো না—সেটা আরও বড় মূর্খামি।

ঔপনিবেশিকদের একটা প্রস্তাবনায় বিশ্বাসযোগ্যতার ছিটেফোঁটা হলেও আছে। এতে বলা হয়, পুঁজিবাদ আর উপনিবেশবাদী শাসনের ফলে আফ্রিকানদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বেড়েছে। মজুরিভোগী যুবসমাজ বা অর্থকরী

ফসলচাষীরা মুক্তি পেয়েছে তাদের পারিবারিক চাহিদা থেকে। এই মুক্তি আসলে কতটা আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তা প্রশ্নবিদ্ধ। ইউরোপে পুঁজিবাদ যেভাবে ব্যক্তিকে সামন্তবাদী সমাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে, তার সাথে তুলনা করা হচ্ছে এই মুক্তিকে। কিন্তু একজন আফ্রিকান যখন তার বর্ধিত পরিবারের শেকল ভেঙে একলা থাকা শুরু করল, এই স্বাধীনতায় লাভটা কতটুকু? পুঁজিপতিদের ইচ্ছের বাইরে তো তার হাতে কোনো বিকল্পই ছিল না। তাদের অর্থনীতি ও ইউরোপমুখী সংস্কৃতিতে ঢোকাটাই ছিল তার একমাত্র "স্বাধীনতা"। সেখানে তার সৃজনশীলতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই, অবস্থান একদম তলানিতে।

আরেকদল ইতিহাসবিদ আবার আরেকটু সদয়। তাদের মতে, উপনিবেশবাদকে পুরোপুরি নেতিবাচক মনে-করা মানে আফ্রিকানদের উদ্যোগকে অগ্রাহ্য করা। আফ্রিকানরা নাকি স্বেচ্ছায় সাহস করেই শ্রম বাজারে, অর্থকরী ফসলের মাঠে, কিছু ক্ষেত্রে সামগ্রিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে, শিক্ষাকার্যক্রমে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছে। অথচ এ সবগুলোই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির দেওয়া একমাত্র বিকল্পের প্রতি সাড়াদান মাত্র। প্রকৃত অর্থে একজন মানুষের বা গোষ্ঠীর উদ্যোগকে স্বপ্রণোদিত তখনই বলা যায়, যদি তারা তাদের গন্তব্য নিজে নির্ধারণ করতে পারে। আর ১৯৬০-এর দশকের আগে সেটা করা আফ্রিকানদের পক্ষে সম্ভবই হয়ে ওঠেনি।

যেকোনো সমাজব্যবস্থাতেই অত্যাচারিতরা কোনো-না-কোনোভাবে সামান্য ফায়দা হাসিলের উপায় বের করেই ফেলে। যেমন, আমেরিকা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাসপ্রথার যুগে আফ্রিকানরা ছোট ছোট কিছু ফায়দা লুটে নেয়। মনিবদের তারা তেল দিয়ে দিয়ে ধোঁকা দিত। ওই মনিবরা এতই তোষামোদপ্রিয় যে, বর্তেও যেত তারা। একইভাবে, ঔপনিবেশিক আমলেও কিছু আফ্রিকান তাদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। দোভাষী, পুলিশ কিংবা আদালতের কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আফ্রিকানরা প্রায়ই টেক্কা মেরে দিয়েছে ইউরোপীয় শাসকদের। কিন্তু এগুলো মোটেও ক্ষমতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুশীলন নয়। দাসপ্রথায় সব ক্ষমতা যেমন মনিবের হাতে কুক্ষিগত, তেমনি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সব ক্ষমতা ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে ন্যস্ত। তাই কোনো আফ্রিকান রাষ্ট্রে ক্ষমতা হারানো মানে প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাধীনতা কমে যাওয়া।

উপনিবেশায়িতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, উপনিবেশবাদ মানেই স্বাধীনতা হরণ। এমনকি সামন্ততান্ত্রিক থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নীত হয়ে ইউরোপ যা একটু আধুনিক রাজনৈতিক মুক্তি পেয়েছে, উপনিবেশবাদ আফ্রিকাকে অতটুকুও

পেতে দেয়নি। মেট্রোপোলে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সংবিধান, আইনসভা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা। ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী এ থেকে থোড়াই লাভবান হয়েছে বটে। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ এবং ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে এগুলো কোনো-না-কোনোরূপে বিদ্যমান ছিল ঠিকই। জনৈক প্রাক্তন উপনিবেশমন্ত্রী জুল ফেরি বলেছেন, ফরাসি বিপ্লব আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থরক্ষার জন্যে হয়নি। বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা, সমতা আর ভ্রার্তৃত্বের স্লোগান ঔপনিবেশিক প্রজাদের জন্য নয়। আফ্রিকানদের জন্যে বরাদ্দ ছিল শুধু বেয়োনেটের খোঁচা, দাঙ্গা আইন, আর গানবোট।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব

এখন পর্যন্ত আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, ঔপনিবেশিকরা তাদের ছোবলে আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে কেমন কল্যাণমূলক কাজ করেছে, তা দেখানো। আমরা জেনেছি, এসব অঞ্চলে যৎসামান্য যে উন্নয়ন হয়েছিল, সেগুলোও উপনিবেশবাদীদের দেওয়া কোনো উপহার নয়। বরং এগুলো এসেছে আফ্রিকানদেরই অমানুষিক খাটুনি আর প্রাকৃতিক সম্পদের বিনিময়ে। উপনিবেশবাদীরা "দ্য ডেভেলাপমেন্ট অফ আফ্রিকা" বলে যে ধুয়া তোলে, তা আসলে "পুঁজিবাদী ইউরোপের উন্নয়নের লক্ষ্যে আফ্রিকাকে তীব্রভাবে শোষণ করার" ভদ্রোচিত মুখোশ। ইউরোপীয়রা দাবি করে, তারা আফ্রিকাকে সামাজিক মর্যাদা, জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনীতির আধুনিকায়ন শিখিয়েছে। আর এগুলোই সেই তথাকথিত উন্নয়নের নির্দেশক। অথচ আমাদের এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা জেনেছি, তাদের এসব দাবি ডাহা মিথ্যা। তারপরও উপনিবেশবাদ যে উন্নয়নের বদলে উলটো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, তার প্রমাণ এখনো আলোচিত হয়নি। উপনিবেশবাদ যে খারাপ একটা ব্যাপার ছিল, এ দৃষ্টিভঙ্গিটি উত্থাপনের উদ্দেশ্য আছে। তা হলো, আফ্রিকায় আগে থেকেই চলমান উন্নয়নের ধারাকে উপনিবেশকরা এসে ভোঁতা করে দিয়েছে, থামিয়ে দিয়েছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে উলটোপথে নিয়ে গিয়েছে—এই ব্যাপারগুলো মনে করিয়ে দেয়া। এবং পরবর্তীকালে সেসব প্রতিবন্ধকতার ক্ষতিপূরণের ঝুলিটা শূন্য।

আফ্রিকার সিংহভাগ অঞ্চলই ঔপনিবেশিকদের অধীনে ছিল বড়জোর সত্তর বছর। ইতিহাসের বিচারে এ নিতান্তই সামান্য সময়। আর ঠিক ওই ছোট্ট সময়টুকুতেই পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় উন্নয়নের জোয়ার বইছিল সর্বাপেক্ষা তীব্র গতিতে। যেমন, পুঁজিবাদী দেশগুলো

প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে প্রবেশ করেছে আণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায়। সমাজতন্ত্র এসে আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা পুঁজিবাদী রাশিয়ার অর্থনীতিই বদলে দিয়েছে পুরোপুরি। এখন অন্য যেকোনো পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় রাশিয়ার প্রবৃদ্ধিই সবচাইতে টেকসই। চীন ও উত্তর কোরিয়ার ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্র একই ভূমিকা রেখেছে। দেশ দুটো এখন স্বনির্ভর এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিন্যাসও অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে সুসংহত। আফ্রিকা বনাম বাকি বিশ্বের সে-সময়কার উন্নতির এ পার্থক্য নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা উচিত। একটু খেয়াল করলে বোঝা যায়, অন্যেরা যখন লাফিয়ে সামনে এগোচ্ছে, তখন সময়ক্ষেপণ করা বা এমনকি ধীর পায়ে চলাটাও পিছিয়ে চলারই সমতুল্য। খোলা চোখেই এটা স্পষ্ট যে, উপনিবেশক দেশগুলোর বিপরীতে আফ্রিকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামরিক সব দিক দিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ে।

উপনিবেশায়িত থাকার ওই স্বল্প সময়েই আফ্রিকার কিন্তু অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। আর এর প্রধান কারণ ছিল আফ্রিকার নিজেকে শাসন করার ক্ষমতা হারানো। একটি সমাজের ক্ষমতার ওপর সবকিছুই নির্ভর করে। কোনো গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং অন্য গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের মানচিত্র এঁকে দেয় তাদের ক্ষমতার মাত্রা। ক্ষমতা মানে নিজের স্বার্থ রক্ষা করার সামর্থ্য, এবং প্রয়োজনে অন্যের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার সক্ষমতা। দুটি জাতির মধ্যকার বিভিন্ন লেনদেন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ক্ষমতার ভূমিকা লক্ষণীয়। প্রতিপক্ষের ক্ষমতার জোরই বলে দেয় তাকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হবে। মোটকথা, একটি জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের নিরূপক ক্ষমতা। কোনো সমাজ যখন এই পুরো ক্ষমতাই অন্যের কাছে ন্যস্ত করে দেয়, সেটাও এক প্রকারের অনুন্নয়নই।

প্রাক-ঔপনিবেশিক ব্যবসার শতাব্দীগুলোতে আফ্রিকার অবস্থান ছিল ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের তুলনায় অসুবিধাজনক। তারপরও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও আফ্রিকার হাতেই থাকে। কিন্তু উপনিবেশবাদের আবির্ভাবের পর নিজেদের ওই বিষয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আফ্রিকাবাসী পুরোপুরিভাবে হারিয়ে ফেলে। উপনিবেশবাদ মানে স্রেফ ব্যবসা না। এর মানে হলো আফ্রিকার সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দখলদারিত্ব গ্রহণের ইউরোপীয় বাসনা। ফলে থেমে যায় আফ্রিকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা, পরম্পরা। এগুলো নিঃসন্দেহে একটি জাতিকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার পদক্ষেপ।

তিউনিসীয় লেখক আলবার্ট মেমি বলেন,

উপনিবেশায়িত জনগণ সবচেয়ে বড় যে আঘাতটা পায়, তা হলো ইতিহাস থেকে এবং গোষ্ঠী থেকে মুছে যাওয়া। যুদ্ধ ও শান্তি, উভয় অবস্থাতেই উপনিবেশবাদ মানুষের স্বাধীনতা ভূমিকাকে হরণ করে। হস্তক্ষেপ করে ব্যক্তির নিজের ও সারা বিশ্বের ভাগ্যের ওপর। বাগড়া বাঁধায় ব্যক্তির সমস্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক দায়িত্বে।

ঢালাও মনে হলেও এই দাবি কিন্তু একদম সত্য। উপনিবেশবাদের কারণে ক্ষমতা হারানোর হাত ধরেই এসেছে ইতিহাস থেকে মুছে যাওয়ার ব্যাপারটি। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা মানে ইতিহাসের বয়ানে সক্রিয়ভাবে ও সচেতনভাবে অংশ নেওয়ার নিশ্চয়তা। উপনিবেশায়িত হওয়া মানে ইতিহাস থেকে মুছে যাওয়া। নিতান্ত পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে হয়তো থেকে যাওয়া যায়। এর সবচাইতে মর্মান্তিক ছবিটা ফুটে ওঠে "আদিম সমাজ" নিয়ে গবেষণাকারী সাদা নৃতাত্ত্বিকদের আচরণে। ঔপনিবেশিক আফ্রিকা তাদের কাছে এক পরোক্ষ উপাদান। উপনিবেশবাদ সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে, ইতিহাসে আফ্রিকানরা গুবরেপোকার মতোই গুরুত্বহীন—অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে তাদের উদ্ভট বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করতে হয়।

রাজনীতির প্রশ্নে নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে উপনিবেশায়িত আফ্রিকা। এর বিশাল সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে ছোট গোত্র, সব রাতারাতি পরিণত হয়েছিল ক্ষমতাহীন, পরাধীন এবং অর্থশূন্য উপকরণে। কিছু সনাতন গোত্রপ্রধানকে অবশ্য পুতুল হিসেবে তখনো বহাল রাখা হয়েছিল। কোনো কোনো রাজ্যের কাঠামোও ছিল আংশিকভাবে অপরিবর্তিত। কিন্তু শাসনের মূল ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়ে যায় বিদেশি মনিবদের হাতে। পৃথিবীর আর দশটা জায়গার মতো আফ্রিকারও আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। সে ইতিহাসে কোনো জাতি কখনো উন্নতির শিখরে উঠেছে, কোনোটা হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। এক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রম ঔপনিবেশিক আমল। যতদিন উপনিবেশকরা ছিল, আফ্রিকার একটি দেশও নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারেনি।

সুনির্দিষ্ট করে বললে, উপনিবেশকরা উত্তর আফ্রিকার টিকে-থাকা সামন্তবাদী রাষ্ট্রগুলোকে গলা চেপে ধ্বংস করেছে। ফরাসিরা নিশ্চিহ্ন করেছে পশ্চিম সুদানের বড় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো; একই কাজ তারা করেছে ডাহোমিতে এবং মাদাগাস্কারের বিভিন্ন রাজ্যে। ব্রিটিশরা চূর্ণ করেছে বহু বহু অঞ্চল। এর মধ্যে প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য মিশর, মাহদিবাদী সুদান, আসান্তে, বেনিন, ইয়োরুবা রাজ্যসমূহ, সোয়াজিল্যান্ড, মাতাবেলেল্যান্ড, লোজি এবং পূর্ব আফ্রিকার হ্রদঘেরা রাজ্যগুলো। ভুলে গেলে চলবে না প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন উঠতি রাজ্যের কথাও।

বেলজিয়ান, পর্তুগিজ, ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ এবং ইটালীয়রা মিলে সেসব রাজ্যের অস্তিত্ব উধাও করে দিয়েছে। শেষতক টিকে ছিল হাতে-গোনা কিছু পুতুল রাষ্ট্র আর সেগুলোর নেতারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মরক্কো আর তিউনিসিয়ার কথা। মরক্কোর সুলতান ১৯১২ সালে শুরু-হওয়া উপনিবেশীয় শাসনের অধীনে নামেমাত্র ক্ষমতা নিয়ে নিজ পদে আসীন ছিলেন। তিউনিসের বে-এর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কিন্তু ফরাসি উপনিবেশের অধীনে মরক্কো এবং তিউনিসিয়ার অবস্থা তাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আলজেরিয়ার মতোই ছিল। আলজেরিয়ার সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত নেতাকেই ফরাসিরা উচ্ছেদ করে দেয়।

উপনিবেশকরা কখনো কখনো আফ্রিকার গোত্রনেতাদেরকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিত। সেসব নেতারা বিদেশিদের হাতের পুতুল ছাড়া আসলে আর কিছুই ছিল না। ফরাসি এবং পর্তুগিজরা তাদের পছন্দমতো আফ্রিকান "মোড়ল" বেছে নিত। ইবোল্যান্ডে গিয়ে ব্রিটিশরা "হুকুমী মোড়ল" (warrant chiefs) নামে নতুন এক পদ চালু করে। এরা-সহ বাকি সব ঔপনিবেশিক শক্তি হরহামেশাই "সর্বোচ্চ নেতা" নিয়োগ দিত নিজেদের পক্ষ থেকে। স্থানীয় সাধারণ মানুষরা এসব ঔপনিবেশিক ভাঁড়কে একদম দেখতেই পারত না। সে-সময়ও কোনো কোনো গোত্রপ্রধান সসম্মানে নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পদে বহাল ছিলেন। নাগরিকরাও সম্মান করত তাদের। যেমন সোকোতোর সুলতান, বুগান্ডার কাবাকা, এবং আসান্তের আসান্তেহেনে। কিন্তু ঔপনিবেশিকদের টেনে দেওয়া ছোট্ট সীমানার বাইরে তাদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না। তেড়িবেড়ি করলে সেইশেলজ দ্বীপপুঞ্জে "মহারাজার সরকারের অতিথি" [নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত] হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের।

বলা চলে, আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে পুরো মহাদেশেই আফ্রিকার রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারণ, মহাদেশব্যাপী উপনিবেশায়নের ফলে লাইবেরিয়া এবং ইথিওপিয়াও আর স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। লাইবেরিয়া বিদেশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক চাপের সামনে এমনভাবে নতি স্বীকার করে, যেমনটি করতে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র কখনোই রাজি হবে না। এদিকে, ইথিওপিয়া ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত স্বাধীন থাকলেও ইউরোপের অধিকাংশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই ইথিওপিয়াকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মানত না। মানে তাদের আচরণে, কূটনীতিতে সেটি বোঝা যেত স্পষ্টভাবে। তাদের মানসিকতা ছিল এমন যে, ইথিওপিয়া তো আফ্রিকারই একটি দেশ। এবং আফ্রিকার দেশ-জনগণ সবকিছুকেই উপনিবেশের আজ্ঞাবহ হতে হবে।

আফ্রিকার রাজনৈতিক উন্নয়নকে স্থবির করে দেয়ার প্রক্রিয়ার একটি প্যাটার্ন আছে। এই প্যাটার্নটি ধরা যাবে যদি খুব মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন ব্যাপার খেয়াল করা হয়। একই সাথে চোখ থেকে খুলে রাখতে হবে ঔপনিবেশিকদের পরানো টিনের চশমাটিও। শুরুতেই আনা যেতে পারে সমাজে নারীর ভূমিকা। আজ অবধি পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতার সুরাহা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্র আসার আগ পর্যন্ত প্রতিটি উৎপাদন-ধরনেই এই অসমতা গেড়ে বসে ছিল। আফ্রিকায় আসা উপনিবেশকরা মাঝেমধ্যে নারীশিক্ষা এবং নারীমুক্তির কথা দায়সারাভাবে উচ্চারণ করত বটে। কিন্তু বাস্তবে তাদের অধীনে নারীদের অবস্থান দিনে দিনে অবনতই হয়েছে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক স্বাধীন আফ্রিকায় নারীর ভূমিকাকে বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করলে দুটি ব্যাপার দেখা যায়। এই দুটো একদিকে পরস্পর সাংঘর্ষিক, অন্যদিকে যুগপৎ চলমান। প্রথমত, বহুপত্নিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষরা নারীদের শ্রমশক্তির মালিকানা কবজা করে নিত। বরাবরের মতোই, এর হাত ধরে চলত নিপীড়ন। মেয়েদেরকে যে আফ্রিকানরা, বিশেষত মুসলিমরা বোঝা মনে করত, তার প্রমাণও আমরা পাই। অন্যদিকে আবার কম-বেশি যা-ই হোক, নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করার একটা প্রবণতা প্রায় সকল আফ্রিকান সমাজেই ছিল। মায়েদের অধিকার ছিল আফ্রিকান সমাজের এক সুবিদিত বৈশিষ্ট্য। আবার উত্তরাধিকারের মূল চাবিকাঠি হিসেবে কিছু নারীর ছিল নানান রকমের সব অধিকার।

তার চেয়ে বড় কথা, রাজনীতির মাঠে কিছু নারী প্রকৃতার্থেই ছিল দারুণ ক্ষমতার অধিকারী। সেটা হয় ধর্মীয় বিচারে, আর নাহয় সরাসরি রাজনৈতিক-সাংবিধানিক পরিমণ্ডলে। যেমন মোজাম্বিকে একবার এক এনগুনি রাজার মৃত্যুর পর তার কবরের ওপর মন্দির নির্মিত হয়, সেটার পুরোহিত হন প্রয়াত রাজার স্ত্রী। পরবর্তী রাজা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেই বিধবা রানির সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য। অল্প কিছু ক্ষেত্রে নারীরাই হতো রাষ্ট্রপ্রধান। ট্রান্সভালের লোভেদুদের প্রধান ছিলেন "বৃষ্টির রানি"। তিনি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দুই ময়দানেরই প্রধান। যে গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের সবচেয়ে অহরহ অধিষ্ঠিত হতে দেখা যেত, তা হলো "রানি-মা" কিংবা "রানি-বুবু"র পদ। মালি, আসান্তে এবং বুগান্ডার রাজাদের মা, বোন কিংবা খালা-ফুপুরা এসব পদপ্রাপ্ত হতো। এদের ছিল উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালিতা। কখনো-বা দেখা যেত "রানি-মা"ই আসল ক্ষমতার অধিকারিণী, আর পুরুষ রাজা তার হাতের পুতুল।

উপনিবেশবাদের অধীনে আফ্রিকান নারীদের সামাজিক, ধর্মীয়,

সাংবিধানিক, ও রাজনৈতিক সুবিধা ও অধিকার উধাও হয়ে যায়। অর্থনৈতিক শোষণ তো এ সময়ে অব্যাহত ছিলই, বরং কিছু ক্ষেত্রে আরও জোরদার হয়ে গেছে। জোরদার হওয়ার কারণ, লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন ব্যাহত হওয়া। আফ্রিকান পুরুষরা যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা ও শিকার ছাড়াও ঐতিহ্যগতভাবে গাছ কাটা, জমি পরিষ্কার, বাড়িঘর তৈরির মতো ভারী শ্রমে যুক্ত ছিল। সেই তারাই যখন নিজ খামার ছেড়ে অন্যত্র চাকরি খুঁজতে চলে যায়, তখন নারীদের ওপরই নিজেদের, শিশুদের, এমনকি পুরুষদের খাদ্যসামগ্রী জোগানো তথা টিকে থাকার সমস্ত দায়ভার এসে পড়ে। উপরন্তু, পুরুষরা নারীদের তুলনায় সহজে এবং অধিক সংখ্যায় অর্থখাতে প্রবেশ করে। ফলে ঔপনিবেশিকদের নির্ধারিত নতুন মূল্যব্যবস্থায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের কাজ হয়ে ওঠে অত্যন্ত হীন। এতে পুরুষদের কাজকে "আধুনিক" এবং নারীদেরগুলোকে "সেকেলে" ও "পশ্চাৎপদ" গণ্য করা হতো। অতএব, কোন কাজটি মর্যাদাপূর্ণ এবং কোনটি নয়, তা নির্ধারণের অধিকারও হারিয়ে যায়। আফ্রিকান নারীদের মর্যাদার অবনতিও এরই ফল।

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় ঐতিহাসিক স্থবিরতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপটি "গোত্রবাদ" শিরোনামে আলোচিত হয়। সাধারণ অর্থে এই পরিভাষা দিয়ে বোঝায় যে, আফ্রিকানরা পুরো জাতির চাইতে যার যার গোত্রের প্রতি বেশি অনুগত। এবং প্রতিটি গোত্রই এখনো তার প্রতিবেশী গোত্রগুলোর প্রতি পুরোনো শত্রুতা জিইয়ে রেখেছে। পুঁজিবাদী সাংবাদিক এবং বুর্জোয়া পণ্ডিতরা এক্ষেত্রে কঙ্গো এবং নাইজেরিয়ার উদাহরণ টানে। তাদের মতে, ইউরোপীয়রা কঙ্গোলিজ ও নাইজেরিয়ানদের নিয়ে একটি ভিন্ন জাতি তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে ঘৃণার সম্পর্ক বিরাজমান। ঔপনিবেশিক শক্তি সেসব স্থান ত্যাগের সাথে সাথে স্থানীয়রা পুনরায় খুনাখুনি শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ইউরোপীয়রা প্রায়ই "atavism" পরিভাষাটি যুক্ত করে বোঝাতে চায়, আফ্রিকানরা তাদের আদিম বর্বর রূপে ফিরে যাচ্ছিল। অথচ আফ্রিকান অতীতের ওপর দায়সারা চোখ বোলালেও বোঝা যায়, এই ধরনের দাবি বাস্তবতার ঠিক বিপরীত।

গোত্র কী, তা অন্তত সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের আলোচনায় গোত্র শব্দটি পরিহার করা হয়েছে। এর একটি কারণ, শব্দটি অবমাননাকর। আরেকটি কারণ, আফ্রিকা-সংক্রান্ত লেখালেখিতে শব্দটির অস্পষ্ট ও বেপরোয়া ব্যবহার। পারিবারিক একাত্মতার নীতি মেনে আফ্রিকানরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করত। এই পুরো গোষ্ঠীর অতীত পূর্বপুরুষ একই। তাত্ত্বিকভাবে, দূর অতীতের একই পূর্বপুরুষ থেকে আগত সমকালীন সবচেয়ে

বড় জনগোষ্ঠীটির নামই গোত্র। সাধারণত এই ধরনের একটি গোষ্ঠীকে একই নৃতাত্ত্বিক দল বলা যায়, যাদের ভাষায় অনেক মিল থাকবে। এর বাইরে কোনো গোত্রই সেভাবে একই রাজনৈতিক এককের সদস্য হতো না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্য ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক উদ্দেশ্য থাকত ভিন্ন ভিন্ন। বরঞ্চ আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো কখনো কখনো নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীর অংশবিশেষ নিয়ে কিংবা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়টির উদাহরণ বেশি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকার সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্র ছিল একাধিক নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়। এদের সম্প্রসারণ ক্রমেই "গোত্রীয়" আনুগত্যকে অতীতে-ফেলে-আসা একটি বিষয়ে পরিণত করে। তার জায়গা দখল করে নেয় জাতীয় এবং শ্রেণীগত সম্পর্ক। কিন্তু গোত্রীয় সম্পর্ক ভেঙে সেখানে জাতীয় এবং শ্রেণীগত বন্ধন প্রতিষ্ঠা একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। বিশ্বের যেকোনো জায়গার ক্ষেত্রেই তা সত্য। সবখানেই এমন কোনো ছোট অঞ্চল বা লোকজন রয়েই যায়, যাদের আনুগত্য আঞ্চলিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। এর কারণ হলো আত্মীয়তা, ভাষা এবং সংস্কৃতির বন্ধন। ঔপনিবেশিক শাসনের আগের শতকগুলোতে এশিয়ার দুই সামন্তবাদী রাষ্ট্র ভিয়েতনাম ও বার্মা ব্যাপক জাতীয় একতা অর্জন করে। কিন্তু তবুও সেখানে ক্ষুদ্র কিছু "গোত্র" বা "সংখ্যালঘু" রয়ে যায়, যারা জাতি-রাষ্ট্র এবং জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষেত্রের বাইরে ছিল।

প্রথমত, ঔপনিবেশিকতা জাতীয় সংহতির অধিকতর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যেসব এশিয়ান বা আফ্রিকান রাষ্ট্র ধীরেধীরে নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজনগুলো একাট্টা করে চলেছিল, উপনিবেশবাদ এসে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিকরা "গোত্রবাদ" নামে পরিচিত গোষ্ঠীগত এবং আঞ্চলিক আনুগত্যের এই সমস্যা সমাধা করতে পারেনি। ফলে অস্বাস্থ্যকর রূপ ধরে বাড়তে থাকে এসব আনুগত্যের ধরন। বস্তুত, ঔপনিবেশিক শক্তি কখনো কখনো ইচ্ছে করেই অভ্যন্তরীণ গোত্রীয় সংঘাত উসকে দিত। এভাবে ইউরোপীয় প্রভুদের সাথে সংঘাতে জড়ানো থেকে উপনিবেশায়িতদের বিরত রাখার ব্যবস্থা করে তারা—সেই চিরাচরিত বিভেদ ও শাসন নীতি। বেলজিয়ানরা তো বুঝেশুনেই এর প্রয়োগ ঘটাত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা ১৯৫০-এর দশকে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা সাজায়। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা নিপীড়িত আফ্রিকান জনগণকে জুলু, জোসা এবং সোথো নামক গোষ্ঠীতে ভাগ করে "গড়ে" তুলবে। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর আফ্রিকান জাতীয় ও শ্রেণী-সংহতির অগ্রযাত্রা থামিয়ে সেটাকে আরও পিছিয়ে দেওয়া।

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধকে সাধারণত গোত্রীয় সংঘাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটা মেনে নিলে তো শেল অয়েল কোম্পানি আর গাল্‌ফ অয়েল কোম্পানির মাঝে প্রতিযোগিতাকেও গোত্রীয় যুদ্ধ বলতে হয়! সেটা বাদ দিন। প্রাক-ঔপনিবেশিক স্বাধীন নাইজেরিয়াতেও ইবো এবং হাউসা-সহ আরও অনেক জাতি ছিল। কিন্তু ইতিহাসে তাদের গণহত্যা বা এমন কোনো সংঘাতেরই নজির নেই, যা থেকে ধারণা করা যায় যে, ঊনিশ শতকের আগ পর্যন্ত তাদের মাঝে কোনো নৃগোষ্ঠীগত শত্রুতা ছিল। যুদ্ধ বাঁধত অবশ্যই, কিন্তু সেগুলো ছিল বাণিজ্য, ধর্মীয় বিবাদ কিংবা রাজনৈতিক সম্প্রসারণঘটিত দ্বন্দ্ব। গোত্রবাদ পরিভাষাটির উদ্ভব ঘটে নাইজেরিয়ায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুগে। ঔপনিবেশিক যুগে শোষণের উদ্দেশ্যে মানুষকে যেভাবে একাট্টা করা হতো, তারই সূত্র ধরে গোত্রবাদের উৎপত্তি। আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নৃগোষ্ঠীগুলোকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ এক প্রশাসনিক কৌশল মাত্র।

পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা এবং কেনিয়াকেও গোত্রীয় সমস্যায় জর্জরিত বলে আখ্যায়িত করা হয়। কোনো সন্দেহ নেই, স্বাধীন উগান্ডার মধ্যে বুগান্ডা রাজ্যের অস্তিত্ব কিছু সমস্যা তৈরি করেছিল। কিন্তু বুগান্ডায় গোত্রের ভুল সংজ্ঞা প্রয়োগের পরও সত্য হলো, বুগান্ডা সমস্যাও ঔপনিবেশিকতার সৃষ্টি। ঊনিশশ সালে উগান্ডায় ব্রিটিশ (মাইলো) ভূমি অভিবাসন, মিশনারি ও ব্রিটিশদের উপস্থিতির ফলেই এমন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তার ওপর ছিল উগান্ডীয় উপনিবেশে বুগান্ডা শাসক-শ্রেণীকে ব্রিটিশদের অধীনস্থ "উপ-সাম্রাজ্যবাদী" হিসেবে ব্যবহার।

শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের উপস্থিতির কারণে কেনিয়ার উপনিবেশিকতার ধরন ছিল উগান্ডার চেয়ে আলাদা। ঔপনিবেশিক অফিসে NCO কোনো পদে আফ্রিকানদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি। শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরাই এই ভূমিকায় থাকত। সবচেয়ে উর্বর জমিগুলো দখল করে নেয় শ্বেতাঙ্গরাই। তারপর আফ্রিকানদের শ্রম দিয়েই সেখানে একটি নতুন বিশ্ব তৈরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাদা অভিবাসী এলাকার ঠিক বাইরেই যেসব আফ্রিকান সম্প্রদায় বাস করত, তাদেরকে গোত্র বলেই ধরে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অসংখ্য রাজকীয় কমিশনের মধ্য থেকে একটি কমিশন কেনিয়ার ওপর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে ১৯৩৪ সালে। সমসাময়িক একজন কেনিয়ান ইতিহাসবিদ এই প্রতিবেদনের ব্যাপারে বলেছেন :

ব্রিটিশ সরকার কমিশনের যেসব সুপারিশ মেনে নেয়, সেগুলোর মূল

বক্তব্য হলো কেনিয়াকে আফ্রিকান এবং ইউরোপীয়, এ দুটি জাতিগত ব্লকে বিভক্ত করা হবে। আফ্রিকান এলাকায় সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন পরিচালিত হবে তাদের গোত্র হিসেবে ধরে নিয়ে। এভাবেই বর্ণবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

গোষ্ঠীতান্ত্রিক যুগে প্রতিটি মহাদেশই এমন এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, যখন মানবীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো শুধুই আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। এই মানবগোষ্ঠীকে বলা চলে গোত্র। আর উক্ত পর্যায়টি ছিল খুবই পরিবর্তনশীল। আফ্রিকাতে এই পর্যায়টি পরিবর্তনশীল না থেকে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে গেছে, কারণ উপনিবেশবাদ এসে আফ্রিকার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আফ্রিকানদের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার বিষয়ে মেমির মন্তব্যের সারাংশ এটাই। ফ্রানৎস ফানোঁ এবং অ্যামিলকার ক্যাব্রালের মতো বিপ্লবী আফ্রিকান চিন্তাবিদরা একই ধারণা প্রকাশ করেছেন একটু ভিন্নভাবে। বলেছেন যে, ঔপনিবেশিকতা আফ্রিকানদের ইতিহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক আফ্রিকান ভূমিদাসদের মতো উপনিবেশায়িত আফ্রিকানদেরও একেক বার একেক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয় ইউরোপীয় স্বার্থের সাথে মিল রেখে। ইউরোপীয়দের এসব কার্যকলাপ আফ্রিকা মহাদেশ এবং এর জনগণের জন্য ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ছিল। এখন সেই পরিস্থিতির আরও কিছু আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের কারণে আফ্রিকায় অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও প্রযুক্তিগত ঘাটতির সূচনা হয়। আর ঔপনিবেশিক শাসন সেই ধারাকে ত্বরান্বিত করে। বলা হয়ে থাকে, গোল্ড কোস্টের ব্রিটিশ উপনিবেশ আক্রা থেকে পার্শ্ববর্তী আইভোরি কোস্টের ফরাসি উপনিবেশ আবিদজানে একটি টেলিফোন কল করার জন্য প্রথমে লন্ডনের একজন অপারেটর ও পরে প্যারিসের একজন অপারেটরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হতো। ওই অপারেটর পরে সংযোগ স্থাপন করত আবিদজানের সাথে। এ থেকে প্রকৃত অবস্থার একটি প্রতিফলন পাওয়া যায়। গোল্ড কোস্টের অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনীতিতে এবং আইভোরি কোস্টের অর্থনীতি ফরাসি অর্থনীতিতে ঠিকই একীভূত হয়ে গিয়েছিল। অথচ প্রতিবেশী আফ্রিকান উপনিবেশগুলোর মাঝে তেমন কোনো ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশন ১৯৫৯ সালে আফ্রিকার ব্যাপারে যে উপসংহারে আসে, তাতে ঠিক এই ব্যাপারটিই উঠে এসেছে।

আফ্রিকার পরিবহন-ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশগুলোর তুলনামূলক বিচ্ছিন্নতা। একেকটি দেশ ও অঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা সেখানেই

সীমাবদ্ধ। একই ভৌগোলিক উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে কোনো যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি।

কিছু আফ্রিকান বাণিজ্য অবশ্য ঔপনিবেশিক অঞ্চল জুড়ে অব্যাহত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম আফ্রিকার বন থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত কোলা বাদাম ও স্বর্ণের শতাব্দী-পুরোনো বাণিজ্য কখনোই পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। পাশাপাশি বাণিজ্যের নতুন ধরনেরও বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে শহরে বা অর্থকরী ফসলের এলাকায়, যেখানে খাদ্যের অপর্যাপ্ততা ছিল, সেখানে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য। এ ধরনের বাণিজ্য পুরোপুরিভাবে কোনো উপনিবেশের মধ্যে বা ঔপনিবেশিক সীমানার বাইরেও চলতে পারে। কিন্তু আন্তঃআফ্রিকীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে যতটুকু শক্তি খরচ করা হয়, রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের তুলনায় সেটা ছিল একদম নগণ্য। এই আন্তঃআফ্রিকীয় বাণিজ্যতে যেহেতু ইউরোপীয়দের কোনো ফায়দা নেই, সেহেতু তারা এর কোনো পৃষ্ঠপোষকতাও করেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষভাগ পর্যন্ত আফ্রিকার বাণিজ্যের মাত্র ১০ শতাংশ ছিল অভ্যন্তরীণ।

আরও লক্ষণীয়, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে সুস্থ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিকাশের সুযোগ থেকে আফ্রিকাকে বঞ্চিত করা হয়। ভারত মহাসাগর জুড়ে কিছু বাণিজ্য অব্যাহত ছিল বটে। কিন্তু মোটের ওপর বলা যায়, আফ্রিকার রাস্তাঘাটগুলো ছিল সমুদ্রবন্দর-অভিমুখী। আর সমুদ্রপথগুলোর গন্তব্য ছিল পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা। এই ধরনের অসামঞ্জস্য আজও অনুন্নয়ন এবং নির্ভরশীলতার প্যাটার্নের অংশ হয়ে আছে।

আফ্রিকান প্রযুক্তিতে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব আগের শতাব্দীগুলোর তুলনায় ঔপনিবেশিক যুগে আরও স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। দাস-ব্যবসা ও ইউরোপীয় পণ্য আমদানি সত্ত্বেও বেশির ভাগ আফ্রিকান হস্তশিল্প ঔপনিবেশিক সময়ের শুরুতে বেশ প্রাণবন্ত ছিল। কোনো ধরনের সম্প্রসারণ বা প্রযুক্তিগত উন্নতি না হলেও অন্তত টিকে ছিল এসব শিল্প। নব্য পুঁজিবাদের ব্যাপক উৎপাদনের ফলে আফ্রিকার বিভিন্ন শিল্প বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। যেমন : কাপড়, লবণ, সাবান, লোহা, এমনকি মৃৎপাত্র তৈরি।

উত্তর আফ্রিকায় পিতলের কাজ থেকে শুরু করে পশমি বস্ত্র পর্যন্ত নানারকম হস্তশিল্প সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধন করে ঔপনিবেশিক যুগের আগে। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের মতো আলজেরিয়ার ওরান, কনস্টানটাইন, আলজিয়ার্স ও টেমসেনের মতো শহরগুলোতে কারুশিল্পের কারখানা বিকাশ লাভ করে।

কিন্তু ফরাসি উপনিবেশবাদ হস্তশিল্পের কারখানাগুলো ধ্বংস করে হাজার হাজার মানুষকে কর্মচ্যুত করে দেয়। শিল্পবিপ্লবের সময় ইউরোপেও সৃষ্টি হয় একই অবস্থা। কারণ ল্যাংকাশায়ার এবং লিওঁর মতো জায়গায় নতুন ধরনের মেশিনারি সেখানকার কারিগরদের কাজ কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে এসব নতুন যন্ত্রপাতি প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি হয়ে ওঠে। পূর্বের স্বাধীন কারিগররা শ্রমজীবী হিসেবে পুনরায় কারখানায় ফিরে আসে। বিভিন্ন দক্ষতা আয়ত্ত করে সমাজের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় তারা। অন্যদিকে আফ্রিকায় প্রতিকারের কোনোরূপ ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের পরিস্থিতি কেবল সর্বনাশই করেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হতে হতে যেসব কারুশিল্প টিকে ছিল, সেগুলো আফ্রিকান জনগণের প্রকৃত চাহিদা পূরণের পরিবর্তে পর্যটক আকর্ষণের দিকে বাঁক নেয়।

উপনিবেশবাদের অধীনে প্রযুক্তি ধ্বংস হওয়ার স্পষ্ট আরেকটি কারণ হলো, আফ্রিকান কর্মোদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করা। ইউরোপীয় দাস-বাণিজ্যের যুগেও এমনটিই ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে যে বিপুল সংখ্যক আফ্রিকানকে টেনে আনা হয়, তারা কেবল কায়িক শ্রমই দিয়ে গেছে। এতে ঘাম ঝরেছে কেবল। বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগের কোনো প্রণোদনা আসেনি। বাণিজ্যখাতে যুক্ত আফ্রিকানরা কখনো কখনো সীমিতভাবে সফল হতো অবশ্য। পশ্চিম আফ্রিকার বাজারে নারীদের দক্ষতার কথা বেশ সুপরিচিত। কিন্তু একেও ব্যবহার করা হয় তুচ্ছ উদ্দেশ্যে। ইউরোপের পুঁজিপতি ও শ্রমিকরা আফ্রিকান পাইরেথ্রাম থেকে কীটনাশক তৈরির সময় যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, তা সমাধানের জন্য উদ্ভাবনী দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত বিকাশ ঘটে। কিন্তু আমদানিকৃত সার্ডিনের প্রতিটি টিন থেকে এক পয়সা বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য আফ্রিকান বাজারের নারীকে সেরকম কিছু করতে হয়নি। কখনো একটু বেশি শ্রম, কখনো অসততার ছোঁয়া, আবার কখনো "জুজু"র ভয় দেখিয়ে সমাধান করা হতো এই সমস্যা।

আফ্রিকান লোহাশ্রমিকরা আগে মাটি থেকে লোহা আহরণ করত। উপনিবেশবাদের ফলে তারা সে কাজ ছেড়ে ইউরোপ-থেকে-আমদানিকৃত ধাতুর ফেলনা অংশ নিয়ে কাজ শুরু করে। সেই বাধার একমাত্র ক্ষতিপূরণ হতে পারত লোহা উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক কৌশলের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আফ্রিকাকে সেসব কৌশল থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন। আগেই দেখানো হয়েছে, আফ্রিকায় শিল্প-বিপর্যয় কাকতালীয় ছিল না। যন্ত্রপাতি ও দক্ষতার স্থানান্তর বন্ধ করে ইচ্ছাকৃতভাবে জোরপূর্বক সেখানে এ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। অথচ

সে যুগে ইউরোপীয় শিল্পের সাথে তারা প্রতিযোগিতা করতেও পারত।

উপনিবেশ-পূর্ববর্তী আফ্রিকান বিকাশের সময়ে কিছু অঞ্চল অন্যদের তুলনায় দ্রুত অগ্রসর হয়। শুধু তা-ই নয়, তারা বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। এদের অন্যতম ছিল উত্তর নাইজেরিয়া। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে অঞ্চলটি কার্যত ঘুমিয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা একে বাকি মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক সম্পর্কের অগ্রগতি থামিয়ে দেয়, যাতে ভূমিদাসরা অভিজাত শাসকদের ডিঙিয়ে কোনো পরিবর্তন আনতে না পারে।

প্রতিটা মহাদেশে এবং প্রত্যেক জাতি-রাষ্ট্রে কিছু ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে যায়। ওগুলোর যোগফলে এগিয়ে যায় সমাজের বাকি অংশও। সামন্তযুগের শেষভাগে ইউরোপের বিভিন্ন শহর এমন ভূমিকায় ছিল। পক্ষান্তরে এই শতাব্দীর শুরুর দশকে বৈদ্যুতিক শিল্পকারখানাগুলো ছিল মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী সমাজের এমন উন্নয়নের চালিকাশক্তি। কিন্তু উপনিবেশবাদ আফ্রিকাকে কোনো প্রবৃদ্ধিই দিতে পারেনি। যেমন, উপনিবেশের অধীনে আফ্রিকার কোনো শহর মানে শিল্পাঞ্চল না, শুধুই প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল। গ্রাম থেকে বহু লোক শহরের টানে ছুটে আসত ঠিকই, কিন্তু এসে পেত অদক্ষ শ্রম ও অনিয়মিত কর্মসংস্থানের এক অস্থিতিশীল জীবন। ইউরোপের বস্তিগুলোর দুরবস্থার কথা মোটামুটি আমরা জানি। কিন্তু অনুন্নত দেশের ঘিঞ্জি শহরগুলো ছিল অবর্ণনীয়। একটি শহর যখন তার বৃদ্ধির সাথে উৎপাদনশীলতার সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়, তখন এ অবস্থা নেমে আসাই স্বাভাবিক। তবুও ভাগ্য ভালো বলতে হয়, এক্ষেত্রে আফ্রিকার অবস্থা এশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার মতো খারাপ হয়নি।

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে "সনাতন" আফ্রিকান জীবনের পতন ত্বরান্বিত করে ঔপনিবেশিক বিভিন্ন কার্যক্রম। যেমন : খনিজ উত্তোলন এবং অর্থকরী ফসল চাষ। মহাদেশের অনেক অংশে সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরিবর্তে ভালো কিছু তো আসেইনি, বরং যেটুকু বাকি যা ছিল তাকেও আগের অবস্থার নির্জীব খোলস বাদে কিছু বলা যায় না। ঔপনিবেশিকতার পেছনে থাকা পুঁজিবাদী শক্তি শুধু শ্রমিক-শোষণেই আগ্রহী ছিল, এমন না। এমনকি যেসমস্ত ক্ষেত্র সরাসরি মুদ্রাভিত্তিক-অর্থনীতিতে জড়িত না, সেসবও শোষণে জর্জরিত ছিল। সেই শ্রম আহরণে ইউরোপীয়রা সমাজের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখা উপাদানগুলোতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে। গতানুগতিক শ্রমশক্তি ও কাজের ধরন থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আফ্রিকান

"সনাতন" জীবন আর "সনাতন" থাকেনি।

ঔপনিবেশিক যুগে, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেকগুলো স্বল্পজনবসতিপূর্ণ গ্রাম গড়ে ওঠে। এগুলোর বাসিন্দারা শুধু নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। তারা কোনোমতে পেট চালানোর মতো জীবিকানির্ভর কৃষিকাজ করত। এসব কাজ থেকে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন হতো না। অন্যদিকে ঔপনিবেশিকরা তৈরি করে অর্থকরী ফসলপূর্ণ এলাকা, যেগুলো তুমুলভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু এতগুলো গ্রামকে জনশূন্যতা ও অনাহারে ঠেলে দেয় উপনিবেশবাদ। কারণ সক্ষম পুরুষরা অন্যত্র শ্রম দিতে চলে গিয়েছিল। সক্রিয়, সামর্থ্যবান শ্রমগোষ্ঠী থেকে বঞ্চিত কোনো এলাকায় তো আর উন্নয়নের আশা করা যায় না।

বিভিন্ন উপনিবেশের কিছু জায়গা মূল শহর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন থেকে এতটাই দূরে ছিল যে, তারা শ্রম সরবরাহও করত না, অর্থকরী ফসল উৎপাদনও করত না। যেমন, দক্ষিণ সুদানে এমন কিছু জনগোষ্ঠী ছিল। তাদের জীবনধারা বিগত শতকগুলো থেকে খুব একটা পালটায়নি। এমনকি এ ধরনের সনাতন আফ্রিকান সমাজের জন্যও উন্নয়নের সুযোগ ছিল না আর। মহাদেশের বাকি অংশের ওপর ঔপনিবেশিকদের দখলদারিত্বের কারণে তারা তখন একেবারে বিচ্ছিন্ন। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ থাকেনি। মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দখলের কবলে পড়ে এসব গোষ্ঠী ধীরে ধীরে ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার এমন ধ্রুপদী উদাহরণ পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রে। শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া আদিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষিত এলাকায় আটকে রাখা হয়। উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত এসব সংরক্ষিত এলাকা হয়ে ওঠে জীবন্ত জাদুঘর। শ্বেতাঙ্গ পর্যটকরা অদ্ভুত প্রাণী দেখতে সেখানে যায়।

রোডেশিয়া [বর্তমানে জিম্বাবুয়ে] ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনো রাখঢাক ছাড়াই অনুসরণ করা হচ্ছিল "নেটিভ রিজার্ভ" প্রতিষ্ঠার নীতি। এরকম একেকটি সংরক্ষিত এলাকার ভেতরে উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম ছিল জমি। কিন্তু যেসব আফ্রিকানকে এসব এলাকায় ঠেসে ঢোকানো হয়, তাদের জন্য বরাদ্দকৃত জমির উর্বরতা ও পরিমাণ, দুইই ছিল অপর্যাপ্ত। এলাকাগুলো ছিল সস্তা শ্রমের আধার। আফ্রিকার বর্ণবাদী দক্ষিণ অংশের মুদ্রাভিত্তিক-অর্থনীতিতে যাদের ঢোকানো যায়নি, তাদের ভাগাড়। আরও উত্তর দিকে ঔপনিবেশিক কেনিয়া এবং তাঙ্গানিকাতে খুব সীমিত কিছু জমি ছাড়া "সংরক্ষিত" বলতে কোনো এলাকা ছিল না। কিন্তু মুদ্রাভিত্তিক-অর্থনীতি স্থানীয় সনাতন খাতগুলোকে ক্রমাগত এমন খাতে রূপান্তরিত করে, যার পরিণতিতে এসব জায়গাও

যেকোনো রিজার্ভ অঞ্চলের মতোই বঞ্চিত হচ্ছিল।

এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি ছিল উপনিবেশবাদের এক বর্ধনশীল খাত। তথাপি, সেই উন্নতি বা ক্রমবিকাশ সমগ্র মহাদেশ বিবেচনায় কতটা সীমিত ছিল, তা ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে। তথাকথিত আধুনিক খাতের প্রবৃদ্ধি এমন সব খাতে বিরূপ প্রভাব ফেলে, যেগুলো অর্থনীতির সাথে জড়িত নয়। সারকথা, উপনিবেশবাদের অধীনে আফ্রিকায় যে প্রবৃদ্ধি হয়, তা কোনো অর্থেই উন্নতি না। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মোকাবিলা, সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ন্যায়নীতি নির্ধারণ, এবং বাইরের শক্তির হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই উন্নতি সমাজের সক্ষমতার কোনো ধরনের প্রসার ঘটায়নি।

পুঁজিবাদ যে ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় দক্ষ শ্রম তৈরি করতে পারেনি, তাতেই এ ব্যাপারটি পরোক্ষভাবে বোঝা গেছে। দক্ষতার সমন্বয়ের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো একটি শাসনব্যবস্থা কারও বা কোনোকিছুর উন্নতি সাধন করে না। যেভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন রেখে আফ্রিকাকে কতিপয় অর্থনৈতিক অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল, তাতেও উক্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট। এতে করে প্রতিটি বিভক্ত উপনিবেশের মধ্যে সর্বমোট বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম যেভাবে যুক্ত করেছিল, সে তুলনায় আফ্রিকার এরূপ কোনো উন্নয়নই হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিবিদরা ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় বিদ্যমান একটি প্যাটার্নকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে "উন্নয়নহীন প্রবৃদ্ধি"। এই শব্দগুচ্ছ এখন লাইবেরিয়া এবং আইভোরি কোস্ট নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইয়ের শিরোনামে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মানে দাঁড়ায়, নির্দিষ্ট ধরনের পণ্য এবং পরিষেবা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, হয়তো রাবার এবং কফি রপ্তানি আগের চেয়ে বেশি হতে পারে, এবং মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গাড়ি আমদানি আরও বাড়তে পারে। ফলে গাড়ির জন্য আরও বেশি পেট্রোল স্টেশন তৈরি হতে হবে। কিন্তু গাড়ি এবং পেট্রোল কিনতে গিয়ে রাবার আর কফি বিক্রি করে অর্জিত মুনাফা বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে কৃষিনির্ভর দেশের অর্থনীতি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে মেট্রোপোলের ওপর। কোনো আফ্রিকান উপনিবেশেই অর্থনীতির সমন্বয় ঘটেনি। স্থানীয় জনগণের কল্যাণে অর্থনীতিকে সাবলম্বী করারও কোনো চেষ্টা হয়নি। অতএব, আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে নির্ভরশীলতা আর অনুন্নয়নই বাড়তে থাকে।

উপনিবেশবাদের অধীনে উন্নয়ন-ব্যতীত-প্রবৃদ্ধির আরও একটি নমুনা হলো একটি বা দুটি রপ্তানি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। যেসব ঔপনিবেশিক অঞ্চল নির্দিষ্ট একটি ফসলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, সেগুলোকে বোঝাতে "মনোকালচার" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। (কৃষিখাতে) রাবারের ওপর নির্ভরশীল একটি মনোকালচার ছিল লাইবেরিয়া। একইভাবে, কোকোর ওপর নির্ভরশীল গোল্ড কোস্ট, পাম উৎপাদনের ওপর ডাহোমি ও দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়া, তুলার ওপর সুদান ও উগান্ডা, এবং সিসালের ওপর তাঙ্গানিকা। সেনেগাল এবং গাম্বিয়াতে উপার্জনের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ আসত চীনাবাদাম থেকে। বস্তুত, এ দুটি আফ্রিকান উপনিবেশের ওপর চীনাবাদাম ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন না করার নির্দেশ ছিল!

অন্যান্য পরিপূরক খাবারের পাশাপাশি চাষাবাদে যুক্ত প্রতিটি মানুষের একটি প্রধান খাদ্য থাকে। ঐতিহাসিক, কৃষিবিদ এবং উদ্ভিদবিদরা প্রাক-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার অর্থনীতিতে এই ধরনের খাবারের অস্তিত্বের বিশাল বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নিজস্ব উৎপাদিত অসংখ্য ফসল, বেশ কিছু বন্য খাদ্য-প্রজাতি (বিশেষত ফল) ছিল। এবং তারা এশিয়া বা আমেরিকায় ফলন হওয়া দরকারি খাদ্য আত্মীকরণে কোনোরূপ অনীহা দেখায়নি। বৈচিত্র্যময় কৃষি আফ্রিকান ঐতিহ্যেরই অংশ। মনোকালচার বা এক-ফসলি উৎপাদনব্যবস্থা একটি উপনিবেশবাদী আবিষ্কার।

শ্রমের ঔপনিবেশিক বিভাজনের সমর্থকরা একে একটি "প্রাকৃতিক" ব্যাপার বলে। তাদের মতে এই বিভাজন মেট্রোপোল ও উপনিবেশগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্মান রেখেই করা হয়েছে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানের বিশেষ দক্ষতা শিল্পে, এবং আফ্রিকার কৃষিতে। পৃথিবীর একটি অংশ যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যস্ত, অন্য অংশ নিড়ানি দিয়ে মাটি কর্ষণ করছে। সব মিলিয়ে যে যার মতো সুবিধাজনক জায়গায়। পৃথিবীকে এভাবে দুই ভাগ করার উন্নাসিক প্রবণতা নতুন কিছু না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল এবং স্পেনের সামন্ত শাসকদল পুরো বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছিল। সে লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে একটি সীমানারেখা আঁকার জন্য পোপকে দায়িত্বও দেয় তারা। কিন্তু ব্রিটেন, হল্যান্ড এবং ফ্রান্স মনে করিয়ে দেয় যে—পৃথিবীকে শুধু পর্তুগাল এবং স্পেনের সম্পত্তি করে দিয়ে আদম কোনো উইল লিখে দিয়ে গেছেন, এরকমটা তাদের মনে পড়ছে না। একইভাবে এটাও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, বাইবেলে কোথাও বলা আছে কি না যে, গাম্বিয়া নদীকে শুধু চীনাবাদামই জন্মাতে হবে অথচ (স্কটল্যান্ডের) ক্লাইড নদীকে জাহাজ নির্মাণের আবাসস্থল হয়ে উঠতে হবে।

মনোকালচারের মধ্যে "প্রাকৃতিক বা সহজাত" কিছুই ছিল না। এটি নামমাত্র রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী চাহিদা ও ষড়যন্ত্র বিস্তৃতিরই একটি পরিণতি। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই মনোকালচার। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী সংস্থাগুলোর চাপে লাতিন কিছু দেশ (যেমন কোস্টারিকা ও গুয়াতেমালা) কলা চাষে এত বেশি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাদের অবজ্ঞাভরে "কলা প্রজাতন্ত্র" ডাকা হতো। বিদেশে বিক্রির জন্য দু-একটি অর্থকরী ফসলের ওপর এমন গুরুত্বারোপ আফ্রিকার ওপর ব্যাপক ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। কখনো কখনো প্রধান খাদ্য বাদ দিয়ে অর্থকরী ফসল চাষ করা হতো, যার পরিণামে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যেমন, ঔপনিবেশিক যুগের আগে গাম্বিয়ায় ধান চাষ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এত এত ভালো জমি চীনাবাদাম চাষের জন্য রূপান্তরিত হয় যে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মোকাবিলায় ব্যাপকভাবে চাল আমদানি করতে হয়েছিল। কোকো চাষে মনোনিবেশের কারণে আসান্তেতেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়। অথচ আগে এটি ছিল মিষ্টি আলু এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য সুপরিচিত একটি অঞ্চল।

তবুও মনোকালচারের যে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলোর তুলনায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নগণ্য একটি অসুবিধা মাত্র। নির্দিষ্ট করে কেবল একটি ফসল চাষ করা হলে বিপদের আশঙ্কা অত্যধিক। ফসলটি রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হলে তা প্রবল বিপর্যয় বয়ে আনবে। গোল্ড কোস্টের কোকোয়ার ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটে। সেখানকার ফসল ১৯৪০ এর দশকে অঙ্কুরফোলা রোগে আক্রান্ত হয়। আরেকটি ঝুঁকি হলো সর্বদাই মূল্যের ওঠানামা (যা অবশ্য বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো)। এটি পুঁজিবাদী কৌশলের মুখে আফ্রিকান উৎপাদকদের অসহায় করে রেখেছিল।

পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনোকালচার বেশ প্রশংসনীয়। কারণ তারা ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে মেট্রোপলিটন ক্রেতাদের ওপর নির্ভরশীল করে তুলছিল। ইউরোপীয় দাসবাণিজ্যের যুগ যখন শেষ হয়, তখন ইউরোপীয় আমদানির ওপর নির্ভরশীল আফ্রিকানের সংখ্যা খুব কম। এরাই যেকোনো মূল্যে পুঁজিবাদী লেনদেন চালু রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পুঁজিপতিদের কাছে ওই সংখ্যা যথেষ্ট মনে হয়নি। উপনিবেশবাদ ওই সংখ্যাটা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল আফ্রিকান মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ে, তেমনি আফ্রিকান আর্থসামাজিক জীবনের আরও অনেক খাত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মেট্রোপোলের ওপর। এই হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন ইউরোপীয় ট্রেডিং ফার্ম, খনি কোম্পানি, শিপিং লাইন, ব্যাংক, বীমা

হাউজ এবং প্ল্যান্টেশনগুলো একসাথে আফ্রিকাকে শোষণ করতে শুরু করে। একই সময়ে তাদের এমন বুঝও দিয়ে দেয় যে, এসমস্ত পুঁজিবাদী পরিষেবা ছাড়া কোনো অর্থ বা ইউরোপীয় পণ্য আসবে না। কাজেই আফ্রিকা শেষপর্যন্ত এর শোষকদের কাছেই ঋণী!

ঔপনিবেশিকদের ওপর নির্ভরতা, উপনিবেশের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে এর প্রভাব অনুভূত করিয়ে ছেড়েছে। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতার নেতিবাচক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিণতির শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় একে। ঔপনিবেশিক সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করার মাধ্যমে নব্য-উপনিবেশবাদের যুগ সূচনার মূল হোতা এই বিষয়টি।

পরিশেষে যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা উচিত, তা হলো উপনিবেশবাদের প্রভাবে আফ্রিকানদের শারীরিক ক্ষতি। আফ্রিকান উন্নয়নের ওপর এটি উপনিবেশবাদের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব। উপনিবেশের কারণে যে শুধু বারবার দুর্ভিক্ষই হয়েছে, তা না। আফ্রিকান অধিবাসীদের দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি, পুষ্টিহীনতা, এবং ক্রমাগত শারীরিক অবনতিও ঘটতে থাকে এর ফলে। এই কথা যদি বেশি অতিরঞ্জিত শোনায়, তবে সেটার জন্য দায়ী বুর্জোয়া প্রোপাগান্ডা। তারা এমনকি আফ্রিকানদেরও বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, অনাদিকাল থেকেই অপুষ্টি ও অনাহার ছিল তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা অক্সফামের বিখ্যাত একটি পোস্টার ছিল। সেখানে দেখানো হয়েছে স্বচ্ছ খাঁচার মতো পাঁজরবিশিষ্ট, বিশাল মাথা, স্ফীত পেট, কোটর থেকে বেরিয়ে পড়া চোখ, কচি ডালের মতো হাত-পাওয়ালা কালো শিশু। পোস্টারটি শিশুদের চরম অপুষ্টিজনিত রোগ কোয়াশিওরকরের চিত্র। অক্সফাম ইউরোপের জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়, যেন ক্ষুধার্ত আফ্রিকান ও এশিয়ান শিশুদের কোয়াশিওরকর এবং এই ধরনের অসুস্থতা থেকে বাঁচাতে তারা এগিয়ে আসে। অথচ পুঁজিবাদ ও উপনিবেশবাদই যে প্রধানত শিশুমৃত্যু, অনাহার, দুর্ভোগ এবং দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল, সেসব কথা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করেনি। পাছে বিবেকে লাগে!

বৈশ্বিক পরিসরে ক্ষুধার পরিসংখ্যান নিয়ে ব্রাজিলিয়ান বিজ্ঞানী হোসু ডি কাস্ত্রোর চমৎকার একটি নিবন্ধ রয়েছে। স্বাধীন প্রাক-ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় কিংবা পুঁজিবাদী চাপমুক্ত সমাজে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট তথ্য উঠে এসেছে এতে। তারপর তার সাথে তুলনা করা হয়েছে পরবর্তী ঔপনিবেশিক সময়কে। সমীক্ষাটি দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত করে, বৈচিত্র্যময় কৃষির ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা আফ্রিকান খাদ্যাভ্যাস পূর্বে আরও সমৃদ্ধ ছিল।

ঔপনিবেশিকতার অধীনে এত বৈচিত্র্য কল্পনা করাও সম্ভব না। যে আফ্রিকানরা যত বেশি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, দেখা গেছে তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার। অর্থাৎ, শহুরে শ্রমিকরা।

যাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাদের স্বার্থে ডি কাস্ত্রোর কতিপয় পর্যবেক্ষণ নিচে দেওয়া হলো (কিছু ক্ষেত্রে উপাত্তের পরিমাণ-সহ)।

(১) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার "আদিম" আফ্রিকানদের পুষ্টিগত অবস্থা নিয়ে গবেষণাকারীরা একমত যে, তাদের খাদ্যতালিকায় কোনো ধরনের ঘাটতি ছিল না। আদিবাসী আফ্রিকান খাদ্যাভ্যাসের শ্রেয়ত্বের সবচেয়ে চমকপ্রদ একটি লক্ষণ তাদের দাঁতের চমৎকার গঠন। একজন গবেষক কেনিয়ার ছয়টি ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ওপর জরিপ চালিয়ে দাঁত ক্ষয়ের কিংবা দাঁতের পাটি বিকৃতির কোনো নজির খুঁজে পাননি। অথচ একই ব্যক্তিদের "সভ্য" খাদ্যাভ্যাসের আওতাভুক্ত করার সাথে সাথে দাঁতে ক্ষয় শুরু হতে দেখা দেয়।

(২) মিশরের কৃষক বা ফেল্লাহিনরা বারবার দুর্ভিক্ষের শিকার হতো বটে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে তা দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যাভাবের রূপ ধারণ করে। আগের অবস্থার সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, এ অঞ্চলে একসময় লেবু, ফলের সমাহার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের অযাচিত হস্তক্ষেপ কৃষকদের খাদ্য-ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে তোলে।

(৩) অক্সফামের পোস্টার ঘাঁটলে বোঝা যায়, যেখানেই আফ্রিকানদের মাঝে ইউরোপীয়দের অবস্থান বেড়েছে বা দীর্ঘায়িত হয়েছে, সেখানেই কোয়াশিওরকর (Kwashiorkor)[১২] রোগের লক্ষণীয় উপস্থিতি চোখে পড়ে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পুষ্টি-বিষয়ক একটি কমিটি গাম্বিয়ায় প্রাণীর চর্বি এবং প্রোটিনের লক্ষণীয় অনুপস্থিতি খুঁজে পায়। ভালো মানের প্রোটিনের অনুপস্থিতি কোয়াশিওরকরের অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয়রা গাম্বিয়াতে দেখে আসছিল ভিন্ন এক চিত্র। বোঝা যায় যে, শ্বেতাঙ্গদের আসার পরই এক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এসেছে। প্রাথমিক যুগে গাম্বিয়া শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের খাদ্যই উৎপাদন করেনি, বরং এটি ছিল পশুপাল-পরিচর্যাকারী একটি দেশ। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাংস খাওয়া হতো এখানে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার ইউরোপীয় ক্রেতার কাছে গবাদিপশুর চামড়া

[১২] এটা শিশুদের আমিষের অভাবজনিত একটি অপুষ্টি রোগ (Protein Energy Malnutrition, PEM)

বিক্রি হতো। স্থানীয় জনগণ জীবন ধারণ করত মাংস খেয়ে। সেখানে এরাই কীভাবে প্রাণিজ তেলের অভাবে ভুগতে পারে!

(৪) বিষুবীয় আফ্রিকার ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে, ঔপনিবেশিক চাকরিতে নিয়োজিত আফ্রিকানদের খাদ্য তালিকায় তাজা খাবার অনুপস্থিত। এ কারণে পুষ্টিগত ঘাটতির ঘন ঘন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তাদের মাঝে। এর মধ্যে রয়েছে বেরিবেরি, রিকেটস এবং স্কার্ভি। রিকেটস নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের একটি রোগ, যার জন্য সূর্যালোকের অভাবও দায়ী। কিন্তু উপনিবেশবাদ গ্রীষ্মমন্ডলীয় আফ্রিকায় সুষম খাদ্য গ্রহণের ধারা এতটাই ধ্বংস করে দিয়েছে যে, আফ্রিকার তপ্ত সূর্যের তাপও আর শিশুদের হাড় সোজা রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না। স্কার্ভি রোগ আর ইংরেজ নাবিক যেন একে অপরের সমার্থক। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাজা খাবারের অভাবে তাদের অহরহ স্কার্ভি হতো। এই রোগ প্রতিরোধে তারা এত বেশি লেবু খেত যে, ইংরেজ নাবিকদের ডাকনামই হয়ে গিয়েছিল "লাইমি"। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে তাঙ্গানিকার মধ্যাঞ্চলে গোল্ডফিল্ডের শ্রমিকদের মধ্যে স্কার্ভি ছড়িয়ে পড়ে মহামারি আকারে। মজুরি এবং কাজের পরিবেশ এতই করুণ ছিল যে, তাজা সাইট্রাস ও অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য এদের কপালে জুটত না।

(৫) পূর্বে আফ্রিকানদের খাদ্যাভ্যাস ছিল মাংস আর সিরিয়াল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ অভিবাসন এবং পুঁজিবাদের প্রভাবে সেসব খাদ্যের জায়গা দখল করে ভুট্টা-নির্ভরশীলতা। প্রায় ১৯১৪ সাল পর্যন্ত পেলাগ্রা[১৩] বা "রুক্ষ ত্বক" দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি অজানা বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে তা তাদের জন্য অভিশাপরূপে হাজির হয়। পর্যাপ্ত দুধ এবং মাংসের অভাবে হয়ে থাকে এই রোগ।

(৬) বাসুতোল্যান্ডের (বর্তমানে লেসোথো) একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনে বলা আছে: "দীর্ঘদিনের পুরাতন বাসিন্দাদের মতে, বাসুতোদের শরীর-স্বাস্থ্য আর আগের মতো নেই। প্রতিটি গ্রাম, ডিসপেনসারি, স্কুল ও রিক্রুটিং অফিসে অপুষ্টি দৃশ্যমান। স্কার্ভিও বিরল নয়। এছাড়া পেলাগ্রার মতো সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব। কুষ্ঠরোগ যে ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসের সাথে জড়িত, সে ধারণাও বদ্ধমূল হওয়ার পথে।"

---

[১৩] Pellagra ভিটামিন বি-৩ এর অভাবজনিত রোগ। এর লক্ষণ: ত্বকে প্রদাহ, ডায়রিয়া, স্মৃতিভ্রষ্টতা এমনকি মৃত্যুও।

উপনিবেশবাদ যে আফ্রিকানদের শারীরিক (এবং অতএব মানসিক) সত্তায় ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল, তার আরেকটি দারুণ প্রমাণ আছে। কিছু আফ্রিকান জনগোষ্ঠী আজ অবধি খাদ্যের ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ, উপনিবেশবাদ তাদের খাদ্যাভ্যাস পালটাতে পারেনি। গ্রামীণ মাসাই, গাল্লা, আনকোলি, বাতুতসি এবং সোমালি—এরা সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের দৈহিক গঠন সাধারণত এত চমৎকার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সহনশীলতা এত বেশি যে, এরা রীতিমতো বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। "ভরপেট" পুঁজিপতিরা যেখানে হৃদরোগে ধপাধপ মরে যাচ্ছে, সেখানে এই আফ্রিকানরা কীভাবে এত তাগড়া—তা সবাইকে ভাবিয়ে তোলে।

ঔপনিবেশিক শাসনের হিসাবখাতার আরেকটি উপাদান নিয়ে আলোচনা বাকি। তা হলো, আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের ডাক্তারি উদ্ভাবনসমূহ। যেমন: আধুনিক ঔষধ, ক্লিনিকাল সার্জারি, এবং টিকাদান। পরিমাণে যত কমই হোক, এগুলো যে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ইতিবাচক উপাদান—তা অস্বীকার করাটা বোকামি। কিন্তু এগুলোর বিপরীত পাল্লায় রয়েছে ঔপনিবেশিকতার ফলে আফ্রিকার সকল পরিসরে সৃষ্ট অসংখ্য সমস্যা, বাধা, ও অবনতি। আরও রয়েছে ইউরোপের প্রতি আফ্রিকার অবদানও। ইউরোপীয় বিজ্ঞান তার নিজ সমাজের চাহিদা পূরণ করেছে, বিশেষত বুর্জোয়াদের। বুর্জোয়ারা ক্ষুধা-অনাহারে ভোগেনি। তাই ওসব সমস্যাকে সমস্যা বলেই মনে করেনি তাদের বিজ্ঞান। ফলে আফ্রিকান তো দূরের কথা, ইউরোপের শ্রমিকরাই বুর্জোয়া বিজ্ঞান থেকে কোনো ফায়দা পায়নি। আফ্রিকা আর পুঁজিবাদী ইউরোপের মাঝে ব্যবধান বৃদ্ধির জন্যই যে আফ্রিকাকে শোষণ করা হয়েছিল—এই সাধারণ নীতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হলো বিজ্ঞান। এই শোষণ ও তুলনামূলক পশ্চাৎপদতা হলো অনুন্নয়নেরই অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

অনুন্নতির জন্য শিক্ষা

যেকোনো সামাজিক কাঠামোয় সমাজের সকলের অস্তিত্ব রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সেখানে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষা একটা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকেও উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষার সিংহভাগই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক, যেটা ছোটরা শেখে বড়দের উদাহরণ বা আচরণ থেকে। স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবেশ থেকেই শিক্ষার জন্ম হয়, আর শিখন পদ্ধতি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে গড়ে ওঠে। তৎকালীন উত্তর রোডেশিয়ার বেম্বা

সম্প্রদায়ের একজন ৬ বছরের একটা শিশু ৫০ থেকে ৬০টি উদ্ভিদের নাম অনায়াসে বলতে পারত। কিন্তু তারা শোভাবর্ধক ফুলের ব্যাপারে জানত-না বললেই চলে। কারণ, ওই এলাকার কৃষিকাজ গাছ কাটা ও পোড়ানোর ওপর নির্ভরশীল। তাই গাছ-সংক্রান্ত জ্ঞান অপরিহার্য। গৃহস্থালি সকল কর্মকাণ্ডেই দরকার হতো উদ্ভিদজাত জিনিসপাতি। অন্যদিকে ফুল তাদের টিকে থাকার লড়াইয়ে একদমই অপ্রাসঙ্গিক একটা বিষয়।

প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের আফ্রিকান শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আফ্রিকান জীবনের সাথে তার প্রাসঙ্গিকতা। পরবর্তীকালে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়, তা একদমই বিপরীত। আফ্রিকান দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য অদ্যাবধি প্রশংসার দাবিদার। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক জীবনের সাথে এর ওতপ্রোত সম্পর্ক, বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই; এর সামগ্রিকতা, বহুমাত্রিকতা; এবং শিশুর দৈহিক, মনোজাগতিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগোনো। এখানে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে উৎপাদন কর্মকাণ্ডের কোনো বিচ্ছিন্নতা ছিল না, তেমনি শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষায়ও কোনো তফাত ছিল না। সব মিলিয়ে, আফ্রিকায় এই অপ্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রাক-ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবতার নিরিখেই চলমান ছিল। সমাজের জন্যে চলনসই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তৈরি করে আসছিল সেই শিক্ষাব্যবস্থা।

আফ্রিকান শিক্ষাব্যবস্থার কিছু দিক ছিল আনুষ্ঠানিক। যেমন, সেখানে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে স্পষ্ট ফারাক ছিল। আফ্রিকায় প্রাক-ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মতোই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও সমাজের উদ্দেশ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। একেকটি শিক্ষাকার্যক্রম একেক বয়সের জন্য নির্দিষ্ট, বিশেষত সাবালকত্ব বা "অভিষেক"-এর সময়টাতে। অনেক আফ্রিকান সমাজেই খতনা করার প্রথা চালু ছিল পুরুষদের জন্যে কিংবা উভয় লিঙ্গের জন্যেই। আর সেখানে খতনা আয়োজনের পূর্বলগ্নে একটা শিক্ষামূলক কার্যক্রম থাকত। কখনো এই কার্যক্রম সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী হতো, কখনো-বা কয়েক বছর অবধি। শেষোক্ত জিনিসটির এক বিখ্যাত উদাহরণ সিয়েরা লিওনে পোরো ভ্রার্তৃসংঘের আয়োজিত অভিষেক বিদ্যালয়। জীবনের পরবর্তী পর্যায়গুলোতেও ছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, বিশেষ করে এক বয়স-শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে যাবার সময় কিংবা নতুন কোনো ভ্রার্তৃসংঘে যোগ দেবার আগে। শিকার করা, ধর্মীয় উপাচার আয়োজন করা কিংবা চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ডও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এসব শিক্ষা দিত পরিবার বা গোত্র। এই সকল শিক্ষাপদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল গোষ্ঠীতান্ত্রিক

যুগে। সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক যুগে এবং ঔপনিবেশিক যুগের প্রাক্কালেও তা দাপটের সাথেই বিরাজ করছিল।

আফ্রিকায় উৎপাদনের ধরন যতই সামন্তবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, ততই নতুন বিষয় যুক্ত হতে থাকে শিক্ষাব্যবস্থায়। যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষায়ণ বাড়তে থাকে। কারণ তখন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যত বাড়ে, অনানুষ্ঠানিকের তুলনায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিমাণ তত বাড়ে। শিকার করা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তো আছেই। এ ছাড়াও মৃৎশিল্প, চামড়াশিল্প, লৌহকর্ম, বস্ত্রবয়ন, পেশাদার সওদাগরি ইত্যাদি নানারকম শ্রমবিভাজন ঘটে। ওইসব কৌশল শিক্ষাদানে গড়ে ওঠে আলাদা আলাদা সংঘ।

সামরিক বাহিনীর ওপর জোরারোপের ফলেও ওই পরিমণ্ডলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ডাহোমি, রুয়ান্ডা আর জুলুর কথা আগেই বলা হয়েছে। রাষ্ট্রকাঠামোর সুপ্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই ইতিহাসের আশ্রয়কে উৎসাহিত করে এসেছে, যাতে শাসকশ্রেণীর গুণগান প্রচার করা যায়। কেটুর ইয়োরুবা রাষ্ট্রে ঊনিশ শতকে এমনই এক হিস্ট্রি ইনস্টিটিউটের সন্ধান পাওয়া যায়। গুরু তার শিষ্যদের ইয়া লম্বা ফর্দ ধরিয়ে দিত, যেখানে থাকত কেটুর সকল রাজার অর্জনের আর অবদানের গুণকীর্তন। সব শিক্ষার্থীকে এসব মুখস্থ করতে হতো। স্বাভাবিকভাবেই এই স্মৃতিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল অনেক সীমাবদ্ধতা। তাই আফ্রিকার যেসব দেশে লেখালেখির উদ্ভব ঘটে, সেগুলো ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রসর।

নীলনদের অববাহিকায়, উত্তর আফ্রিকায়, ইথিওপিয়ায়, সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে, এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের অল্প কিছু আফ্রিকান সাক্ষরতা অর্জন করে। এশিয়া ও ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পরিস্থিতি যেরকম ছিল, এখানেও সেরকম হয়ে ওঠে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতোই আফ্রিকায়ও সাক্ষরতা ছিল ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তাই ইসলামি দেশগুলোতে তা হয়ে ওঠে কুরআনের শিক্ষা। আর খ্রিষ্টান ইথিওপিয়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের প্রশিক্ষণ। মুসলিম শিক্ষা সবচেয়ে ব্যাপক ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও কম না। ঔপনিবেশিকদের অনুপ্রবেশের আগে থেকেই আফ্রিকায় শিক্ষার মান কেমন ছিল—তার জলজ্যান্ত উদাহরণ মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মরক্কোর ফেজ বিশ্ববিদ্যালয়, আর মালির টিমবক্টু বিশ্ববিদ্যালয়।

ঔপনিবেশিক শক্তি আফ্রিকায় শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা করেনি। বরং তারা নতুন ধারার একগুচ্ছ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন ঘটায়। এগুলো

কিছু ক্ষেত্রে আগের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, কিছু ক্ষেত্রে সেগুলোকে একেবারেই হটিয়ে দেয়। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এমন মূল্যবোধ ও চর্চারও উদ্ভব ঘটায়, যার ফলে নতুন ধারার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থারও সূত্রপাত ঘটে।

ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ছিল স্থানীয় প্রশাসনের নিম্নতম পদের কর্মচারী কিংবা ইউরোপীয়-মালিকানাধীন পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে আফ্রিকানদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ, মুষ্টিমেয় কিছু আফ্রিকানকে বাছাই করে নেওয়া হতো গোটা মহাদেশের শাসন ও শোষণে অংশগ্রহণের জন্য। এই শিক্ষাব্যবস্থা মোটেও আফ্রিকান পরিবেশজাত নয়। বস্তুগত ও সামাজিক সম্পদের সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করাও এর উদ্দেশ্য ছিল না। এই শিক্ষাব্যবস্থা মোটেও আফ্রিকান সমাজের সদস্য হিসেবে আফ্রিকান তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গৌরব তৈরি করেনি। বরং ইউরোপীয় আর পুঁজিবাদী সব উপাদানের প্রতি তৈরি করেছে নীরব সমর্থন। ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল পুঁজিবাদী শ্রেণীর আধিপত্য। আর এই একই শ্রেণীবৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে আফ্রিকায়। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে আসে পুঁজিবাদের প্ররোচিত বর্ণবাদ আর সাংস্কৃতিক জাত্যাভিমান। এ সবই হয়েছে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত ছিল অনাচার, শোষণ, মনস্তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি, আর অনুন্নয়নের বিকাশ ঘটানোর পাঁয়তারা।

উপনিবেশবাদের প্রথম চল্লিশ বছরে তেমন কোনো ইউরোপীয় ধাঁচের স্কুল দেখা যায়নি আফ্রিকায়। ওই সময়টায় নিজস্ব পন্থায় এই দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় খ্রিষ্টান যাজকগণ। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজস্ব ধারার শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা যাচাই করতে শুরু করে ১৯২০-এর দশকে। এর পর থেকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ধারা হয়ে ওঠে নিয়মতান্ত্রিক, যদিও পুরোদমে চালু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল নানা ত্রুটির ভেতরে আরও বহু ত্রুটির এক ধারা। এর প্রথম বাস্তব ত্রুটিটি আর্থ-রাজনৈতিক। অর্থাৎ, খরচাপাতি নির্ধারণ করা হয় রাজনৈতিক নীতিমালার নিরিখে। আসলেই কতটুকু টাকা আছে, তার ভিত্তিতে না। মেট্রোপলিটন সরকার এবং তাদের আফ্রিকান প্রশাসকেরা দাবি করে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাদের নেই। উত্তর রোডেশিয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কার্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে ঘোষণা আসে :

স্কুল নির্মাণের জন্য যতদিন না পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান হচ্ছে, ততদিন কোনো দ্রুত উন্নয়ন প্রত্যাশা করা যায় না। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভাবনাও রইবে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

তামা-সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তর রোডেশিয়ায় নাকি নিজস্ব জনগণকে শিক্ষিত করবার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ নেই! ঔপনিবেশিক শক্তি কি অন্যদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে, নাকি নিজেদেরই সফলভাবে বোকা বানিয়েছে—তা বোঝা দুষ্কর। রোডেশিয়ায় অভিবাসী শ্বেতাঙ্গ জনপদ মনে হয় দ্বিতীয় দলে পড়ে। কারণ তারা আজীবন তর্ক চালিয়ে গেছে যে, আফ্রিকানরা ইউরোপীয়দের চেয়ে মাথাপিছু কম কর দেয়। তাই শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের করের টাকায় তারা শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা আশা করতে পারে না। এটাই বোঝার সবচেয়ে বড় ভুল। একটা দেশের সম্পদ আয়কর থেকে না, বরং উৎপাদন থেকে আসে। আফ্রিকার মাটি ও আফ্রিকান শ্রম উত্তর রোডেশিয়ায় বিপুল সম্পদ উৎপাদিত করেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকান শিশুরাই শিক্ষার জন্য সম্পদ ব্যবহার করতে পারেনি।

আগেই বলা হয়েছে, আফ্রিকার উদ্বৃত্তের বেশির ভাগই রপ্তানি হয়ে যেত। সেখানে যা অল্প কিছু বেঁচে সরকারি কোষাগারে থাকত, তার থেকে শিক্ষার বরাদ্দ ছিল অত্যন্ত নগণ্য। পুঁজিবাদী ইউরোপের তুলনায় প্রতিটা উপনিবেশেই শিক্ষা বাজেট ছিল একদমই তুচ্ছ। ফরাসি-শাসিত পশ্চিম আফ্রিকায় ১৯৩৫ সালে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তার মাত্র ৪.০৩ শতাংশ ব্যয় হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। ব্রিটিশ-শাসিত নাইজেরিয়ায় এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩.৪ শতাংশ। কেনিয়ায় ১৯৪৬ সালেও আফ্রিকান শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২.২৬ শতাংশ রাজস্ব। এই পরিমাণ ১৯৬০ সাল নাগাদ দুই, তিন বা চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শুরুটাই এত অপ্রতুল ছিল যে, এখনো তা অগ্রাহ্য করবার মতোই।

যেহেতু সবচেয়ে কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এই খাতে, সেহেতু আরেকটি পরিমাণগত ত্রুটিও তৈরি হবে। অর্থাৎ, আফ্রিকায় স্কুলের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পেরেছে খুবই কম সংখ্যক মানুষ। ফরাসি-শাসিত পুরো বিষুবীয় আফ্রিকায় (চাদ, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গ্যাবন, কঙ্গো ব্র্যাজাভিল) ১৯৩৮ সালে ভর্তি-হওয়া মোট ছাত্রছাত্রী ছিল ২২ হাজার মাত্র। এটা কিন্তু পূর্ববর্তী ৫ বছরের তুলনায় অনেক গুণ। ফরাসিরা ১৯৩৮ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় দেড় কোটি জনগণের মধ্যে মাত্র ৭৭ হাজার ছাত্রের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর এক ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিম

আফ্রিকায় ১৯৪৫ সালের দিকে স্বায়ত্তশাসিত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল ৮০ হাজারেরও বেশি। সমসাময়িক ফরাসিদের বানানো স্কুলের চেয়ে খুব একটা কম না। অন্যভাবে বললে, পশ্চিম আফ্রিকার সাবেক ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে আগে থেকেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল বিশাল। ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ওই পরিমাণ শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিতে শুরু করে ঔপনিবেশিক যুগের একদম শেষ দিকে গিয়ে।

কালেভদ্রে পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকায় ফরাসি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক মাদরাসায় কিছু অনুদান দিত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক আফ্রিকান শিক্ষাব্যবস্থাকে স্রেফ অবজ্ঞা করা হয় এবং তা দিন দিন অবক্ষয়ের শিকার হয়।[১৪] আলজেরিয়ায় ফরাসি-বিরোধী যুদ্ধের সময়টাতে আরব ইসলামি ইনস্টিটিউটগুলো চরম ভুক্তভোগী হয়। আর ফরাসিরা জেতার পর বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাবিয়ে রাখে ইচ্ছেকৃতভাবে। **ফরাসি-শাসিত পুরো উত্তর আফ্রিকা জুড়ে প্রাচীন সব ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিয়েছে উপনিবেশবাদ।** তাই উপনিবেশবাদের মূল্যায়ন হওয়া উচিত—তারা আফ্রিকার কোন কোন সম্ভাবনা রুখে দিয়েছে এবং কোন কোন বাস্তব অবদান ধ্বংস করে দিয়েছে এসবের বিপরীতে। আফ্রিকান জীবনের সকল পরিমণ্ডলের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য।

ফরাসিদের তুলনায় গড়পড়তা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে কিছুটা এগিয়ে ছিল। এর মূল কারণ আসলে ব্রিটিশ সরকারের চেয়ে বেশি ব্রিটিশ মিশনারিগুলোর চোখে পড়ার মতো উদ্যোগ। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিচারে এগিয়ে ছিল ঘানা, নাইজেরিয়া এবং উগান্ডা। তবে এই উন্নতি আসলে আপেক্ষিক অর্থে। বাস্তবে সংখ্যাবিচারে তা এমন আহামরি কিছু ছিল না। সিয়েরা লিওন শিক্ষাদীক্ষায় ফরাসি-শাসিত পশ্চিম আফ্রিকার চেয়ে এগিয়ে ছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সিয়েরা লিওনের স্কুলগামী শিশু ছিল শতকরা সাত জন, যেখানে পশ্চিম আফ্রিকায় এই হার শতকরা পাঁচ। ফরাসিদের চেয়ে ব্রিটিশদের এই সামান্য ভালো রেকর্ডকে বিবর্ণ করে

---

[১৪] উপনিবেশ হবার আগে কেবল মালির টিম্বাকতু শহরেই ৩ টা ভার্সিটি, ১৬শ শতকে। শহরে ১ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ২৫ হাজারই ছিল ভার্সিটি স্টুডেন্ট। কুরআন-হাদিস-ফিকহ-সাহিত্য ছিল প্রধান বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকত—মেডিসিন-সার্জারি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ফিজিক্স, রসায়ন, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, চিত্রকলা। ভার্সিটির সামনে বহু ট্রেড-শপ থাকত, ছাত্ররা এখানে হাতেকলমে ব্যবসা শিখত। এখানে কাঠের কাজ, কৃষি, মাছ ধরা, চামড়া শিল্প, সূচিকর্ম, নৌবিদ্যা শিখত। [Khair, Zulkifli. (2003). The world-class university of Sankore, Timbuktu. muslimheritage.com.]

দেয় অন্য কিছু বিষয়। কেনিয়ায়, তাঙ্গানিকায়, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান অঞ্চলসমূহে, এবং স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকানদের শিক্ষার দশা ছিল একেবারে করুণ। বেশ লম্বা সময় ধরে এগুলো ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ।

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় আরেকটা ক্রটি গড় পরিসংখ্যানের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। আর তা হলো, একই উপনিবেশের ভেতরেই অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য। অনেক উপনিবেশেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে কেবল বড় বড় শহরের ভেতরে বা আশপাশের মানুষেরাই। যেমন, মাদাগাস্কারের রাজধানী শহর তানানারিভে স্কুলসুবিধা ছিল সবচেয়ে বেশি। গাম্বিয়ার বাথার্স্টে সাক্ষরতার হার ছিল অনেক বেশি, অথচ শহরটির বাইরে একদমই কম। আর উগান্ডার নগরায়িত এলাকা বুগান্ডা তো ছিল শিক্ষাক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। শিক্ষাক্ষেত্রের এই অসম বণ্টন মূলত অসমভাবে শোষণেরই প্রতিফলন। উপনিবেশের কোন এলাকা কতটুকু পরিমাণে অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছিল, তাও বোঝা যায় এখান থেকে। তাই গোল্ড কোস্টের উত্তরাঞ্চল শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। কেননা সেখান থেকে ঔপনিবেশিক শক্তি রপ্তানি করার মতো কিছু পায়নি। সুদানের বিশাল দক্ষিণাঞ্চলেও একই চিত্র দেখা যায়। তাঙ্গানিকার মানচিত্রে যেসব অঞ্চল ঔপনিবেশিক শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর, ঠিক সেগুলোই বিপুল মাত্রায় কফি ও তুলা উৎপাদক। তার মানে ঔপনিবেশিক শক্তি যাদের শোষণ করতে অক্ষম, তাদের তারা শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিতেও অনিচ্ছুক।

যতই দেখবেন, ততই বুঝবেন যে—এমনকি একদম সংখ্যার বিচারেও পুরো ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাটা আদতে ভেলকিবাজি। আরেকটা ব্যাপার না বললেই নয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ঝরে পড়ার হার ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এক বিশাল জনগোষ্ঠী স্কুলে ভর্তি হতো ঠিকই, কিন্তু শেষ করতে পারত না। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। কিন্তু আফ্রিকায় সেটা হয় প্রাথমিক স্তরেই, যা প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। প্রাথমিক স্তর উতরে যাওয়া একেকজনের বিপরীতে ঝরে গেছে একজন করে। শুধু প্রাথমিক থেকে ঝরে পড়ে, কারণ এর চেয়ে উচ্চতর প্রতিষ্ঠান ছিলই না। দেশে মাধ্যমিক, কারিগরি, ও বিশ্ববিদ্যালয় না থাকাটা আরেকটি দুরতিক্রম্য বাধা।

ঔপনিবেশিক স্কুলগুলোতে আফ্রিকানদের শিক্ষিত করার মূল উদ্দেশ্য, তারা যেন নিম্নশ্রেণীর কেরানি বা পিওন হতে পারে। আর এসব কেরানি-পিওনদের জন্যে অতিরিক্ত তথ্য ছিল একই সাথে অপ্রয়োজনীয় ও ভয়াবহ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল অপ্রতুল। আর উচ্চশিক্ষা তো পুরো ঔপনিবেশিক

আমলেই ছিল প্রায় অস্তিত্বহীন। যাও ছিল, তা মূলত নন-আফ্রিকানদের জন্যে বরাদ্দ। উগান্ডায় এই ১৯৫৯ সালেও জনপ্রতি আফ্রিকান শিক্ষার্থীর জন্যে বরাদ্দ ছিল ১১ পাউন্ড, ভারতীয়ের জন্যে ৩৮ পাউন্ড, আর ইউরোপীয় শিক্ষার্থীর জন্যে ১৮৬ পাউন্ড। আর এই বিশাল পার্থক্য ছিল ইউরোপীয় পুঁজিপতি কিংবা মধ্যস্বত্বভোগীদের সন্তানদের মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রতুলতার ওপর ভিত্তি করে। কেনিয়ায় এই বৈষম্য ছিল আরও বাজে। ইউরোপীয়দের সন্তানদের অংশগ্রহণের মাত্রাও ছিল অতিরিক্ত। উনিশশ ষাটের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১১ হাজার ইউরোপীয় শিশু স্কুলে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের আছে ৩ হাজার। আলজেরিয়ার অভিবাসী উপনিবেশেও একই চিত্র। সেখানে ১৯৫৪ সালের হিসাব অনুযায়ী মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের "মুসলিম" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে "আলজেরীয়"। বাকিরা ইউরোপীয়। অন্য সংখ্যালঘুরাও স্থানীয়দের চেয়ে ভালো অবস্থানে। যেমন, উত্তর আফ্রিকা ও বিশেষ করে তিউনিসিয়ায় ইহুদিরা সাধারণত মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকায় থাকত। আর তাদের সন্তানেরা মোটামুটি সবাই পড়তে পারত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত।

যেসব আফ্রিকান দেশে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী কম, সেখানেও শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটা স্তরে ছিল বর্ণবাদ। বিশেষত উচ্চশিক্ষায়। সেনেগালে ১৯৪৬ সালে উচ্চবিদ্যালয়ে মোট ৭২৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৭৪ জন ছিল আফ্রিকান। পরবর্তীকালে ডাকারে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (পুরো ফরাসি-শাসিত পশ্চিম আফ্রিকার জন্য), কিন্তু তারপরও ১৯৫০-এর দশকে স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া মোট শিক্ষার্থীর অর্ধেকের বেশিই ছিল ফরাসি।

এতক্ষণের আলোচনায় পর্তুগিজদের নিয়ে কিছুই আসেনি। কেননা ওদের ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডগুলোতে আসলে বলবার মতো কোনো শিক্ষা কার্যক্রম ছিলই না। অনেক বছর যাবৎ কোনো পরিসংখ্যানই প্রকাশিত হতে দেয়নি এসব নিয়ে। ঔপনিবেশিক আমলের শেষে এগুলো প্রকাশিত হয় ফোলানো-ফাঁপানো উপাত্ত সহকারে। এটা একটা অনস্বীকার্য ব্যাপার যে, পর্তুগিজ উপনিবেশগুলিতে বেড়ে ওঠা আফ্রিকান শিশুদের মধ্যে মাত্র এক শতাংশ হয়তো প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয়তে উত্তীর্ণ হতে পারত। যে উচ্চবিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলো মূলত ছিল ইউরোপীয় কিংবা ভারতীয়দের জন্যেই। এই ভারতীয়দের আনা হয়েছিল গোয়া থেকে। আফ্রিকায় পর্তুগালের মতো ছোট অঞ্চলের অধিকারী ঔপনিবেশিক শক্তি স্পেন এবং ইটালি। এরা ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও পশ্চাৎপদ। তারা তাদের ঔপনিবেশিক প্রজাদের জন্য নগণ্য প্রাথমিক পড়াশোনার ব্যবস্থা

করলেও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেলজিয়ামকে একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। আকারে ছোট হলেও তুলনামূলকভাবে বেলজিয়াম উন্নত ও শিল্পায়নে অগ্রসর রাষ্ট্র। আর বেলজিয়ামের উপনিবেশভুক্ত ছিল আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ এক জনপদ তথা কঙ্গো। উপনিবেশের মানদণ্ডে কঙ্গো আর রুয়ান্ডা-উরুন্ডিতে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বেশ ভালো ছিল। অথচ এর ওপরের স্তরে যাওয়া ছিল এক প্রকারের অসম্ভব। এটি বেলজিয়ান সরকার ও ক্যাথোলিক চার্চের এক ইচ্ছেকৃত নীতির ফল। তাদের আফ্রিকান "নেটিভ"কে ধীরে ধীরে সভ্য করা উচিত। তাদের মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়ার অর্থ হচ্ছে দুধের বাচ্চাকে মাংস চিবুতে দেওয়ার মতো। তার ওপর বেলজিয়ানরা আফ্রিকান সমাজের কল্যাণে এতটাই উদগ্রীব যে, তাদের মতে কোনো উচ্চশিক্ষিত আফ্রিকানের পক্ষে তার স্বজাতির সেবায় কাজ করা সম্ভব না! শেষমেশ ১৯৪৮ সালে গিয়ে প্রথমবারের মতো বেলজিয়ান কমিশন তাদের উপনিবেশগুলোতে আফ্রিকানদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ নেয়। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে যে কঙ্গোর মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি এবং স্নাতকের সংখ্যা মাত্র ১৬ জন ছিল, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শিক্ষাবিদরা শিক্ষার কাঠামোকে পিরামিডের সাথে তুলনা করেন, যার ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা এবং চূড়া বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে, চূড়ায় থাকবে একদম অল্প সংখ্যক লোক। পুরো আফ্রিকা জুড়ে পিরামিডের ভিত্তিই ছিল সংকীর্ণ। ঢালও খুব খাড়া। তাই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ওপরে উঠতে সবার খবর হয়ে যায়। কিছু ব্রিটিশ উপনিবেশেই শুধু এই পিরামিড মোটামুটি ঠিকঠাক ছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের ফাউরাহ বে ছাড়াও আচিমোতা আর ইয়াবা কলেজ নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। ঘানা ও ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাতও হয় ঔপনিবেশিক আমল শেষ হবার মাত্র কয়েক বছর আগে। সুদানে দেখা যায় গর্ডন কলেজ, যেটা পরবর্তীকালে খারতুম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত হয়। আর পূর্ব আফ্রিকায় দেখা যায় মাকেরির বিশ্ববিদ্যালয়।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার শিক্ষার পিরামিডের দশা সহজেই বোঝা যায় ১৯৫৮ সালের পরিসংখ্যান দেখলে। সেখানে আফ্রিকান শিক্ষার অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয় ২ লক্ষ ২৭ হাজার। প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণীতে ৭৭ হাজার ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পৌঁছায় মাত্র ১০ হাজার। সেখান থেকে মাত্র ৩ হাজার মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ চুকাতে

পেরেছিল ১৩ জন। ওই বছর সেখানে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকাতে পারেনি। আর ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সলসবেরির বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে স্নাতক ছিল মাত্র ৩ জন।

ইউরোপ আফ্রিকাকে কতটুকু শেখাল, সে আলোচনা শেষ করা যায় আরেকটি পরিসংখ্যান দিয়ে। তা হলো স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর শুরুর দিকের পরিসংখ্যান। কিছু বিশেষজ্ঞ একটা নতুন সূচক প্রবর্তিত করে, যেটা দিয়ে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। শিক্ষাগত বিভিন্ন সুবিধাকে সেখানে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়। যে দেশের নম্বর যত বেশি, সেটি তত অগ্রসর। ওই সূচকে অধিকাংশ আফ্রিকান দেশের নম্বরই ১০ এর নিচে। অন্যদিকে উন্নত শোষক দেশ আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো গড়ে ৮০-এর ওপর নম্বর পাওয়া। স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকায় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে ইউনেস্কো-প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

> ১৭ কোটির এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত, যেখানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিশুর স্কুলে যাবার সুযোগ পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বাকি যে তথাকথিত সুবিধাভোগী ১ কোটি ২০ লাখ শিশু রয়েছে, তার অর্ধেকেরও কম প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়েছে। আফ্রিকায় শতকরা মাত্র ৩ জন শিশু হয়তো কোনোমতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্দরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রতি হাজারে ২ জনও ঠিকঠাকভাবে কোনো ধরনের উচ্চশিক্ষা পায় না, এমনকি আফ্রিকার ভেতরেও না। তাই আনুমানিক যে নিরক্ষরতার হার ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ বলা হয়, তা বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ।

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গরা এই পরিসংখ্যান ব্যবহার করে আফ্রিকার "অশিক্ষিত নেটিভ"দের দিকে নাক সিঁটকায়। তাদের মতে এই নিরক্ষরতা নাকি "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের"ই অনুষঙ্গ। তারপরও এই মানুষগুলোই আবার গর্ব করে বুলি আওড়ায় যে, এরাই নাকি আফ্রিকাকে শিক্ষিত করেছে। যেভাবেই হোক, তালগাছ তাদের। যদি স্বাধীন ও স্বনির্ভর আফ্রিকা আজও আধুনিক শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তার জন্যে অবশ্যই ৭৫ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকেই দায়ী করতে হবে। বিষয়টা কতটা উদ্ভট, তা বুঝতে দুটি জিনিসের তুলনা করুন। একদিকে দেখুন, সেই আমলে আফ্রিকানরা কী পরিমাণ উৎপাদন করেছে। আরেকদিকে দেখুন, সেই উপার্জনের কতটা ব্যয় হয়েছে ইউরোপের পুঁজিবাদী সমাজের কল্যাণার্থে, এমনকি তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও। আফ্রিকান জনগণের শোষণ করা সম্পদ থেকেই সেসিল রোডস শ্বেতাঙ্গদের অক্সফোর্ডে পড়ার জন্যে এমন দিলখোলা বৃত্তির

ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

এত কিছুর পরও যে আফ্রিকানদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্ভব হতো, তারা গুণগত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতো। এদের মান ইউরোপীয় মানদণ্ডে অত্যন্ত নিম্ন। পাঠ্যবই, শিক্ষণ পদ্ধতি আর অন্য সব নিয়মনীতি আফ্রিকায় আমদানি করা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সামগ্রিকভাবে এইসব ঔপনিবেশিক স্কুল বিংশ শতাব্দীতে এসেও একটুও পালটায়নি। মেট্রোপোলে নতুন নতুন যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়, তার ছোঁয়া কোনো উপনিবেশে কখনোই লাগেনি। বিশেষ করে বিজ্ঞানের যে চমৎকার অগ্রগতি, আফ্রিকান ক্লাসরুমে সেগুলো পৌঁছায়নি। কারণ বিজ্ঞান-পড়ানো স্কুলের সংখ্যাই ছিল হাতে-গোনা। একইভাবে কারিগরি শিক্ষারও কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি আফ্রিকায়।

এমন অসংখ্য অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার দেখা যায়, যখন আফ্রিকায় ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়। যখন ডেম্বা সম্প্রদায়ের শিশুরা স্কুলে যায়, তখন সেখানে উদ্ভিদের জীবন নিয়ে তাদের কিছুই পড়ানো হয় না। অথচ অন্যথায় তারা এগুলোকে নিজে থেকেই চিনত। এর বদলে সেখানে তাদের পাঠ্য ছিল ফুলের আদ্যোপান্ত—আর তাতে ছিল ইউরোপীয় গোলাপের কথকতা। ড. কলি বুসিয়া কয়েক বছর আগে স্বীকারোক্তি দেন :

> মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষের শেষে (ফান্তস্পিরিন, কেপ উপকূল, ঘানা) ওয়েনচিতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম বড়দিনের ছুটি কাটাতে। চার বছর পর ফিরলাম। আর তখনই অনুধাবন করি কতটা একা হয়ে গেছি। আমার সমবয়সি যে ছেলেরা স্কুলে যায়নি, তাদের তুলনায় স্বজাতিকে আমি খুব কমই বুঝি। তারপর পেরোলাম কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়। যতই সময় গড়ায় ততই বুঝতে পারি—এই শিক্ষা আমাকে ইউরোপ সম্পর্কে কত বেশি শিখিয়েছে, আর আমার নিজের সমাজ সম্পর্কে কত কম।

আফ্রিকান সমাজ সম্পর্কে বুসিয়ার ধারণা এতই কম ছিল যে, একসময় তিনি মত দেন স্বাধীন আফ্রিকানদের উচিত ওই ফ্যাসিবাদী/বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের সাথে "সংলাপে" বসা, যারা কিনা দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কিছু উপকরণ ছিল আফ্রিকান বাস্তবতার সাথে মারাত্মক সাংঘর্ষিক। চরম গরমের বিকেলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার কোনো এক স্কুলে ঘর্মাক্ত কালো বাচ্চারা ভূগোল ক্লাসে শিখছে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত আর বসন্ত নামক চার ঋতুর গল্প। তাদের হয়তো আল্পস পর্বতমালা কিংবা রাইন নদীর

ব্যাপারে ঠিকই পড়ানো হচ্ছে, কিন্তু উত্তর আফ্রিকার অ্যাটলাস পর্বত কিংবা জাম্বেজি নদীর ব্যাপারে কিছুই পড়ানো হচ্ছে না। আর যদি সেটা হয়ে থাকে ব্রিটিশ উপনিবেশ, তারা হয়তো খাতায় লিখছে, "আমরা স্প্যানিশ আরমাডাকে ১৫৮৮ সালে হারিয়েছি।" অথচ তখন রানি প্রথম এলিজাবেথ হকিনসকে নাইট উপাধি দিয়ে ফেলেছেন শুধুমাত্র আফ্রিকানদের লুট করতে পারার জন্যে। আর যদি সেটা হয়ে থাকে ফরাসি উপনিবেশ, তখন তাদের শেখানো হবে, "নীলচোখের গল আমাদের পূর্বপুরুষ।" তারা এও বিশ্বাস করতে শুরু করত যে, "নেপোলিয়ন আমাদের ইতিহাসের সেরা সেনাপতি।" অথচ নেপোলিয়ন দাসপ্রথা পুনর্বহাল করেছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপ গুয়াদেলুপে। একই কাজ তিনি হাইতিতে করতে ব্যর্থ হন তার চেয়ে শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত আফ্রিকান তুসো লোভার্চারের কাছে পরাস্ত হওয়ার কারণে।

ইউরোপীয়রা বলতে গেলে তাদের নিজেদের পাঠ্যক্রম আফ্রিকায় চালু করে দেয় আগপিছ না ভেবেই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা এটা করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে আফ্রিকানদের মধ্যে ধাঁধা তৈরি করার উদ্দেশ্যে। তাঙ্গানিকার প্রধান শিক্ষাকর্মকর্তা ১৯৪৯ সালে সযত্নে এমন এক রূপরেখা তৈরি করেন, যাতে করে ব্রিটিশ রাজপরিবারের ব্যাপারে তথ্য গেলাতে গেলাতে ওই উপনিবেশের প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চাদের পেট ফাটিয়ে দেওয়া যায়। তিনি বলেন, "ব্রিটিশ রাজা যে জাতির পিতা, এই বিষয়টা পুরো পাঠ্যক্রম জুড়ে প্রতিটি অধ্যায়ে রাখতে হবে।" তিনি আরও বলেন, আফ্রিকান শিশুদের স্যান্ড্রিংহ্যাম আর উইন্ডজর ক্যাসলে ইংরেজ রাজকুমারী আর তাদের টাট্টু ঘোড়ার অসংখ্য ছবি দেখানো চাই।

যতটুকুই আফ্রিকান ইতিহাস আফ্রিকান শিশুদের পড়ানো হতো, তার পুরোটাই ছিল আফ্রিকায় ইউরোপীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে। এই ধারা এখন যথেষ্ট পালটেছে। ব্রিটিশরা কেনিয়া পর্বত কিংবা নাইজার নদী "আবিষ্কার" করেছে—এটা পড়ে হেসে ওঠে বর্তমান জমানার আফ্রিকান শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলের চিত্র ছিল একদমই ভিন্ন। সেখানে এসব ভুলভাল শিক্ষা পেলেই মানুষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত। কারণ আফ্রিকাতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদীরা যে কাঠামো সৃষ্টি করেছে, সেখান থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা বাগানোর মাধ্যম ওই ভুলভাল শিক্ষা।

ফরাসি, পর্তুগিজ, আর বেলজিয়ানরা খোলাখুলিই বলে দেয় যে, যেকোনো স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আফ্রিকান নেটিভদের সভ্য করা। আর শুধু সভ্য নেটিভদের পক্ষেই সম্ভব ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছে উপযুক্ত কর্মসংস্থান আর

নেক নজর পাওয়া। ফরাসিদের মতে, ফরাসি শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই একজন আফ্রিকান "অ্যাসিমিলেই" হতে পারে—মানে উন্নত ফরাসি সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তি লাভের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে পর্তুগিজরা ব্যবহার করত "অ্যাসিমিলাদো" শব্দটি, যার মানে একই। একজন নেটিভ আর একজন অ্যাসিমিলাদোর পার্থক্য পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক আইনে বেশ কড়াকড়িভাবে সংজ্ঞায়িত। অবশ্য পর্তুগিজ ভাষায় লিখতে-পড়তে জানার কারণে এদের "সিভিলিসাদো"ও বলা হয়ে থাকত। বিশেষ বিশেষ সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো এমন আফ্রিকানদের। কিন্তু মজার বিষয়, ১৯৬০ সাল নাগাদ স্বয়ং পর্তুগালের অর্ধেক জনগোষ্ঠীই ছিল নিরক্ষর। সেই অর্থে তো তাদেরও অসভ্য হিসেবেই পরিগণিত হওয়ার কথা! বেলজিয়ামও হাঁটছিল একই পথে। কঙ্গোর "শিক্ষিত বান্টু"দের তারা বলত "এভোল্যুয়েস" (অর্থাৎ, যারা বেলজিয়ানদের বদান্যতায় জংলি থেকে সভ্য অবস্থায় "বিবর্তিত হয়েছে"।)

কীভাবে যেন ব্রিটিশরা শিক্ষিত আর অশিক্ষিত আফ্রিকানদের মধ্যে আইনি বৈষম্য তৈরির ব্যাপারটা খুব ভালোভাবেই এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুকরণকে উৎসাহিত করে গেছে ঠিকই। ১৯২০ এর দশকে তাঙ্গানিকার গভর্নর ক্যামেরন "প্রগতিশীল" গভর্নর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অভিযোগ ওঠে, তিনি আফ্রিকান ব্যক্তিসত্তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাঁচিয়ে রাখার পাঁয়তারা করছেন। সাথে সাথে অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলতে শুরু করেন যে, আফ্রিকানদের স্বকীয় ভাবনা বন্ধ করাটাই তার উদ্দেশ্য। তিনি নাকি চান, প্রতিটি আফ্রিকান যেন একেকজন "মননশীল ইংরেজ" হয়ে ওঠে।[১৫] যেসব শিক্ষার্থী মালাওয়ির লিভিংস্টোনিয়া কিংবা ব্ল্যান্টির মিশন থেকে পাশ করত, তাদের বলা হতো কৃষ্ণাঙ্গ স্কটসম্যান। কারণ ওসব স্কুল স্কটিশ মিশনারিদের প্রচেষ্টার ফসল। সিয়েরা লিওনে শ্বেতাঙ্গদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু। ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়েও সিয়েরা লিওনীয় ক্রিওলেরা এক কাঠি সরেস। তারা কেবল একটা ইংরেজি খ্রিষ্টানি নাম বা এমনকি ইউরোপীয় পদবি নিয়েই সন্তুষ্ট না। বরং তারা দুটো ইউরোপীয় বংশীয় উপাধিকে হাইফেন দিয়ে যুক্ত করে ব্যবহার করত। বাস্তবে অবশ্য এই শিক্ষিতদের দৌড় অতটুকুই ছিল, যতটুকু তাদের প্রভুরা অনুমোদন দিত। ঔপনিবেশিক প্রশাসনে কিংবা পুঁজিপতি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মানের চাকরিই জুটত তাদের কপালে।

[১৫] তুলনা করুন ভারতে উপনিবেশী শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে লর্ড মেকলের বিখ্যাত উক্তিটা—(১৮৩৫-এর শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা এমন প্রজন্ম তৈরি হবে) "এরা হবে এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে-গায়ের রঙে রবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।"

ঔপনিবেশিক আমলে ও তার পরে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্টই সমালোচনা হয়েছে। কারণ এটি মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ের জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী তৈরি করতে পারেনি। তারপরও বলা যায়, যার শিক্ষার গণ্ডি যত বেশি, সে আফ্রিকানদের থেকে ততই বিচ্ছিন্ন। এরাই সেইসব অন্তর্ভুক্ত (assimilated) ও বিবর্তিত (evolved) প্রাণী। শিক্ষার স্তরে যতই ওপরে উঠত, তত বেশি গলাধঃকরণ করত শ্বেতাঙ্গ পুঁজিবাদী মূল্যবোধ। বেতনের টাকায় তারা ওই আমদানিকৃত জীবনধারা উপভোগ করবার ফুরসত পেত। ছুরি-কাঁটাচামচ, তিন পিসের স্যুট আর পিয়ানো তাদের মানসিকতাকেই বদলে দেয়। এক বিখ্যাত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্যালিপসো-বাদক উপহাসের স্বরে বলতেন, ঔপনিবেশিক স্কুলে থাকাকালীন আরও ভালো ছাত্র হতে পারলে তিনি আজ আরও বড় গবেট হতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবশত, ঔপনিবেশিক এই স্কুলগুলো প্রচুর গবেট আর ভাঁড় উৎপাদিত করেছে, যারা ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের ধ্যানধারণা ও জীবনব্যবস্থার প্রতি মুগ্ধ। কেউ কেউ আফ্রিকান জীবনধারা থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যে, তারা নিজেদের চিরতরে "ইউরোপীয়" বলেই গর্ববোধ করে। যেমন সেনেগালের ব্লেইজ ডায়ান।

আফ্রিকান শিক্ষাবিদ আবদু মৌমুনির এই কথাটা মারাত্মক রকমের সত্য— "ঔপনিবেশিক শিক্ষা আফ্রিকান চিন্তা-চেতনাকে একদম দূষিত করে দিয়ে তাকে অস্বাভাবিক সব জটিলতায় ভরে দিয়েছে।" যারা আসলে ইউরোপীয়করণের মধ্যে দিয়ে গেছে, তারা হয়ে গেছে অনাফ্রিকান। এটা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং ঔপনিবেশিক জীবনধারার পরিবেশের ফলাফল। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদের ফলে ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকান সংস্কৃতিকে কীভাবে হেয় করত, তার বহু উদাহরণ বর্তমানে আলোচিত হয়। কিন্তু যেটা নিয়ে অল্পই আলোচনা হয়, তা হলো বহু আফ্রিকান ফ্যাসিবাদেরও শিকার হয়েছে। সেটা ঘটেছে ১৯৩০ সাল ও ১৯৪০-এর দশকে পর্তুগিজ এবং স্প্যানীয়দের হাতে, ইটালীয় ও ভিশি ফরাসিদের হাতে, এবং পুরো শতাব্দী জুড়ে ব্রিটিশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ারদের হাতে। ফ্যাসিবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আসলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই ক্ষ্যাপাটে রূপ। স্পেন আর পর্তুগালে শ্রমিক-কৃষকদের দমন করে বোকা বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে হাত মেলায় সরকারি পুলিশ বাহিনী আর ক্যাথোলিক চার্চ। স্বভাবতই ফ্যাসিবাদী ঔপনিবেশিক শাসকেরা একই কাজ করতে চেয়েছিল আফ্রিকান শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাথেও। এর সাথে যোগ করে আফ্রিকানদের প্রতি তাদের বর্ণবাদ, যেমনটা হিটলার করেছিল ইহুদিদের ওপর।

আর সব ঔপনিবেশিক শক্তির মতোই লিবিয়াতে ইটালীয় প্রশাসন

সেখানকার আফ্রিকান সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যখন ফ্যাসিবাদী মুসোলিনি ক্ষমতায় গেছেন, তখন তিনি এই অবজ্ঞাকে একটা আক্রমণাত্মক রূপ দেন। বিশেষত আরবি ভাষা আর ইসলাম ধর্মের প্রতি। পর্তুগিজ এবং স্প্যানীয়রা সবসময়ই আফ্রিকান ভাষা আর ধর্মের প্রতি আক্রোশ দেখিয়ে এসেছে। আফ্রিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ের স্কুলগুলো ছিল মূলত পর্তুগিজ ভাষা শিক্ষা প্রসারের এজেন্সি। অধিকাংশ স্কুলই পরিচালিত হতো ক্যাথোলিক চার্চের অধীনে, যা ফ্যাসিবাদী পর্তুগালের রাষ্ট্র আর চার্চের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতিফলন। স্বল্প-আলোচিত এক ছোট্ট স্প্যানিশ উপনিবেশ হচ্ছে গিনি (রিও মুনি)। সেখানে যা-ই অল্পবিস্তর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত স্থানীয় ভাষার মূলোৎপাটন করা আর বাচ্চাদের অন্তরে "ঈশ্বরের পবিত্র ভয়" ঢোকানো। ঔপনিবেশিক আফ্রিকার স্কুলগুলোকে উপনিবেশের সাধু-সন্ত, শাসক, পরিব্রাজক কিংবা প্রশাসকের নামে নামকরণ করে ধন্য করা হতো। স্প্যানিশ গিনিতেও এই কাজই করা হয়। রিও মুনির শিশুদের পাশ করতে হতো হোসে আন্তোনিও বিদ্যালয় থেকে। যদি সেটা জার্মান উপনিবেশ হতো, তবে সেই স্কুলের নাম হতো অ্যাডলফ হিটলার স্কুল। কারণ এই হোসে আন্তোনিওই ছিলেন স্প্যানিশ ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের আরেকটি ব্যাপার অনুসন্ধানের দাবিদার। ইউরোপীয় বর্ণবাদ ও আক্রোশ কিন্তু শুধু আফ্রিকান সংস্কৃতির প্রতি বৈরীভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। বরং তারা সমাজের নেতিবাচক ও স্থবির বৈশিষ্ট্যগুলোকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করেছে। অনেক ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে যেসব আফ্রিকান বিষয়কে অদ্ভুত কিংবা মজার মনে হয়েছে, সেগুলোকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছে তারা। আন্তর্জাতিক বিশ্বের যত সম্ভাব্য উপকারী দিক ছিল, সেগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছে আফ্রিকান জীবনকে। এর এক চমৎকার উদাহরণ গ্যাবনের অ্যালবার্ট শুইটজার। তিনি একটা অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন, যেটার চারপাশে কুকুর, বিড়াল, ছাগল, মুরগি ঘুরে বেড়াত। এটাকেই আফ্রিকান সংস্কৃতি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখাতে চাইতেন তিনি।

এই ১৯৫৯ সালে এসেও অ্যালবার্ট শুইটজারের এক বন্ধু ও সহকর্মী এই অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালের সাফাই গেয়েছেন এভাবে,

> এখন আসি হাসপাতালের গৃহপালিত প্রাণীগুলোর প্রসঙ্গে। পশুপাখি আর মানুষের সহাবস্থান দেখে হয়তো মানুষ অবাকই হবে। স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় এটা হয়তো খুব একটা গ্রহণযোগ্য ঠেকবে না। তবে যে যা-ই বলুক না কেন, এটাই কিন্তু এই পরিবেশের আসল নান্দনিকতা।

লেখক নিউ ইয়র্কের একজন দন্ত্যচিকিৎসক। তিনি নিজে হয়তো তার নিউ ইয়র্কের কর্মস্থলে ছাগল বা মুরগি ঘোরাফেরা করতে দেখলে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। তিনি ভালো করেই জানতেন শুইটজারের হাসপাতালে "ছাগল, কুকুর, বিড়ালের অযাচিত আনাগোনা ছিল এবং তাদের গায়ে ছিল অস্বাস্থ্যকর সব জীবাণুর সবচেয়ে ভয়ানক প্রকরণ।" তাও তিনি ওই হাসপাতালের গুণকীর্তন গেয়েছেন, কারণ ওটা সংস্কৃতি আর নান্দনিকতার অংশ, যেটা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন!

শিক্ষাক্ষেত্রে বেলজিয়ানরা এমন এক ভাষানীতি গ্রহণ করে, যেটা হয়তো সমসাময়িক জাতীয়তাবাদীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগবে। সেই ভাষানীতিতে বলা ছিল, আফ্রিকানরা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রধান পাঁচটি আফ্রিকান ভাষার যেকোনো একটি দিয়ে সম্পন্ন করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত আসলে কঙ্গোর নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোকে পরস্পরের থেকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তা ছাড়া, শিক্ষিতদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল জ্ঞানের বৃহত্তর জগৎ থেকে। কারণ মিশনারিগুলো শুধু নিজেদের বাছাইকৃত বিষয়গুলোই স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করত। এই লোকদেখানো আফ্রিকান সংস্কৃতির তোষণ নীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৫৩ সালের কুখ্যাত বান্টু শিক্ষা আইন। এই আইনে জুলু, সোথো, জোসা, ভেন্ডা ইত্যাদি জাতির মধ্যকার পার্থক্যকে উৎসাহিত করা হয়। এসব পার্থক্যের অস্তিত্ব ছিল সামাজিক বিকাশের শুরুর দিকে। ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ না ঘটলে সেগুলো ততদিনে মিলেমিশেই যেত। শ্বেতাঙ্গ শাসনাধীনে যদি কথিত "গোত্রীয়" পার্থক্য বজায় রাখার কিছু পদক্ষেপ না নেওয়া হতো, তাহলেও হারিয়ে যেত ওসকল ভিন্নতা।

সব ঔপনিবেশিক শাসক ও শিক্ষানুরাগীই আসলে উন্নততর দাস বানানোর উদ্দেশ্যে আফ্রিকানদের শিক্ষিত করেনি। বরং তাদের বেশির ভাগই ভাবত, আফ্রিকানদের ব্যাপক কৃপা করছে তারা। অল্প কয়েকজন আবার এতটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, শিক্ষাক্রমকে কিছুটা আফ্রিকার বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার। এমনকি নীলচোখা গল পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আফ্রিকানদের পড়ানো হচ্ছে, এটা জানতে পেরে তৎকালীন ফরাসি শিক্ষামন্ত্রী রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যান। এটা ১৯২৮ সালের ঘটনা। ব্রিটিশ এবং ফরাসিরা উভয়েই ১৯২০-এর দশক থেকে নানারকম শিক্ষা কমিশন গঠন করে চলছিল। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্রমকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করা। প্রাথমিক শিক্ষায় স্থানীয় ভাষার ব্যবহার, নারীশিক্ষার আরও প্রসার, এবং জনবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম বাতিল করার মতো পরামর্শগুলোও সামনে নিয়ে আসে তারা। এত এত প্রগতিশীল প্রস্তাবনাও

এই সত্যিটা বদলাতে পারবে না যে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ছিল ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের সেবক। তারা যাতে আরও ভালোভাবে আফ্রিকাকে শোষণ করতে পারে, সেটাই নিশ্চিত হতো এতে। ওই ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিদেরা যা-ই ভেবে থাকুক না কেন, তাতে এই মূল সত্যিটা বদলে যায়নি।

আফ্রিকান মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর প্রস্তাবনা নিছক শিক্ষানীতির চেয়েও বেশি কিছু। এটার ব্যাপক সামাজিক প্রভাব রয়েছে। তার মানে সমাজ শিক্ষিত নারীদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই তাদের নারীদের মুক্ত করতে পারেনি। পারেনি তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমঅধিকার দিতে কিংবা পুরুষের সমবেতনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে। এমতাবস্থায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আফ্রিকান নারীদের দিকে আলাদা করে মন দেবে, এটা আকাশ-কুসুম কল্পনা। বিশেষত যেহেতু এক্ষেত্রে উপনিবেশকদের দায়িত্ব হবে সামন্তবাদী ও প্রাক-সামন্তবাদী ধ্যানধারণার অপনোদন ঘটানো। অর্থকরী ফসল কিংবা আকরিক রপ্তানিতে শিক্ষিত নারীর জন্যে কর্মের সুযোগ নেই। পুঁজিবাদী মেট্রোপোলের মতো এখানেও ধরেই নেওয়া হয় যে, সরকারি প্রশাসন পুরুষেরই কর্মক্ষেত্র। আর তাই উপনিবেশগুলোর সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীদের প্রবেশের সুযোগই ছিল না বলা চলে। এইজন্যেই আধুনিক শিক্ষা এক প্রকারের বিলাসিতা হয়ে রয়, যার স্বাদ খুব কম নারীই পেয়েছিল।

কিছু ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিদদের আরেকটি প্রগতিশীল প্রস্তাবনা ছিল কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার। কিন্তু প্রকৃত কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ধারণা ছিল সুদূর পরাহত। কারণ আফ্রিকার শিল্প ও দক্ষতা বৃদ্ধি করাকে অনুমোদন দেওয়া কখনোই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল না। দুর্লভ কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় দেখা যায়। যেমন কঙ্গোতে কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আফ্রিকানদের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে ধীরে ধীরে কঙ্গো খনি শিল্পে এতটাই অগ্রসর হয় যে, তখন প্রাথমিক কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আফ্রিকান শ্রমিক ব্যতীত কাজ চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। অল্প কিছু কালাঙ্গি আর অন্যান্য কঙ্গোলি সে-সময় মাধ্যমিক স্তরের কারিগরি প্রশিক্ষণ লাভ করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এগুলো হয়েছিল বেসরকারি কোম্পানিগুলোর নিজস্ব উদ্যোগে। নাহলে তাদের নিজেদের মুনাফাই হুমকিতে পড়ে যেত। আর প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড তো তাদের উৎপাদন-কর্মকাণ্ডেরই অংশ। তারপরও খনন ও শিল্পের মতো ধরাবাঁধা কিছু ক্ষেত্রে যতটুকুই বা বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন দেখা দিত, বেশির ভাগ সময়েই সেই চাহিদা মেটানো হতো ইউরোপীয় দক্ষ কারিগর আমদানির মাধ্যমে।

কৃষি কখনোই আফ্রিকায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্পায়িত হয়নি, যেমনটা হয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে বা নিউজিল্যান্ডে। ওখানে শ্বেতাঙ্গরা চাষবাস করত মূলত পুঁজিবাদী ভিত্তিতে। আগেই বলা হয়েছে, আফ্রিকায় অর্থকরী ফসলের চাষ হতো একদম অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং মূলত কায়িক শ্রমের ওপর ভিত্তি করে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের ধার ধারত না কেউ। তাই শিক্ষাবিদেরা যখন আফ্রিকান চাহিদাভিত্তিক কৃষিশিক্ষার পরামর্শ দেয়, তাতে আফ্রিকান জ্ঞানে নতুন কিছু যোগ হয়নি। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক স্কুলে কৃষিশিক্ষা হয়ে উঠল একটা না-পড়ানোর অজুহাত। এটা একটা প্রতিষ্ঠানের অযোগ্যতার দোহাইও বলা চলে। যেখানে শিক্ষকেরাই কৃষির বিজ্ঞানসম্মত উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ, সেখানে তারা বাচ্চাদের কীই বা শেখাবে? শিশুরা শ্রমসাধ্য শাস্বা কৃষির প্রতি আস্তে আস্তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সত্যি বলতে, ওটা শাস্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হতো।

প্রথম দিককার শিক্ষা কমিশনগুলো শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক গন্ধ যোগ করার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহী ছিল। স্বয়ং ইউরোপেই তখন এই ধারা বিলুপ্তির পথে। শিক্ষা পদ্ধতিতে খ্রিষ্টান চার্চের ভূমিকা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। পরিব্রাজক, ব্যবসায়ী এবং সৈনিকদের মতোই এই খ্রিষ্টান মিশনারিরাও ছিল ঔপনিবেশিক শক্তিরই অংশ। কোনো একটা উপনিবেশে কি মিশনারিরা অন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর আমদানি করে, নাকি এর উলটোটা—এটা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তবে মিশনারিরা যে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই—চাই তারা সেটা নিজেরা স্বীকার করুক বা না করুক। সাম্রাজ্যবাদী অভিযাত্রিক স্যার হ্যানরি জনসন মিশনারিদের পছন্দ করতেন না বটে। তবুও তিনি প্রশংসার স্বরে বলেছেন, “প্রতিটি মিশন হচ্ছে উপনিবেশায়নের এক একটা চর্চাক্ষেত্র।”

ইউরোপে এই খ্রিষ্টান মিশনারিরা সেই সামন্তবাদী যুগ থেকে নিয়ে পুঁজিবাদী যুগের শুরু পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার একাধিপত্য ধরে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চার্চকে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে দিয়েছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশকরা। তাই এই স্কুলব্যবস্থার ভালো-খারাপ সবকিছুর দায় এই চার্চগুলোর ওপরেই বর্তায়।

ঔপনিবেশিক আমলে মূল্যবোধ তৈরিতে চার্চের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটা চার্চ ও স্কুলের ভেতরে যেমন, বাইরেও তা-ই। সেখানে তারা নৈতিকতার যে পাঠ দিত, সেটা আফ্রিকান-ইউরোপীয় নির্বিশেষে সবারই

মানব-মনকে নাড়া দিতে সক্ষম। ইউরোপীয় আচরণ আর খ্রিষ্টান নীতিমালার মধ্যে অবশ্য বিস্তর ফারাক ছিল। আর আফ্রিকানরাও যে ঠিক ধর্মটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই খ্রিষ্টান হয়েছে, এটাও সর্বদা সত্য না। ধর্মান্তরিত বহু আফ্রিকানের কাছে চার্চকে আকর্ষণীয় লাগত শিক্ষার উৎস হিসেবে; ধর্মের প্রচারক হিসেবে না।

চার্চ আফ্রিকায় যা-ই কিছু শেখাক না কেন, সেগুলো ছিল ঔপনিবেশিক আফ্রিকার আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কোনো-না-কোনো সংযোজন। সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচারেই এসব শিক্ষাকে বুঝতে হবে। চার্চের প্রাথমিক ভূমিকা ছিল উপনিবেশবাদের সামাজিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা। ইউরোপে একইভাবে তারা পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা পালন করে। খ্রিষ্টান চার্চ আসলে এই কারণেই বিনয়, নম্রতা আর মেনে-নেওয়ার মানসিকতাকেই উৎসাহিত করে থাকত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাসপ্রথার আমল থেকেই চার্চকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। তবে এই শর্তে যে, তারা কখনো "ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান" এই তত্ত্ব স্থানীয়দের কাছে প্রচার করে তাদের উসকে দেবে না। তখনকার দিনে দাসদের শেখানো হতো, পৃথিবী সুন্দর। মনিব যে প্রাসাদে আরাম করছে, সেটাও ঈশ্বরের ইচ্ছে। দাসেরা যে দৈনিক ২০ ঘন্টা কাজের জন্যে চাবুকের আঘাত সহ্য করছে, সেটাও তা-ই। কাজেই মেনে নাও।

ঠিক একইভাবে ঔপনিবেশিক আফ্রিকায়ও চার্চ এক-গালে-চড়-খেয়ে-আরেক-গাল-পেতে-দেওয়ার অমোঘ বাণী প্রচার করে চলে। বলে যে, পরকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। কেবলমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ রিফর্মড চার্চই ছিল একদম খোলাখুলিভাবে বর্ণবাদী। অন্যান্য চার্চও ব্যতিক্রম না এই অর্থে যে, সেগুলোর কর্তাব্যক্তিরাও বাকি সব শ্বেতাঙ্গের মতো বর্ণবাদ আর সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে ন্যায্য মনে করে। বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপের সাথে বাকি বিশ্বের যে সম্পর্ক, সেখান থেকে তাদের এই ধ্যানধারণার উদ্ভব।

উপনিবেশবাদের সেবার অংশ হিসেবে চার্চ রায় দিত যে, কোন ব্যাপারগুলো সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আর কোনগুলো তা নয়। আফ্রিকানদের বাপ-দাদার ধর্মকে বলা হতো শয়তানের কাজ (যে অতি অবশ্যই কালোই হয়ে থাকবে!)। আফ্রিকান বিশ্বাসগুলো ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের কাছে স্রেফ জাদুটোনা আর তুকতাক। সেগুলোকে ধর্ম বলে মেনে নিতে অনেক সময় লেগেছে তাদের। তবে আফ্রিকান সংস্কৃতি ও তার ধর্মীয় বহিঃপ্রকাশের প্রতি বৈরিতা দেখাতে গিয়ে খ্রিষ্টান চার্চ আসলেই কিছু প্রগতিশীল কাজ করে ফেলে।

আফ্রিকান কিছু সমাজে যমজ শিশুদের অশুভ ভেবে হত্যা করা হতো। অপরাধী চিহ্নিত করতে আসামিকে দেওয়া হতো কঠিন কিছু কাজ। আফ্রিকান সামাজিক বিকাশের প্রাথমিক যুগের কুসংস্কার এগুলো। সে-সময় জমষ সন্তানের মতো বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানুষের অজানা ছিল, তাই স্বভাবতই ধর্মীয় ভয়ভীতি সঞ্চার করত এসব ঘটনা। ইউরোপীয় মিশনারিরা এসব কুসংস্কারের নিন্দা করে।

উল্লেখ্য যে, স্ক্যাম্বলের বহু আগেই পশ্চিম আফ্রিকার সমাজচ্যুত বহু মানুষ স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের শিকার হয়ে তারা চার্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জনগণের একাংশ যা সমর্থন করে, অপর অংশ হয়তো তার বিরোধী। বর্তমান শতাব্দীতে যেমন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের দায়ে চার্চ আবার সমালোচনার শিকার। বহুকাল ধরে আফ্রিকায় চলে আসা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রচলনকে আক্রমণ করে বসে চার্চ। যেমন: পুরুষের বহুবিবাহ। এহেন আক্রমণ করতে গিয়ে চার্চ এসব প্রচলনের আর্থসামাজিক কারণকে ধর্তব্যের মধ্যেই নেয়নি।

এক বিবাহ উৎসাহিত করার পেছনে কোনো ধর্মীয় কারণ দেখাতে পারেনি চার্চ। বরং ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্যকেই তারা এখানে নিয়ে আসে। আফ্রিকান সমাজ ছিল বর্ধিত পরিবারভিত্তিক। ইউরোপীয় প্রোপাগান্ডা সফল করার জন্য এই বিন্যাসে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ছিল বেশ ধীর গতির। এর মধ্যেই আবার বহু আফ্রিকান সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গকে অগ্রাহ্য করে ধর্মীয় বিষয়গুলো মেনে নেয়। এমনকি এটা করতে গিয়ে তারা ইউরোপীয় মিশনারিদেরও তোয়াক্কা করেনি।

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় স্বাধীন চার্চ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। হাজার হাজার আফ্রিকান খ্রিষ্টান মিলে ইউরোপীয় চার্চ (বিশেষত প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। প্রতিষ্ঠিত করে আফ্রিকান খ্রিষ্টান নেতাদের অধীনে নিজস্ব উপাসনালয়। এগুলোর এক একটার উদ্দেশ্য ছিল এক এক রকমের।

কোনো কোনো চার্চ ছিল তীব্রভাবে জাতীয়তাবাদী। যেমন জন চিলেম্বুয়ের আন্দোলন। তিনি ১৯১৭ সালে নিয়াসাল্যান্ডে (মালাওয়িতে) এক সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেন। কিছু আন্দোলন আবার কতিপয় আফ্রিকানের পাদরি হতে চাওয়ার উচ্চাভিলাষের ফল। এরা শ্বেতাঙ্গ মিশনারিদের হাতে বৈষম্যের শিকার। একটা সাধারণ কারণ ছিল ইউরোপীয়দের চাপাচাপি। আফ্রিকানরা যেন নিজেদের ইউরোপীয় বলে পরিচয় দেন, এজন্য এক প্রকার

বাধ্য করত তারা। আর এরই প্রতিবাদস্বরূপ জুলু সম্প্রদায়ের একটি স্বাধীন চার্চ স্থানীয় জনগণকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, "তোমরা কি ইহুদি নাকি জুলু? তারা যখন তাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে ছিলে?" তবু কিছু আফ্রিকান তাদের ওই অযাচিত পরিচয়কেই মেনে নেয়। আফ্রিকানরা যে নিজেদের ইউরোপীয় (হোক ইহুদি বা বিধর্মী) হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করল, এটাই ঔপনিবেশিক আমলের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি খুঁটি।

"When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land.
They said "Let us pray."
We closed our eyes.
When we opened them we had the Bible and they had the land."

[Archbishop Desmond Tutu]

পরিশেষে, ঔপনিবেশিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মহাকাঠামোর উপাদান হিসেবে সমাজে যেসব বিশ্বাস প্রচলিত থাকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও সেসবের একটি। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, অন্য সব বিশ্বাসের মতো এরও আছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকই। ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় পিতার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষ নেয়। চার্চও সামন্তবাদী সমাজের সামষ্টিক ক্ষমতাচর্চার বিরোধিতা করে। এগুলো প্রগতিশীল পদক্ষেপ বটে। কিন্তু এরপরে পুঁজিবাদ আরও আগ বাড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে এমনভাবে কথা বলতে থাকে যে, তা বিপুল সংখ্যক শোষিত-পীড়িত কৃষক আর মজদুরের অধিকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। ঔপনিবেশিক যুগে পুঁজিবাদ যখন আফ্রিকায় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে, ততদিনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করে। এই তত্ত্ব তখন আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মুক্তি না, বরং মুষ্টিমেয়-এর স্বার্থরক্ষায় অধিকাংশকে দাস বানাতে তৎপর।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এরপর ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

তখন জমির ব্যক্তিমালিকানা এবং তা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরের প্রচলন ঘটে মহাদেশের কিছু অংশে। এর চেয়েও বেশি ছড়িয়ে পড়ে যে ধারণাটা, তা হলো ব্যক্তির শ্রমের ফসল সে নিজেই ভোগ করবে, কোনো বৃহত্তর গোত্র বা গোষ্ঠী নয়। তাই সামষ্টিক শ্রম আর সাম্যবাদী সামাজিক বণ্টন বিলুপ্ত হতে থাকে। তার স্থান দখল করে একাট্টা করার প্রবণতা।

বাইরে থেকে মনে হয় যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানবসমাজে প্রগতি নিয়ে আসছে। কিছু ব্যক্তি কফি, কোকো অথবা তুলার বিশাল শাম্বার মালিকানা লাভ করে। আবার কেউ কেউ শিক্ষিত হয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উঁচু পদে আসীন হয়। ব্যক্তি হিসেবে তাদের কপাল খুলে যায়। সমাজের এক একজন রোল মডেল হিসেবে অবতীর্ণ হয় তারা। এই সব মডেলই একটা সমাজে শিক্ষামূলক মডেল হিসেবে কাজ করে। প্রভাবিত করে সমাজের তরুণ থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের চিন্তাভাবনাকেও। উপনিবেশবাদের অধীনে ব্যক্তিগত অর্জনের এসব মডেল আসলে সামগ্রিক অর্থে আফ্রিকার সামাজিক ভাঙন ও অনুন্নয়নের সূচনা ঘটায়।

পুঁজিবাদে একটা মিথ্যা ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন সাধারণ মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একদিন পুঁজিপতি হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এমন ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে জন ডি রকফেলার সিনিয়রের নাম অহরহ বলা হয়। তিনি শূন্য থেকে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। রকফেলারের গল্পের শিক্ষা শুধু "পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি" না। বরং একজন লোকের কোটিপতি হতে কত কোটি মানুষকে শোষণ করা লাগে, সে হিসেবও আনা চাই। সম্পদ অর্জনের একমাত্র কারণ কখনোই পরিশ্রম হতে পারে না। যদি হতো, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আফ্রিকান দাসেরাই হতো সবচেয়ে সম্পদশালী। প্রাপ্যবঞ্চিত জনতার ভিড় থেকেই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আর পুঁজিবাদকে দেখা উচিত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই ধারণা মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী সমাজের যত ক্ষতি সাধন করেছে, তারচেয়ে অনেক বেশি করেছে আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে। মেট্রোপোলে বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থানের ফলে পরোক্ষভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণ হয়েছিল বলা যায়। কারণ এতে করে উন্নত প্রযুক্তির আগমন ঘটে, জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান বাড়ে। কিন্তু আফ্রিকায় এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায়নি। বরং শোষণ আরও ত্বরান্বিত হয়। বিদেশে পাচার হয়ে যায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন। ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জন্ম দিয়েছিল সফল উদ্যোক্তাদের। তারা পরবর্তীকালে এই দেশগুলোকে পুরো বিশ্বজয় করানোয় অগ্রগণ্য ভূমিকা

পালন করে। অথচ আফ্রিকার উপনিবেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা অনানুষ্ঠানিক মূল্যবোধ তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসার ঘটে, তা ছিল একদমই যাচ্ছেতাই দশার। মানুষ সামাজিক দায়িত্ব ভুলে সামাজিক একাত্মতা ছেড়ে একদম বিচ্ছিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। আর এজন্যেই ওই সমাজে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের যে রাজনৈতিক প্রয়াস ছিল, তা ধীর হয়ে যায়।

এখন পর্যন্ত আমরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছি যে, উন্নয়নের শেকড় বেশ কয়েকটি জিনিসে প্রোথিত। বস্তুগত পরিবেশ, উৎপাদনের কৌশল, এবং মানুষের কর্মের ফলে উৎপন্ন সামাজিক সম্পর্ক। "ইতিহাসের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব" বলে একটা বিষয় আছে। এই তত্ত্বমতে, গোটা যুগের পরিবর্তন আসলে কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর গোপন চালের ফল। আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে সম্পর্ক গবেষণা করার ক্ষেত্রে এহেন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কাম্য নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিকই দেখা যায় যে, একটা সুনির্দিষ্ট ইউরোপীয় গোষ্ঠী সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কোটি আফ্রিকানের ভাগ্যের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বেশ লম্বা একটা সময়ের জন্য। এমনকি তাদের সুদূর ভবিষ্যৎকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে ওই গোষ্ঠী।

আফ্রিকাকে পদানত করবার ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির পরিকল্পনার পুরোটাই করতে দেখা গেছে ফরাসি শাসকদের। কারণ ফরাসি রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকরা আফ্রিকা-সংক্রান্ত তাদের মনের ভাবনা বেশ খোলাখুলি বলে ফেলত। আর তাই এখানে স্বয়ং ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্যই তুলে ধরা হবে। এখান থেকে বোঝা যাবে যে, তাদের প্রণীত শিক্ষানীতি আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা অর্জনকে রুখে দেওয়ার এক সচেতন পাঁয়তারা। গুরুত্বপূর্ণ এই রাজনৈতিক বিষয়টিকে তারা মোটেও ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়নি।

আফ্রিকার জন্য কামড়াকামড়ি শুরু হওয়ার সময় থেকেই ফরাসি নেতারা উপলব্ধি করে যে, ফ্রান্স-অধিকৃত অংশগুলোতে কিছু স্কুল চালু করাটা জরুরি। এতে করে কিছু আফ্রিকান হয়তো ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে নেবে। এরা ফরাসি হিসেবেই পরিচয় দেবে পরে। ব্রিটেন-পর্তুগাল বা অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় জাতির ভোগে চলে যাবে না। সীমান্তবর্তী যেসব অঞ্চল নিয়ে একাধিক ঔপনিবেশিক শক্তির মাঝে কাড়াকাড়ি ছিল, সেসব অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি প্রযোজ্য। ঔপনিবেশিক যুগ শুরুর দিকের এক ফরাসি মন্ত্রী ছিলেন ইউজিন এতিয়েন। তিনি বলেন যে, "জাতীয় নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ" হিসেবেই ফরাসি ভাষার প্রসার জরুরি। সেখানে ওই ১৮৮৪ সালেই অলিয়ঁস

ফ্রসেঁ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এটি ছিল শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার, যার স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে স্বয়ং ফরাসি সরকার। অলিয়ঁস ফ্রসেঁর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টতই দেখা যায়, তারা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার বলেই ভাবত নিজেদের। ফ্রান্স যাতে আফ্রিকাতে ঠিকমতো গেড়ে বসতে পারে, সেজন্য তারা লড়াইরত। যেমন, ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে উচ্চতর গিনির ফরাসি স্কুলগুলোর ব্যাপারে অলিয়ঁস ফ্রসেঁ লিখেছে :

> এই অঞ্চলে সিয়েরা লিওনের ইংরেজ স্কুলগুলো যেরকম ভয়ংকর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, সেটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে তাদের [ফরাসি স্কুলগুলোকে]। যত দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায়, ততই হাড্ডাহাড্ডি হয়ে ওঠে দুই ভাষার লড়াই। ইংরেজ নেটিভ ও তাদের মেথোডিস্ট পুরোহিতরা ওই অঞ্চলটিতে হানা দিয়ে দিয়েছে।

বোঝাই যাচ্ছে যে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের ভাষা ছড়িয়ে দেওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মানত। ইতিপূর্বে পর্তুগাল ও স্পেনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ করা গেছে। ওদিকে বেলজিয়াম আবার বিভেদ ও বাধা তৈরির মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় ভাষাগুলোর চর্চাকে উৎসাহিত করে চলে। শুধু জার্মান শাসনাধীন তাঙ্গানিকাতেই দেখা যায় কিছুটা ভিন্ন চিত্র। শিক্ষণের ভাষা হিসেবে সেখানে সোয়াহিলিকে ইতিবাচক চোখে দেখা হয়। এরও আগেই বাণিজ্য, রাজনীতি, ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল ভাষাটি। জার্মান ঔপনিবেশিকদের এই মনোভাবের ফলে তা আরও বেশি গতিশীল হয়।

ভাষা ছাড়াও, বেশির ভাগ উপনিবেশে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি স্তম্ভ ছিল ধর্ম। আফ্রিকার যেসব অংশের উপনিবেশক ছিল ক্যাথোলিক-অধ্যুষিত কোনো দেশ, সেসব অংশে চার্চ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। কিন্তু ফরাসি উপনিবেশে চার্চ কখনোই সেরকম কোনো ভূমিকা রাখেনি। কারণ অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল একদমই পুরোহিত-বিদ্বেষী প্রকৃতির। অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া বিপ্লবে এই বৈশিষ্ট্য সেভাবে দেখা যায়নি। দীর্ঘকাল বাজে সম্পর্ক বজায় রাখার পর ১৯০৫ সালে ফ্রান্সে ক্যাথোলিক চার্চকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কিন্তু একটা সময় গিয়ে ফরাসিরা খেয়াল করে যে, মিশন স্কুলগুলো ইংল্যান্ডকে আফ্রিকায় গেড়ে বসতে খুবই সাহায্য করছে। তখন ফরাসি সরকার তার নিজস্ব ক্যাথোলিক চার্চকে

অনুরোধ করে, যেন তারাও জাতীয় স্বার্থে একই কাজ করে দেয়।

একটা উপনিবেশের সীমানা যখন নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন উপনিবেশকদের সামনে নতুন এক সমস্যা হাজির হয়। আর তা হলো মেট্রোপোলের অনুকূল নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের আনুগত্য অর্জন করা। সে উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের সুযোগ অবশ্যই আছে। কিন্তু ছোটখাটো সব ব্যাপারেই নগ্নভাবে বলপ্রয়োগ করার চেয়ে সেটাকে বরং জরুরি পরিস্থিতির জন্য তুলে রাখাই ভালো। তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পথচলা মসৃণ করতে সবচেয়ে কার্যকর উপকরণ শিক্ষা। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বাধাটা সামনে আসে, তা হলো ভাষা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয়রা তাদের আদেশ-নিষেধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দোভাষীদের ব্যবহার করত। কিন্তু আফ্রিকান দোভাষীরা প্রায়ই এর সুযোগ নিয়ে হয় আত্মপ্রচারণায় লিপ্ত হয়, আর নয়তো আদেশগুলো পালটে দেয় বা এমনকি তথ্য পাচারও করে। ফরাসি উপনিবেশাধীন আফ্রিকায় একটি প্রবাদ ছিল, "ভাষান্তর আর রাষ্ট্রদ্রোহ একই কথা।" এই ঝামেলা এড়ানোর একমাত্র উপায় ছিল জনগণকে ব্যাপক হারে ফরাসি ভাষা শেখানো।

এরপর রয়েছে আফ্রিকানদের শিক্ষিত করার এক ব্যবহারিক উপকারিতা: তাদের আরও ভালো শ্রমিকে পরিণত করা। ইউরোপের শ্রমিকরাও শিক্ষা অর্জন করত, যাতে করে পুঁজিপতিদের জন্য আরও দক্ষতা সহকারে উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারে তারা। ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় কিছু ইউরোপীয় বুর্জোয়া উপলব্ধি করে যে, একটু শিক্ষিত করে তুললেই শ্রমের সর্বোচ্চ মূল্য আদায় করা সম্ভব। জনৈক ফরাসি ঔপনিবেশিক মন্ত্রী অ্যালবার্ট সারট ১৯১৪ সালে এই বিষয়টিকে আখ্যায়িত করেন "[আফ্রিকান] জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার অর্থনৈতিক উপযোগ" হিসেবে। এর কয়েক বছর আগে ফরাসিরা মাদাগাস্কারের ব্যাপারেও একইরকম এক বিবৃতি দেয়। আঠারোশ নিরানব্বই সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশে ইঙ্গিত করা হয় যে, স্কুল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য... তরুণ মালাগাসিদের ফ্রান্সের বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজায় পরিণত করা এবং এমন এক শিক্ষা প্রদান করা, যা হবে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক। উপনিবেশের অভিবাসী এবং বিভিন্ন সরকারি খাত যেন তাদের লোকবলের চাহিদা পূরণ করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা হবে এর মাধ্যমে।

বাস্তবে সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করার কোনো দরকারই ছিল না। কারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে প্রবেশকারী যেসব আফ্রিকানের অবদানকে শিক্ষার মাধ্যমে বর্ধিত করা সম্ভব, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাই ফরাসিরা ওই

মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীটিকে বাছাই করার কাজে মন দেয়। এরা ফরাসি সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। ফ্রান্সকে তার বিশাল আফ্রিকান ঔপনিবেশিক সম্পত্তি দেখভাল করতে সাহায্য করবে তারা। ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকার শুরুর দিকের এক মহাপ্রশাসক উইলিয়াম পন্টি। তিনি "তরুণদের এমন এক অভিজাত শ্রেণী" তৈরি করার কথা বলেন, "যাদের নিয়তিই হলো আমাদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা।" হেনরি সিমোন (ঔপনিবেশিক মন্ত্রী) ১৯১৯ সালে আফ্রিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি রূপরেখা প্রদান করেন। এর উদ্দেশ্য "দেশীয় জনগণের সেরা অংশটিকে সম্পূর্ণরূপে ফ্রেঞ্চম্যানে পরিণত করা।"

ফরাসি ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী, তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় ১৯৩০-এর দশকে। ততদিনে কিছু কথাও কাজে পরিণত হতে শুরু করেছে। ঊনিশশ ত্রিশ সালে ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকার মহাপ্রশাসক ছিলেন ব্রেভিয়ে। তিনি আফ্রিকানদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম বর্ধিত করার আবেদন জানান, "যাতে আমাদের উপনিবেশায়নের কাজ সহজতর হয়।" ব্রেভিয়ে এই কথা বলার উৎসাহ পেয়েছিলেন, কারণ ততদিনে "স্থানীয়দের এক অভিজাত শ্রেণী"র উদ্ভব ঘটে। "পুরোদমে ফরাসি সংস্কৃতি আত্মীকরণের জন্য তাদের জযবা ততদিনে দৃশ্যমান।" তাই শিক্ষা বিষয়ক মহাপরিদর্শকের সহযোগিতায় উক্ত প্রশাসক একটা রূপরেখা তৈরি করেন, যাতে আফ্রিকান শিক্ষার্থীরা ঔপনিবেশিক ক্যাডার হওয়ার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়। যেকোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্যই ক্যাডার প্রয়োজন। শাকার সেনাদলেও সবচেয়ে ছোট বয়স-শ্রেণীর সদস্যরা এই দায়িত্ব পালন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমসোমোল বা ইয়াং কমিউনিস্টদের ভূমিকাও ছিল একই। ক্যাডার হওয়া মানে বাস্তব কোনো দায়িত্বের জন্য প্রশিক্ষিত হওয়াই শুধু নয়। বরং ভবিষ্যৎ-নেতা হিসেবে কাজ করার জন্য ক্যাডারকে বিদ্যমান ব্যবস্থার রাজনৈতিক সমর্থক হিসেবেও গড়ে তুলতে হয়। ফরাসি ও অন্য উপনিবেশকরা ভালো করেই বুঝত এই ব্যাপারটি। ব্রেভিয়ে এই কথাটি এভাবে বলেছেন :

> তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাড়নায় দলে দলে কেবল শিক্ষানবিশ, কেরানি আর কর্মকর্তা তৈরি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ না। এই নেটিভ ক্যাডারদের ভূমিকা আরও অনেক বিস্তৃত।

একমাত্র ব্যতিক্রম উত্তর আফ্রিকা, যেখানে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীর সংখ্যা বিশাল। মেট্রোপোল ও প্রশাসকের নির্দেশনামতে সেখানকার বিষয়-আশয়

পরিচালনার জন্য স্থানীয় একটা অভিজাত শ্রেণী তৈরি করার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি ফরাসিরা। অবশ্য আলজেরিয়াতেও এক শ্রেণীর প্রজা গড়ে উঠেছিল, যাদের বলা হতো বেনি ওউই ওউই—অর্থ "জি-হুজুর মানব"। বেশির ভাগ স্বদেশি ভাইয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও ফরাসিদের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য তারা ছিল সদাপ্রস্তুত। শিক্ষার পরিমণ্ডলে ফরাসিরা আরেকটি দূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে। গোষ্ঠীনেতার সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করত তারা। অতীতে স্বাধীন আফ্রিকায় যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল, ফরাসিরা এই কাজের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য আদায় করার চেষ্টা চালায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে চলে আসা প্রক্রিয়ারই অংশ এটি। ফরাসিদের নিজের ভাষ্যমতেই, সাবেক শাসকদের পুত্রদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে "আমাদের তৈরি করা স্থানীয় ক্যাডার এবং সেখানকার জনগণের পছন্দসই মানুষদের মাঝে একটি বন্ধন সৃষ্টি হয়।"

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদদের একটি দল ১৯৩৫ সালে ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত আফ্রিকা ঘুরে দেখে। ঈর্ষা ও প্রশংসার এক মিশেলে তারা স্বীকার করে যে, ফরাসিরা নিজেদের আদলে একদল অভিজাত আফ্রিকান সৃষ্টি করে নিতে পেরেছে। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনকে চিরস্থায়ী বানাতে সাহায্য করছে এই অভিজাত শ্রেণীটি। কম হোক বা বেশি, প্রতিটি ঔপনিবেশিক শক্তিই এরকম ক্যাডার উৎপাদন করেছে। আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হতো এদের মাধ্যমে।

আফ্রিকায় যে চিরকাল একইভাবে ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখা সম্ভব না, সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্পষ্ট হয়ে যায়। এশিয়া ইতিমধ্যে রশি ছিঁড়ে ছুটে গেছে। আর আফ্রিকা হয়ে গেছে অস্থির। সমাপ্তি ঘনিয়ে আসাটা যখন স্পষ্ট হয়ে যায়, মেট্রোপলিটন শক্তিগুলো তখন তাদের ঔপনিবেশিক ক্যাডারদের দিকে মনোনিবেশ করে। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন আফ্রিকার নীতিনির্ধারক পদগুলো এখন তুলে দিতে হবে তাদের হাতে। আফ্রিকার যে স্বাধীন হওয়া উচিত, এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নেয়নি। বরং নিয়েছে আফ্রিকার জনগণ। কিন্তু উপনিবেশবাদ থেকে নব্য-উপনিবেশবাদে পরিবর্তনের পেছনে ষড়যন্ত্রের হাত অবশ্যই ছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারোল্ড ম্যাকমিলান ১৯৬০ সালে বিখ্যাত এক উক্তি করেন, "আফ্রিকায় এক পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।" বুর্জোয়াদের ভাষায় আসলে এই কথার যা অর্থ, তা খোলাখুলি বলে দেন চাইনিজ প্রিমিয়ার ঝোউ এনলাই: "আফ্রিকা এখন বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণ পরিপক্ক।" এই আফ্রিকান বিপ্লবকে বিলম্বিত বা ছিনতাই করার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এমন একটি দলের শরণাপন্ন হয়, যেটিকে

তারা আগেই ভিন্ন এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিল। এই দলটি হলো ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত আফ্রিকানরা। যেখানেই সম্ভব হয়েছে, সেখানেই এই শ্রেণী থেকেই বাছাই করা হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের। প্রশাসন ও সামরিক ময়দানকেও ছেড়ে দেওয়া হয় একই ধরনের বিশ্বাসযোগ্য ক্যাডারদের হাতে।

অল্পকিছু দূরদর্শী ইউরোপীয় শুরু থেকেই বুঝতে পারছিল যে, আফ্রিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হওয়ার পরেই কেবল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সুফল মিলবে। যেমন, অলিয়ঁস ফ্রঁসের একজন প্রতিষ্ঠাতা পিয়েরে ফংকিন। এই শতকের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, "অত্যন্ত মজবুত এক মনস্তাত্ত্বিক বন্ধনের মাধ্যমে মেট্রোপোলের সাথে উপনিবেশগুলোকে সংযুক্ত করাটা জরুরি। তাদের আসন্ন স্বাধীনতা যেদিন চলেই আসবে, সেদিন যেন তা হয় একটি ফেডারেশানের আকারে। অর্থাৎ ভাষা, চিন্তা ও চেতনায় তারা যেন ফরাসিই থেকে যায়।" তারপরও আফ্রিকাকে সসম্মানে তার অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা প্রদান করতে রাজি-হওয়া প্রথম জাতি ব্রিটিশরা। ওদিকে ফরাসিরা তাদের সংসদে অল্প কয়েকজন আফ্রিকান প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়। এর মাধ্যমে তারা আফ্রিকান অঞ্চলগুলো ফ্রান্সের সাথে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে ও সফল হয়। আর ব্রিটিশরা বাছাইকৃত নির্দিষ্ট আফ্রিকানদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মেট্রোপলিটন পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ছিল (এবং এখনো আছে) কিছু অভিজাত স্কুল। এখান থেকেই রাজনৈতিক ও অন্যান্য নেতৃপর্যায়ের বেশির ভাগ মানুষ উঠে আসে। ইটোন, হ্যারো, রাগবি, ও উইনচেস্টারের ইংলিশ পাবলিক স্কুলগুলো যে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল, তা সর্বজনবিদিত। এসকল মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা ধরাবাঁধা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হয়। তাই স্কুলগুলোর গুরুত্ব ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও বেশি। ফ্রান্সের এরকম দুটি মাধ্যমিক স্কুল লিসে লুই লে গ্রাঁ এবং ইকোলে নখমালে সুপিরিয়খ রু ডি'আল্‌ম। এসব স্কুল থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে সেদেশের মন্ত্রীসভা এবং অন্যান্য উচ্চতর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রে একটা ভুয়া কথা প্রচলিত যে, সবার জন্যই সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। আসলে শাসকশ্রেণীর বড় একটা অংশই যেত নির্দিষ্ট কিছু স্থানের বেসরকারি বালক বিদ্যালয়গুলোতে। যেমন: গ্রটন, সেন্ট পল'স, সেন্ট মার্ক'স, এবং ফিলিপস এক্সেটার।

আফ্রিকায় যে-ই ঔপনিবেশিক যুগে স্কুলে পড়েছে, সে-ই হয়ে গেছে অভিজাত শ্রেণীর সদস্য। কারণ এমনকি প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার মতো সুযোগ-পাওয়া

মানুষের সংখ্যাও ছিল একদম নগণ্য। তার ওপর, প্রতিটি উপনিবেশে অন্তত একটি করে মাধ্যমিক বা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান থাকত। রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুগে যারা আফ্রিকার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নেতা হয়ে ওঠে, তাদের গড়ে তোলা হয় এসকল প্রতিষ্ঠানে। একেকটি আফ্রিকান দেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং স্থায়ী সচিবদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় এসব স্কুলের নামডাকার খাতায়। যেমন: গর্ডন কলেজ (সুদান), অ্যালায়েন্স হাই স্কুল (কেনিয়া), কিং'স কলেজ বুদো (উগান্ডা), তাবোরা সেকেন্ডারি স্কুল (তানজানিয়া), লিভিংস্টোন (মালাওয়ি), উইলিয়াম পন্টি (সেনেগাল), সিয়েরা লিওন গ্র্যামার স্কুল, এমফ্যান্টসিপিম (ঘানা), দ্য লিসে গ্যালিয়েনি (মাদাগাস্কার), এবং আরও কয়েকটি। এগুলোর পাশাপাশি দীর্ঘজীবী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের-কাছাকাছি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল মাকেরেরে, ফাওরা বে, এবং আচিমোতা।

পেছন ফিরে তাকালে স্পষ্টই বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিক ছিল সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনী। কিং'স আফ্রিকান রাইফেলস, দ্য ফ্রেঞ্চ ফ্রি আর্মি, এবং দ্য কঙ্গোলিজ ফোর্স পাবলিক থেকে এমনসব সার্জেন্ট বেরিয়ে আসে, যারা পরবর্তীকালে স্বাধীন আফ্রিকার মেজর ও জেনারেলে পরিণত হয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা হয়ে যায় রাষ্ট্রনায়কও। পুলিশকর্মীরাও একইভাবে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করে। তবে মূল সামরিক বাহিনীর চেয়ে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল বেশ দুর্বল।

বেসামরিক লোকদের মতো এই ভবিষ্যৎ-পুলিশ ও সামরিক অভিজাতদেরও প্রথম প্রথম এমনভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল, যাতে এরা ঔপনিবেশিক প্রভুদের অধীনে ছাপোষা সহকারী হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সামনে যখন স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করে, তখন উপনিবেশকরা এদেরকেই বাছাই করে নিয়েছে নিজেদের ঔপনিবেশিক ক্যাডার হিসেবে। নব্য-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার শাসকশ্রেণী হওয়ার জন্য যারা একদম খাপে-খাপ। কিছু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আরেকটা কাজ করে। উপনিবেশ-যুগের শেষ দিকে কিছু আফ্রিকানকে মেট্রোপলিটন উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায় তারা। তাড়াহুড়া করে বৈজ্ঞানিক সহিংসতা পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিতে থাকে তাদের। এসব প্রতিষ্ঠানের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও হেন্ডন পুলিস স্কুল এবং ফ্রান্সের সেন্ট সিয়াখ মিলিটারি অ্যাকাডেমি। এরকম প্রশিক্ষণের জন্য যে হাতে-গোনা কয়েকজনকে বাছাই করে নেওয়া হয়, এরাই ছিল সামরিক অভিজাত শ্রেণীর সবচেয়ে প্রভুভক্ত অংশটি। আফ্রিকার বা বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে-যাওয়া বেসামরিক আফ্রিকানদের সমগোত্রীয়।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যা বেরিয়ে এসেছে, তার বেশির ভাগ অংশই সেরকম অনন্য কিছু না। শিক্ষাব্যবস্থাকে তৈরিই করা হয় এমনভাবে, যাতে তা নির্দিষ্ট একটা সমাজকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে। কমবয়সি যারা এই ব্যবস্থার ভেতর শিক্ষিত হয়, বড় হয়ে সমাজের নীতিনির্ধারক পদে গেলে সেই শিক্ষকদের মূল্যবোধই বহন করে তারা। আফ্রিকাতে উপনিবেশবাদীরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল নিচু পর্যায়ের প্রশাসক, শিক্ষক, নন-কমিশন্ড অফিসার, এবং রেলের কেরানিদের। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। আর এসকল লোক যে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পরও ঔপনিবেশিক মূল্যবোধই বহন করে চলবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

উপনিবেশকদের সবচেয়ে পছন্দের লোকগুলোই যেন আফ্রিকার প্রশাসনিক পদসমূহে বহাল থাকে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় তারা। নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও পুলিশি ক্ষমতাগুলো তাদেরই হাতে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরলে অনেক ইউরোপীয় এবং এমনকি আফ্রিকানরাও সেটাকে একপেশে চিত্র বলে দাবি করবে। এক দিক দিয়ে কথাটা সত্য। ইচ্ছে করেই এই একপেশে চিত্র তুলে ধরা হলো। কারণ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছে। ওই লক্ষ্যের কতটুকু তারা অর্জন করতে পেরেছে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে এই আলোচনায়। এর পাশাপাশি ভালো যা কিছু হয়েছে, তার কৃতিত্ব উপনিবেশকদের নয়। বরং উপনিবেশকদের হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এবং আফ্রিকান জনগণের সংগ্রামের কারণেই বেরিয়ে এসেছে সেসকল ভালো দিক।

দ্বন্দ্বের মাধ্যমে উন্নয়ন

ঔপনিবেশিকতার একমাত্র ইতিবাচক দিক ছিল এর অবসানে। কীভাবে সেই উন্নয়ন হয়, তা-ই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে এই পরিচ্ছেদে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে শিক্ষাখাতের কথা।

একদিকে উপনিবেশবাদের ভালো দিক এবং অন্যদিকে খারাপ দিক রেখে অনেকসময় তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। এসবের বিপরীতে ভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে। সেখানে একদিকে থাকে ঔপনিবেশিকদের লক্ষ্য ও অর্জন, এবং অন্যদিকে আফ্রিকান জনগণের পালটা লক্ষ্য ও অর্জন। কিছু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সাধ্যমতো ফায়দা হাসিল করে নেওয়া ছাড়া আফ্রিকানদের আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এ ছাড়াও, ঔপনিবেশিক

সমাজের মধ্যে কিছু মৌলিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আফ্রিকানরা জাতি হিসেবে তাদের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমেই কেবল এসব দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব ছিল।

সাধারণত, দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাটা মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে উপনিবেশবাদের ভেঙে পড়াকে সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্ণিত কাঠামোতে আলোচনা করেন :

> উপনিবেশবাদ পরাধীন জাতিগুলোর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের সুবিধার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে চলে। সামাজিক সম্পর্কের মেয়াদোত্তীর্ণ রূপগুলোকে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করে তারা। এর মাধ্যমে তারা বিভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মাঝে। কিন্তু মহা-মুনাফা পেতে হলে উপনিবেশগুলোতে খনন-শিল্প, ক্ষেতখামার ও পুঁজিবাদী কৃষির উন্নয়ন, বন্দর, রেলপথ এবং রাস্তা নির্মাণ করাই লাগে। পরিণামে উপনিবেশকদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, উপনিবেশগুলোতে ঘটে সামাজিক পরিবর্তন। এতে নতুন দুটি সামাজিক শক্তির উদ্ভব ঘটে—একটি হলো শিল্পশ্রমিক ও কৃষিশ্রমিক প্রোলেতারিয়েত, আরেকটি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী।

পুঁজিবাদী কর্মতৎপরতায় যেসব তথাকথিত আধুনিক খাতের উদ্ভব ঘটে, সেগুলোতে বহু আফ্রিকান জড়িত ছিল। এদের মাঝে সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থকরী ফসলের চাষীরা। ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে এই কৃষকদের গভীর অসন্তোষ ছিল। এর কারণ ছিল আফ্রিকান পণ্যের কম দাম নির্ধারণ এবং কখনো কখনো ভূমি-বিচ্ছিন্নতা। মজুরিভোগী কৃষিকর্মী ও শহুরে শ্রমিকরা তাদের জমি তো আগেই হারিয়েছে। এবার সংগঠিত হয়ে মজুরি-দাসত্বকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে তারা। ইউরোপীয় প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীও তাদের উদ্ভবের পর থেকে ঠিক এভাবেই প্রতিরোধ করে আসছিল। এ ছাড়া, সুসংহত সংগঠনের কারণে আফ্রিকান শ্রমিকরা তাদের উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে জানান দিতে সক্ষম হয়। অন্যথায় এই সীমিত সংখ্যা নিয়ে তারা তা কখনোই পারত না। শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক এবং নগণ্য উপার্জকরাও গণহারে আন্দোলনরত দলগুলোতে যোগ দেয়। তবে কৃষকরা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য বিক্ষিপ্ত কিছু বয়কট ও বিদ্রোহের ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে, মজুরিভোগী শ্রমিকরা আরও নিরবচ্ছিন্নভাবে দর কষাকষি, দাবিদাওয়া, ও ধর্মঘট করতে সক্ষম।

শিক্ষিত অভিজাত বা বুদ্ধিজীবীরা ছিল সবচেয়ে ছোট সামাজিক গোষ্ঠী।

পূর্বে যেমনটা বলা হয়েছে, ঔপনিবেশিক যুগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-গ্রহণকারী আফ্রিকানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই যারাই স্কুলে যেত, তারাই হয়ে যেত সুবিধাভোগী ও অভিজাত শ্রেণীর সদস্য। হাতে-গোনা কিছু আইনজীবী ও ডাক্তার ছিল, যাদের বেশির ভাগই উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকাকেন্দ্রিক। সাধারণভাবে বলতে গেলে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীটি ছিল ছাত্র, কেরানি ও শিক্ষক। তা ছাড়া, সংগঠিত শ্রমিকনেতা, আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী শাসকশ্রেণী, প্রাক্তন সৈন্য ও পুলিশ, এবং ব্যবসায়ী ও স্বাধীন কারিগরদের মধ্যেও ছিল শিক্ষিত মানুষজন।

সব মিলিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামে এই শিক্ষিতরা যে ভূমিকা পালন করে, তাদের সংখ্যার অনুপাতে সেটা বিশাল। কারণ সকল আফ্রিকানের স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলার দায়িত্বকে তারা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। এ ছাড়াও এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্যও তাদের প্রয়োজন পড়ে, যে সংগঠনটি উপনিবেশবাদের সমস্ত দ্বন্দ্বকে একাট্টা করবে। তারপর মনোনিবেশ করবে প্রধান দ্বন্দ্বটির ওপর। আর তা হলো, উপনিবেশ ও মেট্রোপোলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।

শিক্ষিত ও উপনিবেশকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তেমন গভীর ছিল না। শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমিকদের কোনোরকম মুক্তি না দিয়েই ঔপনিবেশিকরা প্রস্থান করে। অথচ এরাই ছিল সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত। এর বদলে উপনিবেশকরা বেশির ভাগ আফ্রিকান বুদ্ধিজীবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু উপনিবেশক ও শিক্ষিত আফ্রিকানদের মধ্যে যতদিন শত্রুতা ছিল, ততদিন বেশ কাজের কাজ করে গেছে এই শিক্ষিত শ্রেণী।

ইতিমধ্যে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা নগণ্য সংখ্যক আফ্রিকানদের নাগালে ছিল। সেটাও আবার প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ। আফ্রিকার চেয়ে বরং ইউরোপের স্বার্থে কাজ করাই ছিল এর শিক্ষাগত ও আদর্শিক উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে আফ্রিকানদের নিজস্ব প্রচেষ্টা না থাকলে ভর্তিকৃতের সংখ্যা আরও অনেক কম হতো। আফ্রিকান জনসাধারণের কাজকর্ম যদি ইউরোপীয় উপনিবেশকদের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে লিপ্ত না থাকত, তাহলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ আরও সংকীর্ণ হতো। পাঠ্যক্রমে আদর্শিক উপাদানগুলো হতো আরও নেতিবাচক। সর্বোপরি, চিরকাল পরাধীনতা জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যটি এই শিক্ষাব্যবস্থা কখনোই পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি। বরঞ্চ, দেখা দিতে থাকে নিত্যনতুন সব দ্বন্দ্ব। এগুলোই একসময় স্বাধীনতার পথ দেখায়। কিছু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক

আমলের শেষভাগে নতুন একটি সমাজতান্ত্রিক যুগেরও সূচনা করে এসব দ্বন্দ্ব।

আফ্রিকান ঔপনিবেশিক শিক্ষার ইতিহাসে গৌরবময় কিছু যদি থেকে থাকে, তবে তা ইউরোপীয় শোষকদের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্ট নয়। বরং আফ্রিকানদের অসামান্য উদ্যম। যে শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন তাদের প্রভু হয়ে ছিল, আফ্রিকানরা দারুণ উদ্যমী হয়ে সেগুলোর ওপরই পালটা মুনশিয়ানা হাসিল করে নেয়। অধিকাংশ উপনিবেশে স্কুলশিক্ষার প্রতি প্রথম প্রথম এক ধরনের উদাসীনতা ছিল। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে, ঔপনিবেশিক সমাজে এগিয়ে চলার অল্পকিছু গলিপথের একটি হলো স্কুলশিক্ষা। তখন তা আফ্রিকানদের ঝংকারময় দাবিতে পরিণত হয়। উপনিবেশকদের অভীষ্ট লক্ষ্য যত দূর পর্যন্ত ছিল, তার চেয়েও দূরে তাদের ঠেলে দিতে থাকে আফ্রিকানরা।

আফ্রিকানরা যখন অর্থকরী ফসল চাষের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে, তা মোটের ওপর ইউরোপীয় পুঁজিবাদী উদ্দেশ্যেরই সহায়ক ছিল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আফ্রিকানদের তৎপরতা ঔপনিবেশিক শোষণের অন্তত কিছু উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে দেয়।

ফ্রান্স-শাসিত ঔপনিবেশিক আফ্রিকার শিক্ষা সম্পর্কে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে মূলত আলোচিত হয়েছিল ফরাসিদের নীতিমালা। ফরাসিরা এই আফ্রিকানদের মধ্য থেকে কয়জন ক্যাডার তৈরি করবে, সেটা তাদের নির্ধারিত করা ছিল। আফ্রিকান ট্যাক্স থেকে এদের জন্য প্রদেয় ভর্তুকির পরিমাণও ছিল নির্দিষ্ট। কিন্তু ফরাসিরা খেয়াল করল, শিক্ষিত আফ্রিকানরা ওই নির্ধারিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসি গভর্নর-জেনারেলের ১৯৩০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী :

> নতুন প্রতিটি স্কুল খোলামাত্রই শিক্ষার্থী উপচে পড়ে। সবখানে নেটিভরা শিক্ষিত হওয়ার দাবি নিয়ে ঝনঝন করছে। অমুক জায়গার মোড়ল চাইল, অমনি খুলে ফেলল নিজস্ব একটা স্কুল। আবার কিছু কিছু গ্রামের অধিবাসীরাও স্কুল তৈরির খরচ বহনে এক পায়ে খাড়া। আইভোরি কোস্টের কিছু জায়গায় গ্রামবাসীরা নিজস্ব আয় থেকে শিক্ষকদের বেতন পর্যন্ত দেয়। আমাদের ছাত্ররা একেকজন ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূর থেকেও পড়তে আসে।

অধিকতর ও উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে আফ্রিকানদের এই উৎসাহ মহাদেশের নির্দিষ্ট কোনো অংশে সীমাবদ্ধ ছিল না। অবশ্য কিছু অংশে এর বহিঃপ্রকাশ হয় তুলনামূলক আগে ও তীব্রতর আকারে। যেমন, গোল্ড কোস্ট ও সিয়েরা লিওনে ইউরোপীয় শিক্ষার ধারা সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই চলমান। কাজেই, ১৮২৪ সালে টাইমস এডুকেশনাল সাপ্লিমেন্ট যে মন্তব্য করে, তা মোটেও আশ্চর্যজনক

ছিল না। তারা বলে যে, গোল্ড কোস্টে অধিকতর ও উন্নতমানের শিক্ষার এক সর্বজনীন দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। এই গোল্ড কোস্ট থেকেই উঠে আসেন বিশিষ্ট আফ্রিকান শিক্ষাবিদ ও জাতীয়তাবাদী জে.ই.কে. অ্যাগ্রে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে গোল্ড কোস্টের বাইরেও আফ্রিকানদের স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা ও প্রদত্ত সামাজিক সেবার পরিমাণের মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাই একচেটিয়াভাবে প্রায় সব স্কুলই গড়ে ওঠে শুধুমাত্র শহর, খনিবহুল ও অর্থকরী ফসলের এলাকাগুলোতে। এর একটা কারণ, পুঁজিবাদীরা তো এমনিতেই শ্রমিকদের শ্রমশক্তি বাড়াতে চায়। তবে ওই আফ্রিকানদের প্রচেষ্টারও ফলাফল, যারা মুদ্রা অর্থনীতিতে ঢুকে পড়েছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে নানান দাবি তুলে ধরে তারা। সেইসাথে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর ত্যাগও স্বীকার করে। এভাবে দেখা যায়, পাম তেলচাষী ইবো জনগোষ্ঠী তাদের সামান্য আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিনিয়োগ করেছে স্কুল তৈরিতে। এক্ষেত্রে সাধারণত চার্চেরও সহযোগিতা নেয় তারা। ঘটনাচক্রে এখানে উল্লেখ্য, চার্চ বা মিশন স্কুল নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়সময়ই সম্পূর্ণভাবে আফ্রিকানদের অর্থায়নে পরিচালিত হতো। তারা চার্চকে শুল্ক প্রদান করত, চার্চের ফসলের জন্য দান করত, কখনো বিশেষ শিক্ষা তহবিলে অর্থসহায়তা দিত, এবং প্রায়ই স্কুলের বেতনও পরিশোধ করত তারাই। এই ব্যবস্থা পুরো ইবো-ল্যান্ডজুড়ে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক আফ্রিকার অন্যান্য অংশেও এরকম দৃষ্টান্ত কম না। আফ্রিকায় চার্চ স্কুলগুলোর অস্তিত্ব পাম অয়েল এবং মানুষের শ্রমের কাছে ঋণী। অবশ্যই ভুলে যাওয়া যাবে না যে, মিশনারি, প্রশাসক ও শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী—প্রত্যেকেই আফ্রিকান শ্রম ও সম্পদ ভোগ করে টিকে ছিল।

ব্রিটিশ আফ্রিকার অর্থকরী-ফসল অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য কৃষি উৎপাদন বোর্ড ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ব্যবহারের চেষ্টা দেখা যায়। যত যা-ই হোক, কৃষিজীবী উৎপাদকদের উপকারার্থেই তো কৃষি বোর্ডগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রথম প্রথম তারা উদ্বৃত্ত সম্পদ ডলার রিজার্ভ আকারে ব্রিটেনে রপ্তানি করার পেছনেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকে যখন স্বায়ত্তশাসনের যুগ শুরু হয়, তখন এহেন আচরণ পালটাতে বাধ্য হয় তারা। নিজেদের শ্রমলব্ধ সুবিধা থেকে আফ্রিকানদের এভাবে বঞ্চিত করাটা ততদিনে কেলেঙ্কারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই উৎপাদন বোর্ডগুলো একরকম বাধ্য হয়ে শিক্ষাখাতের জন্য কিছু তহবিল তৈরি করে। যেমন, ১৯৫৩ সালে উগান্ডার আইন পরিষদ কটন প্রাইস স্টেবিলাইজেশান ফান্ড থেকে

১.১ কোটি পাউন্ড অর্থ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয়ের পক্ষে ভোট দেয়। সেখান থেকে বড় একটি অংশ গিয়েছিল কৃষিশিক্ষা খাতে।

আফ্রিকানদের মধ্যে যারা তুলনামূলক সচ্ছল, তারাও কিছু ক্ষেত্রে দরদি হয়ে আফ্রিকান বাচ্চাদের স্কুলে যেতে সাহায্য করে। ইতিহাস ঘাঁটলে ঔপনিবেশিক আফ্রিকার শিক্ষাব্যবস্থার এরকম বেশ কিছু তথ্যকণিকা মেলে। যেমন, সোমালিয়ায় প্রথম মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সালে। এটা ঔপনিবেশিক প্রশাসন বা চার্চের হাতে নয়, বরং গড়ে উঠেছে জনৈক সোমালি ব্যবসায়ীর উদ্যোগে। এখনো আফ্রিকাবাসী আশা করে, তাদের কেউ শিক্ষিত হলে সে তার বর্ধিত পরিবারের অন্তত আরও একজনকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করবে। এর কারণও আছে। এই একজনকে শিক্ষিত করতে তার পরিবার ও গ্রামবাসীরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। মৌরিতানিয়ায় ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংরক্ষিত এলাকাগুলোর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি। কোনো আফ্রিকান দেশেই এরকম উদাহরণের অভাব নেই।

এরকম বহু আফ্রিকানের জীবনী এখন সহজলভ্য, যারা ঔপনিবেশিক যুগে খ্যাতি লাভ করেছেন। বিশেষ করে আফ্রিকান স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে। তাদের জীবনী পড়লেই বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষিত হওয়াটা যে আসলেই কেমন সংগ্রামের ব্যাপার ছিল। একই চিত্র পাওয়া যাবে আধুনিক আফ্রিকান উপন্যাসগুলোতেও। উপন্যাস যদিও কল্পনা-আশ্রিত সাহিত্য, কিন্তু লেখকের ভাবনা তো উৎসারিত হয় সত্য ঘটনা ও ইতিহাস থেকেই। উপনিবেশের পক্ষে সাফাই-গাওয়া লোকদের কথা শুনলে মনে হয় যেন শিক্ষাকে মজাদার খাবারের মতো করে আফ্রিকাবাসীর মুখে তুলে দেওয়া হয়েছিল। অথচ বাস্তবে তখন পড়াশোনার যে কয়টা গুঁড়া নিচে পড়ত, তা নিয়েই আফ্রিকানদের কাড়াকাড়ি করতে হতো। এমনিতেই তাদের আয় ছিল কম। সেখান থেকেই অকল্পনীয়ভাবে টাকা বাঁচিয়ে তারা ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করত। আবার ছেলেমেয়েরাও স্কুলে আসত-যেত মাইলের পর মাইল হেঁটে। এবং এসব নিয়ে কারও কোনো অভিযোগও ছিল না।

বিপুল পরিমাণে শারীরিক এবং আর্থিক ত্যাগস্বীকার তো আছেই। কিছু উপনিবেশের আফ্রিকানদের শিক্ষার অধিকার আদায় করতে রাজনৈতিক যুদ্ধেও নামতে হয়েছে। এসব উপনিবেশে ছিল সাদা অভিবাসীদের আধিক্য।

যেমন, কেনিয়ার অভিবাসীরা স্পষ্ট করেই জানান দেয়, তাদের কাছে একজন শিক্ষিত আফ্রিকানের চাইতে অশিক্ষিত আফ্রিকানই বেশি ভালো। আবার সামান্য কিছু পড়ালেখা করা আফ্রিকানকে মেনে নেয়া গেলেও কয়েক

বছর স্কুলে যাওয়া আফ্রিকানকে পছন্দ করা অসম্ভব। কেনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বীচার রিপোর্ট (১৯৪৯ সালে প্রকাশিত) ছিল সাদা দখলদারদের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। এতে সরাসরি বলা হয়েছে :

> স্কুলে পড়ে-আসা লোকগুলো সহজে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে চায় না। কিন্তু নিরক্ষররা কায়িক শ্রমের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সুতরাং নিয়োগের ক্ষেত্রে এরাই অগ্রগণ্য।

উপনিবেশকালে সাদা অভিবাসীরাই রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছাকাছি থাকত। ফলে কেনিয়ার শিক্ষানীতি প্রণয়নে খুব সহজেই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তারা। আফ্রিকানদের ভাগে জোটে নগণ্য পরিমাণ শিক্ষা। তার মানে, সামাজিক সুবিধার অনুপাতে শোষণ বৃদ্ধি পাওয়ার যে নীতি ছিল, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু কেনিয়ার সবচাইতে নিগৃহীত গোষ্ঠী কিকুয়ু এই অবস্থা এমনি এমনি মেনে নেয়নি। তারা দাবিদাওয়ার বিশাল এক তালিকা ধরিয়ে দেয় ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে। অথচ এমন কাজ তখন সাদা অভিবাসীরা ছাড়া আর কেউ করার কল্পনাও করতে পারত না। যা-ই হোক, দাবিদাওয়া আংশিকভাবে সফল হয়। নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিতৃষ্ণা সহকারে বীচার রিপোর্ট আফ্রিকায় অল্প কিছু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের অনুমতি দেয়। বলে দিয়েছিল, ৪০% আফ্রিকান শিশু জুনিয়র প্রাইমারি, ১০% ছেলেমেয়ে সিনিয়র প্রাইমারি বা ইন্টারমিডিয়েট এবং মাত্র ১% ছাত্র মাধ্যমিকে পড়াশোনা করতে পারবে। কিন্তু ১৯৬০ সালের মধ্যে সাদাদের ধারণার চাইতেও দ্বিগুণ প্রাথমিক বিদ্যালয় আফ্রিকায় গড়ে ওঠে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাদের প্রস্তাবনার তিনগুণ।

কিছু অঞ্চলে সরকার নিজ খরচায়ও স্কুল বানাতে অনাগ্রহী, আবার আফ্রিকান কর থেকে মিশনারিদের ভর্তুকি খাইয়ে তাদের দিয়ে কাজ করাতেও অনিচ্ছুক। ওইসব জায়গায় আফ্রিকানরা শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয় আরও বেশি উদ্যমী হয়ে। কেনিয়ায় স্বাধীন চার্চের আদলে স্বাধীন স্কুল স্থাপনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। সত্যি বলতে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওসব স্কুলের উৎসই ছিল স্বাধীন চার্চসমূহ। কেনিয়ার এই স্বাধীন স্কুলগুলো দুটি প্রধান সংগঠনের গোড়াপত্তন করে। কিকুয়ু ইন্ডিপেনডেন্ট স্কুলস অ্যাসোসিয়েশন এবং কিকুয়ু কারিংগা এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে।

বাস্তবে ইউরোপের খ্রিষ্টান মিশনগুলো এসব স্কুলকে ব্যবহার করত মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে। একই কাজ করে স্বাধীন চার্চগুলোও। জন চিলেম্বুয়ে এক্ষেত্রে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার সহযোগী হিসেবে

ছিল যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ব্রাদাররা।

ঔপনিবেশিক আমলে ইসলাম ধর্মও শিক্ষার বিকাশে দারুণ অনুপ্রেরণা জোগায়। উত্তর আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকদের নির্মিত স্কুলের বিকল্প তৈরিতে প্রচুর শ্রম ব্যয় করে মুসলিমরা। আলজেরিয়ার সোসাইটি অব রিফর্মিস্ট উলামা ১৯৩৬ সালে একটি বৃহৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করে। বিদ্যালয়গুলো ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪৫,০০০ আলজেরিয়ান শিশুকে এ প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসে। আর ১৯৪৭ সাল থেকে একটি বড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও পরিচালনা শুরু করে এই সোসাইটি। একইভাবে তিউনিসিয়ায় জনগণের অর্থায়নে গড়ে ওঠে আধুনিক প্রাথমিক মাদরাসা, যাতে প্রায় ৩৫,০০০ শিশুর জায়গা হয়। এটি প্রাথমিক স্কুলে পড়া ছাত্রের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ।

মরক্কোয় জনপ্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম স্কুলগুলোর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। নারী স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি স্কুলের তুলনায়ও অনেক বেশি মেয়েদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় এখানে। ফরাসি ঔপনিবেশিক প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সরকারি প্রতিবেদনে এসব বিদ্যালয়ের তথ্য বাদ রাখত। পরিদর্শকদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করত এগুলোর অস্তিত্ব।

সুদানে "গ্র্যাজুয়েটস' জেনারেল কংগ্রেস" একটি প্রকল্পের অর্থায়ন করে। এটিও শিক্ষাক্ষেত্রে আফ্রিকানদের স্বাবলম্বিতার আরেকটি চমৎকার উদাহরণ। ছাত্র, বণিক ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত "গ্র্যাজুয়েটস' কংগ্রেস" স্কুল নির্মাণের একটি কার্যক্রম শুরু করে। স্বেচ্ছা-অনুদানের মাধ্যমে চার বছরের মধ্যে খোলা হয় একশটি স্কুল। ছোট কিন্তু একই ধরনের আরেকটি দারুণ উদ্যোগ ছিল ১৯৪৭ সালে তাঙ্গানিকার মোয়ানজায় দুই স্কুলবালকের প্রতিষ্ঠা-করা বুগাবো ইউনাইটেড স্কুলবয়েজ অ্যাসোসিয়েশন। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার লক্ষ্যে গড়ে উঠলেও অল্প সময়ের মধ্যে এটি সব বয়সের এক হাজারেরও বেশি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। আগতদের থাকাখাওয়ার জন্য আয়োজকেরা বিশেষ শিবিরও স্থাপন করেছিল। প্রাথমিক সাক্ষরতার বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের।

কিকুয়ু কৃষক বা গা বাজারের নারী কিংবা কেবাইল রাখালরা স্কুল তৈরি ও সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য টাকা সঞ্চয় করে রাখত। এটি ঔপনিবেশিকদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সাথে খুব একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ না। তাদের উদ্দেশ্য তো ছিল মেট্রোপোলে মুনাফা প্রেরণ করা। অর্থকরী-ফসলের মজুরি ও প্রচলিত অন্যান্য অর্থকে তারা স্বদেশে ফেরত পাঠাতে চাইত ভোগ্যপণ্য বিক্রির মাধ্যমে। কিন্তু

এভাবে ছোট ছোট উপায়ে আফ্রিকানরা ঠিক করে নেয় যে, তারা নিজেরা কোন কোন জিনিসকে অগ্রাধিকার দেবে। এই অগ্রাধিকারের তালিকা ঔপনিবেশিকদের থেকে ভিন্ন। ঔপনিবেশিক আমলের পরবর্তী বছরগুলোতে এই ধারা তীব্রতর হয়। স্বায়ত্তশাসনের যুগে দৃশ্যমান হয় শিক্ষার রাজনৈতিক তাৎপর্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর একজন ফরাসি আফ্রিকান সর্বোচ্চ প্যারিসের ফ্রেঞ্চ অ্যাসেম্বলি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত। আর ইংরেজ উপনিবেশের একজন বাসিন্দার সুযোগ ছিল নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য হিসেবে স্থানীয় আইনসভা পর্যন্ত যাওয়ার। এইসব পদ একদমই ক্ষমতাহীন। তার ওপর, কেবল মুষ্টিমেয় কিছু আফ্রিকানের কপালেই জুটত এসব সুযোগ। তথাপি এগুলোই উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। আফ্রিকানদের বিশ্বাস জোগায় যে, শিক্ষার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ওপরে ওঠা সম্ভব। ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত বিষুবীয় আফ্রিকায় আফ্রিকানদের শিক্ষার আরও প্রসারের দাবিতে নেতৃত্ব দেন আফ্রিকান গভর্নর ফেলিক্স ইবুয়ে। এটি ১৯৪০ এর দশকের শেষ দিকের ঘটনা। ফ্রেঞ্চ ওভারসিজ মিনিস্ট্রিতে ঊর্ধ্বতনদের ওপর চাপপ্রয়োগে কিছুটা হলেও সফল হন তিনি। একই সময় এবং পরবর্তীকালেও আইন পরিষদে শিক্ষার বিষয়টি আলোচনায় থাকে আফ্রিকানদের প্রচেষ্টাতেই। আইনসভায় গভর্নরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশরা কতিপয় শিক্ষিত আফ্রিকান এবং কিছু "চীফ" বেছে নিয়েছিল। এমনিতে এরা ছিল গভর্নরের শিরস্ত্রাণের পালকের মতোই। সৌন্দর্যবর্ধন ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু শিক্ষার করুণ দশা নিয়ে অন্তত কথা বলার জন্য হলেও তাদের ওই পদসমূহে থাকাটা দরকারি ছিল।

মোটকথা, পরিমাণগত বিচারে আফ্রিকানরা উপনিবেশক ও ব্রিটিশদের ওপর ভালো রকম চাপ প্রয়োগ করে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যতটুকু অনুমোদিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার সুযোগ আদায় করে নেয় তারা। এ এক গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ফোরক দ্বন্দ্ব, যা আফ্রিকানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে।

দেখা গেছে ব্রিটিশদের উপনিবেশগুলোতে যে শিক্ষিত সমাজ তৈরি হতো, সেটার আকৃতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আয়ত্তের বাইরে। এর কারণ আফ্রিকান জনগণের অবিরত প্রচেষ্টা। অবশ্য এটাও সত্য যে, আফ্রিকানদের দাবি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ফরাসিরা আরও কঠোর ছিল। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অল্পসংখ্যক বাছাইকৃত ক্যাডার তৈরির যে পরিকল্পনা, তা তারা মেনে চলার

চেষ্টা করে। গোল্ড কোস্টের মতো একটি উপনিবেশে যে পরিমাণ আফ্রিকান শিক্ষিত হয়ে ওঠে, নিতান্ত অর্থনীতির সেবায় এত কর্মচারীর দরকার নেই। কিছু উপনিবেশে এত শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্কুল থেকে পাশ করে যে, মাধ্যমিকে স্থান সংকুলানের অভাব দেখা দেয়। গোল্ড কোস্ট ছিল এই তালিকায় একদম প্রথম দিকে। ফলে তারা এরকম চাকরিও পায় না, যেখানে স্কুল-থেকে-অর্জিত মূল্যবোধ কাজে লাগানো যায়। পুঁজিবাদের ফলে আফ্রিকান সমাজের অভ্যন্তরীণ যে শ্রেণীভেদ তৈরি হয়েছে, সেটাও রক্ষা করতে পারে না তারা।

বলা হয়ে থাকে, কোয়ামে এনক্রুমা কনভেনশন পিপলস পার্টিতে সব নিরক্ষরদের এনে একাট্টা করেছেন। এটা রক্ষণশীল শিক্ষায় শিক্ষিত ঘানাবাসীদের বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগ। তারা ভেবেছিল এনক্রুমা বেশি তাড়াহুড়া করছেন। আসলে এনক্রুমার যুববাহিনীর অগ্রসেনানীরা মোটেই নিরক্ষর ছিল না। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেছে। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের ইশতেহার ও এ সম্পর্কিত লেখালেখি পড়তে জানত তারা। কিন্তু তারা মারাত্মক বীতশ্রদ্ধ। কারণ (অন্যান্য আরও বিষয়ের পাশাপাশি) গোল্ড কোস্টের শিক্ষাদীক্ষার দৃশ্যপটে তারা তুলনামূলক বিলম্বে আগমনকারী। কোকোয়া মনোকালচারে সীমাবদ্ধ আফ্রিকান কর্মজগতে তাদের চাকরি-বাকরির কোনো সুযোগ নেই।

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশিকতা টিকিয়ে রাখার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকজনকে শিক্ষাদান করা। কিন্তু আফ্রিকানরা ঔপনিবেশিকদের "অনুমোদিত" এই সংখ্যার চেয়ে আরও বেশি শিক্ষা অর্জনে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ফলে গভীর এক সংকট সৃষ্টি হয়। এ কারণে ব্রিটিশরা বাধ্য হয়ে গোল্ড কোস্ট থেকে তাদের ঔপনিবেশিক পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবতে থাকে। এদিকে ব্রিটিশদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আফ্রিকার স্বাধীনতার সময়ও ত্বরান্বিত হচ্ছিল। ঘানার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার যে শুধুমাত্র স্থানীয় কোনো ব্যাপার ছিল না, তা সকলের জানা। বরং সমগ্র আফ্রিকার জন্য তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আফ্রিকায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের গুরুত্ব এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

গোল্ড কোস্টই একমাত্র উপনিবেশ না, যেখানে শিক্ষা পিরামিডের সংকীর্ণতার কারণে বহুলনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যে এলাকাটি ঔপনিবেশিক যুগে ফেডারেশান অব রোডেশিয়াস অ্যান্ড নিয়াসাল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল, সেখানে প্রাথমিক স্কুল-পাশ শিক্ষার্থী প্রচুর বেড়ে যায়। শিক্ষাবিদরা এই সমস্যা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন ১৯৫০-এর দশকে। তাদের দাবি, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী অতিরিক্ত হয়ে গেছে। যে উপনিবেশে শিক্ষার সুযোগ এতই

নগণ্য, সেখানে কিনা ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর জায়গা হচ্ছে না! তার মানে উপনিবেশবাদ এতই দেউলিয়া ও আফ্রিকাকে এতই অনুন্নত করে দিয়েছিল যে, শিক্ষিতের সংখ্যা একটু বেড়ে গেলেই তাদের আর কোনো কাজে লাগানো যায় না। উপরন্তু, ঔপনিবেশিকরা প্রতিটি অসচ্ছল আফ্রিকানকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, মুখ বুজে মিশনারি শিক্ষা সয়ে নিতে পারলেই কায়িক শ্রমবিহীন চাকরি জুটে যাবে সবার। আর তা হবে আধুনিক সভ্যতায় প্রবেশের পাসপোর্ট। কিন্তু স্কুল পাশ করার পর আফ্রিকান তরুণরা বুঝতে পারে, ওগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বই কিছু না। সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশনের ষষ্ঠ শ্রেণী-উত্তীর্ণ এক ছাত্র নিচের চিঠিটি একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন ১৯৬০ সালে:

> ষষ্ঠ শ্রেণী পাশের পর পুরো একটা বছর আমার বাড়িতে কাটাতে হয়। কারণ পরবর্তী পর্যায়ের পড়াশোনার জন্য কোথাও জায়গা পাচ্ছিলাম না। এ বছরের শুরুতে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কাজই পেলাম না। যদি জানতাম যে আমার লেখাপড়া নিরর্থক, তাহলে আগেই বাবাকে বলতাম যাতে শুধু শুধু আমার পড়াশোনার পেছনে টাকা নষ্ট না করেন।

বোঝাই যায়, এই চিঠির লেখক শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশনের বিরোধী। জেনে হোক বা না জেনে, তিনি উপনিবেশবাদের গভীর দ্বান্দ্বিক শক্তিগুলোর ফল। ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিণামেই তিনি এই অবস্থানে এসেছেন।

স্কুল-পাশ হতাশ লোকজন মাঝেমাঝে অগঠনমূলক উপায়েও তাদের অনুভূতি প্রকাশ করত। যেমন, ১৯৫৮ সালের মধ্যে আইভোরি কোস্টে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বট্‌লনেক সমস্যা দেখা দেয়। আফ্রিকান নেতৃত্ব তখন দিশেহারা। এই প্রেক্ষাপটে আইভোরি কোস্টের যুবকরা ধরে নেয়, তাদের দেশে চাকরি করা ডাহোমিয়ান ও সেনেগালিজরাই আইভোরি কোস্টের শত্রু। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ ধরনের হতাশাজনক পরিস্থিতি আফ্রিকানদের আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে যে, তাদের শত্রু আসলে ঔপনিবেশিক শক্তি। আর এভাবেই আফ্রিকান সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের আন্দোলন আরও গতিশীল হয়।

ঔপনিবেশিকদের সাথে আফ্রিকানদের দ্বন্দ্ব শুধু শিক্ষার সুযোগের পরিমাণ নিয়েই ছিল না, ছিল শিক্ষার মান নিয়েও। দ্বন্দ্বের অন্যতম এক উৎস ছিল ঔপনিবেশিক কৃষিশিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কৃষিনির্ভর একটি মহাদেশের লোকেরা কৃষিশিক্ষার বিরোধিতা করবে,

এমনটা ঔপনিবেশিকরা কল্পনাও করতে পারেনি। সত্যি বলতে, শিক্ষাক্রমকে "আফ্রিকায়ন" করার এসব পদক্ষেপের খোলাখুলি বিরোধিতা করে কিছু আফ্রিকান। মনে হয় যেন নিজেদের অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। যেমন গিনির এক লোক দাবি করেন, মেট্রোপলিটন ফ্রান্সের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে এক চুলও সরে আসা যাবে না। "ফ্রান্সে যেমন মেট্রোপলিটন শিক্ষাক্রম এবং ডিপ্লোমা প্রচলিত, আমরা ঠিক তেমনটাই চাই। কারণ ফ্রান্সে থাকা লোকেরা যেমন ফরাসি, আমরাও তেমনি ফরাসি।", তার দাবি ছিল এমনই। জার্মান আমলে তাঙ্গানিকায়ও আন্দোলন হয়েছিল, যাতে ইউরোপ থেকে সরাসরি কপি-পেস্ট করা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন না আনা হয়। প্রভাবশালী তাঙ্গানিকান আফ্রিকান মার্টিন কায়াম্বা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "যারা মনে করে আফ্রিকানদের সাক্ষরতা দরকার নেই, তারা এর গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতাই বুঝতে পারছে না। আর এভাবেই আফ্রিকার উন্নয়নেরও বিরোধিতা করছে তারা।"

আফ্রিকানদের এমন প্রতিক্রিয়া যে একদমই ন্যায়সংগত, তা বোঝার জন্য ওপরের বিবৃতিগুলো সঠিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে হবে। ঔপনিবেশিক মূল্যব্যবস্থায় কায়িক শ্রমের মূল্য কম এবং হোয়াইট-কলার বা বুদ্ধিবৃত্তিক আমলাতান্ত্রিক কাজের মূল্য বেশি। তার চেয়েও বড় কথা, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কায়িক শ্রমিকদের অনুকূল না। বরং যারা প্রাতিষ্ঠানিক বা "গ্রন্থগত" শিক্ষার অধিকারী, তাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। যে শিক্ষার ফলে সিভিল সার্ভিসে কাজ করে মাসে একশ শিলিং আয় হবে, সেটা বাদ দিয়ে মাটি কেটে বছরে একশ শিলিং আয়ের শিক্ষা কেন নেওয়া উচিত—এটা সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো আফ্রিকানকে বোঝানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। ইউরোপীয়দের এই জাতীয় জ্ঞান প্রচারে আফ্রিকানরা সন্দিহান হয়ে উঠে।

ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকানরা কর সম্পর্কে বেশ সন্দিগ্ধ ছিল। তারা নিজেরাও শুমারি হতে চাইত না, গৃহপালিত মুরগিরও শুমারি করতে দিত না। কারণ পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছিল, এভাবেই ঔপনিবেশিকরা কর নির্ধারণ করে। একইভাবে, শিক্ষার বিভিন্ন সংস্করণ প্রণয়নেও ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার ওপর আস্থা রাখা যায় না। কারণ এই জাতীয় পরিকল্পনার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো আরও নিম্নমানসম্পন্ন শিক্ষা। আর ওই শিক্ষা আরও নির্লজ্জভাবে ত্বরান্বিত করত অনুন্নয়নকে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বাজে উদাহরণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৫৩ সালে বান্টু শিক্ষা আইন। এই আইনের মূল কথা, কায়িক শ্রমই আফ্রিকানদের "সহজাত" কর্ম। তাই এই কাজের জন্যই প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত তাদের। এরও পূর্বে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের

প্রতিষ্ঠিত "খামার স্কুল" বা "প্রারম্ভিক বিদ্যালয়"গুলোরও উদ্দেশ্য ছিল একই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদীরা ওই পরিকল্পনারই অনুসরণ শুরু করে। বাহ্যত, এসকল অ-গ্রন্থগত শিক্ষাকে আফ্রিকার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু আসলে এটি ছিল তথাকথিত হীন জনগোষ্ঠীর জন্য নির্মিত হীন শিক্ষাক্রম, যাতে তারা নিজেদের ওপর হওয়া শোষণ ও জুলুম মেনে নিতে শেখে। আবদু মুমুনি যেমন বলেছেন, "ঔপনিবেশিক শিক্ষা ছিল দাম কমানোর শিক্ষা।" ইউরোপীয় নিরিখে যেটা নিম্ন-মানের শিক্ষা, সেটাই নাকি সীমিত-বুদ্ধির-অধিকারী আফ্রিকানদের জন্য উপযোগী। ফরাসি ঔপনিবেশিক আফ্রিকার শিক্ষাগত সনদপত্র মেট্রোপোলের সমমানের সনদের ধারেকাছেও যেত না। ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকার একজন সরকারি কর্মকর্তা শিক্ষকদের বলেছিলেন, আফ্রিকার "নোংরা বর্বর"দের সাথে নিজেদের তফাত মনে রাখতে। এই বর্বরদেরকে নাকি ব্রিটেন সভ্য করার চেষ্টা করছিল। এজন্যই বিশেষত কৃষিশিক্ষা ছিল এক ধরনের ভাঁওতাবাজি।

তাই কৃষি বা গ্রামীণ শিক্ষার বিরুদ্ধে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীরা অত্যন্ত তিক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামই সর্বস্তরের আফ্রিকানকে সচেতন করে দেয় যে, উপনিবেশবাদের ভিত্তি হলো শোষণ ও বর্ণবাদ। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকায় খামার স্কুলগুলো প্রবল তোপের মুখে পড়ে। ফলে ঔপনিবেশিক সরকার সেগুলো উচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়। তাঙ্গানিকা ও নিয়াসায় উপনিবেশবাদী ও আফ্রিকান জনগণের মধ্যকার বিবাদ ছিল আরও গুরুতর। কারণ কৃষিশিক্ষার বিরোধিতা মানে ঔপনিবেশিক বিভিন্ন কৃষি-উদ্ভাবনেরই (যেমন টেরাসিং) বিরোধিতা করা। এসব পদ্ধতি কারও সাথে কোনোরকম পরামর্শ ব্যতীত এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করেই সেখানকার জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশদের মতে যেগুলো দরকারি কৃষিশিক্ষা, পূর্ব আফ্রিকায় সেগুলো চালু করার জন্য দৃঢ় কিছু পদক্ষেপ নেয় তারা। এমনই একটি পাইলট প্রকল্প ১৯৩০ সালে চালু করা হয় তাঙ্গানিকার নিয়াকাতোতে। এর অংশ হিসেবে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কৃষি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। নয় বছর টিকতে-পারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক আনা হতো ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্র ও স্থানীয়দের প্রতিবাদের কারণে ব্যর্থ হয় এই প্রচেষ্টা। স্কুলটি নতুন ধরনের কৃষিদক্ষতা শেখানোর দাবি করেছিল বটে। পরে এর আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। ইউরোপীয়রা যেটাকে নেটিভদের জন্য "সঠিক মনোভাব" ও "সহজাত ভূমিকা" বলে মনে করে, সেগুলো বাস্তবায়িত করাটাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

আফ্রিকানরা যেহেতু শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন চায়, সেহেতু স্বভাবতই ১৯৪০ এর দশকের শিক্ষানীতি-প্রণয়নকারী কাউন্সিলগুলোয় প্রতিনিধিত্বের দাবি করে তারা। এই দাবি নিজেই একটা বিপ্লব। কারণ পরাধীনদের তো শাসিত হওয়ার কথা। তারা কিনা অংশ নেবে নীতি-নির্ধারণে! তা ছাড়াও, শিক্ষাগত নীতি-নির্ধারণে আফ্রিকানরা শুধু প্রশাসকদেরই আতঙ্কিত করেনি, মিশনারিদের বাড়া ভাতেও ছাই দেয়। আফ্রিকা ভাগ হওয়ার পর থেকে মিশনারিরা ধরেই নিয়েছিল, শিক্ষার দায়িত্বটা উত্তরাধিকারসূত্রে তাদেরই প্রাপ্য। পরাধীন জনগণের স্বাধীনতার আভাস দিচ্ছিল এসব দ্বন্দ্ব। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটা সর্বদাই পটভূমিতে ছিল।

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টাটা যে আফ্রিকানরা সজ্ঞানেই করছিল, এরকম ধারণা ঠিক নয়। এমনকি ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেও এমন লোক খুব কমই ছিল, যারা ক্যালাবার জাতির নেতা এসিয়েনের সাথে গলা মিলিয়ে বলবে: "আমাদের লক্ষ্য নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। শিক্ষা ছাড়া তা অর্জন করা অসম্ভব।"

কিন্তু শিক্ষা (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয়ই) এক শক্তিশালী প্রভাবক। এটিই যুদ্ধোত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতিকে এমনভাবে পরিবর্তন করে দেয়, যার ফলে বেশির ভাগ পরাধীন আফ্রিকান রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে দুই দশকের মধ্যে।

কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইউরোপীয়ও আফ্রিকানদের আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার "বিপদ" আগেই আঁচ করতে পেরেছিল: আর তা হলো তাদের স্বাধীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় ধাঁচের হলেও সরাসরি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে না, এরকম স্কুলগুলো নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ বিরাজ করত। যেমন, কেনিয়ার স্বাধীন স্কুলগুলো সেখানকার শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের তো বটেই, কেনিয়ার বাইরের অন্য ইউরোপীয়দেরও অপছন্দের ছিল। প্রতিবেশী তাঙ্গানিকার একটি ক্যাথোলিক মিশনের ১৯৩৩ সালের প্রতিবেদন সতর্কবাণী দেয়, তাঙ্গানিকার আফ্রিকানদের যেন স্বাধীন স্কুল বানাতে না দেওয়া হয়। বলে: "স্বতন্ত্র স্কুলগুলো কেনিয়াতে জটিল অবস্থা সৃষ্টি করছে। এ ধরনের স্কুল সহজেই রাষ্ট্রদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে পারে।"

কেনিয়ায় ভূমি ও স্বাধীনতার জন্য মাউ মাউ যুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার প্রথমেই কিকুয়ু ইন্ডিপেনডেন্ট স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের ১৪৯টি স্কুল, কিকুয়ু করিঙ্গা এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের একুশটি এবং আরও চৌদ্দটি স্বতন্ত্র স্কুল বন্ধ করে দেয়। এগুলোকে "বিদ্রোহের প্রশিক্ষণক্ষেত্র" হিসেবে আখ্যায়িত

করা হয়, যা ক্যাথোলিক মিশন রিপোর্টে প্রকাশিত শঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপীয়রা ভালোভাবেই জানত যে, আফ্রিকানদের চিন্তাভাবনা বা মন-মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করেতে না পারলে অচিরেই তারা তাদের শারীরিক ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেও ব্যর্থ হবে।

একইভাবে, উত্তর আফ্রিকার পরাধীন আলজেরীয় ও তিউনিসীয়দের স্বাধীন স্কুলগুলোকেও ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তি ও শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা সহজভাবে নেয়নি। আলজেরিয়ার সোসাইটি অব রিফর্মিষ্ট উলামা যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে, সেগুলোর উদ্দেশ্য শুধু আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই নয়; বরং আরব ও আলজেরীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সেই শিক্ষা প্রদান করা। উলামা স্কুলের ছাত্ররা তাদের পাঠ শুরুর আগে একসাথে গান গাইত : "আরবি আমার ভাষা, আলজেরিয়া আমার দেশ, ইসলাম আমার ধর্ম।" তাই স্বভাবতই উপনিবেশকরা স্কুলগুলোকে রাষ্ট্রদ্রোহের কেন্দ্রস্থল দেখিয়ে ছাত্র ও অভিভাবকদের দমন-পীড়ন করে।

মিশনারিরা স্কুলগুলোর নিয়ন্ত্রণ চাওয়ার একটি কারণ ছিল এর মাধ্যমে চার্চের প্রচারণা বাড়ানো। এবং তারা নিজেদের ভাবত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের (তাদের ভাষায় "সভ্যকরণ") বিশেষজ্ঞ। কিন্তু উপনিবেশের ভেতর-বাইরের কিছু ইউরোপীয় ছিল পুরোদমে স্কুলবিরোধী—সেই স্কুল খ্রিষ্টান, স্বাধীন বা ইসলামি যা-ই হোক না কেন। এর কারণটা বর্ণবাদী। তাদের দাবি, আফ্রিকানদের শিক্ষা দেওয়া মানে শুয়োরের দিকে মুক্তো নিক্ষেপ। সবচেয়ে মারাত্মক বর্ণবাদী মন্তব্যগুলো করা হয় শিক্ষিত আফ্রিকানদের লক্ষ্য করে। লর্ড লুগার্ডের সময় থেকে শুরু করে শেষ ঔপনিবেশিক প্রশাসক স্যার অ্যালান বার্নসের সময়কাল পর্যন্ত শিক্ষিত আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব প্রকাশ করে অসংখ্য উপনিবেশক। শিক্ষিত আফ্রিকানরা উপনিবেশকদের অত্যন্ত অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। কারণ ইউরোপীয়রা "শিশুসুলভ জংলি আফ্রিকান"-এর যে চিত্র কল্পনা করত, তার সাথে এদের মেলানো যায় না।

কিন্তু খতিয়ে দেখলে অন্য বিষয় বেরিয়ে আসে। ইউরোপ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আফ্রিকানরা জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম—এরকম কোনো বিশ্বাস কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীরা পোষণ করত না। শিক্ষিত আফ্রিকানদের চাক্ষুষ প্রমাণ তো তারা দেখছেই। শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের আশঙ্কা, সুযোগ পেলে আফ্রিকানরা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করে ফেলবে শ্বেতাঙ্গ বুর্জোয়া জ্ঞান। এই আফ্রিকানরা তখন আর প্রতি মাসে বারো শিলিং-এর বিনিময়ে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে চাইবে না। আংশিক-দক্ষতা প্রয়োজন, এমন

ক্ষেত্রে তারা ইউরোপীয়দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সর্বোপরি, দাবি করবে স্বাধীনতা।

"নেটিভদের শিক্ষিত করার দরকার কী? তাদের হাতে এমন অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন, যা দিয়ে তারা আপনাকেই কতল করবে!"—ঔপনিবেশিক নথিপত্রে এহেন মন্তব্যের দেখা মেলে অহরহ।

এক অর্থে, ওই ইউরোপীয়রা স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা। কারণ আফ্রিকানদের শিক্ষাদান এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। উপনিবেশবাদ কার্যকর রাখার জন্য এটি ছিল নৈর্ব্যক্তিক প্রয়োজনীয়তা। পি.ই. মিশেল (পরবর্তীকালে উগান্ডার গভর্নর) ১৯২৮ সালে মন্তব্য করেছিলেন, "বেচারা যতই আফসোস করুক, কোনো শিক্ষামন্ত্রী কেরানি, কাঠমিস্ত্রি, মুচি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারবে না। ইউরোপের দরকারেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে এদের। এই মানুষগুলোকে তাদের নিজেদের জনজীবনের জন্যে নয়, বরঞ্চ একটি বিদেশি জাতির অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।"

আবার, বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ওইসব আফ্রিকানের অদম্য চেষ্টারও ফসল, যারা এই বিদেশি ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই এগিয়ে যেতে আশাবাদী। তাই যে ইউরোপীয়রা আফ্রিকানদের শিক্ষিত করার ঘোরতর বিরোধী, তারা নিজেরাই নিজেদের ঔপনিবেশিক সমাজের দ্বন্দ্ব বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু অন্য অর্থে তারা আবার উপনিবেশবাদের স্বার্থই রক্ষা করছিল। প্রথমত, যতই চেষ্টা করুক না কেন, উপনিবেশবাদীরা স্কুলপড়ুয়া সব আফ্রিকানদের চিন্তা-চেতনাকে দখল করতে পারেনি। এই ব্যতিক্রমেরাই উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে চলেছে। দ্বিতীয়ত, পোষমানা ও মগজধোলাই-খাওয়া শিক্ষিত আফ্রিকানরাও উপনিবেশকদের সাথে কিছু বিষয়ে মতবিরোধ পোষণ করে। নিজ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিস্বার্থে এই শিক্ষিত অভিজাতরা ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর আসল রূপ উন্মোচিত করে দিতে সহায়তা করে।

উপর্যুক্ত পার্থক্য মাথায় রেখে দুইরকম দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একটা হলো উপনিবেশক ও সমগ্র আফ্রিকান শিক্ষিত গোষ্ঠীর মাঝে। আরেকটি উপনিবেশিক ও শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিবিশেষের মাঝে।

আগেই বলেছি, অপর্যাপ্ত সুযোগ ও চাকরির অপ্রতুলতা নিয়ে অভিযোগ তুলছিল সেসব আফ্রিকান, যারা ঔপনিবেশিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। যারা মাধ্যমিক স্কুল বা আরও উঁচু স্তরের পড়াশোনা করেছিল, তারাও যোগ্যতা অনুসারে চাকরি পেত না। কারণ সরকারি ও বাণিজ্যিক চাকরির নিচু

পদগুলোই আফ্রিকানদের নিয়তি। আর বিশ বছর টানা একই পদে চাকরির পর অতি সৌভাগ্যবান হলে কোনো কোনো আফ্রিকান হয়তো "হেড ক্লার্ক" বা পুলিশের সার্জেন্ট হতে পারত। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হয়ে ছিল ইউরোপীয়দের পাওয়া অসম বাড়তি সুবিধা। একই পদে থেকেও আফ্রিকানদের চেয়ে তারা পেত বেশি বেতন। অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা কম থাকা সত্ত্বেও সাদাদেরই পদোন্নতি হতো সবসময়। আবার উঁচু পদে থেকে বেতন নেয়া ইউরোপীয়দের অনেক কাজই নিচু পদের আফ্রিকানরা বিনামূল্যে করে দিত। আফ্রিকায় মোটা ও ব্যাপক সুবিধাসম্পন্ন সরকারি চাকরির জন্য ইউরোপীয় হলেই যথেষ্ট। অশিক্ষিত বা বেকুব হলেও সমস্যা নেই। গিনি বিসাউয়ের নেতা আমেলকার কাব্রাল এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

একবার কৃষিবিদ হিসেবে আমি এক ইউরোপীয়-এর অধীনে কাজ করেছিলাম। সেই লোককে পুরো গিনির সবাই মহা আহাম্মক হিসেবে জানত। আমি চোখ বন্ধ করেই তাকে তার কাজ শিখিয়ে দেয়ার যোগ্যতা রাখি। অথচ এই লোকটিই কিনা ছিল আমার বস! ব্যাপারটা হেলাফেলা করার মতো কিছু না তো। এখানেই সত্যিকারের দ্বন্দ্ব।

বেশির ভাগ আফ্রিকান সিভিল সার্ভেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, কল্যাণ সংস্থা বা "ইমপ্রুভমেন্ট" অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সর্বাধিক আগ্রহের বিষয় ছিল বেতন, পদোন্নতি, ছুটি ও ভাতা। স্বার্থ যে একটা কারণ, তা অস্বীকারের জো নেই। তবে তাদের অভিযোগগুলো ন্যায়সংগত। কারণ তাদের জীবনযাত্রার মানের সাথে শ্বেতাঙ্গ প্রবাসী বা অভিবাসীদের বিরাট ফারাক বিদ্যমান। আবার, আফ্রিকাকে উপনিবেশ বানানো বুর্জোয়াদের আদর্শও এখানে দায়ী। শিক্ষিত হওয়ার বদৌলতে অল্প কিছু আফ্রিকান এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গন ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে পরিচিত। উপনিবেশগুলোতে ওইসব গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বুলি একদমই অনুপস্থিত। ফলে স্বভাবতই জাতীয় স্বাধীনতার দাবি অর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আফ্রিকার শিক্ষিত-শ্রেণী। অনেক আগেই একই কাজ করেছে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষিত-শ্রেণীও।

স্পেনের সরকারি সূত্রমতে, স্পেন-অধিকৃত গিনির স্কুল ব্যবস্থা পরিচালিত হতো উপনিবেশকদের প্রত্যাশামতেই। এসব স্কুল থেকে এমন সব ছাত্র বের হতো, যাদের স্প্যানিশপ্রীতি স্বয়ং স্প্যানিশদের চাইতেও বেশি। সেখানে নাকি ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী কোনো ব্যক্তি তৈরি হয়নি। অবশ্য এমন বিবৃতি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। কারণ পিচ্চি স্প্যানিশ উপনিবেশগুলোতে কী চলে, তার সামান্য নমুনাও যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে—এ ব্যাপারে তারা

ছিল খুব সচেতন। কিন্তু স্প্যানিশ গিনিতে যদি শুধু স্পেনের পরিকল্পনামাফিক সাদা আফ্রিকানই তৈরি হয়ে থাকত, তাহলে তা হতো এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। কারণ, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় বড় পরিসরে সফল হলেও, কোথাও কখনোই সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। পরিকল্পনামাফিক প্রচুর "বিশ্বস্ত কিকুয়ু", "ইংরেজপ্রেমী", এবং "ফরাসিপ্রেমী" তৈরি হয়েছে বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কিছু আফ্রিকানও তৈরি হয়েছে, যারা উপনিবেশকদের ভাষ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, বিদ্রোহী, কমিউনিস্ট, সন্ত্রাসী।

ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, পড়াশোনা শেষ করার আগেই সমস্যা শুরু করত বহু আফ্রিকান ছাত্র। যেমন, সুদানে জাতীয়তাবাদী ছাত্র বিক্ষোভের ইতিহাস রয়েছে। আর মাদাগাস্কার তো এক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ। এই শতাব্দীর শুরুর দিককার বছর থেকে মাদাগাস্কারে ক্রমবর্ধমান একটি রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন চলে। দুই ফরাসি গভর্নরের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও একে দমন করা যায়নি। মালাগাসি ছাত্ররা ফ্রেঞ্চদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১৮১৬ সালের মধ্যে ভি ভাটো সোসাইটি সংগঠিত করে। ভি ভাটোর অস্তিত্ব উদ্ঘাটনের পর ছাত্রদের নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রায়শ যা ঘটে, এখানেও হয়েছে তা-ই। অন্য ছাত্ররা তাদের সাথিদের আত্মবলিদান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ায়।

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক প্রভুরা আফ্রিকার কিছু ছাত্রকে নিয়ে যেত মেট্রোপোলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এরাই ছিল ঔপনিবেশিকদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের ও আদরের দুলাল। আর এভাবে এসব ছাত্রকে ইউরোপীয়দের আদলে গড়ে তোলা হয়। তবুও তারাই সর্বপ্রথম মৌখিক ও যৌক্তিকভাবে দাবি জানায় যে—স্বাধীনতা, সাম্য, ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে তাদের যা শেখানো হয়েছে, আফ্রিকাতেও সেসব প্রয়োগ করা উচিত। যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে ফ্রান্সে আফ্রিকান ছাত্রদের সতর্কতার সাথে তৎকালীন রক্ষণশীল ফরাসি জাতীয় ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন পদে রাখা হয়। কিন্তু শীঘ্রই তারা বিদ্রোহ করে এবং ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অব ব্ল্যাক আফ্রিকা (FEANF) গঠন করে। এটি পরে যোগ দেয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের সাথে। ব্রিটেনে আফ্রিকান ছাত্ররা গঠন করে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদী সংগঠন। অংশগ্রহণ করে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে। তাদের বেশির ভাগকে তো ব্রিটিশ সংবিধান এবং সাংবিধানিক আইন অধ্যয়ন করার জন্যই সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আর যেহেতু "স্বাধীনতা" শব্দটি প্রায়শই এসব পড়ালেখায় চলে আসে, এর ভালোই প্রতিদান ব্রিটিশরা পেয়ে যায় শীঘ্রই!

ঔপনিবেশিক যুগে কিছুকাল আফ্রিকানদের শাসন করে ফ্যাসিবাদীরা। তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। যেমন, ইটালীয় ফ্যাসিবাদীরা ১৯২২ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সোমালিয়ার দায়িত্বে ছিল। তারা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইটালীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণতান্ত্রিক শাখার দুই প্রধান নেতা ম্যাজিনি এবং গ্যারিবাল্ডি সম্পর্কিত সব তথ্য সরিয়ে ফেলে। তথাপি সে শিক্ষা গ্রহণকারী কেরানি ও এনসিওরা সোমালি যুবলীগে গিয়ে জনগণের নেতা হয়ে ওঠে। নেতৃত্ব দেয় স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে।

সত্যি বলতে, ইউরোপীয় বই থেকে স্বাধীনতার ধারণা নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ইউরোপীয় স্কুল থেকে আফ্রিকানরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে মাত্র। কিন্তু স্বাধীনতার দাবি তোলার জন্য তাদের সহজাত প্রবণতাই ছিল যথেষ্ট, যেমনটি সোমালিদের উদাহরণে বলা হলো। আফ্রিকানদের মধ্যে স্বাধীনতা অন্বেষণের সর্বজনীন আকুলতা প্রকাশ পায়। এটা নস্যাতের জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও কোনো লাভ হয়নি।

ঔপনিবেশিক জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে শিক্ষিত আফ্রিকানরা উপনিবেশকদের প্রতি পুরোপুরি অনুগত থেকেছে। শিক্ষকরাই আধিপত্যের সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশি ডুবে থাকার ও অন্য আফ্রিকানদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ায়। আফ্রিকান যাজক ও পুরোহিতদেরও হওয়ার কথা ছিল ঈশ্বরের ও তাঁর অনুগত ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের বিশ্বস্ত সেবক। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে চার্চ থেকেই নিয়াসাল্যান্ডে জন চিলেম্বুইয়ের মতো বিপ্লবীর জন্ম হয়। কঙ্গোতে অল্পদিন পরেই সাইমন কিমবাঙ্গু তার নিজের স্বাধীন চার্চের যাত্রা শুরু করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি মূলত বলশেভিক মতবাদ চালুর হুমকি ছুড়ে দেন উপনিবেশকদের দিকে!

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, উপনিবেশবাদীরা কখনোই তাদের নিয়োজিত আফ্রিকান সৈন্যদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, উপনিবেশবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি এবং মূল্যবোধকে স্থায়ী করার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। এ কাজ কতটা সফলতার সাথে তারা সম্পন্ন করেছিল, তা বার্মা ও ইন্দোচীনের যুদ্ধফেরত সৈনিকদের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। তারা নিষ্ঠার সাথে যথাক্রমে ব্রিটেন

ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আফ্রিকায় ফিরে আসে। এ প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের কর্নেল বোকাসা এবং উচ্চতর ভোল্টার কর্নেল লামিজানা। উভয়েই ভিয়েতনামিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শেষমেশ দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিবাদী ও বর্ণবাদী সরকারের সাথে সংলাপে রাজি হওয়ার মতো পর্যায়ে উপনীত হন। তবুও পরবর্তীকালের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে এই যুদ্ধফেরত সৈন্যেরা। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে মাঝেমধ্যে আফ্রিকান সৈন্য ও পুলিশেরা বিদ্রোহও করে বসে, যেমনটা নিয়াসাল্যান্ডে ঘটেছিল ১৯৫৯ সালে।

আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নবাদীরাও ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন "স্কুলে" গিয়েছিল। আফ্রিকার ক্ষুদ্র মজুরি-উপার্জনকারীদের সংগঠন ও কার্যকলাপ উপনিবেশবাদীদের বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। তাদের প্রাথমিক অভিপ্রায় ছিল শ্রমিকবিদ্রোহকে একদম গুঁড়িয়ে দেওয়া। যখন দেখা গেল তা সফল হচ্ছে না, তখন তারা বিদ্রোহীদের কাছে টেনে নেয় এবং "গ্রহণযোগ্য" পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে।

ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল অনেকগুলো আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তাদের শেখানোর চেষ্টা করে যে, শিল্প-সম্পর্কিত বিষয় (যেমন মজুরি ও কর্মঘণ্টা) ও রাজনৈতিক বিষয় একদম আলাদা। কিন্তু TUC তখনকার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের পক্ষে কাজ করছিল। তারা আফ্রিকায় শ্রমিক-শ্রেণীকে আটকে রাখতে পারেনি। বেসরকারি নিয়োগকর্তা এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মধ্যে যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই, তা আফ্রিকান শ্রমিকরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বস্তুত ঔপনিবেশিক প্রশাসন নিজেই অন্যতম বৃহৎ নিয়োগদাতা, যেটার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অনেক অভিযোগ ছিল। পরিণামে ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অহরহ চলতে থাকে শ্রমিকদের ধর্মঘট। বিশেষত গোল্ড কোস্ট, নাইজেরিয়া ও সুদানে।

ফরাসি উপনিবেশগুলোতে ফরাসি শ্রমিক ও আফ্রিকান শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফরাসি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (বিশেষত কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, CGT) দাবি করে, আফ্রিকানদের আলাদা ইউনিয়ন থাকা উচিত নয়। বরং তাদেরও ফরাসি শ্রমিক ইউনিয়নেরই সদস্য হওয়া উচিত। এটা মেনে নেওয়া মানে ফ্রান্সের প্রচারিত সেই রাজনৈতিক কল্পকাহিনিকেই সমর্থন দেওয়া। তা এই যে, ডাহোমি এবং কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের মতো স্থানগুলো ফ্রান্সের উপনিবেশ না, বরং অংশ। ফরাসি ট্রেড ইউনিয়নের খবরদারি ভেঙে

একটি স্বাধীন আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা প্রথম ব্যক্তি গিনির সেকু তুরে। এর মাধ্যমে সেকু তুরে স্পষ্ট করে দেন যে, পরাধীন জনগণ ও উপনিবেশক জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্বই ঔপনিবেশিক অবস্থার মুখ্য দ্বন্দ্ব। সুতরাং যতদিন আফ্রিকান শ্রমিকরা পরাধীন থাকবে, ততদিন তাদের প্রথম পরিচয় হবে আফ্রিকান শ্রমিক; আন্তর্জাতিক প্রোলেতারিয়েতের সদস্য পরিচয়টি আসবে পরে।

এই ব্যাখ্যা বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে ফরাসি-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অত্যন্ত রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্বেতাঙ্গ ফরাসি শ্রমিকদের জাত্যাভিমান ও ফরাসি বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধিকে ব্যর্থ করে দেয় এই ভূমিকা।

আফ্রিকান সহকর্মীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মেট্রোপলিটন শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত বর্ণবাদী মূল্যবোধ দিয়ে প্রভাবিত। উপনিবেশ ও উপনিবেশিতের মধ্যে বিদ্যমান মূল দ্বন্দ্বকে আরও জোরালো করে বর্ণবাদ। প্রতিটি উপনিবেশেই বৈষম্যমূলক বর্ণবাদী পদ্ধতি ও ব্যবস্থার চল ছিল। কোথাও খোলাখুলি, কোথাও কপটভাবে। শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ কখনো পৈশাচিক, কখনো অযাচিত অভিভাবকসুলভ। বর্ণবাদ সর্বক্ষেত্রেই ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিকভাবে লোভের প্রতিফলন নয়। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বর্ণবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের চাকরি ও চুরি-করা জমি রক্ষা। কিন্তু মাঝেমাঝে বোনাস হিসেবে থাকত আধা-শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ দারোগার হাতে শিক্ষিত সিয়েরা লিওনিজকে করা অপমান। এসব ক্ষেত্রে বর্ণবাদ আসলে অর্থনৈতিক শোষণকে উপকৃত করে না। এ কেবল কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা কুসংস্কারের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বর্ণবাদী দ্বন্দ্ব শুধু আফ্রিকার উপকূলেই সীমাবদ্ধ না। এর কারণ অতীতে দাসব্যবসার ইতিহাস। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ও উত্তর আমেরিকানদেরও যে জোরেসোরে সর্ব-আফ্রিকানবাদী মত প্রচার করতে হয়েছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গার্ভে ও প্যাডমোর এবং উত্তর আমেরিকার ডব্লিউও.ই.বি. দু বোই ও আলফিয়াস হান্টন এরকম উদাহরণ। শ্রেণী ও বর্ণের ভিত্তিতে শোষণ করে আসছিল যে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী কাঠামো, তার মধ্যে থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন এসকল ব্যক্তি। তারা উপলব্ধি করেন যে, কালো চামড়া ও আফ্রিকার দুর্বলতার কারণেই আমেরিকান সমাজে তাদের অবস্থান নিচু। তাই সর্ব-আফ্রিকানবাদীরা আফ্রিকা মহাদেশের ওপর ইউরোপের শোষণ ও নিপীড়নের মতো কেন্দ্রীয় সমস্যাটি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হন। বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, নতুন

বিশ্বে লাখ লাখ আফ্রিকানদের সাথে করা অপমান শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হবে এবং তা আফ্রিকাকে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করবে।

যে প্রক্রিয়ায় আফ্রিকা ত্রিশটির বেশি সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরি করে, তা ছিল অত্যন্ত জটিল। আফ্রিকান বিভিন্ন গোষ্ঠী, ঔপনিবেশিক শক্তি, মেট্রোপোলের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপ, তাদের শক্তি, স্বার্থ প্রভৃতি এক্ষেত্রে পারস্পরিক ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান, ভারত ও চীনের স্বাধীনতা, ইন্দোচীনে জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বান্দুং সম্মেলনের মতো আন্তর্জাতিক ঘটনা দিয়ে প্রভাবিত হয় আফ্রিকার স্বাধীনতা। আফ্রিকা মহাদেশের ভেতরেই চলতে থাকে "ডমিনো তত্ত্ব"। নাসেরের অধীনে মিশরের পুনরুত্থান, ঘানা, সুদান ও গিনির দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন, এবং কেনিয়া ও আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ বাকি উপনিবেশগুলোকেও ধ্বংস করতে সাহায্য করে। কিন্তু জোর দিয়ে বলতে হয় যে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেছে আফ্রিকান জনগণ। সে উদ্দেশ্য যেটুকুই বাস্তবায়িত হোক না কেন, জনগণ যে এর চালিকাশক্তি ছিল—তা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

ব্রাজাভিলে ১৯৪৮ সালে ফরাসিদের আয়োজিত একটি সম্মেলনে (এবং জেনারেল ডি গলের সভাপতিত্বে) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, "দূরবর্তী ভবিষ্যতেও উপনিবেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন ঠেকাতে হবে।" সবাই জানে, আলজেরিয়ার জনগণের কাছে একটা উচিত শিক্ষা পাওয়ার পর ফরাসিরা আফ্রিকান জনগণের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনে। উপরন্তু, স্থায়ীভাবে ফ্রান্সের পদসেবী হওয়ার পরিবর্তে ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতার পথ বেছে নেয় গিনি। তখন ফরাসি প্রশাসকরা আক্ষরিক অর্থেই উন্মাদ হয়ে যায়। জাহাজে চড়ে গিনি ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত বলা যায় বন্য শূকরের মতো আচরণ করছিল তারা। আফ্রিকানরা স্বাধীনতা অর্জন করবে, এ বাস্তবতা তারা হজম করতে পারেনি।

পর্তুগিজদের কথা বাদ দিলে, আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের মুখে সেখান থেকে প্রস্থানে সবচেয়ে বেশি অনাগ্রহী ছিল বেলজিয়ান উপনিবেশকরা। একজন বেলজিয়ান অধ্যাপক ১৯৫৫ সালে সুপারিশ করেন, কঙ্গোকে ত্রিশ বছরের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এর ফলে তাকে উগ্রবাদী আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য কঙ্গোতে সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকান বিপ্লব ছিনতাই করে নিতে সফল হয়। কিন্তু তবু এখানে ঘটনাক্রম বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, কঙ্গোলিজ ও আফ্রিকানদের কঠিন সব দাবিদাওয়ার কারণেই স্বাধীনতার প্রশ্নটি আর অকল্পনীয়

থাকেনি। এবং দ্বিতীয়ত, লুমাম্বার অধীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে শক্তি ও সম্ভাবনা ছিল, এরই ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা হত্যা ও আক্রমণের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

ব্রিটিশরা খুব বড়াই করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর তারাই সবার আগে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা প্রসব করে। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অনেক ফারাক। স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ঘোষণাটা চটকদার রাজনৈতিক কৌশল বই কিছু ছিল না। উপনিবেশবাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এক কণ্ঠস্বর ছিলেন লেডি মার্জারি পারহাম। তিনি স্বীকার করেন যে, আফ্রিকান জনগণ বেশ সুসংহত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসন যে সময়সূচি অনুমান করে রেখেছিল, তা বাতিল করতে হবে। গণমানুষ এভাবেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের মতো ধেয়ে আসতে থাকে। এর আগ পর্যন্ত এমনকি আফ্রিকান নেতারাও ভাবতে পারেনি যে, এত তাড়াতাড়ি জাতীয় সার্বভৌমত্ব হাসিল হয়ে যাবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু শিক্ষিত আফ্রিকানদের ভূমিকাই আলোচনা করা হয়েছে এ পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণ আফ্রিকানদের অবদানকে খর্ব করা মোটেও এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তারা ভূমিকা রেখেছে জীবন ও সর্বস্ব দিয়ে। সংক্ষেপে এটা বলাই যথেষ্ট যে, গোটা আফ্রিকান জাতিই উপনিবেশবাদীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়। কথাটা অতি-রোমান্টিক মনে হতে পারে। উনিশশ ষাটের দশকের শুরুতে আফ্রিকান স্বাধীনতা নিয়ে এসব মনোহারী কথাবার্তা বলা হতো। কিন্তু নব্য-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার দুঃখজনক বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থেকেও এই দাবি করাই যায়। এমনকি (বিপ্লবী, সমাজতান্ত্রিক এবং জন-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে) শুধুমাত্র "পতাকার স্বাধীনতাও" ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভাঙার পথে এক ইতিবাচক অগ্রগতি।

সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাটা আফ্রিকান স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার-প্রক্রিয়ার একটি মাত্র পর্যায়। আফ্রিকাকে যখন ১৮৮৫ সালের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে ভাগাভাগি করা হয়, তখনই জনগণ ও সমাজব্যবস্থা তাদের অনেকখানি স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল। বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আফ্রিকা তার নিজস্ব অর্থনীতির ওপর অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ হারায়। কিন্তু স্ক্র্যাম্বলের সময় রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হারানোটাই ছিল চূড়ান্ত আঘাত। তার মানে ১৯৬০ সালের মধ্যে যে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার হয়, তা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এরই হাত ধরে আসবে সকল পরিমণ্ডলের উন্নয়ন।

উপরন্তু, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবকালীন কিছু সংখ্যালঘু মতাদর্শিক প্রবণতার উত্থান হয়। এগুলো আফ্রিকান ভবিষ্যৎ উন্নয়নের শেকড়। বুদ্ধিজীবী ও এমনকি শ্রমিক আন্দোলনের বেশির ভাগ আফ্রিকান নেতা প্রকাশ্যে পুঁজিবাদী ছিল। বুর্জোয়া প্রভুদের মতাদর্শ পুরোদমে ধারণ করত তারা। ফরাসি উপনিবেশকরা একসময় ফেলিক্স হুফয় বনিকে পর্যন্ত "কমিউনিস্ট" নামে আখ্যা দেয়! তিনি ১৯৪৮ সালে জোরালোভাবে এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন :

"এটা সত্য যে, [ফরাসি] কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তার মানে মোটেও এই নয় যে, আমরা নিজেরাই কমিউনিস্ট। আমি, হুফয় বনি সনাতন নেতা, মেডিসিনের ডাক্তার, অঢেল সম্পত্তির মালিক, একজন ক্যাথোলিক—আমি আবার কমিউনিস্ট হই কীভাবে?"

হুফয় বনির যুক্তি স্বাধীন যুগের আরও অনেক আফ্রিকান নেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম তারাই, যারা হয় পুঁজিবাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে, অথবা কিছু বুর্জোয়া নীতিতে (যেমন, ব্যক্তিস্বাধীনতা) সততার সাথে অনড় থাকে। সময়ের সাথে সাথে তারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ হয় এমন সমাজে এসব আদর্শ রূপকথার বুলির মতো। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঔপনিবেশিক শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্য ছিল, প্রথাবিরোধী সব নেতাই সেগুলোর সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত। উপনিবেশকদের সাথে তাদের মতপার্থক্য এতই গভীর যে, শুধুমাত্র "পতাকার স্বাধীনতা" দিয়ে সেসবের সমাধান সম্ভব নয়।

আড়ম্বর, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান সংগীত ও নৃত্যের পুনরুত্থানের মাধ্যমে আফ্রিকান স্বাধীনতাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। সে-সময়ের কতিপয় নিত্যকার বুলি ছিল—"নতুন দিনের সূচনা", "আমরা নতুন এক যুগের দ্বারপ্রান্তে", "আমরা এখন রাজনৈতিক রাজ্যে প্রবেশ করেছি"... ইত্যাদি। সস্তা হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এসবের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। কিন্তু কোটোনৌ থেকে প্যারিস এবং লন্ডন থেকে লুসাকা পর্যন্ত এত আসা-যাওয়া, এতসব পতাকা নামানো-উত্তোলন সবই অর্থহীন না। রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন কোনো বিকল্প উত্থাপন করার আগে উপনিবেশকদের সরাসরি সামরিক ও রাজনৈতিক উপস্থিতি প্রত্যাহার করে নেওয়া আবশ্যক ছিল।

ওপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু আফ্রিকান নেতা। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। তাই উন্নয়নের জন্য এক অ-পুঁজিবাদী পথে যাত্রা করেছে তারা। বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে এসকল

সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এ সমস্যাগুলো শুধু আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে নয়, আফ্রিকার অভ্যন্তরেও বিদ্যমান। চার শতাব্দীর দাসপ্রথা এবং এক শতাব্দীর উপনিবেশবাদের ফলে এগুলোর সৃষ্টি। প্রকাশ্য বিদেশি শাসন অপসৃত হয়েছে। এখন কৃষক ও শ্রমিকদের ওপর হওয়া শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আরও মৌলিকভাবে কাজ করা যাবে। এমনকি ক্যামেরুনের মতো অঞ্চলে যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা কৃষক-শ্রমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে নিজেদের পুতুল শাসকদের নিয়োগ দিয়ে গিয়েছিল, সেখানেও জনগণের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই সেই সচেতন কর্মকাণ্ড, যা বস্তুগত অবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের ঐতিহ্যকে বোঝার মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টির সক্ষমতা রাখে।

বিস্তারিত দেখুন :

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, যেগুলোকে ইতিহাস পুনর্নির্মাণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এমনকি যারা আফ্রিকান ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ না, তাদের প্রতিও পরামর্শ থাকবে কিছু মৌলিক উৎসতে চোখ বোলানোর জন্য। যেমন, লর্ড হেইলির সংকলিত উপাত্ত। মনোযোগ দিয়ে পড়লে কিছু নৃবৈজ্ঞানিক বই থেকেও বেরিয়ে আসবে আফ্রিকান সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও বিশ্লেষণ।

কিন্তু সর্বোপরি, যেসব প্রজন্ম উপনিবেশবাদের অধীনে নিষ্পেষিত হয়েছিল, তারাই এখনো মহাদেশটির ইতিহাসের জলজ্যান্ত উৎস। আফ্রিকান জনমানুষ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে সামষ্টিক জ্ঞান অর্জন করেছে, তা ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে সহিহ সংকলন। দুর্ভাগ্যবশত, এসকল অভিজ্ঞতার বেশির ভাগ অংশই এখনো লিখিত রূপ লাভ করেনি। তবে প্রসিদ্ধ কিছু আফ্রিকানের জীবনী থেকে এর কিছু-না-কিছু ঝলক দেখা যায়। যেমন : নামদি আযিকিউয়ে, কোয়ামে এনক্রুমা, ওগিংগা ওদিংগা, এবং কেনেথ কাউন্দা। আরও আছে তাদের ও অন্য নেতাদের রাজনৈতিক লেখালেখি—বিশেষ করে মোয়ালিমু নিয়েরেরে এবং সেকু তুরের। অধ্যায় ৫-এর পাঠ্যতালিকায় প্যাডমোর ও হান্টনের যে বইগুলোর কথা বলা হলো, সেগুলো এই প্রেক্ষাপটে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

জ্যাক ওডিস, *আফ্রিকা, দ্য রুটস অব রিভল্ট*। লন্ডন : লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, ১৯৬১।

ঐ, আফ্রিকা, দ্য লায়ন অ্যাওয়েকস।

গ্যান, এল.এইচ. দুইঙ্গান, *পিটার, দ্য বার্ডেন অব এম্পায়ার*। নিউ ইয়র্ক : প্রেজার, ১৯৬৭।

উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনে আফ্রিকানদের সমর্থক হিসেবে প্রথম লেখক ও তার লেখালেখি বেশ বিখ্যাত। দ্বিতীয়টি উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ

থেকে লেখা।

আব্দু মুমুনি, *এডুকেশান ইন আফ্রিকা*। নিউ ইয়র্ক : প্রেজার, ১৯৬৮।

শ্লোয়ান অ্যান্ড কিচেন, *দি এডুকেটেড আফ্রিকান*।

উপাত্তের জন্য দ্বিতীয় বইটি উপকারী। আর বিশ্লেষণের কথা বলতে গেলে মুমুনির বইটি এক ধুন্ধুমার উদাহরণ।

ফ্রানৎস ফানোঁ, *ব্ল্যাক স্কিনস, ওয়াইট মাস্কস*। নিউ ইয়র্ক : গ্রোভ প্রেস, ১৯৬৭।

ঐ, *দ্য রেচেড অব দি আর্থ*। নিউ ইয়র্ক : গ্রোভ প্রেস, ১৯৬৩।

ঐ, *টুওয়ার্ডস দি আফ্রিকান রেভোল্যুশান*। নিউ ইয়র্ক : মান্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৬৭।

দাসত্ব ও উপনিবেশায়নের ফলে আফ্রিকানদের মনস্তত্ত্বে কীরকম প্রভাব পড়েছে, উক্ত বইগুলো তার অদ্বিতীয় উদাহরণ। সেই দাসত্ব ও পরাধীনতা আমেরিকার ভূমিতে হোক, বা আফ্রিকা মহাদেশে হোক। আফ্রিকান উপনিবেশবাদের সর্বশেষ পর্যায়সমূহ এবং নব্য-উপনিবেশবাদের আগমন সম্পর্কে ফানোঁ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, সারা বিশ্বে তার কোনো জুড়ি নেই।

পুনশ্চ

এ. এম. বাবু

অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের কি কোনো শর্টকাট আছে? বিগত দশকে বহু আগ্রহী ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে এই প্রশ্নটি। এদের মাঝে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন সংস্থা, ওএইউ, বিভিন্ন পরিকল্পনা সংস্থা এবং অর্থমন্ত্রীবৃন্দ। নানাজনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই দশকে। প্রকাশিত হয়েছে খণ্ডের পর খণ্ড রেজোল্যুশান, দিক-নির্দেশনা, শিক্ষণ নথিপত্র। এর ফলাফল হয়েছে নেতিবাচক। উন্নয়নশীল দেশগুলো অনুন্নতই রয়ে গেছে, উন্নতদের তুলনায় অবস্থা হয়েছে আরও খারাপ।

মোটাদাগে এই প্রশ্ন এখনো অনুত্তরিত। এই দশকেও কি আমরা একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটাব? দেখে মনে হচ্ছে, তা-ই করে চলেছি। ইতিমধ্যে জাতিসংঘ একইরকম জযবা ও ধুমধাম সহকারে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক দশক ঘোষণা করেছে, যেমনটা করেছিল প্রথমটির সময়ে। উন্নত দেশগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছে দানশীল হওয়ার জন্য এবং "তাদের জাতীয় আয়ের এক শতাংশ" উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাহায্যার্থে প্রদান করার জন্য। যেন বিশ্বের জনগণকে গরিবই থেকে যাওয়া উচিত, যাতে বড়লোকরা দানশীল হতে পারে! অতীত যদি কথা বলেই থাকে, তাহলে ষাটের দশক যেভাবে শেষ হয়েছে, সত্তরেও একইরকম হতাশার অভিজ্ঞতাই হতে চলেছে।

প্রশ্ন জাগে, ভুলটা কোথায় হচ্ছে? অনুন্নতির কি এমন কোনো অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই আছে, যার ফলে উন্নয়ন এভাবে অসম্ভব হয়ে গেল? বহু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন: সাংস্কৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, এমনকি অর্থনৈতিকও। এগুলোর কোনোটাই তেমন আশাপ্রদ ফল দেয়নি। সত্যি বলতে, প্রায় সবগুলোই নেতিবাচক ফল দিয়েছে এবং পরিস্থিতিকে করে দিয়েছে আরও খারাপ। জনগণকে বলি দিয়ে কি আমরা সেই একই গবেষণা চালিয়ে যেতে

থাকবে? স্বীকার করতেই হয়, গত দশকের এতশত গবেষণার পুরো ধকলটা
কিন্তু এই জনগণের ওপর দিয়েই গেছে। এটা এমন এক প্রশ্ন, যা সকল
উন্নয়নশীল দেশের নিজেকে করা উচিত। বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোর।
যত আগে হয়, ততই ভালো। কারণ আমাদের অর্থনীতি চিরতরে বিকৃত হয়ে
যেতে আর বেশিদিন বাকি নেই। তখন হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনো অর্থপূর্ণ
পুনর্গঠনের কাজ করাও যাবে না।

ড. ওয়াল্টার রডনি এই অসাধারণ বইটিতে দারুণ এক আলোচনার
সূচনা ঘটিয়েছেন। এরই হাত ধরে একসময় হয়তো সঠিক সমাধান বেরিয়ে
আসতেও পারে। অনুন্নতি ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার যে প্রকৃতি, সে ব্যাপারে
একদম মৌলিক প্রশ্নগুলো উত্থাপিত করেছেন তিনি। এ ধরনের অন্য বহু
লেখালেখিতেই এই সমস্যাটিকে অনেকটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে
(যদিও এগুলোর শরীরে ঠিকই বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পোশাক চাপানো)।
পক্ষান্তরে ড. রডনি অনুসরণ করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এর মূল কথা:
"বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকে বুঝতে হবে। আর ভবিষ্যৎকে জানতে
হলে বুঝতে হবে অতীত ও বর্তমানকে।" এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
অন্তত এতটুকু ভরসা রাখা যায় যে, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এর উপসংহারটি
কলুষিত হবে না।

বিশেষত রডনির ব্যাখ্যা পড়ার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিগত দশকটি
জুড়ে আমরা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার ব্যাপারে ভুল প্রশ্নটি করে গেছি।
আমরা "বর্তমানকে বোঝার জন্য অতীতের দিকে" তাকাইনি। আমাদের বলা
হয়েছে এবং স্বীকার করানো হয়েছে, দারিদ্র্যই আমাদের দারিদ্র্যের কারণ।
বর্তমানকালের জনপ্রিয় এক তত্ত্ব যেটাকে বলে "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র"। আমরা
সেই চক্রকে ভাঙার উপায় ও পদ্ধতি খোঁজার জন্য সেই চক্রের ভেতরই
ঘুরপাক খেয়েছি। ড. রডনি তার বইয়ে যে মৌলিক প্রশ্নগুলো তুলেছেন,
সেগুলো তুলতে পারলে "বিদেশি বিনিয়োগ"-এর হাতে আমাদের অর্থনীতি
নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠিত হতো না। দুষ্টচক্র তত্ত্বের প্রবক্তারা এই বিদেশি বিনিয়োগের
ঘোরতর সমর্থক। বিদেশি বিনিয়োগ যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমাধান নয়,
বরং কারণ—তা এতক্ষণে পরিষ্কার।

অতীতে উপনিবেশায়িত হয়েছিলাম বলেই কি আমরা এখন অনুন্নত নই?
অনুন্নত বিশ্বের পুরোটাই যে এককালে পশ্চিমা শক্তিগুলোর হাতে প্রত্যক্ষ বা
পরোক্ষভাবে উপনিবেশায়িত ছিল, এটার আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? আর
উপনিবেশায়ন কি মেট্রোপলিটন শক্তিগুলোর "বিদেশি বিনিয়োগ"-এরই একটি

ব্যবস্থা নয়? অতীতে যেহেতু এটি আমাদের অনুন্নতিতে অবদান রেখেছে, বর্তমানেও কি তা-ই হবে না? এমনকি রাজনীতির লাগাম আমাদের নিজেদের হাতে থাকলেও? এভাবে প্রশ্ন করলে অনুন্নতির ব্যাপারটি আরও বেশি বোধগম্য হয়ে ওঠে। এমনকি যাদের এ ব্যাপারে তেমন লেখাপড়া নেই, তাদের কাছেও। আর ড. রডনি ঠিক এভাবেই প্রশ্ন করার পথ দেখাচ্ছেন আমাদের।

এখান থেকে একটাই উপসংহারে আসা যায়। বিদেশি বিনিয়োগ বিপুল পরিমাণ মুনাফা হাতানোর মাধ্যমে আমাদের দেশগুলোর অবমূল্যায়ন করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। বরং ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি করছে সব দেশের অর্থনীতিতে। সময়মতো এই প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দিতে না পারলে এই বিকৃতি স্থায়ী হয়ে যাবে। বিগত শতাব্দীগুলোর মতো এখনো যদি আমরা কথিত বিশ্ববাজার তৈরি করা অব্যাহত রাখি, তাহলে আমাদের অর্থনীতি ঔপনিবেশিকই থেকে যাবে। কারণ এই কথিত বিশ্ববাজারের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দাসপ্রথা আর উপনিবেশবাদের জগদ্দল পাথর। কোনো উন্নতি হলেও তা হবে কাকতালীয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশটির কোনো সংশ্লিষ্টতাই থাকবে না। "বিশ্ববাজার" হাত করার জন্য যতই আমরা রপ্তানি খাতে বিনিয়োগ করব, ততই উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ থেকে সরে যেতে থাকবে মানুষের দৃষ্টি। ফলে আমাদের উন্নয়নের চেষ্টাও কার্যকারিতা হারাতে থাকবে।

এ ধরনের বিনিয়োগের ফলে অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই পশ্চিমা দেশগুলো যা কিছু ক্রয়-বিক্রয় করতে রাজি, আমাদের দেশগুলো শুধু সেগুলোর প্রতিই সাড়া দিয়ে চলে। অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন, সেটার প্রতি সাড়া দেয় না বললেই চলে। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে "গ্রামাঞ্চলীয় প্রকল্প"-এর জন্য বিশাল বরাদ্দ রাখা হয় বটে। কিন্তু প্রতিবারই এসব বরাদ্দের বেশির ভাগ ফিরে আসে শহরাঞ্চলীয় প্রকল্পগুলোয়। ফলে আরও বেড়ে যায় গ্রাম-শহর বৈষম্য। বস্তি, বেকারত্ব, সামাজিক অসংগতি, এবং সর্বোপরি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হয়ে গেছে আমাদের সবচেয়ে প্রকট বৈশিষ্ট্য।

উন্নয়ন সত্যিকার অর্থে কার্যকরী হতে হলে আগে অর্থনীতিকে বানাতে হবে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রতি সাড়াদানকারী। এর ঔপনিবেশিক, বাহ্যিক সাড়াদানকারী রূপটিকে পালটে দিতে হবে। এটি উন্নয়নের মৌলিক চাহিদা। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই, প্রায় সকল সাবেক ঔপনিবেশিক দেশ এটিকে অগ্রাহ্য করে আসছে। শোষণকারীদের শিখিয়ে দেওয়া ধ্যান-ধারণাকে যখন

থেকে আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করেছি, তখন থেকেই গুবলেট পাকিয়ে গেছে সবকিছু। এসকল ধ্যান-ধারণার মূল কথা: "রপ্তানি এবং আর্থিক সম্পদের পরিমাণ অপর্যাপ্ত বলেই অনুন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব দেশের 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ'।" এর সমাধান হিসেবে তারা বলে: "রপ্তানি বাড়াতে হবে, উন্নত দেশ থেকে সাহায্য ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।"

গত দশকজুড়ে আমরা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য সহকারে এই ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে গিয়েছি। যদিও আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই একে মিথ্যে প্রমাণিত করে, তবুও একে মান্য করে চলেছি উগ্রের মতো! আসলে মানসিক বি-উপনিবেশায়নই বেশি দরকার। কারণ এহেন পাগলামিকে না কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে জায়েজ করা যায়, না সুস্থ অর্থনীতির সাহায্যে, আর না আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে।

কিছু দেশ ভিন্ন একটা পথ বেছে নিয়েছে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথ। এটাই এখানে সবচেয়ে বেশি দিক-নির্দেশনামূলক। উত্তর কোরিয়া বা আলবেনিয়াকে দেখুন। এই পঞ্চাশের দশকেও দেশ দুটি ছিল অনুন্নত। এরপর তারা দুর্দান্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত করেছে। এর একমাত্র কারণ, তথাকথিত বিশ্ববাজারের জন্য উৎপাদন করা বাদ দিয়ে দিয়েছে তারা। এর বদলে নিজেদের সম্পদকে ব্যবহার করেছে অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত ভিত্তির উন্নয়ন ঘটানোর জন্য।

পিয়ারসন কমিশনের রিপোর্ট পার্টনার্স ইন ডেভেলাপমেন্টকে সবাই যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ বলে ধন্য ধন্য করছে। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোও। যেন এটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কিছু একটা। এমনকি এই রিপোর্টের পরামর্শগুলো যদি অক্ষরে অক্ষরেও বাস্তবায়িত করা হয়, তবুও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ওপর সামান্যতম প্রভাব পড়বে কি না সন্দেহ। কারণ সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নটিকেই এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে: "আমাদের উৎপাদন কৌশল যতদিন বিশ্ববাজারের চাহিদা দিয়ে প্রভাবিত থাকছে, ততদিন কি উন্নয়ন আসলেই সম্ভব? অথচ বিশ্ববাজারকে প্রায় একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদী ইউরোপ ও আমেরিকার উৎপাদন ও ভোগের বিন্যাস।" আরেকভাবে বললে, বিশ্ববাজারের চাহিদা সবসময় আমাদের নিজেদের উন্নয়নের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাহলে তাদের চাহিদা অনুযায়ী

নিজেদের অর্থনীতিকে বিকৃত করার মাধ্যমে আমরা কি দেশের স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির সামর্থ্য নষ্ট করে দিচ্ছি না? অথচ এই সামর্থ্য হলো উন্নয়নের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

এইভাবে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেই আন্তর্জাতিক মায়াকান্নাকারীদের টাঙানো পর্দা খসে পড়ে। বেরিয়ে আসতে থাকে আমাদের অনুন্নতির আসল কারণ। অবশ্য পিয়ারসন বা তার উদারপন্থি মিত্ররা এই প্রশ্ন এভাবে করতে পারবেন, এমনটা আশা করা বোকামি। কারণ তাদের প্রশিক্ষিত করাই হয়েছে এমনভাবে, যেখানে এ ধরনের প্রশ্ন করা রীতিমতো গুনাহের কাজ।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের নেতা হিসেবে আমাদের এরকম প্রশ্ন ছোঁড়া শিখতে হবে। কারণ উন্নয়নের পথচলার দায়িত্ব আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। এর সাফল্য বা ব্যর্থতা কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করবে লাখো কোটি মানুষের জীবনকে, যারা পুরো মানবজাতির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি।

বহুকাল যাবৎ আমরা তাদের ভাগ্যকে এমন এক উৎপাদন-ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, যা তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। বরং গড়ে উঠেছে তথাকথিত বিশ্ববাজারের চাহিদা-জোগান নীতির ওপর ভিত্তি করে। বাহিরের পক্ষদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই যার উদ্দেশ্য। আমরা তাদের শিক্ষাকে বাঁকাত্যাড়া করে দিয়েছি। তাই তাদের এমনসব "দক্ষতা" গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করি, যা তাদের নিজেদের বস্তুগত ভিত্তির উন্নয়ন ঘটায় না। বরং ওই একই বিশ্ববাজারের দাস হয়ে থাকে। এর ফলে আমরা প্রযুক্তিগতভাবে এবং উন্নত দেশগুলোর সাপেক্ষে এগিয়ে চলা তো দূরের কথা, উলটো আরও পিছিয়ে যাই। শান্তশিষ্টভাবে আমরা মেনে নিয়েছি তথাকথিত আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনকে। আর এর ফলে জনগণকে এমনসব পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করছি, যেগুলো না তাদের প্রযুক্তিগত বিকাশে সহায়তা করে, আর না উন্নততর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের তাড়না জোগায়। অথচ এ দুটি জিনিসই সত্যিকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

ড. রডনির বইয়ের গুরুত্ব এই যে, এটি নেতাদের উদ্দেশ্যে না, বরং যথার্থই জনগণকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে জনগণকে কিছুটা হলেও বড় কোনো পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। প্রতিশ্রুতিশীল নেতৃত্বের অভাবে বহু আফ্রিকান দেশ সামরিক শোষণের হাতে পড়ে গেছে। অবস্থা এমন যে, আফ্রিকান সম্মেলনের বেশির ভাগ নেতাই সেনাপ্রধান। হবেই তো! কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের চেতনা হারিয়ে ফেলে, জনগণের সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দেয়, আর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সম্পদ

একোয়া করতে শুরু করে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব তখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমেই "আদেশবাদী" হয়ে উঠতে থাকে। যুক্তি আর বিবেকবোধকে ভাবা হয় বিদ্রোহ। আর রাজনীতিবিদরা যখন আদেশবাদী হয়ে ওঠে, তখন তারা নিজেরাও হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয়। কারণ আদেশ দেওয়াই যদি কাজ হয়, তাহলে সেখানে সেনাবাহিনীর চেয়ে ভালো আর কে আছে?

সারা মহাদেশ জুড়ে বর্তমানে নেতাদের যে স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে, আফ্রিকা তাদের থেকে কোনো উপকার পাচ্ছে না। দুঃখের সাথে বলতে হয়, এতে ব্যতিক্রমের সংখ্যা খুবই কম। এশিয়া আর লাতিন আমেরিকা থেকে তৈরি হয় মাও সে তুং, হোচিমিন, আর চে গুয়েভারার মতো রথী-মহারথী। তারা শুধু স্বদেশের সঙ্গীদেরই না, বরং বাকি বিশ্বকেও আশায় উদ্বেলিত করে তোলেন। এমনকি উন্নত বিশ্বকে পর্যন্ত। আর এদিকে আফ্রিকায় তৈরি হয়েছেন মাত্র একজন নিয়েরেরে। ওদিকে আমরা লুমুম্বাকে খুন করে ফেলেছি, সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমে বন্দি বা নির্বাসিত করেছি বেন বেল্লা ও এনক্রুমার মতো নেতাদের। কারণ ওই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দাতা, আমাদের ত্রাতা, আমাদের অভিভাবক, আমাদের প্রভু, আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদার।

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক বলছি, দুই-একজন সম্মাননীয় ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বর্তমান নেতাদের মাঝে এমন কাউকে দেখা যায় না, যিনি জনগণের সত্যিকার অধিকারের পক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম। তারা ভালো করেই জানেন, এসকল অধিকার সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। অথচ নেতা হিসেবে আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে হলে এভাবে দাঁড়ানোটা আবশ্যক। নাহলে জনগণের ওপর নেতা হিসেবে নিজেদের চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই। বেশির ভাগ নেতার মাঝে জনগণের দুর্ভোগ দূর করার কোনো তাড়না নেই, কারণ তারা নিজেরা এই দুর্ভোগের শিকার হননি। কিন্তু যে জনগণ এর ভুক্তভোগী, তারা অধৈর্য হয়ে উঠছে। এজন্যই আশা করা যায়, ড. রডনির বইটি ব্যাপক হারে পঠিত হবে। এমন এক সময় চলে এসেছে, যখন কথা নয়, কাজ চাই।

দাসত্বের পাশবিকতা, পরাধীনতা, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার এক মর্মভেদী বর্ণনা এখানে উঠে এসেছে। পুরো একটা সভ্যতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য। স্থিতিশীল সমাজগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী বাহুর ঝাঁকুনিতে। এতে করে "নতুন বিশ্ব"-এর উপনিবেশ-মালিকেরা আফ্রিকার মানুষদের শেকড় থেকে ছিন্ন করে স্থায়ীভাবে গোলাম বানিয়ে ফেলে। তাদের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলে বর্তমানের

এই উন্নততম পুঁজিবাদী অর্থনীতি। তাই এখন পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুক্তির একমাত্র পথ বিপ্লবের পথ—যে ব্যবস্থাটি আমাদের অতীত ও বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে বেরিয়ে আসা।

আমাদের ভবিষ্যৎ পথের দিশা হতে হবে দ্বান্দ্বিক। অতীতকে দেখে যদি আমরা বর্তমানকে জানতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎকে জানতে হলে অবশ্যই তাকাতে হবে বর্তমানের দিকে। আমাদের কাজ হতে হবে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। আধ্যাত্মিক আশা ও আকাঙ্ক্ষায় আটকে গেলে হবে না। যে রাক্ষস গোটা ইতিহাসজুড়ে আমাদের ধাওয়া করে গেছে, সেটা আচমকা একদিন ভেড়া হয়ে যাবে না। এ আশা ও আকাঙ্ক্ষা করে লাভ নেই। এঙ্গেলস যেমনটি বলেছেন : "প্রকৃতির নিয়ম থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার স্বপ্নের মাধ্যমে মুক্তি আসে না, বরং আসে এসব নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান থেকে ... তাই ইচ্ছের স্বাধীনতা মানে ওই বিষয়টির ব্যাপারে জ্ঞান সহকারে সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা।" বিষয়টিকে আমরা খুব ভালোভাবে চিনেছি, আর সে এক রাক্ষস। এখন যখন ড. রডনি আমাদের বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে ফেলেছেন, আমরা কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা রাখি? জনগণকে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে।

দার-এস-সালাম, তানজানিয়া

ডিসেম্বর, ১৯৭১

এ. এম. বাবু